ভারতের লোককথা

ভারতের লোক সংস্কৃতি

ভারতের লোককথা

বাইশটি ভাষার প্রচলিত লোককথার সংকলন

সংকলন ও সম্পাদনা

এ. কে. রামানুজন

অনুবাদ

মহাশ্বেতা দেবী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

কেরোলিন ও অ্যালান ডাণ্ডেসকে

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

ভারতের শ্রুতিবাহিত এ গল্পগুলি, যা বাইশটি ভাষা থেকে নির্বাচিত ও অনূদিত হল, তা ভারতের প্রায় সব অঞ্চলেরই। এর নাম ভারতের লোককথা, ভারতীয় লোককথা নয়। কেননা, কোন সংকলনই ভারতের লোককথার বিচিত্র ও পরিবর্তনশীল জীবনস্রোতকে যথার্থতায় উপস্থাপনা করতে পারে না। তার বদলে এটি, এই উপমহাদেশের প্রিয় রূপকথাগুলির নিদর্শন মাত্র। সামান্য কয়েকটি বাদ দিলে এ সব গল্পের প্রত্যেকটিই যেমন একটি অঞ্চলের একজন গল্পবলিয়ের কাছে পাওয়া,—তেমনিই তা সামান্য অন্যরকম করে অন্যান্য অঞ্চলেও বলা হয়। প্রতিটি গল্প একজনই বলেছেন, লেখাও হয়েছে তখনকাব পাঠকের জন্য। আবার আপনি, বা অন্য কেউ সেটি যেই পড়লেন, তখন সে কাহিনী আবার প্রাণবন্ত হল। পুনর্কথন কালে সেটি সামান্য বদলে দিলেন। গল্পগুলি পেয়েছি পরম্পরা সূত্রে। নির্বাচন, সাজানো ও লেখার কালে আমি আবার সেগুলির ওপর কাজ করেছি। বলতে পারেন, আমিই শেষ কথক। আপনিই শেষ শ্রোতা। আপনি আবার এ গল্প নতুন করে বলবেন। প্রবাদ যেমন প্রাসঙ্গিকতার প্রেক্ষিতে অর্থবহ হয়, গল্পও তাই। এ বইয়ের বেলা মানেটা আপনার আমার মধ্যে এখানকার মতো বুঝে নেবার ব্যাপার। লোককথা তো কবিতায় সেই অধ্যয়ন, যার মধ্যে প্রবাহিত হয় তার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের কিছু কিছু। তা এক চলমান রূপক অলঙ্কারও বটে। যা যতবার বলা হয় ততবার তার নতুন নতুন অর্থ মেলে। কবিতার বই হলে যেমনটি করতাম, তেমনি করেই গল্পগুলিকে বৃত্তবিন্যাসে সাজিয়েছি। তারা এ-ওর সঙ্গে সংলাপ বিনিময় করছে। আর অভিঘাতে, মিশ্রণে, তৈরি করছে মিলেমিশে এক নিজস্ব জগৎ।

শ্রুতিবাহিত গল্পের আদি কথনটি কোন মতেই যথাযথ উপস্থাপন করা যায় না। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন মানুষ তা অনুবাদ করেছে। আমি ওগুলি ফিরে বলেছি মাত্র। কোথাও সামান্যই বদলেছি। যেখানে ভাষা বিরক্তিকর, জবড়জং বা নেহাৎ অচল, সেখানে বেশি বদলেছি। গল্প বলার মূল সুরটি অনুসরণ করেছি। কোন খুঁটিনাটি বা প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ বাদ দিইনি। গল্পটির মূল বিষয়বস্তু অটুট রেখেছি। গল্পগুলি যেমন নাটকীয় এবং শিল্পসম্মত, তার ওপর রং চড়াবার জন্য কাহিনীর বিভিন্ন রূপান্তরে বিধৃত ঘটনাবলীকে বদলাইনি।

লিখিত গল্প নয়। আমি সযত্নে নিয়েছি সত্যি কোন কথকের মুখে বলা গল্প। এ গুলির এক চতুর্থাংশ আমার সংকলিত, বা মনে থাকা গল্প। কিছু তো কোনদিন ছাপাই হয়নি। ইংরিজিতেও কখনো অনুবাদ হয়নি।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে শ্রুতিবাহিত লোককথার কিছু শ্রেষ্ঠ সংকলন বেরোয় 'দি ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারিং', 'দি জার্নাল অফ দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল', 'নর্থ ইণ্ডিয়ান নোট্‌স অ্যাণ্ড কুয়েরিজ' এমন সব পত্রিকায়। তা থেকেও অনেক নিয়েছি। সরকারী কর্মচারীরা, তাঁদের স্ত্রী-কন্যারা, বিদেশী মিশনারীরা, ভারতীয় বিদ্বজ্জনরা এ উদ্যোগে অংশ নেন। সে সময়ে দুই হাজারেরও বেশি গল্প সংগৃহীত, অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। গল্পগুলি পুরনো, তবু তা বলা হয়, আজও বলা হয়।

ভারত বিষয়ে যে কোন গবেষণা ক্ষেত্রেই শ্রুতিবাহিত ঐতিহ্যের গুরুত্ব ভূমিকায় আলোচিত হ'য়। তবু মনে রাখতে হবে যে এ গল্পগুলি সর্বাগ্রে পড়তে হবে আনন্দের জন্য, নান্দনিক অভিজ্ঞতায় উপলব্ধির জন্য। একটি প্রাচীন চৈনিক প্রবাদ যেমন বলেছে, 'অনেক জবাব দেবার আছে বলে পাখি কিন্তু গান গায় না। গান তাদের আছে, তাই তারা গায়।' গানেরও তো আছে নিজ নিজ সীমানা, প্রজাতি, সূত্র, ক্রিয়াক্ষেত্র।

আমার নিজের পিতামহী থেকে শুরু করে ভারতব্যাপী অসংখ্য গল্পবলিয়েদের কাছেই শুধু ঋণী নই। পৃথিবীর নানা জায়গায় শতাধিক বর্ষ ধরে যে সব সংকলক, বিদ্বজ্জন, সম্পাদক, নির্ঘণ্ট নির্মাতারা আছেন, আমি ঋণী তাঁদের কাছেও। ওয়েণ্ডি উল্‌ফ, সুসান বেরঘোল্‌ঝ পাঁচ বছর আগে এই পরিকল্পনা সূচিত করেন। গল্পগুলি পড়ে বারবারা স্টোলার মিলার ও ওয়েণ্ডি ডোনিগেলের আনন্দ রীতিমত প্রেরণা দিয়েছিল। য়োজি য়ামাগুচির সৌজন্য, সম্পদনার দক্ষতা ও সবিনয়ে আমাকে তাগাদা দেওয়া,---এর ফলে বইটি শেষ করতে ও সাজাতে সুবিধা হয়। বইয়ের কথা যখন ভাবিনি, তখন থেকেই লোককথা শুনতে ও সংগ্রহ করতে ভালবাসতাম। ১৯৫৬ সালে দক্ষিণ ভারতে এক ছোট্ট শহরে এডুইন কার্কল্যাণ্ডের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে সচেতন হলাম যে, লোককথা এক অনুশীলনীয় বিষয়। আমেরিকায় এসে প্রথম মাসেই যাঁদের সঙ্গে দেখা হয় সেই ক্যারোলীন ও আলান ডাণ্ডেসের সঙ্গে অর্ধজীবন ব্যাপী বন্ধুত্ব এক অবিচ্ছিন্ন আনন্দ ও নিরন্তর শিক্ষা। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অফ সাউথ এশিয়ান ল্যাংগুয়েজের সতীর্থগণ, আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়ান স্টাডিজের আর্থিক সহায়তা আর রিজেনস্টাইন লাইব্রেরীর সমৃদ্ধ সঞ্চয় এ বইকে সব কিছুই সাহায্য করেছে। প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাই।

এ. কে. রামানুজন
শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়

ভুমিকা

যিনি ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলন করছেন, তাঁরই লিখিত ক্লাসিক পড়াই যথেষ্ট, এমন নয়। ভারতের শ্রুতিবাহিত ঐতিহ্যও জানা দরকার। লোককথা এ ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। লোককথা ব্যাপ্ত করে রেখেছে শৈশব, পরিবার, সমাজ এবং জনগণের নিরক্ষর অংশের সংস্কৃতি ও প্রতীকী ভাষা। চেন্নাই, মুম্বই বা কলকাতার মত কোন বড় শহরে, এমন কি পাশ্চাত্য অনুগামী নিউক্লিয়ার পরিবার ও তাদের সুপরিকল্পিত ২.২ ছেলেমেয়ে, সেখানেও প্রবাদ, ঘুমপাড়ানী ছড়া, টোটকা ওষুধ, লোককথা আছেই একটু দূরে শহরতলীতে, কোন নিকটাত্মীয় বা ঠাকুমা দিদিমা যেখানে, সেখানেই। চেন্নাইয়ের মতো শহরের গলিতেই চলে খাঁটি লোকনাট্য উৎসব, তার সঙ্গে জড়িত যত লোক নৃত্য ও নাট্য। যেমন, হাতীমুখো গণেশকে নিয়ে মুম্বইয়ে। এ সব গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক ঘটনা। এক কন্নড় ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপক আমাকে বললেন, 'আজকাল বড় শহরে লোককথা সংগ্রহ করবেন কেমন করে?' আমি বললাম, বরং তিনি ক্লাসে তাঁর শহুরে ছাত্রদের বলুন, যে-রূপকথা তারা শুনেছে মাত্র, পড়েনি, তেমন একটি লিখতে। সেই সন্ধ্যায় আমার বন্ধু উত্তেজিত হয়ে আমাকে দেখাল এক বাণ্ডিল কাগজ। ওর ছাত্র স্মৃতি থেকে চল্লিশটা শোনা-গল্প লিখেছে।

যেখনেই মানুষ, সেখানেই লোককথার জন্ম। নতুন নতুন তামাশা, প্রবাদ (যেমন কলেজে, টু জেরক্স ইজ টু নো), ছড়া, গল্প, গান তো মুখে মুখেই তৈরি হয় ও ফেরে। একটি চিঠি পেলে অনেক চিঠি লেখা, মারকি'জ ল, কাগজে লিখিত দৌড়ে বেড়ায়, নয়তো শৌচালয়ের দেয়ালে গ্র্যাফিতি হয়ে দেখা দেয়। প্রধানত শ্রুতিবাহিত ঐতিহ্য অনুসারে মুখে মুখে লোককথা ফেরে (প্রবাদ, ধাঁধা ও হেঁয়ালি, ঘুমপাড়ানি ছড়া, গল্প, দীর্ঘ কবিতা, গদ্যে বলা গল্প, গান),—কথিত বা শ্রুতিবাহিত নয়, অন্য রূপে (নাচ, খেলা, মেঝে বা দেয়াল চিত্র, খেলনা থেকে শুরু করে গ্রামে গ্রামে মাটির ঘোড়া),—আর যৌথ দৃশ্য শিল্প (রাস্তার ম্যাজিক ও থিয়েটার, যাতে মিশে থাকে গদ্য, কবিতা, ছড়া, গান, নাচ, নানা স্থানীয় জিনিস, পোশাক)—এ সব প্রকাশধর্মী লোকরীতি বড় শহর, ছোট শহর ও গ্রামজীবনের প্রতি বৃত্তে জড়িয়ে আছে। জলবৃত্তের বাগধারা না জানলে ঘরের বা জনজীবনের সংস্কৃতি পুরো বোঝা যায় না। ভারতের সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্র, সাংস্কৃতিক প্রদর্শন, 'সে মহাকাব্যীয় ক্লাসিক, বা থিয়েটার, বা আধুনিক ফিল্ম, বা

রাজনীতিক বক্তব্য সব কিছুই শ্রুতি পরম্পরা ও লোকরীতির কাছে ঋণী। শিল্প, রাজনীতি, ধর্ম এভাবে আমরা এর থেকে ওকে পৃথক করায় যত চেষ্টাই করি না কেন, যেন তা একেরই ভিন্নমুখী বহির্প্রকাশ। ব্যক্তির শৈশবেই গড়ে ওঠে নন্দনবীক্ষা, চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য এবং পৃথিবীকে দেখার দৃষ্টি। সে-সবই চলতে থাকে প্রথম জীবনে। পরে এ সব শাব্দ্য এবং নিঃশব্দ পরিবেশ তাকে আরো সচেতন করে সে বিষয়ে। মূলত অক্ষরহীন যে সংস্কৃতি, তাতে সকলের মধ্যেই আছে এক বৃহৎ অক্ষরহীন উপমহাদেশ। সে গরিব বা ধনী, উচ্চ বা নীচু জাত, অধ্যাপক, পণ্ডিত, বা মূর্খ যাই হোক না কেন।

এক দক্ষিণ ভারতীয় লোককথানুসারে (এটি অন্যত্রও বলা হয়), অন্ধকার রাতে এক বুড়ি গভীর অভিনিবেশে রাস্তায় কি যেন খুঁজছিল। পথচলতি একজন শুধাল, 'কিছু কি হারিয়ে ফেলেছ?'

বুড়ি বলল, 'হ্যাঁ, চাবিটা হারিয়েছি। সারা সন্ধ্যা সেটাই খুঁজে মরছি।'

—'হারালে কোথায়?'

—'জানি না। হয়তো বাড়িতেই হারিয়েছি।'

—'তবে এখানে খুঁজছ কেন?'

—'সেখানে যে অন্ধকার। বাতিতে তেল নেই। এখানে পথের আলোয় খানিক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

আজও, ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক অনেক গবেষণা ওই নীতি মেনেই করা হয়। আলো যেখানে, সেখানে খোঁজো,—খোঁজো সংস্কৃতে, লিখিত পাঠে৷ যেগুলোকে মনে করি সংস্কৃতির আলোকদীপ্ত, সেই সব জায়গায়। যেগুলো আমরা জানি। সেখানে অবশ্যই আমরা মূল্যবান অনেক কিছু পেয়েছি। এমন এক বইয়ে এমন নীতি কথায় জের টেনে লাভ নেই। বলা চলে, আমরা এখন অন্দরে ঢুকছি চাবি খুঁজতে, ঘরসংসারের ব্যঞ্জনাময় সংস্কৃতির মধ্যে। যেমনটি প্রায় ঘটে, হয়তো চাবি খুঁজে পাব না,—হয়তো নতুন চাবি বানাতে হবে, --হয়তো অনেক কিছু পেয়ে যাব, যা ছিল বলেই জানতাম না, যা হারিয়ে গিয়েছিল।

ভারতের আঞ্চলিক ভাষা[১]

আমরা এ বইয়ের শিরোনামায় যেমন বলছি, তেমন যে কেউ যখন 'ভারতীয়' বা 'ভারত' বলে, যেন তড়িঘড়ি এটাও বলা দরকার যে ভারত বলতে তা অনেকগুলো ভারতের সমাহার। একশোরও বেশি ভাষা, দশটি মুখ্য ও অজস্র গৌণ লিপি-নিয়ম, বহু প্রাচীন ধর্ম ও সেগুলির অগণিত শাখা, সম্প্রদায় ও পূজাপদ্ধতি, সহস্রাধিক জাতির সংমিশ্রণ, বিচিত্র ভূ-প্রকৃতি ও আবহাওয়া, সব কিছু মিলে গড়ে উঠেছে ঐতিহ্য ও প্রতি ঐতিহ্যের এক ভয়ানক জটিল মিশ্রণ।

বারবার বলা হয়, ভারত বিষয়ে যে কথাই অন্তর থেকে বলা যাক, ঠিক তার

বিপরীত কথাও একই আন্তরিকতায় বলা যায়। ভাষার মতো আর কিছুই ভারতের জীবন বৈচিত্র্যের পরিচয় দেয় না। ১৯৬১ লোকগণনায় ১,৬৫২ মাতৃভাষা রেকর্ড করা হয়। বক্তারা কথা বলার কালে যে বাচন বৈচিত্র্য ব্যবহার করেন, তার নামগুলিও লেখা হয়। ভাষাবিজ্ঞানীরা এই বাচন-বৈচিত্র্য বা আঞ্চলিক ভাষার শ্রেণী নির্ণয় করেন। সে গুলিকে ১০৫ মতো ভাষার অন্তর্ভুক্ত বলে চিহ্নিত করেন। এগুলি আবার চারটি ভাষা পরিবারভুক্ত।[২] এই ১০৫ বা অমনই কিছু ভাষার মধ্যে, ৯০ খানেক বলেন সমগ্র জনসংখ্যার ৫ শতাংশেরও কম মানুষ। ৬৫ হল ছোট ছোট আদিবাসী গোষ্ঠীর ভাষা। এর সঙ্গে যোগ করা উচিত আদি ভাষা সংস্কৃত, যা ধর্মপুস্তক, ক্লাসিক সাহিত্য ও ভারতীয় বিজ্ঞানসমূহের ভাষা,—এবং ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক ইংরিজি,—যা ব্যাপক ব্যবহৃত এক দ্বিতীয় ভাষা। ভাষাগুলির ১৫টি ভারতের জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশ লেখে, পড়ে ও বলে এবং প্রত্যেকটি বলে লক্ষ কোটি লোক।

এই পনেরটি ভাষার সাহিত্যের[৩] কোন কোনটির প্রাচীন ইতিহাস আছে। এগুলি পাশ্চাত্যে সবে শেখানো এবং অনূদিত হচ্ছে। তামিলের মতো এক ভাষার সাহিত্যের বয়স দুই হাজারেরও বেশি, অনেকগুলির ক্ষেত্রে যেমন বাংলা ও গুজরাটী, অন্তত আটশো বছরের। লিখিত সাহিত্যের উপর আছে শ্রুতিবাহিত ঐতিহ্য—হেঁয়ালি, প্রবাদ, গান, গাথা, রূপকথা, মহাকাব্য ইত্যাদি, আছে ১,৬০০ মতো আঞ্চলিক ভাষায় বা মাতৃভাষায়, যা আমরা ১০৫টি ভাষা শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছি। ভারতের শ্রুতিবাহিত লোককথা ব্যাখ্যা করতে হলে বলতে হয় তা হ'ল লৌকিক ভাষার সাহিত্য। তা গ্রাম, পথ, রান্নাঘর, আদিবাসীর কুটীর, পথের পাশের চা-দোকানের মাতৃভাষা। এটাই হ'ল ভারতীয় পিরামিডের ভিত্তি, যার উপর অন্য সব ভারতীয় সাহিত্য দাঁড়িয়ে আছে।

ভারতীয় সভ্যতা গবেষকরা পিরামিডের চূড়াটির মূল্যায়ন করেছেন, ওতে উঠেছেন। পরম্পরা অনুসারে ভারতীয়রা 'মার্গ' বা রাজপথ, এবং 'দেশী' বা 'মেঠোপথ' এ দুয়ের পার্থক্য করেন শিল্প আলোচনা কালে। আমেরিকান নৃতত্ত্ববিজ্ঞানে শিকাগোর নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী রবার্ট রেডফিলড ১৯৫০ ও ১৯৬০-র ভারতচর্চাকে প্রভাবিত করেছিলেন ও বলেছিলেন, 'একটি সভ্যতায় প্রতিবিম্বন ক্ষেপণকারী বস্তুর মহান ঐতিহ্য থাকে। অনুদ্রেককারী অনেক কিছুর ঐতিহ্য সংখ্যায় কমই থাকে।'[৪] এই 'মহান ঐতিহ্য', যা সংস্কৃত দ্বারা চালিত, তাকেই প্যান-ইণ্ডিয়ান, সমানজনক, প্রাচীন পাঠ্যগ্রন্থের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত বলে মনে করা হয়। 'ক্ষুদ্র ঐতিহ্য পাঠ্যগ্রন্থের ঐতিহ্যগুলিকে দেখা হয় সেগুলি আঞ্চলিক, প্রধানত শ্রুতিবাহিত, যা বাঁচিয়ে রেখেছে অক্ষর পরিচয়হীন লোকেরা (উদারপন্থীরা তাদের নিরক্ষর বলবেন)—এই অজ্ঞাতপরিচয়, প্রতিবিম্ব সৃজনে অক্ষম অসংখ্যজন।' রেডফিলড নিজে এবং মিলটন সিংগার পরে তাঁদের ধারণা সংশোধন করেন। অন্যেরা তাঁদের সমালোচক হয়ে ওঠেন। একদা এঁরা ছিলেন পথিকৃৎ। কেননা তাঁরা

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের বলেছিলেন, 'ফিলডওয়ার্কের' স্বার্থে তাঁরা যেন 'টেকার্টে'কে অবহেলা না করেন।

এখন আমাদের নতুন করে জোর দিতে হবে অনাত্র। 'টেক্সট'গুলি বিষয়ে চাই প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি। ভারতের মত এক দেশের সংস্কৃতিক্ষেত্রে লিখিত ও পবিত্র বলে গণ্য টেক্সটই একমাত্র টেক্সট নয়। শ্রুতিবাহিত ঐতিহ্যের প্রতিটি নতুন টেক্সট তৈরি করে। 'সাংস্কৃতিক কাজকর্মে'র প্রতিটি, সে নাটক, ধর্মাচার, খেলাধুলা যাই হোক, তাতে লিখিত ও শ্রুতিবাহিত নিজস্ব টেক্সট থাকে। এক অর্থে, প্রতিটি সাংস্কৃতিক কাজই নিজেই এক টেক্সট।

এ ভাবে যদি দেখি, তবে 'মহান ঐতিহ্য', 'গৌণ ঐতিহ্য' এমন সব পরিভাষাকে সংস্কার করতেই হয়। এ সব সাংস্কৃতিক কাজকর্মকে দেখতে হয় এক ক্রিয়াশীল গতি হিসেবে। 'নানা মাত্রার রূপ' যেন, যা এ-ওর ডাকে সাড়া দেয়, সর্বদা গতিশীল তাদের প্রাণদীপ্ত কথোপকথনের সম্পর্ক। অতীত ও বর্তমান, কি 'প্যান-ইণ্ডিয়ান', কি স্থানিয়, লিখিত ও শ্রুতিবাহিত, শাব্দিক ও অশাব্দিক—সব নিযুক্ত আছে প্রাসঙ্গিক অন্যগুলিকে ঢেলে সাজাতে, নতুন করে ব্যাখ্যা করতে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে যা 'ধ্রুপদী', 'লোকবৃত্তের' ও 'জনপ্রিয়' বলে স্বতন্ত্রীকৃত,—তাদের দেখা যাবে পারস্পরিক ক্রিয়াশীল এক অনবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া রূপে। টেক্সট তাহলে প্রাসঙ্গিকতাও, অন্যান্য টেক্সটের পূর্বকথাও বটে। এখন গবেষণা করতে গিয়ে তা আমরা বুঝছি এবং লোকবৃত্তের টেক্সটকে এই মূলপাঠের চিরন্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে স্থাপন করছি। সমাজে সকল পাঠ্যবস্তুর সর্বত্র তার সকল স্তরে এই লোকবৃত্তের টেক্সট ব্যাপ্ত, পিছনে, নিচে, সর্বত্র। শুধু গ্রামীন বা অনক্ষরদের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। শহর ও গ্রাম, কারখানা ও রন্ধনশালা, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলিম, সকল জাতি ও শ্রেণী, জরাগ্রস্ত পঞ্জিকা এবং দ্রুতগতি কম্পিউটার,—সব ব্যপ্ত করে রেখেছে শ্রুতিবাহিত ঐতিহ্য, গল্প, কৌতুক, বিশ্বাস, এবং অভিজ্ঞতা,—বইয়ের তত্ত্ব নয়।

আন্তরক্রিয়াশীল সর্বভারতীয় ব্যবস্থাগুলি

এখানে যে অভিমতকে অবয়ব দেওয়া হচ্ছে, তা হ'ল ব্রহ্মণ্যবাদ, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, তন্ত্র ও ভক্তি এমন সব আন্তরক্রিয়াশীল সর্বভারতীয় ব্যবস্থার সক্রিয়তা। অর্থাৎ যাকে মহান ঐতিহ্য বলি, তাও একবাচনিক নয়, উপরের অর্থে বহুবাচনিক, এক নয়, বহু। আরো ব্যাপকার্থে আমাদের আরো ধরা উচিত ইসলাম, জরাথুস্ত্রের ধর্ম, ক্রীশ্চানধর্ম এবং আধুনিকতা,—সেগুলি সেইসব ক্রিয়াশীল ব্যবস্থা যা এই দেওয়া নেওয়াতে অংশ নেয়।[৫] এ সব কিছুর মধ্যেই লোককথা আছে। যেমন, এ বইয়ের শ্রুতিবাহিত কাহিনীগুলি বহু সম্প্রদায় থেকে সংকলিত, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলামীয় এমন কি ক্রীশ্চান বইয়েও ওগুলির সাহিত্যিক সাদৃশ্য আছে।

মহান ঐতিহ্য সর্বভারতীয় এবং গৌণ ঐতিহ্য তা নয়, এ ধারণাটিকে সংক্ষেপে বিচার করা যাক। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের উৎপত্তি বিশেষ অঞ্চলে, যদিও তাদের বিস্তার গোটা ভারতে। সংস্কৃত স্থানিক সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে যায়, দেখাই যাচ্ছে তা ভৌগলিক সীমাতে বদ্ধ নয়। তবে তার উচ্চারণ বৈচিত্র্যে বাংলা, মালয়ালী বা বারণসীর ছাপ চেনা যায়।[৮] তথাকথিত ছোট বা গৌণ ঐতিহ্যগুলিও ছোট ছোট অঞ্চল বা আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে বন্দী নয়। প্রবাদ, হেঁয়ালি, গল্প, সুর, গান ও নাচের বিষয়বস্তু ও রীতি কোন অঞ্চলে আবদ্ধ নয়। হতেই পারে তা মূর্ত হয় অনক্ষরদের আঞ্চলিক ভাষায়। তথাকথিত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের কল্পপ্রতিম পরিচয় নিহিত থাকতেই পারে। এটা সুবিদিত যে অমন লোককথার বিষয়বস্তু, সাংস্কৃতিক লেনদেনের অনেক কিছুর মতো নিজেরাই চলে বেড়ায়। জনসংখ্যা চলাচল না করলেও, ওগুলি চলমান। একটি প্রবাদ, হেঁয়ালি, তামাশা, গল্প, রোগ সারাবার উপদেশ, কি দিয়ে কি রাঁধতে হবে, এ সব যতবার বলা হয়, ততই তা চলে যায় আপনা থেকে। কোন দ্বিভাষিক মানুষ যখন এটি শোনে, বা বলে, বস্তুটি ভাষায় সীমানা ছাড়িয়ে চলে যায়।

ভারতের ভাষা ও অঞ্চলগুলির মধ্যে এক বিশাল সঞ্চয় আছে বন্টন করে নেওয়া লৌকিক উপাদানের। প্রবাদ, হেঁয়ালি ও রূপকথার সংকলন করাই যায়। দেখা যাবে এ উপমহাদেশের বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী অঞ্চলে সেগুলির একই রূপ। আবার অঞ্চল ভেদে লৌকিক উপাদনগুলির মানেও পৃথক হতে পারে। যেমন ধরা যাক 'আলোর নিচেই অন্ধকার' প্রবাদটি কর্ণাটক ও কাশ্মীর, ভারতের দু' প্রান্তেই শোনা যায়। কন্নড়ে এর মানে (অন্যান্য মানের সঙ্গে), যে দীপ্ত আলোর মতো এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির স্বভাবে লুকানো থাকতে পারে পাপ। শুনলাম, কাশ্মীরে 'আলোর নিচেই অন্ধকার' প্রবাদের ব্যাখ্যাটি রাজনৈতিক। তা হ'ল, এক প্রজাবৎসল রাজার নিষ্ঠুর ঠ্যাঙাড়ে কাহিনী থাকতে পারে। এ ধরনের পার্থক্য, সংস্কৃতিগত চরিত্র বোঝায়। এই সংকেতকগুলি, তা হয়তো প্রতিচ্ছবি, বা চরিত্র, বা ঘটনাবলী, বা তথাকথিত কাঠামো বা আদিরূপ,— বিভিন্ন সময়কালে, বিভিন্ন অঞ্চলে হয়তো একই থেকে যায়। শুধু মর্মার্থ বদলে যায়। আকার দেখে তার অর্থ কি হবে তা বলা যায়না। কেননা কোন চিহ্নের অর্থ সংস্কৃতি ও প্রসঙ্গগত ভাবে নির্দিষ্ট থাকে। একটি চিহ্নের প্রয়োজন হয় নির্দেশের। শুধু লোককথার উপাদানই নয়, যা দৃশ্যতই সংকীর্ণ, সংবাহন অযোগ্য জায়গায়, অত্যন্ত স্থানবদ্ধ আঞ্চলিক ভাষায় উদ্ভূত হচ্ছে, চালু থাকছে, দেশের মধ্যে যা বিভিন্ন সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যাতায়াত করে,—সেগুলি এক আন্তর্জাতিক জটাকালের অংশও বটে। আর্থার টেইলরের 'ইংলিশ রিড্ লস'[৯] থেকে পাই সমসাময়িক ইংরিজি হেঁয়ালি, শতবর্ষের পুরাতন লিখিত রূপান্তর, আফ্রিকা, ভারত ও আমেরিকায় সেগুলির পরিবর্তিত চেহারা। আমি অভিজ্ঞতা থেকে জানি, আজ দক্ষিণ ভারতের গল্প-বলিয়েদের কাছ থেকে শ্রুতিবাহিত কাহিনী সংগ্রহ

করতে পারে, যেগুলি ইংরিজিভাষী দুনিয়ায় প্রচলিত, চেনা গল্প গ্রীক 'অয়দিপাউস' বা শেক্‌সপীয়ারের 'কিং লীয়রে'র সঙ্গে অবিকল মিলে যায়।[৮]

ইউরোপে অ্যারিস্টটল এবং ভারতে এক ভারতীয় দার্শনিক বিষয়ে এক গল্প আছে। দার্শনিকের সঙ্গে এক গ্রামীণ সূত্রধরের দেখা। ছুতারের চমৎকার ছুরিটি দেখে দার্শনিক বললেন, 'ছুরিটা তোমার কাছে কতদিন আছে?' ছুতার বলল, 'অনেক পুরুষ ধরে ছুরিটা বাড়িতে আছে। কয়েকবার হাতল বদলেছি, কয়েকবার ফলাটাও, কিন্তু ছুরি তো সেই ছুরিই।' তেমনিই, এক লোককথায়, যা কথক থেকে কথকের মুখে বদলে যায়, গল্পের কাঠামো একই থাকে, তবে সাংস্কৃতিক খুঁটিনাটি বদলে যায়। নানা গল্পের অংশ মিলিয়ে মিশিয়ে এক নতুন গল্প তৈরি হয়। যা সংস্কৃতি অনুযায়ী এক নতুন নান্দনিক ও নৈতিক চেহারা নেয়। সে গল্পই যদি অন্য কোন সময়ে অন্যত্র বলা হয়, তা হয়তো নতুন ও সময়োপযোগী কিছু বলবে, অথচ গল্পের মূলধারা একই থাকবে। কোন অনড়তা, কোন পুনর্গঠিত আদিরূপ, সে হবে এক বানানো ব্যাপার, একটা ছাপ, সুবিধার্থে তৈরি করা।

প্রাসঙ্গিকতা

বিভিন্ন প্রাসঙ্গিকতায় গল্প বলা হয়, তা কাজও করে নানা ভাবে। একটি গল্পের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ নির্ধারণ করতে চাইলে আমাদের জানা দরকার বক্তাকে। কখন, কোথায়, কাকে বক্তা বা বক্ত্রী গল্পটি বলেছিল। সে বা শ্রোতারা গল্পটির বিষয়ে কি ভেবেছিল, গল্প শুনে শ্রোতাদের মনে কেমন সাড়া জেগেছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। জনপরিচায়ক বিজ্ঞানবাহী এ সব গল্পে আমাদের আরো অনুভূতির মাত্রা যোগ করা উচিত,—কোথায় গল্পটি অন্যসব টেক্‌সটে বা সংস্কৃতি ক্রিয়াকলাপে খাপ খায়,—কোথায় এটিকে অর্থবহ মনে করা হয়, কেমন করে এটি অর্থপূর্ণ হয়, কি নিষিদ্ধ, কি তা নয়, সবই। সম্প্রদায়ে গল্পকথকদের জায়গা কোথায়! শুধু গল্পকথনই নয়, গল্পের মধ্যে নিহিত অনুভূতি, মানে, মানে বের করা। পরবর্তী পাতা ও টীকায়, খুব বিশদ বিবরণে না গিয়ে আমি কয়েকটি সাধারণ প্রসঙ্গের উল্লেখ করব।

কে বলে এ সব গল্প? পেশাদারী ও শৌখিন গল্পবলিয়েরা আছে। আমি প্রধানত বেছে নিয়েছি অপেশাদারী ঘরোয়া গল্পবলিয়েদের। বলা যায় দক্ষিণ ভারতে গায়ক ও কথকরা ঘুরে বেড়ায়। পরিবার, বা কোন সংস্থা তাদের নিয়োগ করে। প্রধানত তারা রামায়ণ ও মহাভারতের মহাকাব্যিক গল্প বলে, কিংবা পুরাণের দেবদেবীর গল্প (পুরাণ তো হিন্দু পুরাকথায় বিশ্বকোষ), গ্রামে আছে চারণ কবিদের দল, তারা উচ্চবর্ণের বীর, বা গ্রামীণ দেবদেবী, বা সাধুসন্তের জীবনী নাট্য করে।[৮] চারণকবি ছড়িয়ে দেয় তার গান। তা হয়তো একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা, রাতের পর রাত গাওয়া চলবে। ছোট ছোট গল্প থাকবে তাতে, স্মৃতিচারণা, কবিতা ও গান। সে বর্তমান

রাজনীতির প্রসঙ্গও আনবে। এমনি করেই প্রাচীন গল্প ও মহাকাব্য সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা পায়।

বাড়ির গল্পবলিয়েরা ছোটদের তেমন গল্প বলে, যা এই সংকলনে আছে। আমার মতো পরিবারে এ সব খাবার সময়ে বলার গল্প ছিল, শোবার সময়ের নয়। কোন মাসি/পিসি, দিদিমা/ঠাকুমা বাড়ির সব ছোটদের জড়ো করতেন, একান্নবর্তী পরিবারে তো বটেই,—সকলকে গোল করে বসাতেন, একটা বড় থালায় ভাত মাখতেন আর প্রত্যেকের হাতে দলা তুলে দিতেন। গল্প বলা চলত, যাতে ছেলেদের মন গল্পের দিকে থাকে। তারা চারটি বেশি খায়। আমি বাড়ির রাঁধুনিদের কাছে গল্প শুনতাম। তারা বিধবা, খেটে খেত স্বজাতের ঘরে, আমাদের মতই কথাবার্তা কইত। অন্য জাতের দাসদাসীরাও গল্প বলত, আরেকটি জাত ও শ্রেণীর সঙ্গে সংস্পর্শে আসতাম। অন্যান্য পরিবারে পিতামহ/মাতামহ এবং বাড়ির বয়স্ক পুরুষরা গল্প বলতেন। রান্নাঘরে নয়। বাড়ির বারমহলে, অন্যান্য পরিবারের ছেলেমেয়েও শুনতে আসত। জানিনা গল্প নির্বাচনে তফাৎ হত কিনা, কিংবা একই গল্পের খুঁটিনাটি বদলে যেত কিনা, যখন পিতামহ বা পিতামহী, অথবা মাতামহ বা মাতামহী তা বলতেন। আরো বলব নারীকেন্দ্রিক গল্পের কথা, পুরুষকেন্দ্রিক গল্পের সঙ্গে তার তফাৎ, বলছেন অবশ্য কোন মহিলাই। এক নিপুণ গল্পবলিয়ে বিশ থেকে ত্রিশটি গল্পই ঘুরে ফিরে বলতেন। তাও আবার তাঁদের শৈশবে শোনা গল্প, বড় হয়ে শোনা গল্প নয়। একজন বক্তার কাছে আমি সর্বাধিক তেইশটি গল্প পেয়েছি। অধিকাংশ জনই বলতেন চমৎকার, কিন্তু জানতেন কমসংখ্যক গল্প। তাঁদের গল্পে থাকত পশুপাখি, ভাঁড়, পুরুষ, মহিলা, বোকা, জ্ঞানীজন, নানা জাত ও পেশার মানুষ, যেমন তাঁতি, রাখাল, আর ব্রাহ্মণ তো বটেই। আমি গল্পগুলি ওভাবেই ভাগ করেছি। এ বইয়ে বক্তারা মিলে মিশে গল্প বলছেন। একটি গল্পে স্বপ্নের কথা বলা হল, তা থেকে হয়তো আরেকটি স্বপ্নের গল্পে চলে গেলাম। ছোটদের চারটি বেশি খাওয়াবার জন্য, বা তাদের ঘুম পাড়াবার জন্য সবসময়ে লোককথা বলা হয় না। বড়দের জাগিয়ে রাখবার জন্যেও তা বলা হয়। কৃষকরা যখন ফসল পাহারা দিতে রাত জাগে; অথবা সারাদিন চরায় ভেড়া বা গরু; অথবা কাটুনীরা কুচোয় সুপারি (যা পাড়ার পরে পরেই কুচাতে হয়); অথবা কারখানায় বিড়ি বাঁধে (সস্তা, দেশী সিগারেট)। কাজ করার কালে যে গান গাওয়া হয়, তেমনি এই গল্পগুলি সময়ের চাপ ভুলিয়ে দেয়। (কল্পরাজ্যের কথা বলে একটানা কাজের একঘেয়েমি কাটিয়ে দেয়)। এ সব গল্পে মগ্নচৈতন্যগত, অন্তর্ঘাতমূলক অর্থও থাকে।

প্রবাদের মত গল্পও নেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্যে। রাজনীতিক ভাষণ, ধর্মালোচনা, আইন-আলোচনা, এ সবের মধ্যে এর অনুমোদন আছে, যেমন, গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সভায় মিও সম্প্রদায়ের একজন 'স্বপ্নে ভোজ খাওয়া' গল্পটি বলে। গল্পের মধ্যেই দেখছি, একটি মিও, দু'জন মুসলিমকে পরাজিত করল। গল্পের ভিতরের

মানবিক সম্পর্কগুলি, গল্প বক্তা এবং মানব সম্প্রদায়ের লোকগুলির সম্পর্কের রূপক। তাই গল্প রূপকমাত্র, তা খোঁজে প্রাসঙ্গিকতা, অপেক্ষা করে থাকে, গল্পটি বলা হবে ও নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে।

লোকাচার বিষয়ক গল্প বা ব্রতকথা বাৎসরিক লোকাচারেরই অঙ্গ। সেই মতো এ সব কাহিনী বললে তা ধর্মাচারের মতো ফলপ্রসূ হয়। কথক ও শ্রোতা উভয়েই লাভবান হয়, এমতো বিশ্বাস। যেমন 'শ্রোতার সন্ধানে গল্প' আর 'ভাই ফোঁটা' এমন সব কাহিনী। অনেক সময়ে এক সাধারণ গল্পও এমন সব প্রসঙ্গে বললে তার মূল্য বেড়ে যায়।[১০]

গল্পগুলো কত পুরনো? এ সব ঘরোয়া গল্পের প্রাচীনত্ব ও বিস্তার বিস্ময় জাগায়। আমার প্রত্নবিজ্ঞানী বন্ধু জন ক্যাসওয়েলকে যখন 'বাঁদর আর কুমির'-এর গল্প বলি, ওর মুখ ঝলমল করে উঠল। শ্রীলঙ্কার মানতাইয়ে খনন চালিয়ে ও এক মৃৎপাত্রের টুকরো পায়। সেটি ওর ব্রিফকেসে ছিল। টুকরোতে এক ছবি, কুমিরের পিঠে সওয়ার হয়ে বানর বসে আছে। গল্পটি বৌদ্ধ জাতকের। প্রথম হিন্দু গ্রন্থে এর উল্লেখ 'পঞ্চতন্ত্রে' (সংস্কৃত, পঞ্চম শতাব্দী)। ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থগুলিকে মনে করা হয় ক্লান্তিকর পাঠ্য, ধর্মীয় আচারের খুঁটিনাটি নিয়ে গূঢ় রহস্যাবৃত কাহিনী। অথচ তাতে তেমন সব গল্প মেলে তা আজও চলছে।[১১] উপনিষদ বিষয়ে এক বিদগ্ধ মন্তব্যে মহান ভারতীয় দার্শনিক শঙ্কর বলেছেন, 'নদী পেরোনো, নিজেকে হারানো' এই গল্প। এ গল্প আমি আমার শৈশবে শুনেছি। সপ্তম শতাব্দীতে শঙ্করও নিশ্চয় এটি জানতেন, এবং এটিকে তিনি অহংবোধের অজ্ঞতার রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছেন।[১২]

একাদশ শতকের 'কথাসরিৎসাগর'-এ গল্প আছে, যা 'আরব্যোপন্যাস'-এ, 'বোক্কাচ্চিও'-তে, শেক্‌সপীয়ারে ('অলস ওয়েল দ্যাট এন্‌ডস ওয়েল' ও 'সিম্‌বেলিন') এবং এখনকার, কর্ণাটকে গ্রামীন মেয়েদের নাট্যাভিনয় মেলে। পঞ্চাশ বছর আগে আমি বালক, আমার পিতামহীর বয়স ষাট। তাঁর পিতামহীর কাছে যে গল্প শুনেছেন, তাই বলতেন আমাকে। এস. এম. নটেশ শাস্ত্রী, তামিলনাদের ওই অঞ্চলের (ত্রিচিনোপল্লীর) মানুষ। শৈশবে তিনিও এ সব গল্প শোনেন ও ১৮৭০ সালে তামিল ও ইংরিজিতে তা প্রকাশ করেন। এমন সমর্থন যখন মেলে, তখন এ সব পুরনো বই সম্পর্কে আস্থা জাগে। বাস্তবিক, উনিশ শতকে সংগৃহীত প্রতিটি গল্পের সমর্থন মেলে যখন আমি আঞ্চলিক ভাষাভাষী আজকের ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলি। তাই এই শতবর্ষের পুরনো গল্পগুলি সমসাময়িকও বটে। কিছু পার্থক্য, কিছু সমান্তরলতা আজ দেশ জোড়া কথকদের ঘরে ঘরে তো তৈরি হচ্ছেই। কন্নড়ে, আমার সংগ্রহের উপরেও আমি জানি যে গত পঁচিশ বছর ধরে বন্ধু লোককথাকাররা তিন হাজারের বেশি গল্প জোগাড় করেছেন। এ উপমহাদেশের অন্যান্য অংশেও তাঁদের গল্পের সদৃশ গল্প আছে। ইদানিংকার সংগ্রহগুলির পাতা উলটোলেই তার সমর্থন পাব।

এ বইয়ের গল্প

এ বইয়ের জন্য গল্প বাছাই ও সাজাবার সময়ে আমি হিসাবে রেখেছি প্রধান ভাষাগুলি, এক শতক ধরে ইংরিজিতে যে সব নির্ভরযোগ্য সংকলন বেরিয়েছে সেগুলি, আন্তর্জাতিক বিষয় সূচীতে যে সব শ্রুতিবাহিত লোককথাকে শ্রেণীভাগ ও তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলি,—আবার যে সব লোকপ্রিয় বিষয়বস্তু ও কথনরীতি নানা অঞ্চলে ফিরে ফিরে আসে, সেগুলি। আমি বাদ দিয়েছি পৌরাণিক কাহিনী (ধর্মীয় কাহিনী), কিংবদন্তী (ঐতিহাসিক মানুষ ও স্থান বিষয়ে যে সব গল্পকে সত্য মনে করা হয়), এবং শুধু লিখিত বইয়ে মেলে, এমন গল্প। চারণকবিরা জনসমক্ষে যে সব গাথা গায় ও অভিনয় করে তা বাদ দিয়েছি। যদিও ('অবাধ্য ছেলের কাণ্ড') জাতীয় কিছু গল্প এ বইয়ে আছে, যা বাড়িতে বলা হয়, চারণ কবিরাও গায়। তাই সরাসরি সংস্কৃত থেকে কোন গল্প বাছা হয়নি, যেমন 'পঞ্চতন্ত্র' বা 'কথাসরিৎসাগর', অথবা পালি 'জাতক', হিন্দু বা জৈন 'পুরাণ'। যদি এ সব গল্পের কোনটি, ধরা যাক পঞ্চতন্ত্রে আছে (যেমন 'বাঘ বানানেওয়ালারা') শ্রুতিবাহিত লোককথায়, তা আমি স্বীকার করেছি। রামকৃষ্ণ ছিলেন এক ধর্মাচার্য, প্রতিভাবান ও সন্ত। জানা যায় তিনি ছিলেন নিরক্ষর, এবং শ্রুতিবাহিত লোককথায় এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। তিনি নিজেও অনেকগুলির রচয়িতা, তাঁর গল্প আমি নিয়েছি।[১৩]

সংকীর্ণভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার বদলে (রোমান্টিক গল্প, ম্যাজিকের গল্প, ইত্যাদি) আমি গল্পগুলিকে সাজিয়েছি এগারোটি বৃত্তে বা ভাগে। প্রতিটিতে আট থেকে এগারটি গল্প আছে। প্রতি বৃত্তে এক বা একাধিক নিম্নরূপ গল্প আছে।

পুরুষ-কেন্দ্রিক গল্প

নারী-কেন্দ্রিক গল্প

পরিবার বিষয়ক গল্প (সাধারণত দুটি দু'রকম পরিবারের)

ভাগ্য, মৃত্যু, দেবদেবী, দৈত্য, ভূত, এবং তেমন মজার গল্প যা ভাঁড়রা বলে, চালাক বক্তার গল্প

প্রাণিজগৎ নিয়ে গল্প

গল্প নিয়ে গল্প

এ ভাবে আমরা, একই রকম বিষয়বস্তুকে দেখব প্রসঙ্গ ও বিপরীত প্রসঙ্গে বারবার,—অনেক সময়ে তারা পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভংগী ব্যক্ত করবে (যেমন ভাগ্য বিষয়ে, বা ভাইবোনের সম্পর্ক নিয়ে), যাতে গল্পটি প্রাসঙ্গিকতা পায়। তারা পরস্পরকে ভেদ করে ঢুকে যায় এবং এ ওকে অভিব্যক্ত করে, মিলেমিশে সৃজন করে এক পৃথিবী। আমি যে তিন হাজার মতো গল্প দেখেছি, এ তা থেকে কম-বেশি একশো গল্পের এক সামান্য নিদর্শ। এ নিদর্শকে সব ধরনের গল্পের প্রতিনিধিত্বকারী করিনি। এনেছি এগুলির বৈপরীত্য ও প্যাটার্ন, বৈচিত্র্য এবং সঙ্গতির ছায়াভাস, যা আমি

জেনেছি ভারতীয় লোককথার বিশাল ভাণ্ডারে,—এ সংকলন এক বিশেষ লক্ষণযুক্ত। খানিকটা বলে, আবার নিজের সামীবদ্ধতা ছাপিয়ে আরো বড় কিছু বলে। এর পর, আমি তালিকাবদ্ধ গল্পগুলির প্রত্যেকটি বিষয়ে আলোচনা করব।

পুরুষ-কেন্দ্রিক গল্প। এ সব গল্পে এক নায়ক আছে বিশিষ্ট হয়ে। পিতার পরিবার ছেড়ে সে অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে বেরোয়। এ হ'ল, যে সব তরুণরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে নিজ ঘরসংসার পাতে, তাদের সূচনাপর্ব। 'অবাধ্য ছেলের কাণ্ড' গল্পে যেমন, নায়ক, বাবার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুভব করে বলে বেরিয়ে যায়, মেরে ফেলে বা বশীভূত করে এক দৈত্যকে (বাবা সদৃশ কেউ), নানা জায়গা থেকে রাজকন্যাদের হৃদয় জয় করে, প্রাণিজগতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে (প্রায়ই কোনো উড়ন্ত পাখী, জলের মাছ বা কুমির, মাটির তলার পিঁপড়ে), এমন সব কাজ করতে যায়, যাতে এ সব প্রাণিরা, (অথবা ওই মেয়েরা) ওকে সাহায্য করে। তারপর জয়ী হয়ে ফিরে আসে স্বীকৃতি পেতে, কোন রাজকন্যা আর আধেক হলেও রাজত্ব পেতে। তার জীবনে মেয়েরা দাবার বাজি, বা পুরস্কার বা সহায়িকার বাইরে কিছু নয়। ওর বিরোধীরা সাধারণত পুরুষ, আবার কোন সৎমা বা ডাইনিও ওর বিনাশ চাইতে পারে।[১১] গল্পটা শেষ হয় সাধারণত বিয়েতে।

নারী-কেন্দ্রিক গল্প। পুরুষ-কেন্দ্রিক গল্পে যদি নায়কের জীবনকাহিনীর অংশ হয় অনুসন্ধান ও দায়িত্ব,—নারী-কেন্দ্রিক গল্পের কেন্দ্রবিন্দু অন্যত্র। পুরুষকে রক্ষা, ত্রাণ, বাঁচিয়ে তোলা, পুরুষটির হয়ে হেঁয়ালির সমাধান, নায়িকার জীবনের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। তেমন গল্পে নারীদেরই আধিপত্য, পুরুষরা দুর্বল। তারা মা, প্রণয়িনী বা স্ত্রী-শাসিত। 'চালাক পুত্রবধূ' গল্পে নায়িকা জব্দ করে এক দুর্বল ও নগণ্য স্বামীকে, এক নীচমনা শাশুড়িকে, পুরুষ ডাকাতদের. গ্রাম দেবীকে। (লক্ষণীয় এমন গল্পে দেবতাটি স্ত্রী-দেবতা)। বিরোধীরাও সচরাচর নারী,—সতীন, ননদ, সৎ মা।[১২] কখনো কোন পুরুষ, পিতা, ভাই, বা গুরু, নায়িকাকে অসৎভাবে কামনা করতে পারে, তার শত্রু হয়ে উঠতে পারে। মেয়েটির প্রধান সহায়িকারাও নারী।[১৩] পারিবারিক, যেমন ভাই ও বোনের গল্পে, নকশাটা উলটো হয়ে যায় : বোন ও ভাই পরস্পরকে সাহায্য করে, অথবা এ-ওকে এত চায় যে এ-ওর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

নারীকেন্দ্রিক গল্পের কথাকে যখন নারী, প্রসঙ্গও নারী, শ্রোত্রী অল্পবয়সী মেয়েরা, সে গল্পের এক বিশেষ প্যাটার্ন থাকে। পুরুষ-কেন্দ্রিক গল্পের বিপরীত তা। বিয়ে দিয়ে গল্পের শুরু, শেষ নয়। বিচ্ছেদ একটা ঘটে, তারপর মেয়েটি পুরুষটিকে ত্রাণ করে। 'রাজপুত্র শবর' গল্পে রাজকন্যাকে নির্বাসনে দেন তাঁর লীয়র-সদৃশ পিতা। রাজকন্যা এক রাজপুত্রকে জয় করেন ভালবেসে, কিন্তু নির্মম বোনদের ঈর্ষার ফলে

তাঁকে হারান। আবার, রাজপুত্রের ক্ষত আরোগ্য করার পর তাঁকে ফিরে পান। দুঃখ সয়ে, সেবা করে তবে তাঁর ভালবাসা আবার পান। 'মৃত রাজপুত্র ও কথাকওয়া পুতুল' গল্পে রাজপুত্র তো মৃত। নায়িকা সেই মৃতদেহ আগলে রাখেন বারো বছর। এক কমবয়সী ডাকাবুকো মেয়ে যখন তাঁর জায়গা নেয়, সেই শেষ মুহূর্তে রাজকন্যা রাজপুত্রকে হারাতে বসেন। বিষয়বস্তুর এই যে সন্নিবেশ,—কালো বউ, ফর্সা বউ,—রাজকন্যা রাজপুত্রকে জিনে নেবার পরেও নায়িকাকে তাড়িয়ে অন্যের দখলদারী, এ বার বার ঘটে। মেয়েদের মনে যে নিরন্তর ভয় থাকে. স্বামীকে সে ধরে রাখতে পারবে না,—কৌশলী ও চতুরা কোন কমবয়সী প্রতিদ্বন্দ্বিনী স্বামীকে নিয়ে যাবে, এ গল্প যেন তারই সাক্ষ্য বহন করে। 'তেজা ও তেজী', সিণ্ডারেলা ধর্মী এক গল্প। সৎবোন এসে তেজীর জায়গা নেয়, তবে তা বেশিদিনের জন্য নয়।

অনেক মেয়ে-কেন্দ্রিক গল্পে এক নারী,—মা, বা স্ত্রী, বা মেয়েকে দেখি, তাদের পুরুষরা যে রহস্য সমাধান করতে পারে না, তারা তা করে। আকবর ও বীরবলের গল্পে বীরবলের মেয়ে, 'অন্য এক দেশে' ও 'কোনমতে প্রাণ বাঁচানো' গল্পে স্ত্রী যেমন। 'যে বউ মার খেতে নারাজ' গল্পে মেয়েটি বিয়ে করে এক মূর্খকে। মূর্খের ধারণা, বউকে জুতো পেটাই হ'ল পৌরুষ। মেয়েটি স্বামীকে তা করতে দেয় না। এক ধূর্ত স্ত্রীলোক যখন তার স্বামীকে পাশা খেলায় ঠকায়, সব টাকা কেড়ে নেয়, তাকে দেউলিয়াদের কারাগারে বন্দী করে, এই স্ত্রী তাকে ক্রমে ক্রমে উদ্ধার করে। 'কথাসরিৎসাগর'-এর মতো প্রাচীন সংকলনে এমন সব গল্প আছে। শেক্‌সপীয়ারের কমেডির প্রাণচঞ্চল নায়িকাদের মাসতুত বোন এ সব মেয়েরা। ও সব কমেডির গল্পাংশ ইতালীয়ান নভেলা থেকে নেওয়া, যা আবার সম্পর্কিত 'আরব্যরজনী' ও 'কথাসরিৎসাগর'-এর গল্পের সঙ্গে। এ সব গল্পের মেয়েরা পুরাণের সীতা সদৃশ মেয়েদের একেবারে বিপরীত। সীতা হলেন আদর্শ পত্নীদের প্রতিনিধি। বিনা প্রশ্নে তিনি স্বামীর ছায়ানুগামিনী, সারাজীবন কষ্টই পান। হিন্দু পুরাণের শক্তির মতো এ সব মেয়ে। দেবতারা যখন মহিষাসুরকে নিধনে অক্ষম হলেন, তাঁরা এক স্ত্রী-শক্তির শরণ নিলেন। এই দেবীর, দেবতাদের যত ক্ষমতা, সবই আছে। এ ছাড়াও তিনি অসুরের মনকে লুব্ধ করতে, তাকে বোকা বানাতে সক্ষম।

পরিবার নিয়ে গল্প। অনেক গল্পের বিষয়বস্তু হল, সব রকম পারিবারিক সম্পর্ক, নর-নারী সকলকে নিয়ে। বোন, ভাই, ভাইবোনের জুড়ি, বউদি, শ্যালিকা, ননদ, শাশুড়ি, দম্পতি, সতীন, মা ও ছেলে, বাবা, মেয়ে, সকলকেই দেখি তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের জটিলতাসহ। শুধু স্নেহের বন্ধন নয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অজাচার, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতা উন্মোচিত হয় এ সব পারিবারিক গল্পে।

ফ্রয়েড ও ইয়ুং-এর মতো মনস্তত্ত্ববিদরা প্রধানত মীথ-এর প্রসঙ্গেই গেছেন।

কিন্তু মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির এক শক্তিশালী উৎসসূত্র এই লোককথাগুলি। কেননা এগুলি ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধন ও শৈশবের উদ্ভট কল্পনার ওপর অভিনিবিষ্ট।[১৭] যেমন, পিতামাতার বিষয়ে উভয়চারিতা নানা প্রতীকী প্রকাশে ব্যক্ত হয়। মায়েরা দ্বিধাবিভক্ত। ভালো মায়েরা মরে যান, কচ্ছপ বা ফলদাত্রী গাছে রূপান্তরিত হন তাঁদের অনাথ সন্তানদের জন্য। আবার নিষ্ঠুর বিমাতারা শিশুদের মারেন, উপোশী রাখেন, নদীর জলে ভাসিয়ে দেন, যেমন 'তেজা ও তেজী।' বাবারা ভালো রাজা হতে পারেন, সন্তানদের পাঠান জয়যাত্রায়। সাহায্যকারী সাধু হতে পারেন, যাঁরা যাত্রাপথে এদের সাহায্য করেন। আবার দৈত্য বা সুদূরবাসী রাজা হতে পারেন, যাঁরা মেয়েদের ছাড়তে চান না যতক্ষণ না তরুণটি তাঁর ঈপ্সিত কঠিন বিপদ উত্তীর্ণ হবার পরীক্ষা দেয়। নিষিদ্ধ অজাচারের প্রবণতা দেখি সন্তানদের প্রতি পিতা ও মাতার। ছোট ভাইবোনদের প্রতি বড় ভাইবোনদের। সব কিছুরই মুখোমুখি হয় এ সব গল্প, এমন সম্পর্কের ফলাফলও জানিয়ে দেয়। ('সোনা ও রূপা' এবং 'মা বিয়ে করল ছেলেকে' গল্প দ্রষ্টব্য)। এ সব গল্প পরিবারের শিশুদেরই বলা হয়। নিষিদ্ধ অনুভূতির মুখোমুখি হবার মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষায় অংশ এ সব গল্প, যা সব কিছুই বলে দেয়, হয়তো সমাধান করতে পারে না, এ এক শিক্ষা বক্তা এবং ছোট্ট শ্রোতাদের।

যে সব গল্পে স্বামী কোন প্রাণী, আর স্ত্রীর চেষ্টায় তার মায়াজাল ছিন্ন হয়, সেগুলো আমার মতে প্রতীকী। যেমন চোখে নারী, পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ককে দেয়, বন্য পশুকে পোষ মানায়, অথবা মৃত্যুমুখ থেকে তাকে ফিরিয়ে আনে, তার প্রতীকী ('মৃত রাজপুত্র ও কথাকওয়া পুতুল')। 'তোমাকে আমার আসল চেহারা দেখাব?' গল্পে এক যুবক কোথা থেকে যেন আসে, সৎ পরিবারের এক মেয়েকে বিয়ে করে, তারপর তাকে ভয় দেখাতে থাকে। মেয়েটির ভাইদের কাজ হয় বোনকে উদ্ধার করা, জামাইকে ভয় দেখানো, অবমাননা করা, সত্যি সত্যি তাকে মল খেতে বাধ্য করা, অবশেষে তাকে এক কুয়োতে পুঁতে ফেলা। অজানা ও বিদেশী লোককে বিবাহ বিষয়ে ঘোর অবিশ্বাস প্রকাশ করে এমন সব গল্প। এক একান্নবর্তী পরিবার, যেখানে মেয়েরা অন্যরকম অবস্থান ও পরিবার থেকে এনেছে বাড়ির ছেলেদের বউ হয়ে (অথবা একই লোকের অনেক বউয়ের এক সতীন হয়ে), কোন পুরুষশাসিত সংসারে বাস করছে,—সেখানে ক্ষমতার লড়াই ও কূটকচালি এ সব গল্পে উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত (যেমন 'চিলের মেয়ে', 'দানবী মা')। 'সাপিনী মা' গল্পে কনিষ্ঠা পুত্রবধুর বাপের বাড়ি বলতে কিছু নেই। নিজ পরিবার সে খুঁজে পায় এক সাপের গর্তে। সাপরা তাকে সোনাদানা দেয়, ভালবাসে। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে যে অনাথ আছে, তার জন্যও এই চমৎকার কল্পকথা খুবই ভালো। গুপ্ত থাকা, এক ভূগর্ভস্থ নিজ পরিবার।

ভাগ্য, দেবদেবী, দৈত্য ও অন্যান্য। হিন্দু ও অন্য ধর্মে প্রচলিত পুরাণ এবং শ্রুতিবাহিত লোককথার মধ্যে আরেক পার্থক্য হ'ল, যে ভাবে অলৌকিকতাকে ব্যবহার করা হয়েছে। হিন্দু পুরাণে দেবদেবীদের ঘাম হয় না, চোখের পলক পড়ে না, তাঁদের পা মাটি ছোঁয় না। লোককথায় দেবদেবীরা শরীরী। তাঁদের গায়ে গন্ধ, তাঁরা মলমূত্র ত্যাগ করেন। দেবীরা ঋতুমতী হন। 'চালাক পুত্রবধূ' গল্পে দেবী সেই মশলাদার লাউয়ের তরকারী চান, যা বউটি খাচ্ছে, অথচ তাঁকে দেবে না। লোভের চোটে তিনি অস্থির, মুখ চাপা দিচ্ছেন বারবার। বউটি তাঁকে মোটে সমীহ করছে না, ঝাঁটা দিয়ে পেটাবে বলে শাসাচ্ছে (একটি পৃথক বক্তব্যে দেখি বউটি দেবীর মুখে বাতকর্ম করতে চায়) যদি না দেবী লোভ সামলান। আরেকটি লোককথায়, এক বামুন বিধাতাকে গিলে ফেলে। বিধাতা ভাগ্য নিয়ন্ত্রা দেবতা, কার কি ভাগ্য হবে তিনিই ঠিক করেন। বামুন লাঠি তুলে গাল দিতে দিতে বিদ্যার দেবী সরস্বতী ও ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীকেও তাড়িয়ে দেয়।

লোককথাগুলি, ভাগ্য সম্পর্কে নানা রকম বৈচিত্র্যকে সম্ভব করে তোলে। কোন কোন লোককথায় ('বাঘের হাতে নিহত', 'মা বিয়ে করল ছেলেকে') ভাগ্য অনতিক্রম্য। যতই এড়াতে চাও, তুমি ভাগ্যের ফাঁদেই পড়ো। অন্যগুলিতে ('ভাগ্যকে বোবা বানানো') কোন চালাক পুরুষ বা নারী ভাগ্যকে চালনা করে। ভাগ্য যাকে শিকার করতে চায়, তার সুবিধা হয়, এমন ভাবেই নিয়তির প্রতি প্রচেষ্টাকে পরাজিত করে। অনেক গল্পে দেখা যায়, এক বিশ্বাসী ভৃত্য, বা মা, বা বোন, পাখির কথাবার্তা শোনে, অথবা নিয়তি বিড়বিড় করে কি বলছে তা শোনে (নারী-কেন্দ্রিক গল্পে ভাগ্যের স্ত্রী-রূপ নিয়তিকে দেখি)। এখন কালনির্দিষ্ট সর্বনাশগুলিকে পরাজিত করে তারা। যেমন নির্দিষ্ট লোকটির খাবারে কাঁটা থাকলে তা সরিয়ে দেয়। অথবা ঠেকায় সেই গাছের নিচ দিয়ে গমন, যা লোকটির মাথায় ভেঙে পড়বে, যেমন দেখি 'ভাইফোঁটা' বা 'অকথিত কাহিনী'তে। এ সব গল্প সে সব বদ্ধমূল ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, যে 'চাষীরা', 'নিরক্ষররা', 'প্রাচ্যবাসী' হ'ল ভাগ্যবাদী। তারা নীরবে ভাগ্যলিপি মেনে নেয়।

কর্ম বিষয়ক ধারণা (গত জন্মের কর্ম এ জন্ম কেমন হবে তা স্থির করে)। যেমনটি 'মহাভারত'-এর মতো ভারতীয় মহাকাব্যে দেখি, তেমনটি লোককথায় ক্বচিৎ মেলে। বাস্তবিক, লোককথাগুলি একের অধিক জন্ম নিয়ে তেমন ভাবিত নয়। অবশ্য তা নিয়ে মজা করে, যেমন 'শুওরের মতো জীবন যাপন' গল্পে। শিলার মত অনড় এক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে লোককথা আবদ্ধ নয়। তাই আমরা পাই 'অন্যান্য জীবন'-এর মতো এক চিন্তাউদ্রেককারী গল্প। তাতে এক ব্রাহ্মণ অনেকগুলি জন্মের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়। এক অস্পৃশ্য, এক নৃপতি, এবং বিস্ময়ে হতবাক হয় যখন অতীত জন্মের কোন চরিত্র তার বর্তমান জীবনে ঢুকে পড়ে। তবে এমন গল্প বিরল প্রাপ্তি।

এমন নানারকম দৃষ্টিভঙ্গীকে আমি উলটে পালটে সাজিয়েছি। 'মৃত্যুর দেবতা' গল্পে এক গুরুগম্ভীর দর্শন,—যে ভাবে কপট ও ভয়ংকর রূপ ধরে মৃত্যু মানুষ মারতে চায়। এ গল্প মিলবে 'রাখালের ভূত' গল্পের পরেই, সে গল্পে কমেডি। এক বোকা রাখাল ভাবছে সে মরে গেছে। আসলে সে মরেনি।

হিন্দু পুরাণে দৈত্যদের মতো অলৌকিক সত্তাগুলি ভয়ংকর, তাদের শক্তিও অপরিসীম। লোককথায় তারা সহজেই ধোঁকা খায়। এক নাপিত একটা আয়নার সাহায্যে তাদের শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে, কোনো ঝগড়াটি বুড়ির হাতে ঝাঁটা থাকলে তারা ভয়ে মরে, কোনো বাঁশিওয়ালা বিস্বরে বিকট সুরে বাঁশি বাজালে তাদের সূক্ষ্ম শ্রবণযন্ত্র ফেটে যেতে যায়, তারা দিশাহারা হয়ে পড়ে।

মজার গল্প। ভারতীয় সাহিত্যকে গম্ভীর, আধ্যাত্মিক, কৌতুকরসবর্জিত বলা প্রথা দাঁড়িয়ে গেছে। লোককথা ওই বাঁধাগতের চমৎকার প্রত্যুত্তর। যে সব গল্প এই সব প্রথাসিদ্ধ কঠিন কাঠামোকে ভেঙেচুরে দেয়, তেমন অনেক মজার গল্প ও কাহিনী আমি এ সংকলনে এনেছি। নারী-কেন্দ্রিক গল্পগুলি যেমন পুরুষ-কেন্দ্রিক গল্পের দৃষ্টিভঙ্গীর মোকাবিলাও করে, আবার ওগুলিকে ঋদ্ধও করে, তেমনি মজার গল্প, ভাঁড় ও বোকাদের গল্প নভেলা ও রোমাণ্টিক গল্পের মুখোশ খুলে দেয়। যেমন, সিরিয়াল গল্পগুলিতে অনেক জাদু সরঞ্জাম থাকে। শূন্য পাত্র দেয় খাবার, পশুদের পুরীষ বদলে যায় সোনায়। মজার গল্পে দেখি ধূর্তরা বোকা খদ্দেরদের পকেট খালি করছে। আজেবাজে জাদু সরঞ্জাম বিক্রি করছে তাদের, যেমন 'গ্রামের জালিয়াৎ' গল্পের এক ভালুক, সে নাকি মলত্যাগ কালে রূপোর টাকা বের করে। ম্যাজিকের গল্পে একটি রূপককে সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ করা হয়, যেমনটি স্বপ্নে ঘটে। তামিল ও সংস্কৃত ভাষায় রজস্বলা হওয়া আর ফুলফোটা, দুটো বোঝাতে একটা শব্দই ব্যবহার হয়। তাই 'একটি কুসুমিত গাছ' গল্পের মেয়েটি হয়ে যায় ফুল্ল কুসুমিত এক চমৎকার গাছ। কিন্তু সাহিত্যকরণের এ প্রক্রিয়ার এক কৌতুককর দিকও আছে।[১৮] রাজা, ভাঁড় তেনালি রামাকে রেগে বলেন, সে যেন আর মুখ না দেখায়। পরদিনই রামা, মাথা হাঁড়িতে ঢুকিয়ে রাজার সামনে হাজির। কোন রমনী যখন জিজ্ঞাসা করে, লঙ্কা পুড়ল কেমন করে? রামা মেয়েটির ঘরে আগুন দেয় ও বলে, 'এমনি করে'। বলে, এটাই হ'ল যথার্থ, বা বাস্তববাদী রামায়ণ। শক্তিধারী যারা, যেমন রাজা, বিচার ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ, গুরু, দেবদেবী, জামাই, শাশুড়ি, বাঘ, দৈত্য ও দানব, ডাকাত, এদেরকে দেখানো হয় বোকা, সহজে বোকা বনে যায়, নানা দোষে দোষী। তেনালি রামার মতো ভাঁড়েরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে টক্কর নেয়, দেবীদের নিয়ে তামাশা করে, রাজাদের নিয়ে ঠাট্টা করে ওঁদের অহঙ্কার চুপসে দেয়। সামান্য নাপিত, বা বাড়ির গিন্নি, দৈত্যদের দাবিয়ে রাখে, নয় তাদের নাক কেটে দেয়, নয় এমন কাজ করতে দেয়, যা তারা করতে পারে না।

এমন কি পাণ্ডিত্য, জাদুবিদ্যা ও বিজ্ঞানের পরিণাম হয় আত্মঘাতী। যেমন 'বাঘ বানানেওয়ালা'তে। আইনী যুক্তি, নিখুঁত তদন্ত, অপরাধের জন্য কে দায়ী, সে জিজ্ঞাসা, এ সবের ফলাফল অতি উদ্ভট দাঁড়ায় বোকাদের রাজত্বে।

পশুপাখির গল্প। প্রাচীনতম গল্পগুলির মধ্যে আছে পশুপাখির গল্প। বৌদ্ধ 'জাতক' ও 'পঞ্চতন্ত্র', দুই জায়গাতেই তাদের পাই ('পঞ্চতন্ত্র' আরবিক, ফার্সী, লাতিনে ব্যাপক অনূদিত এবং ইউরোপেও তা পৌঁছয়)। গল্পগুলি শিশুরা খুব উপভোগ করে, প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছয় এবং বড়দের সঙ্গে যে শিশুরা পেরে ওঠে না, সে কথাও ব্যক্ত করে। শিশুদের মতই ছোট ছোট প্রাণী এ সব গল্পের উপজীবৎ, যারা তাদের উপর অত্যাচারীদের বোকা বানায়।

এ সব নীতিমূলক গল্পের সবচেয়ে দেখার মতো ব্যাপার হ'ল, গল্পগুলির লাগাতার রাজনীতিক বক্তব্য। ক্ষমতার চরিত্র, নেতৃত্বের গুণাবলী, স্বভাবদ্ধ বুদ্ধি ও চতুরালি হল দুর্বলের অস্ত্র। অন্তর্ঘাত, বিশ্বাসঘাতকতা, ধাপ্পাবাজি, এ সব নিয়মিত দেখি বিষয়বস্তুতে। এখানেও শক্তিশালী বাঘ, কুমির ও কালো সাপরা জেতে না। এক পারাবত, অনেক সহায়কের মদত নিয়ে এক হাতিকে নতজানু করে ফেলে। একটি ছোট্ট কাক, রাজভৃত্যদের এনে এক মস্ত বড় দুষ্ট সাপকে পিষে ফেলে। কোন কোন গল্পে অবশ্য দুনিয়ায় যা ঘটে তাই দেখা যায়, যখন বাঘ বা নেকড়ে একটি ভেড়াকে খেয়ে ফেলে।

গল্প নিয়ে গল্প। এখানে দেখছি কাহিনী বিষয়ে কাহিনী। তাতে বক্তারা, গল্প এবং গল্প কি ভাবে বলা হয় তাই নিয়ে ভাবছে। গল্প নিয়ে অনেক গল্প আছে আমাদের। লোককথা বিষয়ে সংস্কৃতিজগৎ কি ভাবে তাই বলে ওই গল্পগুলি। যেমন প্রথমটিই 'যাও, দেয়ালকে বলো গিয়ে' বলছে এক বুড়ির কথা। কারোকে না কারোকে তার নিজের গল্পটি বলার ভয়ানক তাগাদা তার, নইলে তার অসুখ হয়। 'নাপিতের গুপ্তকথা' গল্পে নাপিতকে তার গোপন কথা বলতেই হয় অন্তত একটি গাছকে। গাছটি আবার কথা রাখতে পারেনা গোপনতা রক্ষা করবার। এ গল্পেরই সামান্য অন্য চেহারায় দেখি, গোপন কথা বলতে পারছে না বলে নাপিত মোটাই হচ্ছে। যখন বউকে বলল, বউ মোটা হতে থাকল। বউ গোপন কথাটি বলল এক গর্তকে। গর্তটা মাটি দিয়ে বুজিয়ে দিল। সেখানে গজাল একটা গাছ। এ গাছের জাল দিয়ে বানানো বাঁশি, বা ঢাকের কাঠি, গোপন কথাটি দিগ্বিদিকে জানিয়ে দিল। বুড়ি বা নাপিত, তাদের গল্প বলছে নিজেরা হালকা হবে বলে। অন্যদের জ্ঞান দিতে চাইছে না। মেয়েটির হৃদয়হীন পরিবার বদলে গেল, তাদের মনে মমতা জাগল, এ বিষয়ে কিছুই বলা হচ্ছে না। তবে নিজের দুঃখের বোঝা হালকা করতে পেরে মেয়েটি বদলে

গেল। এমন আত্মখুশির কল্পনা ভারতীয় ধ্রুপদী কাব্যসাহিত্যের অঙ্গ নয়। দেখ, আবেগানুভূতিরও কেমন ওজন আছে। চরিত্রগুলি আক্ষরিক বা রূপক অর্থে 'ভারাবনত', 'গুরুভার হৃদয়' বা 'লঘু হৃদয়'। আগেই বলেছি, গল্পে ও স্বপ্নে, রূপকগুলিকে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া হয়। এই অক্ষরে-অক্ষরে মেনে নেওয়া কোন সাহিত্য-কারণে নয়। এতে এ কথাই নিহিত আছে, যে অনুভূতি এবং চিন্তার মধ্যে সারবস্তু আছে। বাস্তবতাও অবাস্তবতা হল 'স্থূল' ও 'সূক্ষ্ম' সারবস্তুর ধারাবাহিকতার অংশ। এতে পরিবর্তনের অবকাশও আছে। এ ওতে বদলে যেতেই পারে।

গল্প, শব্দ, এদের ওজনই নেই শুধু, আছে ইচ্ছাশক্তি, আছে ক্রোধ। তারা নানা রূপ ধারণ করতে পারে। যে তাদের কথকতা করে না, দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে দেয় না, তার বিরুদ্ধে ওরা শোধ নিতে সক্ষম, যেমন 'অকথিত গল্প'। তেমন গল্প বলে দেয়। কেন গল্পটা বলতেই হবে। গল্পগুলির এক স্বতন্ত্র সত্তা আছে, অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয়ের মতো আছে বিষয়মুখিতা। দার্শনিক কার্ল পপার যাকে তৃতীয় ভুবন বলেছেন, এরা তারই অঙ্গ। এ ভুবন বিষয় নয়, লক্ষ্যও নয়। এ এক তৃতীয় রাজ্য যা বিষয় ও লক্ষ্যের নির্মিতিতে ঢুকে পড়ে, তার ওপর নির্ভরও করে। সংস্কৃতির দিকগুলি (যেমন গল্প) মানুষ যা, তাই বানায়। মানুষ যেমন বানায় সংস্কৃতি। কোন বিশেষ কথক বলবার আগে থেকেই গল্পগুলো ছিল। কথনবাহিত হয়ে অন্যদের কাছে না পৌঁছলে গল্পগুলো রেগে যায়। বলা চলতে থাকলে তবেই তো ওরা বারবার প্রাণ পায়। এ বইয়ের মতো এক বই, অমন প্রয়োজনবোধই তার পিছনের উদ্দেশ্য। তুমি যদি কোন গল্প জানো, সেটা বলার জন্য শুধু অন্যদের কাছে নয়। গল্পটির কাছেও তুমি দায়বদ্ধ। নইলে গল্পটি দম আটকে হাঁসফাঁস করে, যেমন 'অকথিত কাহিনী'। ঐতিহ্যকে জীর্ণ হতে দেয়া যায় না, তাকে সংবাহিতও করতে হয়। নইলে সাবধান! গল্পগুলো যেন বলে, তোমার বিপদ হবে কিন্তু। গল্প জমিয়ে আটক রাখতে তো পার না।

তাছাড়াও, সমাজে পরিব্যাপ্ত এক প্রক্রিয়ার অঙ্গ এ গল্পগুলি। গল্পগুলো বারবার বুঝিয়ে দেয় যে মেয়ে, (ছেলে), ঐশ্বর্য, জ্ঞান আর খাদ্য এর চলাচল চাই। এগুলো 'দাস' বা উপহার, যা সুসংগতভাবেই দেবে আর নেবে। গল্প পৃথক কিছু নয়। মানব সম্প্রদায়, প্রজন্মসকল, এমন বদলাবদলি ও হস্তান্তরের ওপর নির্ভরশীল।

স্ত্রী-আচার বিষয়ক দুটি গল্পে একজন একটি ব্রতকথা আরেকজনকে বলতে চাইল, কিন্তু সে লোক শুনতে নারাজ। 'শ্রোতার খোঁজে গল্প' গল্পে কথয়িত্রী নিজ পরিবারের আত্মীয় থেকে আত্মীয়ের কাছে যাচ্ছেন, শহরের পথ থেকে পথে ঘুরছেন শ্রোতার খোঁজে। অবশেষে একটি গরিব গর্ভিনী মেয়ের অজ্ঞাত শিশুকে গল্পটি বললো, আর শিশুটি অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকার পেল। 'যখন সত্যিই শোন, তখন যা হয়' গল্পের মধ্যেকার ক্ষমতা যেন 'রামায়ণ'-এর মতো। এক অসভ্য বোকার পরিবর্তনই ঘটে যায়। সে যখন সত্যিই রামের মহকাবিাক উপাখ্যান মন

দিয়ে শোনে, সে কাহিনীটির অঙ্গ হয়ে ওঠে। বাস্তবতা ও কাহিনীর মধ্যেকার পাঁচিল ভেঙে পড়ে।

লোককথার আর একটি-দুটি প্রসঙ্গে মন্তব্য করে এ ভূমিকা শেষ করি। লোককথার নিজস্ব বিশেষ বাকবৈশিষ্ট্য আছে। যেমন 'অনেক দিন আগে' (কন্নড় ভাষায় ওন্‌ডানোন্‌ড়ু কালাড়াল্লি) বা 'সে এক শহরে' (ওরে ওরু উরলে তামিলে) এ সব দিয়ে গল্প শুরু হয়। গল্পের দুনিয়া, গল্পের সময়ের চাবিটি খুলে ও সব শব্দ আমাদের ঢুকিয়ে নেয় ভিতরে। চৌকাঠ পেরিয়ে আমরা আরেক রকম সময় বিস্তারে চলে যাই।

অনেক ভাষায় লোককথা সমাপনের বৈশিষ্ট্য আছে। অসমীয়া ভাষায় গল্পটি প্রায়ই শেষ হয় এই কথা বলে, 'ধোপাকে কাপড় দিতে হবে, তাই আমরা বাড়ি চলে এলাম।' তেলুগুতে ওরা বলে, 'গল্প গেল কাঞ্চী, আমরা এলাম বাড়ি।' (কাঞ্চী এক বিখ্যাত মন্দির নগরী)। কন্নড়ে বলা হয়, 'ওরা রইল ওখানে, আমরা এখানে।' এমন উপসংহার, গল্পের চরিত্রের সঙ্গে একাত্মীভবন ভেঙে দেয়, গল্পের দুনিয়া থেকে আমাদের দুনিয়াকে পৃথক করে দেয়। গল্পগুলি যে বানানো, তা বুঝিয়ে দেয়। ওগুলির সাজানো, কল্পজগৎটা চিনিয়ে দেয়। আরো কি, আমার প্রিয় কথকরা যখন গল্প বলে, চরিত্রের অন্তর ও বাহির বুঝাতে কোন বিশেষণ ব্যবহার করে না (চারণ গাথায় যেমন শোনা যায়)। সম্পাদকের হাত নেই, কি মনে করব তা বলা নেই। গল্পটা নিজেই নিজেকে বলে যায়।

লোককথা স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক, এমন রোমান্টিক ধারণার একেবারে বিপরীত। লোককথা যথেষ্ট ঠাটবাট মেনে চলা, আনুষ্ঠানিক। সে চেহারাটা তো লোককথা দেখিয়ে দেয়। (চরিত্রগুলির সঙ্গে শ্রোতাদের) একাত্মীকরণ ও নিরাত্মীকরণ ব্যাপারটা গল্পের মধ্যে একটা সশস্ত্র হুঁসিয়ারি আছে। কারো ভর হওয়া এবং ভর ছাড়ানোর আচার নিয়মের প্রক্রিয়ার মতই। কল্পিত এক জগৎ, যা যখন আছে তখন সত্যি মনে হচ্ছে, যদিও তা সত্যি নয়,—তেমন এক জগতের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হবার ব্যাপারটির কথা আমি যেমন ভাবে বলতে চাই, তা এক ওড়িয়া লোককথার চমৎকার বলা হয়েছে। অতীব রোমান্টিক এক রাজা ও রানীর গল্পের শেষে ওড়িয়া কথক বলছেন, 'রাজপুত্রকে সেদিন বাজারে দেখলাম। সে আমার সঙ্গে কথাই কইল না।'

পাদটীকা

১. পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার ভাষা বাদ দিয়ে খানিকটা স্বেচ্ছাধিকারেই আমি নিজেকে আবদ্ধ রেখেছি ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে। ভাষাগুলি (যেমন বাংলা, পাঞ্জাবী, উর্দু, তামিল) বা লোককথার মতো সাংস্কৃতিক ব্যঞ্জনা, কিন্তু রাজনৈতিক সীমানা মানে না। এ বইয়ের গল্পগুলি এ সব দক্ষিণ এশীয় দেশেরও বটে।

২. চারটি ভাষা পরিবার হ'ল, ইন্দো-আর্য, দ্রাবিড়ীয়, তিবেতো-বার্মাণ ও অস্ট্রো-এশিয়াটিক।

৩. পনেরটি সাহিত্যভাষা হল অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটী, হিন্দী, কাশ্মীরী, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, সিন্ধী, উর্দু, কন্নড়, মালয়ালম, তামিল এবং তেলুগু। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপরিবারের ইন্দো-আর্য শাখার অন্তর্গত প্রথম এগারটি। বাকি চারটি প্রধান দ্রবিড় সাহিত্য ভাষা। (কাশ্মীরীকে মাঝেমধ্যে দর্দিক বা ইন্দোইরানীয়ান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়)। এই বইয়ে, যে সব ভাষায় কম মানুষ কথা বলে, তাও নেওয়া হয়েছে, যেমন অস্ট্রো-এশীয় সাঁওতালী ও দিদায়ি; টুলু, কোটা ও গোণ্ডীর মতো দ্রবিড়; কোঙ্কনী ও রাজস্থানীর মতো ইন্দো-এরিয়ান। সেদিন অবধি এসব ভাষার লিপি ছিলনা (যদিও কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই টুলু লেখা শুরু হয়)। ১৯৭১ লোকগণনা অনুসারে কত সংখ্যক লোক কি ভাষা বলে তার ধারণা মিলবে নিচের তালিকায় :

অসমীয়া	—	৭ মিলিয়ন
বাংলা	—	ভারতে ৪৫ মিলিয়ন, বাংলাদেশে ৭০ মিলিয়ন এবং আশেপাশে ৪ মিলিয়ন
দিদায়ি, বা গ্টা	—	নগণ্য সংখ্যক
গোণ্ডী	—	২ মিলিয়ন
গুজরাটী	—	২৬ মিলিয়ন
হিন্দী	—	প্রথম ভাষা হিসাবে ভারতে ১৬৩ মিলিয়ন
কন্নড়	—	২৫ মিলিয়ন
কাশ্মীরী	—	২.৪ মিলিয়ন
কোঙ্কনী	—	১.৫ মিলিয়ন
কোটা	—	১০০০ এরও কম
মালয়ালম	—	২২ মিলিয়ন
মারাঠী	—	৪২ মিলিয়ন
ওড়িয়া	—	২০ মিলিয়ন
পাঞ্জাবী	—	৩০ মিলিয়ন
রাজস্থানী	—	২০ মিলিয়ন (হিন্দীর আঞ্চলিক রূপ বলে প্রায়শ বিবেচিত)
সংস্কৃত	—	কথ্য মাতৃভাষা নয়
সাঁওতালী	—	৪ মিলিয়ন
সিন্ধী	—	ভারতে ১.৭ মিলিয়ন, পাকিস্তানে ৪ মিলিয়ন
তামিল	—	৪০ মিলিয়ন
তেলুগু	—	৪৭ মিলিয়ন
টুলু	—	১.২ মিলিয়ন
উর্দু	—	ভারতে ২৪ মিলিয়ন, পাকিস্তানে ১০ মিলিয়ন

এগারটি ভাষা স্বরাজ্যে কথিত। হিন্দী বলা হয় ছয়টি রাজ্যে। সিন্ধী ও উর্দু রাজ্যভাষা নয়। প্রতি রাজ্যে, প্রধান ভাষার উপরে সংখ্যালঘুরা নানা ভাষা বলে। যেমন ৮৬% মানুষ অন্ধ্রে তেলুগু বলে। অন্যেরা অন্যান্য ভাষার নয়টির এক বা অধিক বলে। যেমন তামিল উর্দু, কন্নড়, পাঞ্জাবী। অঞ্চল, ভাষা, ধর্ম ও লিঙ্গের প্রেক্ষিতে সাক্ষরতার হার নিরূপিত হয়।

৪. রবার্ট রেডফিল্ড, 'দি লিট্‌ল কম্যুনিটি অ্যান্ড পীজেণ্ট সোসাইটি অ্যান্ড কালচার (শিকাগো : ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস, ১৯৬০), পৃষ্ঠা ৪১।

৫. এ. কে. রামানুজন, 'হেয়্যার মিররস আর উইণ্ডোজ : অ্যান অ্যানথোলজি অফ রিফ্লেকশান্‌স অন ইণ্ডিয়ান লিটারেচার্স, হিস্ট্রী অফ রিলিজিয়ন্‌স, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯।

৬. ফ্রিট্‌স্ কে. স্টহ্‌ল, 'নাম্বুদিরি লেদা রিসাইটেশন' (দি হেগ : মৌটন, ১৯৬১)।

৭. আর্চার টেইলর, 'ইংলিশ রিড্‌ল্‌স ফ্রম ওয়াশ ট্রাডিশন' (বার্কলে : ইউনিভার্সিটি অফ কালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৫১)।

৮. দ্রষ্টব্য 'মা বিয়ে করল ছেলেকে', 'অবাধ্য ছেলের কাণ্ড', 'রাজপুত্র শবর' এবং 'হানচি'।

৯. দ্রষ্টব্য 'স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন, 'ওয়াল এপিরস ইন ইণ্ডিয়া' (বার্কলে : ইউনিভার্সিটি অফ কালফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৮৯)।

১০. এমন প্রসঙ্গ বিষয়ে বিশদ তথ্যের জন দ্রষ্টব্য, 'টু রিয়াম্‌স অফ কান্নাড়া ফোকলেরর্স', স্টুয়াট ব্ল্যাকবার্ণের লেখা ও এ. কে. রামানুজন লিখিত 'অ্যানাদার হারমনি : নিউ এসেজ্ অন সাউথ এশিয়ান ফোকলোর (বার্কলে : ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৮৬)।

১১. ওয়েণ্ডি ডোনিগার ও'ফ্ল্যাহার্টি, 'টেল্‌স অফ সেক্স অ্যাণ্ড ভায়োলেন্স্ : ফোকলোর. স্যাক্রিকাইস, অ্যাণ্ড ডেঞ্জার ইন দি জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ (শিকাগো : ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস, ১৯৮৫)।

১২. 'দি বৃহদারণ্যক উপনিষদ, উইথ দি কমেণ্টারি অফ শঙ্করাচার্য', অনুবাদ · স্বামী মাধবানন্দ (কলকাতা: অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৬৫), পৃষ্ঠা ১২০।

১৩. নীতিগর্ভ রূপক কাহিনীর এক জীবন্ত আধুনিক গবেষণার জন্য, দ্রষ্টব্য কিরিন নারায়ণের, 'স্টোরি টেলার্স, সেইন্টস অ্যাণ্ড স্কাউণ্ড্রেল্‌স : ফোক ন্যারেটিভ অন হিন্দু রিলিজিয়াস টীচিং (ফিলাডেলফিয়া : ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভানিয়া প্রেস, ১৯৮৯)।

১৪. দ্রষ্টব্য : 'রাজা বিক্রম ও চীনের রাজকন্যা'. এবং 'অবাধ্য ছেলের কাণ্ড'।

১৫. দ্রষ্টব্য : 'চিলের মেয়ে', 'একটি কুসুমিত গাছ', 'তেজা ও তেজী'।

১৬. দ্রষ্টব্য : 'হানচি', 'একটি কুসুমিত গাছ', 'যে রাজকন্যাকে তার বাবা বিয়ে করতে চেয়েছিল'। ইউরোপীয় (ড্যানিশ) মেয়েদের গল্প বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, বেংট্ হোলবেকের 'দি ইনটারপ্রিটেশান অফ ফেয়ারি টেল্‌স : ড্যানিশ ফোকলোর ইন ও ইউরোপীয়ান পারস্পেকটিভ (হেলসিংকি : সুওমালাইনেন টিয়োডিকাটিমিয়া, ১৯৮৭)।

১৭. গ্রন্থপঞ্জী ও আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, অ্যালান ডান্‌ডাসের 'দি সাইকোলজিকাল স্টাডি অফ ফোকলোর ইন দি ইউনাইটেড স্টেট্‌স, ১৮৮০-১৯৮০', 'সাদার্ন ফোকলোর', ভল্যুম ৪৮ (১৯৯১), পৃষ্ঠা ৯৭-১২০।

১৮. দ্রষ্টব্য ডেভিড শালম্যানের 'দি কিং অ্যাণ্ড দি ক্লাউন ইন সাউথ ইণ্ডিয়ান মীথ অ্যাণ্ড পোয়েট্রি' বইয়ের তেনালি রাম-এর উপর আলোক নিক্ষেপকারী পাতাগুলি (প্রিন্সটন : এন. জে. : প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৫), অধ্যায় ৪।

দেয়ালকে বলো

তামিল
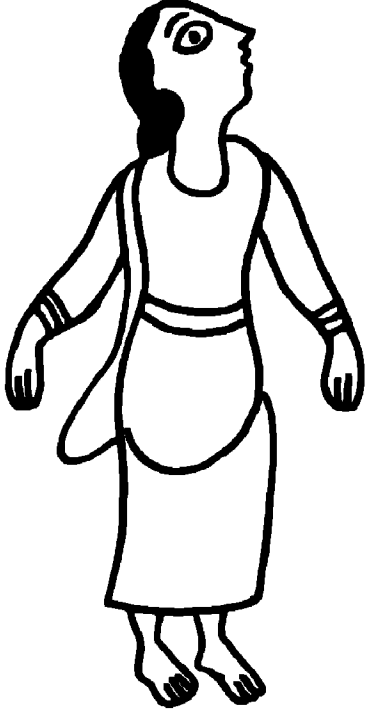
দুই ছেলে আর তাদের দুই বউ নিয়ে থাকত এক গরিব বিধবা। চারজনেই সারাদিন তাকে বকত, খুব দুর্ব্যবহার করত। কেউ নেই তার, যে তার কাছে যায়, দুটো দুঃখের কথা বলে। যত দুঃখ সব বুকে চেপে রাখে, ফলে সে মোটা হতে থাকল। ছেলেরা আর বউরা তাতে মজাই পেয়ে গেল। রোজ রোজ মোটা হচ্ছে দেখে তারা বিদ্রূপ করত, খাওয়া কমাতে বলত।

একদিন বাড়িতে কেউ নেই, সবাই গেছে এখানে ওখানে। মনের দুঃখে বুড়ি বাড়ি ছেড়ে বেরোল। শহরের বাইরে অবধি পৌঁছে গেল। দেখে কি, সেখানে একটা পোড়ো সুনসান বাড়ি। বাড়িতো পড়ো পড়ো, ছাত অবধি নেই। বুড়ি গিয়ে ঢুকল সেখানে। হঠাৎ নিজেকে বড়ো একলা মনে হ'ল, দুঃখের ভার এমন, যেন আর বইতে পারে না। মনে হ'ল এত দুঃখ চেপে থাকতে পারিনা। বলতেই হবে কাউকে।

বড় ছেলের বিষয়ে যত অভিযোগ, সব কথা সে বলল সামনের দেয়ালটিকে। তার কথাও ফুরোল, আর তার দুঃখের ভারে দেয়ালটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল। বুড়ির দেহটাও যেন খানিক হালকা হ'ল।

তারপর দ্বিতীয় দেয়ালটির দিকে ফিরে বড় বউয়ের বিরুদ্ধে যত দুঃখের অভিযোগ, সবই বলে সে বুকের বোঝা খানিক নামাল। দেয়াল পড়ল ভেঙে, বুড়ি যেন আরো খানিক হালকা বোধ করল। ছোট ছেলের নামে যত অভিযোগ, সব বলতে তৃতীয় দেয়ালটিও ভেঙে পড়ল। ছোট বউয়ের নামে সব কথা বলতে চতুর্থ দেয়ালটিও ধূলিসাৎ!

চারপাশে ভাঙাচোরা ইট আর রাবিশ। তার মাঝে দাঁড়িয়ে বুড়ির মনে হ'ল মনমেজাজও হালকা লাগছে, দেহের ওজনও যেন কমেছে। নিজের দিকে চেয়ে দেখে সত্যিই তো! দুঃখ মনে চেপে রাখার সময়ে যত ওজন বেড়েছিল, সব সত্যিই ঝরে গেছে।

সে বাড়ি ফিরে গেল।

না-বলা গল্প

গোণ্ডী
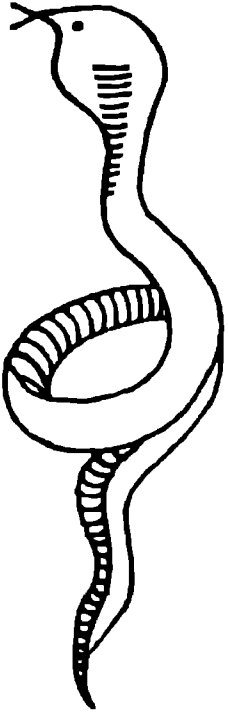
এক গোঁড় চাষীর খামারে ছিল এক খামারু ছেলে। খামারুটি মনিবের ক্ষেতে কাজ করত। গোঁড়টি ছেলে আর বউকে দেখতে যাবে অনেক দূরের এক গাঁয়ে। তাই একদিন ওরা রওনা হ'ল। চলতে চলতে পথের পাশের এক ছোট্ট কুঁড়েঘরে ওরা খানিক বসল। খাওয়াদাওয়া হয়ে যেতে খামারু বলে, 'একটা গল্প বলো।'

গোঁড় তো হয়রান হয়ে গেছে। সে ঘুমিয়ে পড়ল। খামারু কিন্তু জেগে থাকল। সে জানত যে মনিব চার-চারটে গল্প জানে। কিন্তু এমন আল্‌সে লোক, যে গল্প বলতেও আলিস্যি।

গোঁড় যখন গভীর ঘুমে, গল্পগুলো স-ব তার পেট থেকে বেরিয়ে এল। গোঁড়ের ওপর চেপে বসে ওরা এ-ওর সঙ্গে কথা জুড়ে দিল।

ওরা বলছে, 'আরে এ গোঁড় তো ছেলেবেলা থেকেই আমাদের জানে! কিন্তু কাউকে শোনায় না আমাদের কথা? নিষ্কম্মার মতো ওর পেটে থাকি কেন? ওকে মেরে ফেলা যাক। তারপর আর কারো কাছে গিয়ে থাকি।'

খামারু ছেলেটা ঘুমের ভান করছে বটে। তবে সে জেগেও আছে। সব কথা শুনছে মন দিয়ে।

এক নম্বর গল্প বলল, ' ও যখন ছেলের বাড়ি পৌঁছে খেতে বসবে, আমি ওর মুখের মধ্যে খাবারটাকে তীক্ষ্ণ সূচ বানিয়ে দেব। যেই গ্রাসটা গিলবে, সূচ বিঁধে ও মরে যাবে।'

দু' নম্বর গল্প বলছে, 'তাতেও যদি না মরে, আমি এক পেল্লায় গাছ হয়ে পথের পাশে গজিয়ে উঠব। ও যখন যাবে, ভেঙে পড়ব ওর ওপরে। ও মরে যাবেই।

তিন নম্বর গল্প বলল, 'তাতেও যদি কাজ না হয়, আমি সাপ হয়ে ওর ঠ্যাং জড়িয়ে উঠব আর কামড়ে দেব।'

চার নম্বর গল্প বলল, 'ধরো তবু মরল না। ও যখন নদী পেরোবে, আমি হয়ে যাব প্রকাণ্ড এক ঢেউ। বাস্! ওকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাব।'

পরদিন সকালে খামারুকে নিয়ে গোঁড় তো পৌঁছিয়েছে ওর ছেলের বাড়ি। ছেলে আর বউ ওকে খুব খাতির যত্ন করল। রেঁধে বেড়ে ওকে খেতে দিল। গোঁড় যেই ভাতের প্রথম গ্রাসটি মুখে তুলছে, খামারু ওর হাত থেকে গ্রাসটা ফেলে দিল। বলল, 'খাবারে একটা পোকা দেখলাম?'

সবাই যখন খুঁটিয়ে দেখল, দেখে ভাতের প্রতিটি দানা সূচ হয়ে গেছে।

পরদিন গোঁড় ও তার খামারু তো বাড়ি ফিরছে। রাস্তার ধারে একটা মস্ত গাছ পথের দিকে হেলে পড়েছে। খামারু বলল, 'চলুন, ছুটে পেরিয়ে চলে যাই জায়গাটা।' দু'জনে তো দৌড় মেরেছে আর গাছও মড়মড়িয়ে আছড়ে পড়ল। ওরা চলছে, চলছে, দেখে পথের পাশে একটা সাপ। খামারু লাঠি দিয়ে সেটাকে পিটিযে মারল। এরপরে ওরা পৌঁছল নদীর পাড়ে। নদী পেরোবার সময়ে এক প্রকাণ্ড ঢেউ ধেয়ে এল বটে, কিন্তু খামারু গোঁড়কে কোনমতে টেনে তুলল।

নদীর পাড়ে ওরা জিরোচ্ছে তো গোঁড়টি বলছে, 'চারবার আমার প্রাণ বাঁচালে। তুমি কিছু জেনেছ, যা আমি জানি না। কেমন করে জানলে, যে এত সব বিপদ হতে চলেছে?'

খামারু বলল, 'তা বললে পরে তো আমি পাথর হয়ে যাব!'

গোঁড় বলল, 'মানুষ কেমন করে পাথর হয়ে যেতে পারে? বলোই না বাপু!'

খামারু বলল, 'বেশ! বলব আপনাকে। তবে, যখন পাথর হয়ে যাব,—আপনার বেটার বউয়ের সন্তানকে নিয়ে আমার গায়ে ফেলে দেবেন। তা হলেই আমি মানুষ হয়ে যাব আবার।'

খামারু তার গল্পটি বলল, আর পাথরও হয়ে গেল। গোঁড় তাকে সেখানে ফেলে রেখেই বাড়ি চলে গেল। কিছু কাল বাদে তার পুত্রবধূ সব জানতে পারল। সে নিজে নিজেই চলে গেল, পাথরের ওপর ফেলে দিল তার সন্তানকে। খামারু আবার জীবন্ত মানুষ হয়ে উঠল।

কিন্তু গোঁড় তাকে ঘরে ঢুকতে দিল না। তাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিল। সে জন্যেই তো এ অঞ্চলে কম মানুষই গোঁড়দের বিশ্বাস করে। তাদের একটি প্রবাদও আছে, 'গোঁড় বা রমনী বা স্বপ্নের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারে না কেউ।'

গোপাল ভাঁড়ের তারা গোনা

বাংলা

একদিন নবাব, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে খবর পাঠালেন, যে তাঁর ইচ্ছে, গোটা পৃথিবীটা মাপা হোক। এদিক থেকে ওদিক, এ সীমা থেকে ও সীমা। তিনি খুব খুশি হবেন, এর সঙ্গে যদি মহারাজা নিজে আকাশের সব তারা গুণে ফেলেন।

মহারাজা চমৎকৃত হয়ে বললেন, 'ভাববেন না আমি অনিচ্ছুক, কিন্তু আপনি আমাকে যা করতে বলছেন, সে তো অসম্ভব!'

নবাব বললেন, 'পারলে কাজটা করুন।'

মহারাজা ভেঙে পড়লেন। নবাবের দাবী মেটান কি করে সে চিন্তাতেই অস্থির।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতে গোপাল ভাঁড় উপস্থিত। মহারাজাকে অমন হতাশ দেখে নিজের গোঁফে তা দিয়ে সে বলল, 'মহারাজ! এ কি দেখছি? যদি কোন ঝামেলায় পড়ে থাকেন, আপনার গোপালকে বলেই দেখুন। সব ঝামেলা মিটে যাবে।'

রাজা অত সহজে সান্ত্বনা পেলেন না। বললেন, 'না গোপাল! এ সমস্যার সমাধান তোমার সাধ্যে কুলোবে না। নবাব আদেশ করেছেন, গোটা পৃথিবীটাকে এদিক থেকে ওদিক, এ সীমা থেকে ও সীমা মাপতে হবে। শুধু তাই নয়। তিনি চান, আমি আকাশ ভরা তারাও গুনে ফেলব।

গোপাল মোটেই দমে গেল না। সে বলল, 'এই কথা? মহারাজ! এর চেয়ে সহজ কাজ কী আছে? আমাকে আপনার সরকারী দুনিয়া মাপিয়ে আর তারাগুনিয়ের চাকরি দিন, দিয়ে নিশ্চিন্ত হোন। আমার কাজ হয়ে গেলে সব হিসেব নিয়ে নবাবের কাছে যাব। তবে একটা আর্জি আছে। নবাবকে বলুন কাজের জন্যে এক বছর সময় দিতে, আর খরচপত্রের জন্যে দশ লক্ষ টাকা পাঠাতে। এক বছরেই আমি তাঁকে ফলাফল জানিয়ে দেব।'

মহারাজা যেমন খুশি, তেমনি নিশ্চিন্ত হলেন। কাজটা না হলে গোপালের মুণ্ডু কাটা যাবে, তাঁর তো নয়। তিনি গোপালের কথামতোই কাজ করলেন।

একটি বছর গোপাল মহানন্দে কাটাল। দশলক্ষ টাকা নিয়ে সে কত সুন্দরী মেয়েকে পেল, কত সুখ্যাদ্য না খেল। কত প্রাসাদ, বড় বড় হাতি, মণিমাণিক্য, সব সাধ মিটিয়ে নিল। এক বছর মজায় কাটিয়ে সে মহারাজার কাছে হাজির। দশ লাখ টাকা থেকে বেঁচেছে তো চারটে সীসের পয়সা, আর দুটো তামার পয়সা। সেগুলি হাতে নাচাতে নাচাতে মহাচিন্তাকুল মুখে বলল, 'মহারাজ! যা ভেবেছিলাম, কাজটা তার চেয়ে কঠিন বোধ হচ্ছে। শুরুটা চমৎকার হয়েছে, ফলাফলও ভালোই জানছি।

তবে আরেক বছর সময় লাগবে, আর দশ লক্ষ টাকাও দরকার। কাজেই লেগে যাবে।'

মহারাজ গভীর অনিচ্ছায় নবাবকে আর্জি পেশ করলেন। নবাবও গভীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সময় আর টাকা দুই দিলেন। আরেকটা বছর গোপাল মহানন্দে কাটাল। আরোই আনন্দে। এখন তো সে এ বিষয়ে এক অভিজ্ঞ লোক।

ঠিক এক বছর বাদে গোপাল নবাবের প্রাসাদের পথে হাজির। তার পিছনে পনেরটা বলদ-টানা গাড়ি। তাতে পর্বত প্রমাণ অতি মিহি সুতো ঠাসবোঝাই। জড়িয়ে মড়িয়ে একাকার একেকটা স্তূপ। আর পাঁচটা মোটা সোটা অতীব লোমশ ভেড়া। এই অদ্ভুত মিছিল নিয়ে সে নবাব বাড়ির ফটক দিয়ে ঢুকে একেবারে দরবারে হাজির!

নবাবের সামনে মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করে গোপাল বলল, 'জাঁহাপনা! যেমনটি বলেছেন, তেমনটি করেছি। গোটা দুনিয়াটার কোণ থেকে কোণ মেপে ফেলেছি, আকাশের তারা গোণাও শেষ!'

—'চমৎকার! এখন হিসেব দাও। সঠিক হিসেব দেবে। সঠিক অঙ্কে।'

—'অঙ্কে? জাঁহাপনা, শর্তের সময়ে তো অঙ্কের কথা বলেন নি। যা বলেছিলেন, তা করেছি। প্রথম সাতটা বলদের গাড়িতে যত সুতো আছে, পৃথিবী ততটা চওড়া। আর পরের আটটা বলদের গাড়িতে যত সুতো আছে, পৃথিবী তার মাপে লম্বা। পাঁচটা ভেড়ার গায়ে যত লোম আছে, আকাশে ঠিক ততগুলো তারা আছে। ও রকম ভেড়া খুঁজে বের করতে আমার খুব মেহনত হয়েছে।'

নবাব আর কি বলবেন? তিনি বললেন, 'অসম্ভব! আমি ও সুতোও মাপতে পারব না, ভেড়ার লোমও গুনতে পারব না। যাক গে, তুমি তোমার কথা রেখেছ। এই নাও দশলক্ষ টাকা পুরস্কার!'

গোপাল আরো কিছুকাল মহানন্দে কাটাল।

বোপোলুচি

পাঞ্জাবী

কয়েকটি তরুণী গ্রামের কুয়ো থেকে জল নিচ্ছিল। আর কবে, কাকে, কেমন করে তারা বিয়ে করবে তা নিয়ে নিজেদের স্বপ্ন কল্পনার কথা বলছিল এ-ওকে।

একজন বলল, 'বিয়ের যৌতুকের পাহাড় নিয়ে কাকা আসবে, আমাকে সাচ্চা জরির পোশাকে সাজাবে, এক প্রাসাদে বিয়ে হবে আমার।'

আরেকজন বলল, 'উটের পিঠে মিঠাই চাপিয়ে আমার কাকা এসে পড়বে।'

তৃতীয়জন বলল, 'সোনার গাড়িতে মণিমুক্তোর বোঝা চাপিয়ে কাকা আমার এল বলে।'

বোপোলুচি ওদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী। মুখটি মলিন হয়ে গেল তার। সে অনাথ, দুনিয়াতে কেউ নেই তার, যে বিয়ের ব্যবস্থা করে, যৌতুক দেয়। তবু, অন্যদের কাছে হার মানবে না বলে ও বলল, 'সোনার থালায় পোশাক, মিঠাই আর ধনরত্ন সাজিয়ে আনবে আমার কাকা।'

এক চোর বসেছিল কুয়োর কাছে। ফেরিওয়ালা সেজে ও গ্রামের মেয়েদের কাছে আতর বেচে। বোপোলুচির রূপ আর তেজ দেখে ও ঠিক করল, নিজেই বিয়ে করবে মেয়েটাকে। পরের দিনই এক ধনী চাষী সেজে ও বোপোলুচির ঘরে হাজির হ'ল। সঙ্গে বড় বড় থালায় রেশমের পোশাক, মিঠাই, মণিমুক্তো, কত কি! এ সবই চুরির মাল, ও লুকিয়ে রেখেছিল।

বোপোলুচির যেন বিশ্বাস হতেই চায় না। যেমনটি ভেবেছিল সে স্বপ্নই যেন সত্যি হ'ল। চোরটা এ কথাও বলল, যে সে বোপোলুচির কাকা। তার বাপের সোদর ভাই, অনেক দিন আগেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এখন বাড়ি এসেছে, নিজের এক ছেলের সঙ্গেই ভাইঝির বিয়ে দেবে। নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস হয় না বোপোলুচির, তবে চোরের সব কথাই বিশ্বাস হচ্ছে যে! আনন্দে ভেসে গেল মেয়েটা। নিজের যা কিছু, পোঁটলা বেঁধে চলল চোরের সঙ্গে। কিন্তু পথ

দিয়ে যখন ওরা হাঁটছে, একটা কাক ডেকে বলল,

বোপোলুচি, সাবধান!
বাতাসে বিপদের গন্ধ পাচ্ছ?
তোমাকে উদ্ধার করতে কাকা আসেনি
ও ডাকাত! তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছে।

বোপোলুচি বলল, 'কাকা! কাকটা যেন কেমন বেয়াড়া ঢঙে ডাকছে। ও কি বলছে?'

—'কিচ্ছু না। এখানে কাকরা অমনিই ক্যাঁ ক্যাঁ করে বটে।'

আরো খানিক পথ যেতেই দেখে একটা ময়ূর। ফুটফুটে মেয়েটাকে দেখেই ময়ূর কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বলল,

বোপোলুচি! বোপোলুচি!
বাতাসে বিপদের্ গন্ধ পাচ্ছ?
ও কাকা নয়, কাকা নয়!
ও ডাকাত! তোমাকে ধাপ্পা দিচ্ছে।

মেয়েটা তো অবাক। 'কাকা! ময়ূরটা কেমন যেন গলায় ডাকছে। ও কি বলছে গো?'

—'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, এ দেশে ময়ূরগুলো অমনি হেঁড়ে গলায় চেঁচায়।'

তখন একটা শিয়াল পথ থেকে সরে যেতে যেতে বিকট ডেকে উঠল।

বোপোলুচি! সাবধান!
বাতাস শোঁকো, বিপদের গন্ধ পাবে
তোমাকে বাঁচাতে কোন কাকা আসেনি,
ও এক ডাকাত! তোমাকে ধাপ্পা দিচ্ছে।

বোপোলুচি বলল, 'কাকা! শিয়ালটা অমন গলায় ডাকল কেন গো? কি যেন বলছিল, তাই না?'

—'আরে না! এ দেশে শিয়াল মাত্রেই বিশ্রি গলায় হুক্কা হুয়া ডাকে।'

তা বোপোলুচি লোকটার সঙ্গে অনেক মাইল হাঁটল। তারপর পৌঁছল ওর বাড়ি। ঘরে ঢুকতেই লোকটা দোরে খিল দিল। তারপর নিজের পরিচয় দিল, বলল ও নিজেই বোপোলুচিকে বিয়ে করবে। কত কাঁদল বোপোলুচি, কত না বিলাপ করল। কিন্তু লোকটার তো দয়ামায়া নেই। নিজের বুড়ি মায়ের কাছে ওকে রেখে নিজে বেরোল। বিয়ে আর ভোজের ব্যবস্থা তো করতে হবে।

এখন বোপোলুচির চুল যেমন লম্বা, তেমন সুন্দর, একেবারে গোড়ালি অবধি নেমেছে। লোকটার মা বেজায় বুড়ি, মাথায় একটা চুলও নেই।

কনের সাজপোশাক বের করতে করতে বুড়ি বলছে, 'ও মেয়ে! অমন সুন্দর চুল

হ'ল কি করে গো?'

বোপোলুচি বলল, 'এই কথা? আমার মা করত কি, ধান কোটবার হামানদিস্তায় আমার মাথা ঢুকিয়ে হামাল দিয়ে আমার মাথা কুটত, যাতে চুল গজায়। একটা করে বাড়ি মারে, আমার চুল লম্বা হয়। এ একেবারে অব্যর্থ দাওয়াই।'

—'হয়তো আমার বেলাও কাজ করবে, চুল গজাবে আমারও।'

বুড়ির বড্ড শখ ছিল লম্বা লম্বা চুলের। বেচারার মাথায় কোনদিন তেমন চুল ছিল না।

—'হয়তো কাজ করবে। দেখলেই তো হয়?'

বুড়ি হামানদিস্তায় যেই মাথা ঢুকিয়েছে, বোপোলুচি ধাঁই করে বাড়ি মেরেছে। এমন জোরে মেরেছে, যে বুড়ি মরেই গেল।

বোপোলুচি মরা বুড়িকেই কনের সাজে সাজাল। তাকে টেনে বসাল কনের চৌকিতে। ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে সামনে রাখল একটা চরকা। ডাকাতটা ফিরবে যখন, ভাববে তার কনে বসে আছে। তারপর, নিজে বুড়ির কাপড় জামা পরে, নিজের পোঁটলাটি নিয়ে সাততাড়াতাড়ি বাড়ি ছেড়ে বেরোল।

ফেরার পথে ডাকাতটা ওকে দেখেছে। ও নিজে একটা জাঁতা চুরি করে ঘরে আনছে, যাতে ভোজের জন্যে গম পেষা যায়। ও ভাবল, কে জানে কোন বুড়ি, পা হেঁচড়ে চলেছে।

তা বোপোলুচি নিজের বাড়ি নিরাপদেই পৌঁছল।

বাড়ি ফিরে ডাকাত ভেবেছে এ নিশ্চয় বোপোলুচি। কনে সেজে চৌকিতে বসে চরকা কাটছে। ও চেঁচিয়ে বলছে জাঁতাটা ধরতে। কনে তো কথা কয় না। যত ডাকে, সাড়া নেই। শেষে ক্ষেপে গিয়ে ও জাঁতাটা ছুঁড়ে মেরেছে কনের মাথায়। কনে তো ধপাস করে পড়ে গেছে। কাছে গিয়ে ডাকাত দেখে কি, এ তো বোপোলুচি নয়। এ তো তার মা, মাথাটা গুঁড়িয়েই গেছে। ডাকাত তখন যত কাঁদে, তত বুক চাপড়ায়। সে তো ভাবছে সেই তার মাকে মেরেছে। ক্রমে ক্রমে ও বুঝল, বোপোলুচি ত্রিসীমানায় নেই, পালিয়ে গেছে। রাগে উন্মাদ হয়ে ও ছুটে বেরোল। যেখানেই পালাক, ওকে ধরবেই ধরবে।

গ্রামে পৌঁছলেও বোপোলুচি জানে, লোকটা ওকে ধরতে আসবেই আসবে। রোজ রাতে ও পড়শীদের বলে, আজ রাতটা তোমার ঘরে ঘুমোব। নিজের ছোট্ট ঘরটি, ছোট্ট বিছানাটি খালি পড়ে থাকে।

কিন্তু এ তো নিত্যি নিত্যি চলে না। দেখা গেল, সব পড়শির ঘরেই রাত কাটানো হয়েছে. আর কেউ বাকি নেই।

অগত্যা সাহসে বুক বেঁধে ও নিজের ঘরেই থাকল। বিছানায় রাখল খুব ধারাল একটা নিড়ানি। মাঝরাতে চারটে লোক ঢুকেছে ঘরে, খাটিয়ার চারটে পায়া একেকজন

ধরেছে, তুলে নিয়ে বেরিয়েছে পথে। ডাকাতটা নিজে ধরেছে বোপোলুচির মাথার দিকে একটা খুরো। বোপোলুচি ঘুমের ভান করছে, কিন্তু সে জেগেই আছে। ওরা পৌঁছিয়েছে এক নির্জন জায়গায়। লোকগুলো তেমন সতর্কও থাকছে না আর।

বোপোলুচি নিড়ানিটা তুলে, পায়ের দিকে লোক দুটোর মাথা কচাৎ করে কেটে ফেলেছে। আর ঝাঁ করে ঘুরে বসে আরেকটা লোকের মাথাও কেটেছে। ভয়ের চোটে ডাকাত দৌড় মেরেছে। বোপোলুচি তাকে ধরার আগেই সে বনবিড়ালের মতো হাঁচড়ে পাঁচড়ে একটা গাছে উঠে পড়েছে। বোপোলুচি নিড়ানি নাচাচ্ছে আর বলছে, 'নেমে আয়। যদি মরদ হোস, তো এসে লড়াই কর।' ডাকাত তো নামে না। বোপোলুচি তখন শুকনো ডালপালা এনে গাছ ঘিরে পাঁজা করল। তারপর আগুন দিল তাতে। গাছটাতেই আগুন লেগে গেল। ধোঁয়ার জ্বালায় দম আটকে যায়, ডাকাত লাফিয়ে নামতে গেছে। যেমন লাফানো, অমনি ঘাড় মটকে সে মরেই গেল।

তারপর বোপোলুচি চলে গেল সেই ডাকাতের বাড়ি। যত সোনা, রুপো, মণিমুক্তো, পোশাক-আশাক লুকোনো ছিল, স-ব সাজাল সোনা আর রুপোর থালায়। থালাগুলো চাপাল উট আর গাধার পিঠে। এবার সে গ্রামে ফিরে এল।

এখন সে এত বড়লোক, এত বড়লোক, যে বোপোলুচি যাকে ইচ্ছে, তাকেই বিয়ে করতে পারবে।

জুঁই রাজপুত্র

তামিল

এক যে ছিলেন রাজা। সবাই তাঁকে বলত জুঁই রাজপুত্র, কেন না যখনি তিনি হাসেন, জুঁই ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে বহুদূর অবধি। কিন্তু তেমনটি হতে হ'লে, তাঁকে আপনা থেকে হাসতে হয়। কেউ কাতুকুতু দিল, বা জোর করে হাসাল, তা হ'লে কিন্তু জুঁই ফুলের গন্ধ বেরোবে না।

জুঁই রাজপুত্র ছিলেন এক ছোট্ট রাজ্যের রাজা। এক অনেক বড় রাজাকে নজরানা দিতে হয় তাঁর। এই বড় রাজা তো শুনেছেন ক্ষুদে রাজার এ আশ্চর্য গুণের কথা। তিনি হাসলেই জুঁইফুলের গন্ধ বেরোয়। বড় রাজা এমন কথা দেখতেও চান, জানতেও চান নিজে। তাই জুঁই রাজপুত্রকে নিজের প্রাসাদে নেমন্তন্ন করে আনলেন। হাসতে হুকুম করলেন। রাজপুত্র তো হুকুম মাফিক হাসতে পারেন

না। অনেক, অনেক চেষ্টা করলেন, হাসি কিন্তু এল না।

বড় রাজা ক্ষেপে লাল।

"হুকুম মানছে না! আমাদের অপমান করতে চেষ্টা করছে!"—এই ভেবে রাজপুত্রকে বন্দী করলেন। যতদিন না হাসছেন। ততদিন বন্দী থাকুন।

কারাগারের ঠিক সামনে এক কুটীরে থাকে একটি পঙ্গু লোক। রাজ্যের রাণী তার প্রেমে হাবুডুবু। রাত হলেই তিনি লোকটির ঘরে যান।

জুঁই রাজপুত্র জানলা দিয়ে সবই দেখতে পান। ভাবেন, "যাক গে! আমার মাথা ঘামানোর কি আছে!" ভাবগতিকে বুঝতেও দেন না যে তিনি সব জানেন।

এক রাত্তিরে রাণীর আসতে খুব দেরি হয়েছে। সে লোকটি বেজায় ক্ষেপে গিয়ে রাণীকে পিটতে লেগেছে। নুলো হাতে মারছে, খোঁড়া পা দিয়ে লাথি মারছে. রাণী নীরবে মার খাচ্ছেন। একটি কথাও বলছেন না। যত সুখাদ্য এনেছেন প্রাসাদ থেকে, কত যত্নে না তাকে খাওয়াচ্ছেন। কিছুক্ষণ বাদে লোকটির অনুতাপ হয়েছে। সে বলছে, "এত মারধোর করলাম। তুমি রেগে যাওনি তো?"

রাণী বললেন, "না না, আমার চমৎকার লাগছিল। যেন চৌদ্দ ভুবন একসঙ্গে দেখলাম!"

যে বারান্দায় ওঁরা কথা বলছেন, তার পাশেই এক বেচারা গরিব ধোপা শীতে কাঁপছে। তার গাধাটা হারিয়ে গেছে। চার-পাঁচ দিন ধরে সে খুঁজছে তো খুঁজছেই। কখনো যে খুঁজে পাবে, সে আশাও ছেড়ে দিয়েছে।

রাণীর কথাবার্তা শুনে সে ভাবছে, "ইনি তো চৌদ্দ ভুবন দেখেছেন। নিশ্চয় আমার গাধাটাকে দেখেছেন কোথাও।"

তাই ও হেঁকে বলছে, "ও ঠাকরুণ! আমার গাধাটা দেখলেন কোথাও?"

জুঁই রাজপুত্র জানলায় দাঁড়িয়ে সবই দেখছেন ও শুনছেন। ধোপার কথা শুনে তাঁর বেজায় হাসি পেল। তখন তো রাত। তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাতের বাতাস ভরে গেল জুঁই ফুলের গন্ধে। যোজন যোজন ছড়িয়ে গেল গন্ধ।

ভোর তখনো হয়নি। তবু কারাগারের প্রহরীরা ছুটে গেল রাজার কাছে। বলল হাসির কথা, জুঁইফুলের গন্ধের কথা।

ভোর হবার জন্যে সবুর করলেন না রাজা। তখনি জুঁই রাজপুত্রকে ডেকে আনলেন প্রাসাদে। বললেন, "সেদিন যখন হাসতে বললাম, তুমি হাসতেই পারলে না। মাঝরাতে কি এমন ঘটল, যে তুমি হাসছ?"

কেন হেসেছেন, সে কথা চেপে রাখতে অনেক চেষ্টা করলেন রাজপুত্র। কিন্তু বড় রাজা তো ছাড়ার পাত্র নন।

রাজপুত্র সব কথাই বললেন।

সব শুনে বড় রাজা দুটি হুকুম দিলেন।

জুঁই রাজপুত্রকে সসম্মানে স্বরাজ্যে ফেরত পাঠানো হোক।
আর রাণীকে তৎক্ষণাৎ ফেলে দেয়া হোক চুনের ভাঁটায়।

সোনা ও রূপা

মাল্‌ভী : মধ্যপ্রদেশের এক রাজস্থানী হিন্দী আঞ্চলিক ভাষা

একদিন সন্ধ্যায়, শিকারের পর এক রাজপুত্র তাঁর কালো ঘোড়ী চেপে ঘরে ফিরছেন। ঘোড়ীটিকে জল খাওয়াবেন বলে এক ঝর্ণার ধারে গেছেন। তিনি চেয়ে আছেন। ঘোড়ী জল খাচ্ছে। দেখেন কি, তাঁর আর ঘোড়ীর ছায়া পড়েছে জলে। সেখানে সোনালি আর রুপোলি চুলও ভেসে বেড়াচ্ছে।

নিশ্চয়, ঝর্ণার উজানে সুন্দরী মেয়েরা স্নান করেছে। তাদের মাথায় নিশ্চয় সোনালি আর রুপালি চুল আছে।

নিচু হয়ে চুলটি তুলে নিলেন কুমার। যতই দেখেন, ততই ভাবেন, এমন চুল যাদের, সে মেয়েরা না জানি কত সুন্দরী! ভেবে ভেবে তিনি মুগ্ধ। পাগড়িতে চুলটি গুঁজে, ঘোড়ীর পিঠে চেপে তিনি প্রাসাদে ফিরলেন।

রাতে খাবার সময় হ'ল। কুমারের কিন্তু দেখা নেই। খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল, কুমারকে তো পাওয়া গেল না। রাণীমা দাস দাসীদের পাঠালেন, প্রাসাদের ঘরে ঘরে খোঁজ করো।

এক দাসী ভাঁড়ারঘরে ঢুকেছে খানিক চিনি নেবে ব'লে। দেখে কুমার মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। সে চেঁচাতে যাচ্ছিল, কিন্তু কুমার বললেন, "কাউকে বলেছ তো প্রাণে বাঁচবে না।"

কথায় বলে, মেয়েরা আর বাতাস, কোন কথা গোপন রাখতে পারে না। দাসীটি গিয়ে রাণীমাকে সব বলেছে। আর রাণীমা দাসীদের বকতে বকতে ভাঁড়ার ঘরেই আসছেন। বলছেন, "ঝাঁটপাট দাও নি কেন? ভারি আলসে আর কুঁড়ে হয়েছ সব!"

তারপর, যেন হঠাৎ দেখলেন, এইভাবে বলে উঠলেন, "দেখ দেখ কে এখানে শুয়ে আছে। কি হয়েছে বাছা? ধুলোয় পড়ে আছ কেন? কিসের এত দুঃখ? কেউ কি অপমান করেছে? জিভ ছিঁড়ে নেব তার। তোমার গায়ে হাত তুলেছে কেউ? হাত কেটে নেব তার। কি হয়েছে বলো। ওঠ, ধুলো ছেড়ে ওঠো।"

কুমার উঠে বসলেন। পাগড়ি থেকে বের করলেন সেই সোনা আর রুপোর চুল।

রাণীকে দেখিয়ে বললেন, "যে মেয়েদের মাথায় সোনার চুল আর রুপোর চুল, আমি তাদের বিয়ে করব।"

রাণী বললেন, "এই কথা? তেমন মেয়েরা যেখানে থাকুক না কেন, আমরা খুঁজে বের করবই।"

—"আমি শুধু সেই মেয়েদেরই চাই, যাদের চুল ঠিক এ রকম।"

—"হ্যাঁ বাছা, তাদের পাবে।" রাণী বললেন বটে। কিন্তু তাঁর মাথা ঘুরছিল, পা টলে যাচ্ছিল ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরোবার সময়ে।

রাজধানীর দিকে দিকে ছুটল দূত। নগর-ঘোষক পথে পথে ঢেঁড়া দিয়ে জানাল, আগামী কাল সকালে নগরীর প্রতিটি মেয়ে যেন প্রাসাদ অঙ্গনে যায়। কারো মাথায় যেন ওড়না না থাকে।

পরদিন সকালে প্রাসাদের সামনে লম্বা সারি বেঁধে দাঁড়াল যত মেয়ে। কুমার তাদের দেখলেন আর দেখলেন। না, কারো মাথার চুলই তাঁর হাতের দু'গাছা চুলের মতো নয়।

হঠাৎ দেখেন, প্রাসাদের অন্দরমহলের উঠোনে বসে আছে দুটি মেয়ে। একজনের চুল সোনার, আরেকজনের চুল রুপোর।

তখনি কুমার রাণীমাকে ডাকলেন, দেখালেন ওদের।

রাণী যেন বজ্রাহত হলেন। তবু কোনমতে বললেন, "হা ভগবান! ওরা যে তোমার বোন! সোনা আর রূপা!"

কুমারের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তবু তিনি জেদ ছাড়লেন না। বললেন, "ওরা যেই হোক, ওদেরই আমি বিয়ে করব। নইলে দেশ ছেড়ে বিবাগী হয়ে যাব।"

রাজা এসে কুমারকে কত বোঝালেন। আত্মীয়স্বজন, গুরুজনেরা, মন্ত্রীরা, সবাই বোঝালেন। রাণীমা হাত জোড় করে মিনতি করলেন কত। কিন্তু কুমারের যা চাই, তা চাইই চাই।

তাই বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। সবুজ বাঁশের খুঁটিতে রেশম ও কাপড়ের বিশাল সামিয়ানা হ'ল। বিশাল এক মণ্ডপ তৈরি হ'ল। মুখে মুখে কথা ছড়াল, কানাকানি শুরু হয়ে গেল।

সোনা আর রুপাও জানতে পারল সব। আতঙ্কে তারা যেন বোবা হয়ে গেল। মুখ কালো, চোখে নামল জল।

যে নদীর ঘাটে ওরা স্নান করত, তার পাড়ে ছিল এক চন্দন গাছ। ছোটবেলা থেকে দু'বোন সে গাছে জল দিয়েছে, যত্ন করেছে তাকে। ওদের সঙ্গেই বেড়ে উঠেছে গাছটা। এখন সে গাছ দীর্ঘ; বিশাল।

বিয়ের দিন সোনা আর রূপা চন্দন গাছ বেয়ে উঠল, ডালপালার ফাঁকে লুকিয়ে থাকল দু'বোন। বিয়ের লগ্ন এগিয়ে আসছে। প্রাসাদের দাসরা খুঁজতে খুঁজতে ওদের

হদিশ পেল। কত না মিনতি করল ওরা, কিছুতে নামল না সোনা আর রুপা।

শেষে স্বয়ং রাজা এসে বললেন·

নেমে এসো নেমে এসো
আমার দুলালী সোনা আর রুপা!
বিয়ের লগ্ন হয়েছে যে!

সোনা আর রূপা বলল,

বাবা! তোমাকে তো আমরা বাবা বলি!
কেমন করে "শ্বশুর" ব'লে বলব?
চন্দনগাছ গো! ওঠো, আরো ওপরে ওঠো!

সরসর করে উঁচুতে উঠল চন্দনগাছ। সোনা আর রুপা এখন কত ওপরে! রাজপরিবারের সবাই এল, সবাই ডাকল ওদের। ওরা তো নামল না। একজন ডাকে, গাছের মাথা ততই ওঠে আকাশে; সোনা আর রুপাও চলে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে।

শেষে কুমার নিজে এলেন ওদের ডাকতে।

নেমে এসো বোন সোনা!
নেমে এসো বোন রুপা!
আমাদের বিয়ের লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে।

ওরা বলল,

দাদা! চিরকাল তোমাকে দাদা বলেছি
এখন কেমন করে তোমাকে "স্বামী" বলব?
ও চন্দন গাছ! ওঠো, আরো ওপরে ওঠো!

হঠাৎ কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। আকাশে গর্জাল বাজ। চন্দন গাছটা হঠাৎ দু'ভাগে কেটে গেল। সোনা আর রুপাকে নিয়ে নিল ভিতরে। বাড়ির সকলের চোখের সামনে সোনা আর রুপা গাছের কোলে মিলিয়ে গেল।

ভাইয়ের দিন

রাজস্থানী

ছিল এক ভাই, তার দিদির বিয়েও হয়েছিল। থাকতও অনেক দূরে। তো ভাই তার মাকে বলল, "মা! দিদির সঙ্গে দেখা করতে যাব ভাইয়ের দিনে, দেখব নতুন কাপড়ে তাকে সাজিয়ে। কত লোক না যাচ্ছে বোনদের দেখতে। আমিও যাব।"

মা বলল, "বাছা! তুমি এখনো বড়ই ছোট। দিদিও থাকে অনেক দূরে। যাবে কেমন করে? পথে তো সিংহ আছে, আরো কত বুনো জন্তু! ভয় পাবে তুমি। যাবে কি করে?"

ছেলে বলল, "মা! আমি যাবই।"

মা মেয়ের জন্যে দিল ঘাঘরা আর ওড়না, জামাইয়ের জন্যে কুর্তা আর পাগড়ী। সব পোঁটলা বেঁধে ছেলেকে দিয়ে বলল, "ভালয় ভালয় যাও। ভাইয়ের দিনে দিদিকে নতুন কাপড় পরিয়ে দেখে এসো।"

ভাই রওনা হ'ল। পথে দেখে এক বিশাল গাছ। গাছ বলছে, "ভাই! আমি তোমার ওপর পড়ব।" ভাই বলল, "এখনি পোড় না। ভাইয়ের দিনে দিদিকে নতুন কাপড়ে সাজিয়ে দেখতে যাচ্ছি তো। কাজ হয়ে গেলে যখন ফিরব, আমাকে মেরে ফেলো।"

এরপরেই দেখা এক সাপের সঙ্গে। সাপ বলছে, "ভাই! আমি তো তোমাকে কামড়াব।"

—"এখন নয়। দিদিকে দেখতে যাচ্ছি। ভাইয়ের দিনে দিদি নতুন কাপড় পরবে। ফিরব যখন, তখন কামড়িও আমাকে।

এবার দেখা এক সিংহের সঙ্গে। সে বলল, "তোমাকে খাব ভাই।"

—"এখন খেও না। দিদিকে নতুন কাপড়ে সাজিয়ে দেখে ফিরব যখন, তখন খেও।"

শেষমেশ দিদির গ্রামে পৌঁছল ভাই। দিদি তো চরকা নিয়ে বসেছে। এ-ওকে দেখল, কিন্তু তখনি সুতোটা ছিঁড়েছে, দিদি তাই উঠল না। (লোক বিশ্বাস, সুতো যখন ছিঁড়েছে, তখন যদি কোন অতিথিকে স্বাগত জানাও, অতিথির ক্ষতি হবে)।

ভাই তো তা জানে না। সে ভাবল, 'ইশ্! এতটা পথ হেঁটে দিদিকে দেখতে এলাম, নিজের বোন দেখি কথাই কয় না।' ফিরে যাই বলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, দিদি ছেঁড়া সুতোয় গিঁট দিয়ে বলছে, " অ ভাই! কোথায় যাস? চরকার সুতো ছিঁড়লে কি কথা কইতে আছে? তোকে বিপদ থেকে বাঁচাচ্ছিলাম রে!"

দুজনে মহানন্দে সম্ভাষণ জানাল। এখন দিদি দৌড়ল এক পড়শি মেয়ের বাড়ি।

"অ পড়শি ঠাকরুণ! আমার ভাই যে ভাইয়ের দিন ব'লে নতুন কাপড় এনেছে। আমাকে কি করতে হয়?"

পড়শি ঠাকরুণ তেমন সুবিধের মানুষ নন। তিনি বললেন, "হতচ্ছাড়ী! উঠোনটা তেল দিয়ে লেপে দে, আর ঘি চড়া উনোনে, ফুটবে।"

দিদি তো মস্ত বাসনে ঘি চড়িয়েছে, আর উঠোনে তেল ঢালছে। ঘি-ও ফোটে না, তেলও শুকোয় না।

দিদি দৌড়ে গেল আরেক পড়শির বাড়ি। "অ মাসি! আমার ভাই তো এসেছে নতুন জামাকাপড় নিয়ে। ও বাড়ির পড়শি ঠাকরুণকে শুধোলাম, কি করতে হয়? তিনি বললেন, উঠোন তেল দিয়ে লেপতে হয়, ঘি ফোটাতে হয়। দেখ, তেলও শুকোচ্ছে না, ঘি-ও ফুটছে না।"

ইনি মানুষ ভালো। বললেন, "গেরিমাটি আর গোবর দিয়ে উঠোন লেপ। ভাত চড়িয়ে দাও। ভাত রান্না হলে ঘি আর অনেকটা চিনি মিশিয়ে ভাইকে খাওয়াও।"

বাড়ি এসে দিদি হলদে গেরিমাটি আর গোবরে উঠোন লেপল। ভাত রেঁধে ঘি-চিনি মিশিয়ে দিনে দিনে চারদিন কাটল। ভাই বলছে, "দিদি, এবার তো আমি ফিরব।" এ কথা শুনে দিদি ভাবছে, "ভাইকে কয়েকটা গোল পিঠে করে দিই। ভালো করে গড়ব, সঙ্গে দিয়ে দেব। বাবা খাবে, মা খাবে, ভাইও পথে খাবে। যেমন তেমন রুটি দেব না, ভালো পিঠে বানিয়ে দেব।"

পরদিন মাঝরাতে উঠে দিদি গম পিষতে লেগেছে। একটা কালো সাপ পড়ে গেল আটায়। অন্ধকারে দিদি তো দেখতে পায় নি। আটা দিয়ে পিঠে গড়ে ন্যাকড়ায় বেঁধে ভাইকে দিচ্ছে। বিদায় জানিয়ে বলছে, "যা ভাই, দেখে শুনে যাস।"

ছেলেমেয়ের জন্যে কয়েকটা পিঠেও রেখেছিল। ছেলেমেয়ে বলছে, "মামাকে তো বেঁধে ছেঁদে দিলে। এখন আমাদেরও দাও।"

তো দিদি দুটো পিঠে ভেঙে চার ছেলেমেয়েকে দিয়েছে। দিতে গিয়ে দেখে, কালো সাপের হাড়গোড় পিঠের মধ্যে।" সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দিদি দৌড়েছে ভালো পড়শির বাড়ি।
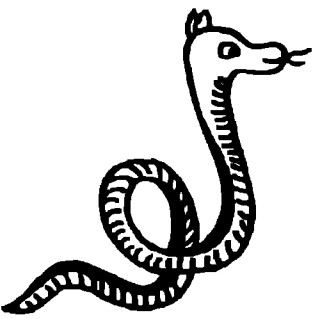
—"অ মাসি! আমার ঘরদোর দেখো, ছেলেমেয়েদেরও দেখো। ভাই হয়তো পিঠে খেতে লেগেছে, মরেও যাবে নির্ঘাত।"

পড়শি রাজী হ'ল। দিদি তখন জঙ্গলে ছুটছে, আর ডাকছে, "অ ভাই! দাঁড়াও, দাঁড়াও, অ ভাই!"

সে জঙ্গল এদিকে চব্বিশ মাইল, ওদিকে চাব্বশ মাইল। গোটা জঙ্গলটায় দৌড়ে বেড়াচ্ছে দিদি।

অবশেষে দিদি ভাইয়ের কাছে পৌঁছল। ভাই ভাবছে, দিদি এল কেন? আমি তো ওর ঘর থেকে সরাই নি কিছু?"

দিদি ভাইকে দেখেই বলল, "পিঠে খাস নি তো ভাই? খাসনি তো?"

ভাই বলল, "দেখ। যেমনটি বেঁধে দিয়েছ। তেমনটিই আছে। আমি ছুঁইনি একটাও।"

দিদি বলল, "একটা পিঠে ভাঙলাম, দেখি কালো সাপের হাড়।" ভাই তখনি পিঠের পোঁটলা জঙ্গলে ফেলে দিয়ে দিদির সঙ্গে দিদির বাড়ি ফিরে গেল। দিদি ভাইকে এক সপ্তাহ ধরে রাখল।

শেষে ভাই বলছে, "অ দিদি? আমাকে বাঁচানো কি তোমার সাধ্যি? গ্রাম ছেড়ে বেরিয়েছি, এক পেল্লায় গাছ বলছে, তোমাকে পিষে দেব। তা'বাদে গেলাম নদীর পাড়ে। নদী বলছে, তোমাকে ভাসিয়ে নেব। তা'বাদে দেখি একটা সাপ। সাপ বলছে, তোমায় কাটব। একটা সিংহও বলল, সে আমাকে খাবে। —এখন বলো, আমাকে বাঁচাবে, এমন সাধ্যি কি আছে তোমার?

দিদি গলার হারটি নিল, নদীকে দেবে। নিল এক বাটি দুধ, সাপকে দেবে। নিল এক ছাগলছানা, সিংহকে দেবে। পাঁচটা মার্বেল নিল, দেখে গাছ খুশি হবে।
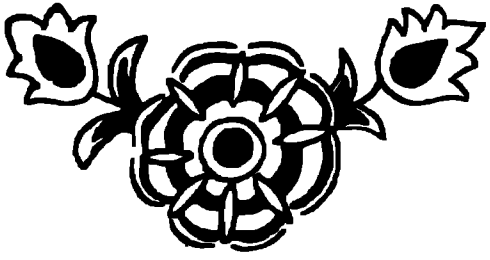
আবার দৌড়ল ভালো পড়শির কাছে। "অ মাসি! আমার বাড়িঘর দেখো, আমার ছেলেমেয়েকে দেখো। ভাইকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি ফিরে আসব।"

দিদি আর ভাই ঢুকল সেই অজগর বনে। দিদি যে সব উপহার এনেছিল, তা দিয়ে ভাইকে বাঁচাল সিংহ, সাপ, নদী আর গাছের হাত থেকে।

হাঁটতে হাঁটতে দিদির তো তেষ্টা পেয়েছে। ভাই বলছে, "দিদি! ওই গাছে উঠি। যেখানেই দেখব সারস উড়ছে, সেখানেই জানব নিচে জলাশয় আছে।" গাছে উঠে ও দেখছে, কিছুদূরে সত্যিই সারস উড়ছে। ও বলছে, "দিদি! ওখানে নিশ্চয় জল পাব। নিচে জল না থাকলে সারস তো ওড়ে না। তুমি ছায়ায় জিরোও, আমি জল নিয়ে আসি।"

ভাই তো চলে গেছে। বোন দেখে, নিয়তি ঠাকরুণ জঙ্গলে ঘুরছেন আর বলছেন, "কারো একটি ছেলে থাকলে তার কলিজার জন্যে আমি ঢাকনি বানাচ্ছি।" দিদি ডেকে বলছে, "অ বুড়ি মা! করছ কি?"

—"একমাত্র ছেলেটির কলজের জন্যে ঢাকনি বানাচ্ছি।"

দিদি তো বুঝেছে, এবার তার ভাইয়ের মরণ ঘনিয়েছে।

—"বলো মা! আমি কি করি?"

নিয়তি ঠাকরুণ বলছে, "হোলি আর দেয়ালির পর ভাইয়ের দিনে এ গল্প বলবে, তাকে পুজো করবে। কিন্তু এ দিনে তাকে শাপশাপান্তও করবে। করলে তোমার ভাই রক্ষা পাবে।"

তৎক্ষণাৎ দিদি ভাইকে শাপশাপান্ত শুরু করল, "আমার ভাইয়ের মরণ হোক। তার হাড় ছাই হোক।" ভাই যখন ফিরেছে, তখনো দিদি শাপ দিচ্ছে। ভাই তো মর্মাহত। ভাবছে, এখন কি হবে?

চলতে চলতে ওরা বাড়ি পৌঁছেছে। দেখে কি, ভাইয়ের বিয়ের আয়োজন চলছে। দিদি বলল, "ওর বিয়ের ব্যবস্থা করছ? আমার বিয়ের ব্যবস্থাও করো।"

সে তো বিবাহিতা। এমন কথা বলা তো পাগলামি। ভাই বলল, "আমার দিদি কত ভালো, কি বুদ্ধিমতী! এ কি হ'ল তার?"

বিয়ের আগে নানা স্ত্রী-আচার আছে। বরকে বসানো হ'ল বরের চৌকিতে। দিদি বলছে, "ও একা বসবে? আমিও বসব ওখানে।"

অন্যরা ভাবছে, এ তো অদ্ভুতুড়ে ব্যাপার। কিন্তু ভাই বলল, "কিছু বোল না ওকে। ও যা বলে তাই করো। ওকেও চৌকিতে বসাও।" বরকে তেল হলুদ মাখানো হচ্ছে, তো দিদি বলছে আমাকেও মাখাও।

ভাই বলছে, "দিদি পাগলই হয়ে গেছে। ও যা বলছে তাই করো।"

আত্মীয় বন্ধুরা ভাইকে আইবুড়ো ভাত খেতে নেমন্তন্ন জানাচ্ছে, তো দিদি বলছে, "আমিও যাব।" ভাই যা যা করেছে, দিদি ঠিক তাই করছে।

গ্রাম থেকে বর যাত্রা করবে ঘোড়ায় চেপে। (বিয়ের সময়ে বরই তো যায় কনের গ্রামে)। দিদি জেদ ধরল, সে ভাইয়ের সঙ্গে এক ঘোড়াতেই বসবে। ভাই বলছে, "বসুক, দিদি আমার সঙ্গে বসুক।"

ভাই যখন তরোয়াল দিয়ে কনের দরজার বিয়ের প্রতীক, কাঠের নকশাটিতে ঘা মারবে, দিদি বলছে, "আমিও মারব।"

ভাই যখন কনের সঙ্গে দেব পূজায় বসেছে, দিদিও বসল। ভাই বলছে, "ও তো পাগল হয়ে গেছে। আমি যেটি করব, সেটি করবেই ও।"

যখন যজ্ঞকুণ্ড ঘিরে সাতপাক ঘুরছে বর কনে, দিদিও তাই করছে। বরযাত্রীরা বরকনে নিয়ে বরের বাড়ি ফিরল। দিদিও তাই করল।

বর কনে যখন শুতে যাবে, দিদি বলছে, "আমি ওদের কাছে শোব।"

ভাই বলছে, "তাই শোবে।"

তখন বরকনের বিছানার পাশে একটা পর্দা টানানো হল। ও পাশে দিদি শুয়ে পড়ল মেঝেতে।

বরকনে ঘুমিয়ে গেছে। মাঝরাতে সেই সাপটা কিলবিল করে ঢুকেছে, বরকনের দিকে যাচ্ছে। দিদি কি ঘুমোতে পারে? ভাইয়ের দুষমন কোথায়, সে তো নজর রাখতে হবে। সাপটা দেখেই ও বাড়ি মেরেছে, তিন টুকরো করে কেটেছে, একটা ঢালের নিচে চাপা দিয়েছে। তারপর দিদি পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে গেছে।

সকালে সবাই জেগেছে, দিদি তো জাগে না। ভাই বলছে, "দিদি তো গভীর

ঘুমে। যাই, অতিথিদের বিদায় জানাই। দিদি তো পাগল! ঘুম ভাঙলে কি করে তার ঠিক কি?"

মা কিন্তু তা মানছে না। ছেলেকে বলছে, "ও পাগল নয়। এমন ঘুম ও কখনো ঘুমোয় নি। জন্মকাল থেকেই ওর ঘুম খুব পাতলা। ডেকে তোল ওকে, অতিথিরা থাকতে থাকতেই ডাকো, নইলে আবার তাদের ডেকে আনতে হবে।"

সবাই দিদিকে ডেকে তুলল। দিদি বলছে, "যাও, গ্রামের সকলকে ডাকো। সবাই শুনুক কেন আমি ছেলেমেয়ে পড়শির ঘরে রেখে চলে এলাম। নিজের ঘরসংসার ফেলে ভাইয়ের সঙ্গে এলাম,—ওই ভাইয়ের দুষমন সাপটার জন্যে,—বিয়ের রাতেই ওটা ঢুকেছিল।"

ঢালটা উঠিয়ে দিদি সকলকে দেখাল খণ্ড খণ্ড করে কাটা মরা সাপটাকে।

তারপর সব কথাই খুলেমেলে বলল। বলল, ভাই! জঙ্গলেই আমি ভাগ্যদেবী, নিয়তি ঠাকরুণকে দেখি। তিনি বলছেন, "একমাত্র ছেলের কলজের জন্যে ঢাকনি বানাচ্ছি। তিনিই বললেন, হোলি আর দেয়ালির পর ভাইয়ের দিনে ভাইকে পূজো করবে, ভাইরা বোনদের ঘাঘরা আর ওড়না দেবে, বোনরা ভাইদের শাপশাপান্ত করবে। বলবে, আমার ভাই মরুক! তার হাড় ছাই হোক!"

যেন সে জন্ম জন্ম বাঁচে!

যে বামুন এক দেবতাকে খেয়েছিল

বাংলা
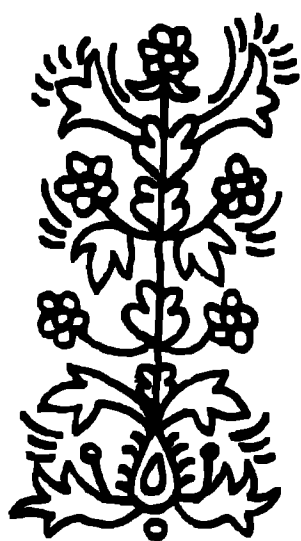
সকলের জন্মকালে বিধাতা কপালে ভাগ্যলিপি লিখে দেন। এক গরিব বামুনের কপালে এমন এক লিপি লেখেন, যে বেচারার অবস্থা নাজেহাল। কখনো সে আশ মিটিয়ে খেতে পাবে না। আধপেটা ভাত খেতে না খেতে একটা অঘটন ঘটবে, তার খাওয়া হবে না।

একদিন তার নেমন্তন্ন এল রাজবাড়ি থেকে। আহ্লাদে ডগমগ হয়ে ও বামনিকে বলল, "জোটে তো আধপেটা। সারাটা জীবনে ক্ষিদে আমার মিটল না। ভাগ্যবলে রাজবাড়ি নেমন্তন্ন পেলাম। জামাকাপড় নোংরা, ছেঁড়াখোঁড়া, এমন চেহারায় গেলে তো দরোয়ান খেদিয়ে দেবে।"

বামনি বল, "ছেঁড়া মেরামত করে কেচে কুচে দেব। তখন তুমি যেও।" বামনি

সব করেকর্মে দিল, বামুন চলল রাজবাড়ি।

পৌঁছতে দেরি হয়েছে, সন্ধ্যাও নেমেছে, তবু সে রাজকীয় অভ্যর্থনাই পেল। সার সার থালায় অন্নব্যঞ্জন দেখে বুড়ো বামুন ভারি খুশি। সে ভাবছে, "আজ যাই হোক, পেট ভরে খেয়ে নেব।" আসনে বসে ও খেতে শুরু করল।

ছাতের কড়িতে ঝোলানো ছিল একটা মাটির ভাঁড়। বামুন সবে আধপেটা খেয়েছে, ভাঁড়টা ভেঙে পড়ল ওর পাতে। তখনি খাওয়া থামাল বামুন। জল খেয়ে উঠে পড়ল। তারপর গেল রাজার কাছে। রাজা বলছেন, "কি ঠাকুর! খেয়ে তৃপ্তি হয়েছে তো?"

বামুন বলল, "মহারাজ! আপনার পরিবেশকরা খুবই যত্ন করেছে। যত চেয়েছি, সব দিয়েছে। তবু যে ভরপেট খাওয়া হ'ল না, এ তো আমার কপালের লেখার কারণে।"

—"কেন? কি হ'ল?"

—"মহারাজ। যখন খাচ্ছি, উপর থেকে একটা ভাঁড় ভেঙে পড়ল। খাওয়াটা নষ্ট হ'ল।"

রাজা ক্রুদ্ধ হলেন। নিজের লোকজনকে বকলেন। তারপর বললেন, "ঠাকুর! রাতটা প্রাসাদে থাকুন। কাল আপনার জন্যে নতুন করে রান্না হবে, আমি স্বহস্তে পরিবেশন করব।"

সে রাতটা বামুন রাজবাড়িতেই থাকল।

পরদিন রান্নার তত্ত্বাবধান করলেন রাজা স্বয়ং, কয়েকটি পদ নিজেও রাঁধলেন। পরিবেশনও করলেন স্বহস্তে। সে ঘরে বামুনের আহারে বাগড়া দেবার কোন উপায় নেই। চারদিকে চেয়ে বামুন তো রাজার আতিথ্যে অভিভূত। সে খেতে বসল। আধাআধি খেয়েছে, বিধাতা ভাবল, এবার তো বাগড়া দিতে হয়। কোন পন্থাও খুঁজে পায় না। তখন সে নিজেই একটা সোনা ব্যাং হয়ে লাফিয়ে পড়েছে ভোজের কলাপাতায়।

বামুন খেতেই ব্যস্ত, কিছু নজরেই পড়ছেনা তার। ভাতের দলার সঙ্গে ব্যাংটাও ও গিলে নিয়েছে। খাওয়ার শেষে রাজা বলছেন, "আজ কেমন খেলেন ঠাকুর? খেয়ে তৃপ্তি হ'ল তো?" বামুন বলছে, 'মহারাজ! জীবনেও এমন খাওয়া খাইনি।'

এ কথা বলে বামুন বিদায় নিল। রাজা তাকে টাকা ও নানা উপহার দিলেন, সে বাড়ি চলল।

সন্ধ্যায় এক জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছে, শোনে কে চেঁচাচ্ছে, "অ বামুন আমাকে ছেড়ে দে! ছেড়ে দে!"

চারিদিকে চেয়ে বামুন জনমনিষ্যি দেখে না। কিন্তু আবার শুনল, 'অ বামুন! ছেড়ে দে!'

—"কে হে তুমি?"

—"বিধাতা! আমি বিধাতা!"

—"তুমি কোথায়?"

—"তোর পেটে। তুই আমাকে গিলে খেয়েছিস।"

—"অসম্ভব!"

—"হ্যাঁ রে বাপু! ব্যাং হয়ে তোর পাতে লাফালাম, তুই আমাকে গিলে ফেললি।"

—এর চেয়ে সুসংবাদ আর কী আছে? শয়তান! সারাটা জীবন তুমি আমাকে জ্বালিয়েছ। বের তো করবই না। তার চেয়ে নিজের টুঁটি চেপে ধরব।"

ভয়ের চোটে বিধাতা বলছে, "অ বামুন! আমার যে দম আটকে যাচ্ছে বাবা!"

বামুন তাড়াতাড়ি বাড়ি গেছে। গিয়েই বামনিকে বলছে, "হুঁকোতে তামাক দাও তো! একটা লাঠি নিয়ে এখানে পাহারা থাকো।"

বামুন মনের সুখে তামাক খাচ্ছে। ওদিকে বিধাতা তামাকের ধোঁয়ায় খাবি খাচ্ছে। বামুন কিন্তু বিধাতার কাকুতিমিনতিতে আমলই দিচ্ছে না।

এদিকে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, ত্রিভুবনে মহা গোলযোগ বেধে গেছে। বিধাতা নেই। ত্রিভুবন বুঝি লয় পায়। তখন দেবতারা পরামর্শে বসলেন। ঠিক করলেন, তাঁদেরই একজন বামুনের কাছে যাবেন।

যাবে কে? সবাই বললেন, লক্ষ্মী ঠাকরুণের যাওয়াই ঠিক হবে।"

লক্ষ্মী বললেন, "ও বামুনের কাছে গেলে আমি তো আর জ্যান্ত ফিরব না।"

সব দেবতারা কাকুতি মিনতি জানালেন। রাজী হয়ে লক্ষ্মী বামুনের বাড়ি গেলেন। বামুন যখন শুনল, তার দোরে এসেছেন সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী,—ধুতির খোঁটে গলবস্ত্র হয়ে সম্মান জানিয়ে সে লক্ষ্মীকে চৌকিতে বসতে দিল। জানতে চাইল, গরিবের কুঁড়েতে লক্ষ্মী কেন?

লক্ষ্মী বললেন, "ঠাকুর! বিধাতাকে তুমি কয়েদ করে রেখেছ। তাঁকে ছেড়ে দাও, নইলে বিশ্বভুবন রসাতলে যাবে।"

বামুন বামনিকে বলল, "দাও দেখি লাঠিখানা। দেখবে, আমি এই লক্ষ্মী ঠাকরুণকে কত ছেদ্দা করি! যেদিন থেকে জন্মেছি, ইনি আমাকে চেয়েও দেখেন নি। সারাটা জীবন মন্দভাগ্য নিয়ে কাটল, আর আজ স্বয়ং লক্ষ্মী আমার দোরে!"

এ কথা শুনেই ভয়ের চোটে লক্ষ্মী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কোন কালে কেউ তাঁকে এমন বকেনি। দেবতাদের সবই বললেন। অনেক পরামর্শের পর দেবতারা বিদ্যার দেবী সরস্বতীকে পাঠালেন।

পৌঁছে সরস্বতী ডাকছেন, "বাড়ি আছ? অ বামুন! বাড়ি আছ?"

বামুন তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করল। বলছে, "জননী! বাগ্‌দেবী! গরিবের
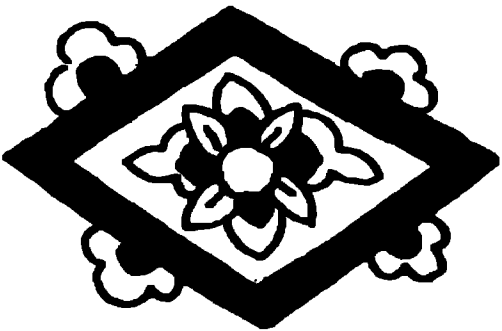
কুঁড়েতে তোমার পা পড়ল কেন?"—"ঠাকুর! বিশ্বসংসার ধ্বংস হতে বসেছে। বিধাতাকে ছেড়ে দাও ঠাকুর!"

রেগে আগুন তেলে বেগুন বামুন বলছে, "বামনি! লাঠিটা দাও তো! দেখাচ্ছি বাগদেবীকে! আমাকে অ-আ অবধি শেখান নি, এখন এসেছেন আমার বাড়ি!"

এ কথা শুনেই সরস্বতী পড়িমরি করে দৌড়ে হাওয়া।

শেষে মহাদেব স্বয়ং দায়িত্ব নিলেন। বামুন হ'ল শৈব। এমন ভক্ত, যে শিব পুজো না করে জলস্পর্শ করে না। শিব আসতেই বামুন আর বামনি তাঁর পা ধুতে জল দিল, ফুল-দুর্বা-বেলপাতা-চন্দন আর আতপ চাল দিয়ে নৈবেদ্য দিল, পূজা করল। শিব বসলেন।

বললেন, "বামুন! বিধাতাকে ছেড়ে দাও।"

বামুন বলল, "আপনি স্বয়ং এসেছেন যখন, তখন ছেড়ে দেব। কিন্তু আমি কি করব? বিধাতার কারণে জন্ম থেকে অশেষ কষ্ট পাচ্ছি। সেই সব কিছুর মূলে।"

শিব বললেন, "আর চিন্তা কোর না। আমি তোমাকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছি।"

বামুন তখন মুখ হাঁ করল, বিধাতা বেরিয়ে এল। শিব বামুন আর বামনিকে সশরীরে কৈলাসে নিয়ে গেলেন।

এক ধার্মিকের ধর্ম

ওড়িয়া
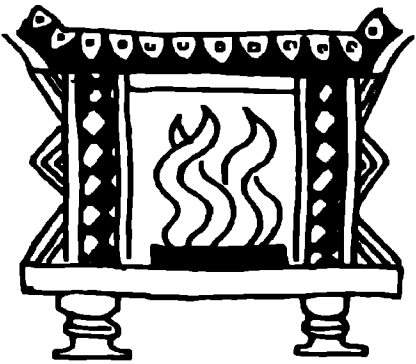
এক গাঁয়ে থাকে শুধুই বামুনরা। ভারি ধার্মিক তারা। সাদাসিধা জীবন, সকাল-সন্ধ্যা প্রার্থনা করে। সব আচার নিয়ম মানে, বেদ তাদের কণ্ঠস্থ, জীবন যাত্রা সেই মতোই। সব বৈদিক ব্রাহ্মণদের মতোই তাদের কুটীরে জ্বলে অনির্বাণ পবিত্র আগুন। ওরা কখনো সে আগুন নিভতে দেয় না।

তেমন এক পরিবারে এক রাতে, ছোট বউয়ের প্রস্রাব চেপেছে খুব। অন্ধকার রাত, আঁধারে তার ভারি ভয়। কুটীরের মধ্যিখানে পবিত্র অগ্নিকুণ্ডের কাঠকয়লার ওপরেই সে কাজটি সারল। সকালে উঠে সবাই দেখে, কাঠকয়লার মাঝে এক ডেলা সোনা।

সবাই তাজ্জব। বাড়ির কর্তা এক বুড়ো, জ্ঞানী বামুন। তিনি বলছেন, "কেউ কোন অন্যায় করেছে। নইলে বামুনবাড়ির অগ্নিকুণ্ডে এতখানি সোনা আসে কোথা থেকে?"

বাড়ির সকলকে দাঁড় করিয়ে তিনি জেরা করলেন। শেষে ছোট বউ বলে ফেলল, গত রাতে কি করেছে। কর্তা তাকে সাবধান করলেন। সকলকে বললেন, কেউ যেন বউয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে। ব্যবস্থা করলেন। ছোট বউ যখন বাইরে যাবে, সঙ্গে যেন কেউ যায়।

এ অলৌকিক কাণ্ডের খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপরে দ্রুত, অনেক ব্রাহ্মণ বাড়ির পবিত্র অগ্নিকুণ্ডে সোনা মিলতে থাকল। অনেকে বড়লোক হয়ে গেল। বড় বড় বাড়ি বানাচ্ছে, রেশম আর মসলিন পরছে, মেয়েদের বিয়েতে প্রচুর যৌতুক দিচ্ছে, না, গ্রাম আর আগের মতো থাকল না।

কিন্তু একটি পরিবার গরিবই রয়ে গেল। গ্রাম তো তখন শহর। সে শহরে একটিই কুটীরে সেই পরিবারটি থাকে। কুটীরটি গ্রামান্তে ছিল, এখন শহরান্তে। গিন্নি নিত্যই কর্তার সঙ্গে ঝগড়া করেন।

বলেন, "কেন পবিত্র অগ্নিকুণ্ডে একটি বার যেতে দাওনা আমাকে? তাহ'লে তো গরীবি ঘুচে যায়। দুটি খেতে পাই, দু'জনের একেকটা কাপড় জোটে। এক বারটি যেতে দাও না! এক খণ্ড সোনায় আমাদের অনেক দিন যাবে।'

গিন্নি ঘ্যানঘ্যান করে, কাকুতিমিনতি করে, যত রকমে পারে স্বামীকে চাপ দেয়। কত সহজে না সমস্যা মিটে যেত! তবু কঠোর স্বামী এ কাজ তাকে করতে দেবে না। একদিন বামনি এত চাপাচাপি করেছে যে স্বামী না বলে পারল না, 'জানো, কিসে এই ব্রাহ্মণ গ্রামটিকে একতাবদ্ধ রেখেছে?'

—'কেন? কারণ তুমি আমাকে পবিত্র অগ্নিকুণ্ডে প্রস্রাব করতে দাও না, সেই জন্যে? সবাই ধনী হোক, আর তুমি চাও, আমরা গরিবই থাকি। এটাই কি সেই কারণ?'

—'ঠিক বলেছ। আমরা যেমন, তেমনই থেকে গেছি। সে জন্যেই আমাদের সমাজটা টিকে আছে। ওরা যা করেছে, আমরাও যদি তাই করি, অথবা গ্রাম ছেড়ে চলে যাই, স-ব ভেঙেচুরে যাবে।'

বামনি ভাবল, এ নেহাৎ দম্ভের কথা।

—'আমরা গরিব থেকে স-ব ধনী প্রতিবেশীদের বাঁচিয়ে রাখছি? নিজেকে কত বড় ভাব তুমি?'

বামুন বলল, 'আমার কথা সত্য কি না, তা দেখিয়ে দেব। সব গুছিয়ে নাও। পাশের গ্রামে চলে যাই। দেখবে, কি ঘটে!' সব বেঁধেছেঁদে নিয়ে ওরা পাশের গ্রামে গেল।

এক সপ্তাহ যেতে না যেতে ব্রাহ্মণদের মধ্যে তুমুল কলহ বিবাদ শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেকে প্রত্যেককে অভিযুক্ত করল এই বলে, যে এ-ওর, সে-তার বাড়ি ও জমিজমা কিনতে চায়। যারা লোভে অন্ধ, তারা স্ত্রী-মেয়ে-পুত্রবধূদের বলল, তারা যেন পবিত্র

অগ্নিস্থলে বেশি করে প্রস্রাব করে। ফলে আগুন প্রায় নিভেই গেল। লোভে অন্ধ, ক্রোধে মত্ত, একজন আরেকজনের বাড়িতে আগুন দিল। যাদের ঘর পুড়ল, তারা পালটা আগুন লাগাল। আগুন হাহা করে ছড়িয়ে গেল। বাড়ির পর বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সে গ্রামের কিছুই রইল না।

সেই যে ব্রাহ্মণ, এ খবর পেয়ে তার বউকে বলল, 'আমার কথা তো বিশ্বাস করো নি। এক ধার্মিকের ধর্ম শুধু নিজেকে নয়, আশপাশের সকলকে বাঁচায়, রক্ষা করে।'

এক কাকের প্রতিশোধ

কন্নড়
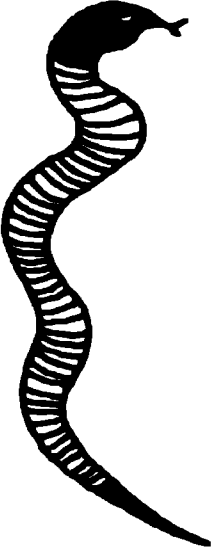
মস্ত এক বটগাছের ডালে এক কাক পরিবার বাসা বেঁধে বাস করত। গাছের ফাঁপা গুঁড়ি বেয়ে একটা কালো সাপ উঠবেই। ডিম ফুটে কাকের ছানা বেরোলেই সেগুলো খাবে। এ তো বারবার হচ্ছে। কাকিনীর আর সহ্য হয় না।

সে কাককে ডেকে বলছে, 'এ হতভাগা সাপটা তো আমাদের সব ছানাগুলোকেই খেল। আমি তা' দেব ব'লে ও বসে থাকে, ডিম ফুটে বেরোলেই খেয়ে নেয়। আমরা কিছু করতেও পারি না। চলো, এ গাছ ছেড়ে চলে যাই।'

কাকের তো গাছটি পছন্দ, অনেক দিন আছে ওখানে, ও বলল, 'সত্তুরটাকে মারবার উপায় বের করতে হবে একটা।'

—'কেমন করে পারব? আমরা তুচ্ছ কাক! ও এমন এক বিশাল সাপ!'

—'উপায় নিশ্চয় আছে। আমি হয়তো ছোট্ট আর কমজোর। কিন্তু আমার অনেক ধূর্ত বন্ধু আছে। এবার আর ওকে ছাড়ছি না।'
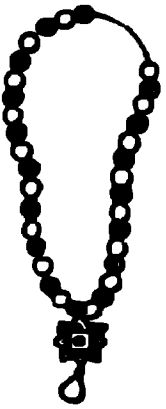
কাক গেল তার বন্ধু শিয়ালের কাছে। শিয়াল সব শুনে বলল, 'বদমাশটাকে দেখাচ্ছি আমরা। রাজা তাঁর রানীদের নিয়ে যে ঝিলে স্নান করেন, সাঁতার কাটেন, সেখানে চলে যাও। একটা কণ্ঠী বা মণিরত্ন, যা হয় নিয়ে এসো। এনে সেটি সাপটার গর্তে ফেলে দাও, বাস!'

কাক তখনি ঝিলের দিকে উড়ে গেল। গাছের ডালে বসেই রইল। রাজা রানীদের নিয়ে এলেন, জামা কাপড় বদলালেন, সোনার হার আর মুক্তোর কণ্ঠীগুলো খুলে রাখলেন, তারপর নামলেন জলে। ওঁরা যখন জলে মাতামাতি

করছেন, কাক একটা কণ্ঠী ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে উড়ে চলল। রাজার চাকররা তো সবই দেখেছে। তারা লাঠি-বল্লম সব তুলে কাককে তাড়া করল।

বটগাছের নিচে সাপের গর্ত, কাকটা তার মধ্যে কণ্ঠীটা ফেলে দিল। রাজার লোকজন গর্ত খুঁড়ে কালো সাপটাকে দেখল। সেটাকে পিটিয়ে মারল ওরা, রানীর কণ্ঠীটা নিল। চলে গেল।

কাকপরিবারে শান্তি নেমে এল।

গল্প ফেরে শ্রোতার খোঁজে

তেলুগু

এক সময়ে রথসপ্তমীর দিনে এক বুড়ি মাথা থেকে পা অবধি সেজে পুণ্যস্নান সেরে পূজো করল। এই রথসপ্তমী, মাঘ মাসের সপ্তমীও বটে। ওই দিনে মন্দিরের রথ বেরিয়ে পথে পথে ঘোরে।

সেদিনের নিয়ম অনুযায়ী বুড়িকে, মাঘ মাসের রবিবারে কারোকে না কারোকে সূর্যদেবের কথা শোনাতেই হয়। তাই হলুদে রাঙানো এক মুঠো আতপ চাল নিয়ে বুড়ি বেরোল। এ চাল দিতে হবে কারোকে, সূর্যকথা বলতে হবে। কিন্তু যার কাছেই যায়, সেই বড় ব্যস্ত।

ওর ছেলেরা দৌড়চ্ছে দেশের রাজার দরবারে। দেরি হয়ে যাচ্ছে, রাজা বকাবকি করেন, এ তারা চায় না। ছেলেরা যখন সূর্যকথা শুনতে চাইল না, বুড়ি গেল নাতিদের কাছে। তাদের তখন বিদ্যালয়ে যাবার সময়, বুড়ির গল্প শোনে কি করে? গেল পুত্রবধূর কাছে। তার বা সময় কোথায়? কোলের শিশুটিকে দেখতে হবে না?

যে মেয়েরা নদীর ঘাটে কাপড় কাচে, বুড়ি গেল তাদের কাছে। মাঘ মাসে রবিবারে এ গল্পটা শুনুক তারা! মেয়েদের সকালের পাঠ সারা হয়েছে. ঘরে ফিরতে ব্যস্ত সবাই, ওরাও শুনতে চাইল না। যেখানেই যায় বুড়ি, যার কাছেই যায়, একটিও শোনার মানুষ পায় না। বামুন, কাঠুরে, ঝুড়ি বোনে যারা, কুমোর, কারো হাতে তিলেক সময় নেই যে বুড়ির মুখে সূর্যকথা শোনে।

ফলে, মাঘ মাসে রবিবারে সূর্যকথা যারাই শুলন না, তাদের নানা দুর্ভোগ হ'ল। ছেলেরা দরবারে শাস্তি পেল, ছেলের বউয়ের কোলের সন্তানটির ভারি অসুখ হ'ল, নাতিরা পণ্ডিতমশাইয়ের হাতে বেদম পিটুনি খেল।

কাপড় কাচুনীরা গাল খেল শাশুড়ির, বামুন একটি যজমানও পেল না যে তাকে খাওয়াবে। কে জানে কেন, ঝুড়ি বুনিয়েদের আঙুলে বাঁশের চোঁচ ঢুকে গেল, আর কুমোরের চাক থেকে যা বোরোল, সবই বেঁকাতেড়া।

বুড়ি এত কথা জানে নি। তার দুঃখ, যে কেউ তার কথা শুনল না, তবু সে ধৈর্য হারায় নি। অবশেষে ও গেল শহরের পিছনের গলি পথে। লবণ বেচে যারা, সেই সুনিয়া জাতের এক গর্ভিনী মেয়ে বলল, সূর্যকথা শুনতে সে খুব রাজী। কিন্তু বড়ই খিদে পেয়েছে তার। গরিব মেয়েটি বলল, আগে একটু পায়েস খেলে ভাল হ'ত। দুধ, চিনি আর অনেকটা চাল দিয়ে রাঁধা পায়েস। বড্ড খিদে পেয়েছে তো!

বুড়ি আতিপিতি বাড়ি গেল, খুব যত্নে অনেকটা পায়েস রাঁধল, সবটা বয়ে আনল গর্ভিনী মেয়েটির কাছে। মেয়েটি মহা খুশি! সবটুকু পায়েস সে চেটেপুটে খেল। কিন্তু বুড়ি সূর্যকথা শুরু করার আগেই গভীর ঘুমে ডুবে গেল। সে তো ঘুমে অচেতন! দুনিয়ার কোন চিন্তাই নেই যেন। বুড়ি ব্রতের চাল হাতে নিয়ে বসে আছে।

হঠাৎ শোনে, ঘুমন্ত মায়ের গর্ভের শিশু বলছে, 'আমাকে সূর্যকথা বলো না গো! আমি শুনব। মায়ের নাভিতে হাতে চাল রাখো. আমাকে বলো!'

বুড়ি আহ্লাদে ডগমগ। সযত্নে ও ঘুমন্ত মেয়েটির নাভি ঢেকে দিল সেই চালে। তারপর, সামনের স্ফীত উদর, আর গর্ভের শিশুকে শোনাল, মাঘ মাসে রবিবারে শোনাবার সূর্যকথা।

গল্প হয়ে গেলে বুড়ি গাইল একটি ঘুমপাড়ানি গান ওই শিশুকে।

'তুমি যেখানে যাবে, পোড়ো গ্রাম হয়ে উঠবে ঝলমলে শহর! কাপাসতুলোর বীজ হয়ে যাবে মুক্তো! শুকনো গাছে ফল ধরবে! বুড়ি গাইও আবার দুধ দেবে! বাঁজা মেয়েদের সন্তান হবে! হারোনো মাণিক ফিরে পাবে মানুষ! মৃত মানুষ প্রাণ পাবে! বাছা আমার! এমন ক্ষমতা হবে তোমার, যে রাজার বুকেও আনন্দের বান ডাকে!'

সূর্যকথা আর গানও ফুরোল, লুনিয়া মেয়েটি জেগে উঠল। এখন সে কথা শুনতে চায়, কিন্তু বুড়ি বলল, 'তোমার পেটের শিশু সব শুনেছে গো! খুব সুখের জীবন হবে ওর। ও জন্মালে আমাকে অবিশ্যি জানিও। ছেলে হ'ল, না মেয়ে, তাও জানিও।' এখন বুড়ি বাড়ি গেল।

ক' সপ্তাহ বাদে বুড়ি খবর পেল, গরিব লুনিয়া মেয়েটির এক মেয়ে জন্মেছে। একটা শাড়ি, একটা ঝিনুক, রেড়ির তেল আর ওষুধ, আঁতুড়ে শিশুকে যা যা দেয়, স-ব নিয়ে বুড়ি লুনিয়াদের গলিতে গেল। শাড়ি দিয়ে দোলনা বানাল একটা। কাছাকাছি এক জঙ্গলে এক গাছের ডালে টানাল দোলনা, মেয়েকে তাতে শোয়াল। গাছদের বলল দোলনা দোলাতে, পাখিদের বলল ঘুমপাড়ানি গান গাইতে। মেয়ের

মা দিনভোর খাটবার ফুরসৎ পেল, গাছ আর পাখি মেয়ের ভার নিল. বুড়ি গেল বাড়ি।

দেশের রাজা যাচ্ছেন জঙ্গল দিয়ে, শোনেন পাখিরা গাইছে, একটি শিশু কাঁদছে। কৌতূহলে খুঁজতে খুঁজতে দেখেন গাছের ডালে দোলনা, পাখিরা উড়ে উড়ে দোলনা ঘিরে গাইছে। পাখিরা রাজাকে বলল, 'এ তোমার রানী, আর আমাদের মা। একে নিয়ে যাও, বড় হলে বিয়ে কোর।!

মেয়েকে পালকিতে শুইয়ে রাজা চলছেন। এক জনশূন্য পোড়ো গাঁয়ে পৌঁছলেন, অমনি সেটি জমজমাট শহর হয়ে গেল। পথে তুলোর ক্ষেতে জিরোচ্ছেন, তো কাপাস তুলোর বীজ মুক্তো হয়ে যাচ্ছে। যত গরিব-গরিব গাঁ পেরিয়ে যান, বুড়ো গাই দুধ দেয়, শুকনো গাছ পাতার সাজে ফল ধরে তাতে। প্রাসাদে বড় রানী এতকাল সন্তানহীনা ছিলেন। তাঁরও একটি সন্তান হ'ল।

লুনিয়া মায়ের মেয়ে ক্রমে বালিকা হ'ল, তারপর যুবতী। বছর বছর রাজ্যে সমৃদ্ধি বেড়েই চলে। অবশেষে দিনক্ষণ দেখে রাজা তাকে বিয়ে করলেন।

বুঝতেই পারছ. বড়রানী মোটেই খুশি হলেন না। সুন্দরী ছোটরানী কোত্থেকে না কোত্থেকে প্রাসাদে এলেন, তাঁকে নিয়ে এত মাতামাতি দেখে হিংসেয় বুক পুড়ে গেল তাঁর।

হিংসের জ্বালায় একদিন বড় রানী প্রাসাদের সব মণিমুক্তো নিয়ে একটা বাক্সে ভরলেন, ফেলে দিলেন সেটা সমুদ্রে। কিছুদিন বাদে এক জেলে ধরেছে এক অতিকায় মাছ। আর বড়রানীকে সেটি দিতে এসেছে। রানী নাক কুঁচকোচ্ছেন, বলছেন মাছে কি গন্ধ! হেলাভরে সেটি ছোটরানীকে পাঠালেন।

ছোটরানী ভারি খুশি! মাছ কোটা হচ্ছে। তা দাঁড়িয়ে দেখছেন। যেমন পেটটা কেটেছে, দেখে এ তো মণিমুক্তোর সেই বাক্স, যা বড়রানী সমুদ্রে ফেলেছিলেন। রাজাও কথাটা জানলেন। এখন তাঁর মনে পড়ছে, পাখিরা গানে গানে এ মেয়ের কত ক্ষমতার কথা না বলেছিল।

তিনি তো স্বচক্ষে দেখেছেন, কত কথা সত্যি হয়েছে। পোড়ো গ্রাম হয়ে গেছে জমজমাট শহর, কাপাসের বীজ হয়েছে মুক্তো, বুড়ী গাই দুধ দিয়েছে, মরা গাছ ফুলে ফলে জ্যান্ত হয়েছে। আর হারানো মণিমুক্তোও ফিরে পাওয়া গেল।

শুধু একটি পরীক্ষা বাকি। তিনি দেখতে চান, ও মৃতকে বাঁচাতে পারে কিনা। রাজা ছোটরানীর ঘরে খেলেন, বড়রানীর ঘরে শুতে গেলেন। সেখানে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বিষ খেলেন। মরেও গেলেন। বড়রানী শোকে আলুথালু। ছোটরানীকে ডাকছেন। রাজার চিতায় দুজনেই পুড়ে মরবেন। সতী হবেন। রাজার মৃতদেহকে সাজানো গোজানো হচ্ছে, ছোটরানীও তৈরি হচ্ছেন।

এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ এসে পা ধোবার জল চাইছেন। ছোটরানীকেও নিজের

পা ধুতে বলছেন। তারপর বলছেন, তিনিও মাথায় জল ঢেলে স্নান করবেন, ছোটরানীও যেন তাই করেন। গায়ে মাখতে চন্দনবাটা চাইছেন, ছোটরানীকে বলছেন হলুদ মাখতে। এখন সিঁদুর নিয়ে নিজে কপালে তিলক আঁকছেন। ছোটরানীকে টিপ পরতে বলছেন।

এরপর খেতে চাইছেন, ছোটরানীকেও খেতে বলছেন। তারপর নিজেও পানসুপারি চাইছেন, ছোটরানীকেও নিতে বলছেন। ছোটরানী শোকে কাতর। তিনি তো স্বামীর চিতায় উঠতে চান। কিন্তু ব্রাহ্মণ যা যা বলছেন, সব না করলে যেতেও দিচ্ছেন না। সবশেষে ছোটরানী জানতে চাইছেন, ব্রাহ্মণ কে!

তিনি বললেন, তিনি আদিনারায়ণ, সূর্যদেব। তাঁর কথাই বুড়ি ওঁকে শুনিয়েছিল যখন রানী মায়ের পেটে। হলুদে রাঙানো চারটি আতপ চাল দিয়ে ছোটরানীকে বলছেন, এ চাল স্বামীর দেহে ছিটিয়ে দিতে। এ কথা বলেই তিনি অদৃশ্য হলেন।

ছোটরানী শ্মশানে ছুটে গেলেন। সবাই তো তাঁর অপেক্ষাতেই আছে। রানী স্বামীর কাছে গিয়ে ওই চাল ছিটিয়ে দিলেন। রাজা চিতাশয্যায় জেগে উঠলেন, যেন তাঁর নিজের বিছানাতেই ঘুমোচ্ছিলেন। রাজা আর অন্যেরা যখন জানতে চাইলেন এটা কেমন করে সম্ভব হ'ল, রানী বললেন, মাতৃগর্ভে মাঘ মাসে রবিবারের সূর্যকথা শুনেছিলেন বলেই এ সব ক্ষমতা লাভ করেছেন।
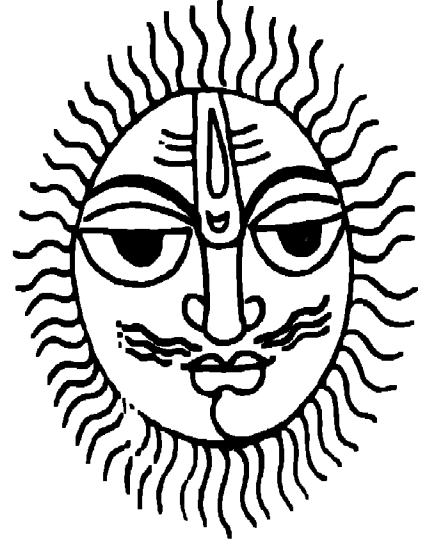
রাজা চমৎকৃত হয়ে বললেন, 'গল্পটি শুনেই এত ক্ষমতা লাভ করা যায়, তাহলে এ সূর্যব্রত যদি সবাই পালন করে, সে তো অনেক ভালো হবে!'

তখনি ব্যবস্থা করলেন, রানীরা যেন এ ব্রত পালন করেন। যে ব্রত রানীরা রবিবার পালন করলেন তা এই অধর্মপূর্ণ কলিযুগের উঁচু জাতের মানুষরা পালন করে চলেছেন।

মাটির শাশুড়ি

তামিল
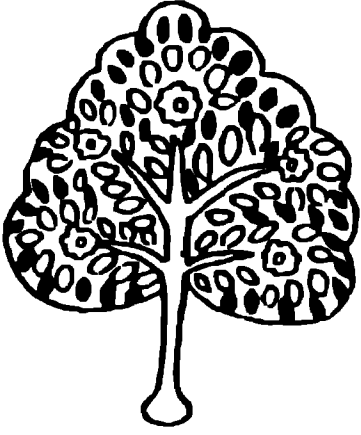
অনেকদিন আগে ভারি শান্ত শিষ্ট একটি ছেলের বউ ছিল। শাশুড়িকে সে খুব মানত, তাঁর তুচ্ছতম ইচ্ছাও পালন করত। বুড়ি শাশুড়ির মানমর্যাদা রেখে চলত। কথাই বলত না পারত পক্ষে, হুকুম জানাত মাথা নেড়ে। প্রতি সকালে বউ জানতে আসত, আজ ক'কুনকে চাল চড়ানো হবে। বুড়ি গম্ভীর মুখে চিন্তা করত। তারপর হাত তুলত। কোনদিন দুটো আঙুল দেখায়, কোনদিন তিনটে, যেমনটি তার খেয়ালখুশি। বউ নীরবে শুনত। রান্নাঘরে গিয়ে আঙুলের নির্দেশ মতো রান্না করত।

একদিন বুড়ির অসুখ হ'ল, সে মরেও গেল। কচি বউটিতো কেঁদে বান ডাকাল। ছোট গেরস্থালিতে কি করবে ভেবে পায় না, শাশুড়ি বলে দেন না কিছু, তাতেও মন খারাপ। কতটা চাল রাঁধবে, তা বলে দেয় কে? ওর স্বামী প্রথম প্রথম খুশি, বউ শাশুড়িকে এমন মানত! কিন্তু নিত্যি নিত্যি ক'কুনকে চাল রাঁধতে হবে সে প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে সে বিরক্ত হয়ে উঠল।

এ ঝামেলা এড়াবার পথ তো বের করতে হয়। সে পাড়ার কুমোরের কাছে গেল, বলল তার মায়ের একটি প্রমাণ মাপের মূর্তি করে দিতে হবে। বিশেষ করে বলল, এক হাত দেখাবে দুটো আঙুল, আরেকটায় তিনটে। কয়েকদিনেই মাটির শাশুড়িতে রং পড়ল, গায়ে জামা কাপড় উঠল, সব একেবারে তৈরি।

স্বামী সেটি বাড়ি এনে রান্নাঘরের কাছে এমন জায়গায় রাখল, যাতে সহজে চোখ পড়ে। বউ তো শাশুড়িকে ফিরে পেয়ে মহাখুশি। যেন তার বিপদ কেটে গেল। এখন আবার ভোর থেকে দিনটা ঠিকমতো শুরু হবে। চালের মাপ নিয়ে সন্দেহ জাগলেই রান্নাঘর থেকে বাইরে চাইবে, হুকুম মিলে যাবে। দুটো আঙুল মানে দু' কুনকে চাল, তিনটে আঙুল মানে তিন কুনকে চাল। মাটির শাশুড়ি পেয়ে বউ মহাখুশি, বউয়ের খুশিতে স্বামীও খুশি।

বেশ চলছিল সব, শেষমেষ স্বামীর খেয়াল হ'ল, কয়েক সপ্তাহ বাদেই চালের বস্তা খালি হয়ে যাচ্ছে, যদিও বাড়িতে মানুষ মোটে দুটি। বউকে শুধোল। বউ তার রোজকার রুটিন বলল। রোজই সকালে শাশুড়িকে জিগ্যেস করে, তাঁর নির্দেশ মতো রাঁধে।

স্বামী তো খাপচুরিয়াস! 'দু'জনের জন্যে নিতি দু' তিন কুনকে চাল লাগছে? মা বেঁচেছিলেন যখন, তুমি দু' কুনকে রাঁধতে। তিনটে মানুষ খেয়ে হাঁসফাঁস করতাম।'

বউ নিচু গলায় বলল, 'আমরা দু'জন না কি? তিনজন তো! মাকে ভুলেই গেলে? আমি খাবার আগেই তাঁকে ভাত বেড়ে দিই। কতদিন আমার ভাগেই কম পড়ে। কিছু মনে কোর না, মা আগের চেয়ে বেশিই খান এখন।'

নিজের কানকেই স্বামীর বিশ্বাস হল না। মাটির শাশুড়ি বস্তা বস্তা চাল খাচ্ছে, এ কি উদ্ভট কথা! রাগের চোটে ও বউকে পেটাল। তারপর মাটির শাশুড়ি আর বউ, দুটোকেই বের করে দিল।

আসল কথা তো অন্য! রোজ দু'বেলা বউ শাশুড়ির সামনে কলাপাতা বিছিয়ে সব পরিবেশন করে। যেই সে রান্নাঘরে ঢোকে, গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢোকে পাশের বাড়ির বউ। খাবার চুরি করে পালায়, বাড়িতে রাঁধতেই হয় না। বেচারি বোকা বউটি আগাগোড়া ভেবেছে, শাশুড়ি চেটেপুটে খাচ্ছেন। এই সরল অজ্ঞতার জন্যে তাকে পথে দাঁড়াতে হ'ল।

ভারি দুঃখ তার। শাশুড়ির মূর্তি বয়ে সে অন্ধকারে পথ চলছে, আঁধারে ভয় পাচ্ছে, কাঁদছে, ভগবানকে ডাকছে, নিজের ভাগ্যকে গাল পাড়ছে। যে কোন শব্দেই ভয়ে কেঁপে উঠছে। কোনদিন তো পথে পা দেয় নি। কোনমতে একটা গাছে উঠেছে ও শাশুড়িকে জাপটে নিয়ে। গাছের ডালের সঙ্গে নিজেকে বেঁধেছে শাড়ি দিয়ে। শাশুড়িকে জাপটে বসে কাঁপছে।

হঠাৎ শোনে দুপদাপ পায়ের শব্দ। দাড়ি গোঁফওয়ালা মুশকো জোয়ান ক'জন মশাল হাতে এই গাছের দিকেই আসছে। সারাদিন ছুটোছুটিতে তারাও ক্লান্ত। পোশাক আর মুখচোখ দেখেই বউটি বুঝেছে ওরা ডাকাত। পিঠ থেকে বোঝা নামিয়ে ওরা বসেছে মশালের আলোয় লুটের মাল ভাগ করতে। মশালের আলোয় ভূতের মতো দেখাচ্ছে ওদের। বউ বেচারি ভয়ে কাঁপতে লেগেছে। তার হাত পিছলে মাটির শাশুড়ি ডাকাতের মাথায় পড়েছে।

কি হ'ল তা না দেখেই ডাকাতরা ভয়ের চোটে পালিয়েছে। বউটি তো গাছের ডালে পড়ে আছে ভয়ের চোটে অজ্ঞান। সকাল অবধি।

ভোর হতে ও যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠল। দেখে গাছের নিচে শাশুড়ির মূর্তি তিন টুকরো। অনেক সোনাদানা ছেটানো, কয়েকটা পোড়া মশাল পড়ে আছে।

চারদিকে কেউ নেই দেখে বউ গাছ থেকে নেমেছে, শাশুড়িকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে এত ঐশ্বর্য পেল বলে, বউকে প্রাণে বাঁচাল বলে।

ক' ঘণ্টা বাদে ঘরে ফিরেছে তো স্বামী দেখে, বউয়ের এক কাঁখে ভাঙাচোরা মাটির শাশুড়ি, অন্য হাতে ঝোলা। প্রথমটা সে ঘরে ফেরার জন্যে বকল বটে, কিন্তু তারপরেই জানল ঝোলায় কি আছে।

বউকে টেনে ঘরে ঢুকিয়ে সে সব কথা জেনে নিল। অত চুনী আর সোনা দেখে ওর তো চোখ গোল গোল হয়ে গেল। সব সাবধানে সরিয়ে রেখে বউকে নিয়ে ও

আবার গেল জঙ্গলে। যা কিছু পড়েছিল, সব নিয়ে এল ঘরে। একটা রাজা কেনার মতো সম্পদ বটে!

মেঝেতে সব বিছিয়ে দেখতে দেখতে স্বামীর জানতে সাধ যাচ্ছে, এর ওজন কত হবে। বউকে পাঠাচ্ছে পাশের বাড়ি, বড়সড় দাঁড়িপাল্লাটা সে চেয়ে আনুক, কিন্তু কাউকে কিছু যেন না বলে।

পড়শি বউটি কৌতূহলে অস্থির, মাপের জন্যে বড় দাঁড়িপাল্লা কেন লাগবে? বউটিও কিছু বলছে না। তা পড়শি বউ পাল্লায় খানিকটা পাকা তেঁতুল চিটকে দিল। যখন পাল্লা ফেরত এল, দেখে কি, একটা দামী জহরত ঝলমল করছে। ওরা কর্তগিন্নি ভেবে পাচ্ছেনা, কাল অবধি যাদের কানাকড়িও ছিল না, তারা আজ পাল্লায় মাপার মতো হীরে জহরত পেল কোথায়?

পড়শি বউ তো পরদিন এবাড়ির বউয়ের পিছু ছাড়ছে না। শেষে ভালোমানুষ বউটা সব বলে ফেলল। কেমন করে তাকে বর তাড়িয়ে দিল, গাছে কেমন বসে থাকল শাশুড়িকে জাপটে, স-ব বলল। শেষে বলল, শাশুড়ির আশীর্বাদেই এত ঐশ্বর্য পেয়েছে ওরা। বারবার অবশ্য বলল, 'কাউকে বোল না কিন্তু!'

মরা শাশুড়ির কথা ধূর্ত বউটি বিশ্বাস করেনি। ওর স্বামী ভাবল, এ হ'ল ধনী হবার সহজ উপায়। সেও এক মস্ত মাটির পুতুল তৈরি করাল, বউকে নিয়ে গেল জঙ্গলে। পড়শীর বোকা বউটা স্বামীকে যত ধনদৌলত এনে দিয়েছে. তা না আনলে যে ঘরে জায়গা পাবেনা, এ কথাও স্বামী জানিয়ে দিল।

চালাক বউ তো সব ভেবে চিন্তে কাজে নেমেছে, আর সফল হবেই হবে সে বিশ্বাস করে। যেমন ভাবা গিয়েছিল, তাই ঘটল। সেই ডাকাতরাই মশাল হাতে এল, লুটের মাল ভাগ করতেও বসল। ওরা যেই পোঁটলা খুলেছে, বউটাও মাটির মূর্তিটা ছুঁড়ে মেরেছে।

ভীষণ ভাঙচুরের শব্দ। ডাকাতরা পালাল বটে, দূরে গেল না। ওদের মনে সন্দেহ ঢুকেছে। প্রথমবার আচমকা বিপদ ঘটে যায়। এখন তো দেখতে হয়, হুড়মুড়িয়ে পড়ছে কি! কয়েকটা গাছের পিছনে লুকিয়ে ওরা সব দেখছে। দেখে কি, গাছ থেকে নেমে এসে একটি স্ত্রীলোক ওদের লুটের মাল সরাচ্ছে। রাগে গর্জন করতে করতে ওরা ওকে ঘিরে ধরেছে, আর আরেক রাতে ওদের ভয় দেখিয়ে সব ধনরত্ন নিয়ে যাবার জন্যে ওকে বেজায় ধমকাচ্ছে। মেয়েটা মুখ খোলার আগেই ওরা ওকে ঠেসে পিটাচ্ছে আর গাছের গায়ে ওকে বেঁধে রেখে নিজেরা ভেগেছে।

ওর স্বামী ওকে পরদিন খুঁজে পেল। ভয়ের চোটে মেয়েটা পাগল-পাগল। রাতে ধনরত্ন খুঁজতে এসে কি দুর্দশা না তার। কিন্তু একটি কানাকড়িও মেলেনি।

চালাক পুত্রবধূ

কন্নড়

এক ছিল শাশুড়ি, নিদারুণ দজ্জাল। ছেলের বউকে এতটুকু নিজের মতো চলতে দেয় না। তার কড়া নজর থাকে, যাতে কচি বউটি সংসারের সব কাজ করে, গোহাল কাড়ে, কুয়ো থেকে জল আনে। কাজ ফুরোতে ফুরোতে সন্ধ্যা। মা আর ছেলে নিজেরা খেয়ে নেয়। বউকে দেয় এঁটোকাঁটা আর বাসি ভাত।

বউ তিলেক আপত্তি জানালে শাশুড়ি ওর মাথায় মারে ঝাঁটার বাড়ি। কাঁদলে পরে বুড়ি তোড়ে গাল দেয়, 'হারামজাদী! নচ্ছার মেয়েছেলে! চোখের জলে আমার বাড়ি ভাসাবি? দুর্ভাগ্য ডেকে আনবি? বদ মেয়েমানুষের মেয়ে তুই!'

ছেলে গোবেচারা, সে চুপ করেই থাকে।

ওদের পিছনের উঠোনে একটা চিচিঙ্গা লতা ফনফনিয়ে বেড়ে উঠেছে। লম্বা লম্বা চিচিঙ্গা ঝোলে। যে দেখে, তারই নোলা সকসক করে। সময় এলে, শাশুড়ি এক বিশাল পাত্রে তৈরি করে চমৎকার চিচিঙ্গার 'তালাড়া।' মা-ছেলেতে প্রায় সবটাই খায়, বউকে দেয় ছাঁছামোছা একটুখানি। আধা উপোসী থাকতে থাকতে বউটার বড় সাধ জাগল, সে পেট পুরে চিচিঙ্গার 'তালাড়া' খায়।

সেদিন জঞ্জাল ফেলার ঝুড়ি নিয়ে বউ তাড়াতাড়ি বাড়ী এল শাশুড়িকে ডাকতে ডাকতে।

বুড়ি খেঁকিয়ে উঠল, 'খ্যাকশিয়ালীর মতো চেঁচাস যে? হয়েছেটা কি?'

—'বড়মাসির স্বামীর সঙ্গে দেখা হল। বলে, মাসি ভাল নেই, তোমাকে দেখতে চাইছে। খুব অসুখ, তোমাকে একবারটি দেখবে বলে প্রাণ বেরোচ্ছে না। মেসো তোমাকে বলতে বলল।'

—'ও হো হো! আমার বোন মরে যাচ্ছে! অ দিদি! তোমার হ'ল কি?'

শাশুড়ি বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, 'আমি চিচিঙ্গা আনশাচ্ছিলাম (আনশানো = কম তেলে এ পিঠ ও পিঠ ভাজা)। এখন তুই কর। আমি গেলাম দিদির বাড়ি।'

বউ তো খুব খুশি। সে আরো খানিক 'তালাড়া' বানাল। নানা নিধি ব্যঞ্জন রেঁধে স্বামীকে চর্বচোষ্য খাওয়াল। সবটা 'তালাড়া' ঢালল একটা কলসিতে। সেটা কাঁখে নিয়ে বেরোল, যেন জল আনতে যাচ্ছে।

সিধা চলে গেল কালী মন্দিরের ভিতরে, দোর বন্ধ করে বসে একা সবটা 'তালাড়া' খেল। দেবী চেয়ে দেখছেন। বউটি এত গবগবিয়ে নিমেষে অতটা

'তালাড়া' খেল দেখে অবাক হয়ে ডান হাতে নিজের মুখ চাপা দিলেন। বউটির ও সব খেয়াল নেই। মনের সাধ মিটিয়ে খেয়ে পরম তৃপ্তিতে সে একটা ঢেকুর তুলল। তারপর এঁটো কলসি নিয়ে মাজতে গেল পুকুরে।

জল নিয়ে ঘরে ফিরেছে তো সদর দরজা বন্ধ। শাশুড়ি তো ফিরে এসেছে। দোরে ঘা দিতে শাশুড়িই খুলল। রাগে গমগম করছে, চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোচ্ছে। হাতের লাঠি দিয়ে বউকে পেটাচ্ছে। পড়ে গিয়ে আর্তনাদ করছে বউ। শাশুড়ির মুখে গালাগালির বান ডাকছে, 'নষ্ট মেয়েছেলের বেটি! কতদিন ধরে ঠকাচ্ছিস আমাকে? মোষের মতো এক কলসি 'তালাড়া' খেয়েছিস, বজ্জাত মেয়েছেলে!' চেঁচাচ্ছে আর পেটাচ্ছে। স্বামী যখন ফিরল, সেও হাত লাগাল মায়ের সঙ্গে।

এদিকে সারা শহরে একই কথা। মন্দিরে কালীমূর্তি মুখে ডানহাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যান্য শহরের মানুষও এ অদ্ভুত ঘটনা দেখতে আসছে। সবাই আতঙ্কিত। এ তো বেজায় অলক্ষণ! নিশ্চয় সর্বনেশে কিছু ঘটবে এখানে। ভয়ে সব থরহরি কাঁপছে।

'দেবীকে অশুচি করেছে কেউ! তাই তিনি মুখ চেপে আছেন। আর বৃষ্টি পড়বে না। ছেলেপিলেও জন্মাবেনা আর!' ভয়ে সবাই বলতে থাকল। গ্রাম জুড়ে চলল পূজো আর যজ্ঞ! নানা দেবার্চনা চলল, পাঁঠাবলি দিল সবাই। কিন্তু দেবী প্রসন্ন হলেন না। গ্রামের বুড়োরা এক নগর ঘোষককে দিয়ে দিকে দিকে ঘোষণা করালেন, যে দেবীর মুখ থেকে হাত সরাতে পারবে, সে মোটা পুরস্কার পাবে।

কেউ এগিয়ে এল না।

বউটি সব দেখে যাচ্ছে। একদিন ও শাশুড়িকে বলল, 'ঠাকরুন! প্রধানদের বলুন, আমরা মা কালীর মুখ থেকে হাত সরাতে পারব। আমি জানি কি করতে হবে।'

প্রথমে তো শ্বাশুড়ি রণচণ্ডী। 'দেখ! গাধাটার কথা শোনো! ও চায়, গাঁয়ে আমি মুখ পোড়াই। ভাবভঙ্গি দেখ! যেন উনি সন্নেসিনী, পুণ্যবতী! যা কেউ পারছে না, তা করবে ও? তাহ'লে তো চমৎকার!'

খুব বিষ ঢালল জিভে। বউ কিন্তু জেদ ধরেই থাকল। শাশুড়িকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ল। সে কিছু একটা জানে এ ব্যাপারে, যা কেউ জানে না।

দিন দেখে বউটি তেঁতুল ডালের ঝাঁটা আর ঝুড়ি বোঝাই রাবিশ নিয়ে মন্দিরে গেল। সকলকে বের করে দিয়ে ও দোর বন্ধ করল। তারপর কালী ঠাকুরের সামনে জনজালের ঝুড়ি নামিয়ে ঝাঁটা নাচিয়ে বলল, 'হিংসুটে মেয়েমানুষ! আমি চিচিঙ্গের তালাড়া খেলাম তো তোমার তাতে কি? ওঃ চোখ যেন জ্বলছে, কেন? চাইলে পরেই চারটি খেতে দিতাম। তোমার মুখ পুড়ুক, গাল ফুলে ফেটে যাক, চোখ কোটরে ঢুকে যাক। অন্ধ হঁয়ে যাও

তুমি! এখনি মুখ থেকে হাত নামাবে, না ঝাঁটা পেটা করব? এক্ষুণি, এক্ষুণি!'

দেবী তো নিরুত্তর। বউ তখন ক্ষ্যাপা হাতি। তাকেই মা কালীর মতো ভয়ংকর দেখাচ্ছে। বেদীতে উঠে ও কালীকে কষে ঝাঁটাপেটা করল। কালী কেঁদে উঠলেন, 'ও হো হো' বললেন, মুখ থেকে হাত নামালেন। আবার তাঁকে আগের মত দেখতে হল।

'ঠিক আছে এখন!' বিড়বিড় করে বলে বউটি জঞ্জালের ঝুড়ি আর ঝাঁটা নিয়ে বাড়ি ফিরল। জানিয়ে দিল, কালীর মুখ থেকে হাত ও নামিয়ে দিয়েছে।

এ খবরে সারা গ্রাম তাজ্জব বনে গেল। সবাই ছুটল মন্দিরে। স্বচক্ষে দেখল, দেখেও যেন বিশ্বাস হয় না। বউটির প্রশংসা তখন পঞ্চমুখে। এ বউ পরম সতী! পতিব্রতা! সতীধর্ম তাকে অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছে। অনেক পুরস্কার, অনেক উপহার পেল বউটি।

শাশুড়ি এ ঘটনায় বেজায় ভয় পেল। বউয়ের তো আছে অলৌকিক ক্ষমতা। এত বছর ধরে তাকে যত নির্যাতন করেছে, বউ তো তার শোধ নেবে। বউ জাদু জানে, কে জানে সে কেমন জাদু!

এক অন্ধকার কৃষ্ণা একাদশীর রাতে মা ছেলে ফিশফিশ করে কথা বলছে। মা বলছে, 'বাছা। বউ তো কালীকেও জব্দ করে ছাড়ল। দেবী মুখ থেকে হাত নামালেন। ও আমাদের ছাড়বে না। আমরা ওকে মেরেছি, উপোসী রেখেছি। নানা লাঞ্ছনা করেছি। ও শোধ নেবেই। শেষ করে দেবে আমাদের। এখন কি করি?'

কাপুরুষ ছেলে বলল, 'আমি ভেবে পথ পাচ্ছিনা। তুমি বলো না!'

—'ও ঘুমোচ্ছে এখন। মাদুরে মুড়ে ওকে নিয়ে যাই, মাঠে নিয়ে পুড়িয়ে আসি। তারপর তোমার সুন্দরী বউ এনে দেব।'

—'ঠিক আছে। এখনি চলো।'

দুজনে বউটার মুখ বাঁধল। তার বিছানাপাটি সমেত মাদুরে মোড়াল। বউটা বুঝছে, এরা ভয়ানক কিছু করতে চলেছে, কিন্তু সাহসভরে ও নিশ্চুপ পড়ে আছে। গ্রামের বাইরে মাঠে ওকে ঝোপের পাশে নামিয়ে মা ছেলে গেছে কাঠের খোঁজে।

ওরা যেতে না যেতেই বউটি মাদুর থেকে বেরিয়ে এসেছে। হাত-পা-মুখের বাঁধন খুলেছে। একখানা বড় কাঠকে মাদুরে মুড়েছে। নিজে গিয়ে উঠেছে এক বট গাছে, ডালপালায় লুকিয়ে আছে।

মা আর ছেলে তো কাঠ নিয়ে ফিরেছে। মাদুরের ওপর কাঠের পাঁজা, তাতে খড় বিছিয়ে আগুন দিয়েছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

গাছের ডালপালার গাঁটগুলো যখন ফাটছে, ওরা বলছে, হাড়গুলো ফাটছে এবার।

ভিতরের বড় কাঠটার গ্রন্থি যখন ফাটল, ওরা ভাবল মাথার খুলিটাই ফটাস করে ফাটল। রাত তখন অনেক। দুজনে বাড়ি গেল।

বউটি তো বসেই আছে। চারটে ডাকাত এক বড়লোকের বাড়ি থেকে মণিরত্ন,

টাকা আর সোনা চুরি করে সেখানে এসেছে, লুঠের মাল ভাগ করবে। কিছুদূরে আগুন জ্বলছে দেখে একজন সেই বটগাছে উঠল। দেখবে, মানুষজন কাছে আছে কি না। যখন দেখে একটি মেয়ে বসে আছে, সে আস্তে বলছে, 'কে গো?'

বউটি হাত বাড়িয়ে ওর মুখে হাত চাপা দিল। বলল, 'আস্তে! আমি স্বর্গের পরী গো। একটি ভালো, সুপুরুষ খুঁজছি। তোমাকেই বিয়ে করব। দুনিয়ার সেরা ধনী বানাব তোমায়। শুধু আস্তে কথা বলো।'

ডাকাতের তো বিশ্বাস হয় না এ কি হচ্ছে। সে যেন স্বর্গে পৌঁছে গেছে। আকাশ থেকে নেমে এসেছে অলৌকিক সাদা হাতিটি। মেয়েটির হাত ধরে ও বলছে, 'তুমি স্বপ্ন তো নও, সত্যি তো?'

বউটি বলছে, 'হুঁ'। সে নিজের পানসুপারির বটুয়া খুলে ওকেও দিচ্ছে, নিজেও মুখে পুরছে।

লোকটা ঘেঁষে এসেছে, একটা চুমু খাবে।

বউটি মুখ ফিরিয়ে বলছে, এখনো তো বিয়ে হয়নি আমাদের। তবে জিভ বাড়িয়ে তোমার পানটা আমার মুখে দাও। যেই পানটা খাব, সেই তোমার বিয়ে করা বউ হয়ে যাব বললেই হয়। ঠিক আছে?'

আনন্দে দিশাহারা লোকটা জিভের ডগায় চিবানো পান নিয়ে ওর মুখের কাছে বাড়িয়ে ধরেছে। বউটি তৎক্ষণাৎ দাঁতের পাটি খপ করে বন্ধ করে ওর জিভ কামড়ে নিয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে লোকটা গাছ ছেড়ে মাটিতে পড়ল। ডাকাতরা ভয় পেয়ে দিগ্বিদিকে দৌড় মারল। লোকটা শুধু গোঙাচ্ছে আর থু থু করে রক্ত ফেলছে। গলা থেকে বেরোচ্ছে শুধু 'ব্যা ব্যা ব্যা ব্যা' আর ও ছুটছে সঙ্গীদের পিছনে। ওর অবোধ্য গোঙানি শুনে সঙ্গীদের পিলে চমকে গেছে। ওরা দৌড়তেই থাকল, পিছনে সেই হতভাগ্য।
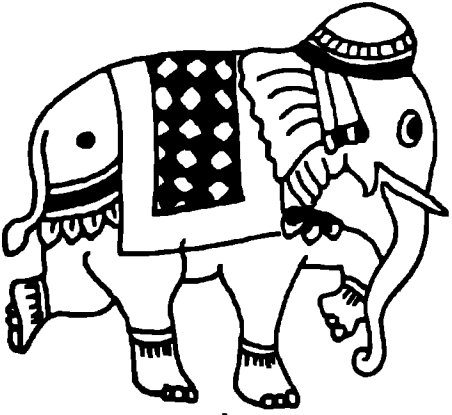
সকাল হতে সন্তর্পণে গাছ থেকে নেমেছে বউটি। অবাক হয়ে দেখে গাছের তলায় কত না সোনা, মণি মুক্তো, টাকা! সব কুড়িয়ে পোঁটলা বেঁধে ও বাড়ি চলল। দোরে ঘা দিয়ে ও ডাকছে, 'দোর খুলুন, ঠাকরুণ!'

বুড়ির মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে, ও দোর খুলল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে হাসি মুখে ওরই পুত্রবধূ। দেখেই শাশুড়ি মুচ্ছো গেল। বউ শাশুড়িকে পাঁজাকোলা করে ঘরে নিল, মুখেচোখে জল ছিটিয়ে মুচ্ছো ভাঙাল। স্বামী দাঁড়িয়ে আছে যেন জড়ভরত।

চোখ খুলে শাশুড়ি বলছে, 'তুমি...কেমন করে...এ কি! তুমি তো...!'

বউ ঝটপট জবাব দিল, 'তোমরা তো আমাকে পোড়ালে। যমদূতরা এসে আমাকে যমের কাছে নিয়ে গেল। যমরাজের চোখে মাকালীর মতোই আগুন ছুটছে।

আমাকে দেখেই যমরাজ বললেন, 'এখনি একে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। এর শাশুড়ি মহাপাপী। তাকে নিয়ে এসো। লোহার কাকটাকে লেলিয়ে দাও। সে ওকে লোহার ঠোঁটে টুকরো টুকরো করে ফেলুক। তারপর ওকে ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে ফেলে দাও।'—তিনি তো তোড়ে বলে যাচ্ছেন। আমি তাঁর পায়ে পড়ে বললাম, 'আমার শাশুড়িকে অমন সাজা দেবেন না। তিনি অতি সজ্জন মানুষ। আমাকে যে সাজা ইচ্ছে, তাই দিন। কিন্তু ওঁকে বাঁচান।

'যমরাজ সন্তুষ্ট হলেন, মৃদু হাসলেন, বললেন, তুমি যেতে পারো। যেমনটি বললে, তেমনটি করব বটে, তবে তোমার শাশুড়ি একবার তোমাকে লাঞ্ছনা করুক, ওকে টেনে আনব এখানে। আমার যমদূতরা সর্বদা নজর রাখবে।—এ কথা বলে এত সোনাদানা ধনরত্ন দিয়ে ঘরে পাঠালেন। যমরাজকে নিন্দে করে মানুষ! কিন্তু আমার সঙ্গে কি ভালো ব্যবহার না করলেন!'

শাশুড়ি ভয়ে কেঁপে ঝেঁপে বউকে জড়িয়ে ধরল। 'আহা হা হা! তুমি এ বাড়ির লক্ষ্মী! যমদূতের খপ্পর থেকে আমায় বাঁচালে। এখন থেকে যা বলবে, তাই করব। শুধু মাপ করে দে মা! বড় কষ্ট দিয়েছি তোকে। মাপ করবি না? লক্ষ্মী বউমা?

বলছে আর বউয়ের গালে হাত বোলাচ্ছে।

বউ এখন বাড়ির গিন্নি। শাশুড়ি আর স্বামী চলে তার কথায়। সবাই সুখেই আছে।

ব্রহ্মদৈত্য ও নাপিত

বাংলা

বর্ধমান শহরে ছিল এক আল্‌সে কুঁড়ে নাপিত। কোন কাজ করত না, একটা পুরনো আয়না আর ভাঙা চিরুনি নিয়ে রাতদিন নিজের মুখ দেখছে, চুল ফেরাচ্ছে। বুড়ি মা রাতদিন বকে, তার ভ্রূক্ষেপও নেই। রাগের চোটে বুড়ি তাকে ঝাঁটা পিটে বসল। নাপিতের মান খোয়া গেল। ঘর ছেড়ে বেরোল সে, আগে অনেক টাকা কামাবে, নইলে ফিরবে না।

হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছল এক জঙ্গলে। ঠাকুরদেবতাকে ডাকবে বলে বাসনা। ঢুকতেই দেখে এক ব্রহ্মদৈত্য উদ্দাম নাচছে। বামুন মরে কোন কারণে ব্রহ্মদত্যি হয়। নাপিত ঘাবড়ে গেল, তবে মাথা ঠিক রাখল। সাহসভরে সেও তালে তালে নাচছে। কিছুক্ষণ বাদে শুধোচ্ছে, 'এত নাচছ কেন? এত আনন্দ কিসের?'

ব্রহ্মদৈত্য হ হ হেসে বলল, কখন শুধোবে তাই ভাবছিলাম। আমি জানতাম, তুমি একটা গাধা, নাচের কারণ বোঝ নি। ও হে, তোমাকে খাব বলে নাচছি। বল দেখি, তুমি নাচছ কেন?'

—'সে আরো ভালো কারণে। আমাদের রাজপুত্তুরের ভারি অসুখ। বদ্যিরা বলছেন একশো একটা ব্রহ্মদৈত্যের কলজের রক্ত পেলে সে সেরে উঠবে। রাজামশাই ঢোলডগর পিটিয়ে ঘোষণা করেছেন. যে একাজ পারবে, তাকে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যে দেবেন। বড় কষ্টে একশোটা ধরেছি গো! তোমাকে পেলাম, একশো একটা হ'ল। তোমার প্রাণটা আমার কবজায়, পকেটে রেখেছি।'

হাত আয়নাটা বের করে ও দত্যির মুখের সুমুখে ধরেছে। ভয়ের চোটে কাঁটা দত্যি দেখে, এ তো তারই মুখ। ধবধবে জ্যোৎস্নায় দিবিা দেখা যাচ্ছে, নিশ্চয় বেটা বন্দী করেছে তার প্রাণপাখিটি। কেঁপেঝেঁপে ও নাপিতকে বলছে তাকে ছেড়ে দিতে। নাপিত রাজী হচ্ছিল না। তবে দত্যি বলল, নাপিতকে ও সাতরাজার ধনদৌলত দেবে।

যেন এ কথা মানতে রাজীই নয়, এমন গলায় নাপিত বলছে, 'সে ধনদৌলত কোথায়? এই নিশুত রাতে কে তা বয়ে দেবে আমার ঘরে?'

দত্যি বলছে. 'তোমার পিছনে গাছ, তার নিচেই তো আছে সব। দেখিয়েও দেব, এক লহমায় পৌঁছেও দেব তোমার ঘরে। আমরা দত্যিদানো তো! অনেক আশ্চর্য ক্ষমতা ধরি!'

এই না বলে দত্যি গাছ উপড়ে ফেলেছে। সাতটা সোনার কলসি বোঝাই হীরেমুক্তো বের করেছে। নাপিত তো চমৎকৃত। কিন্তু মনের ভাব লুকিয়ে রেখে ও দৈত্যকে বলছে সব ধনরত্ন সমেত ওকেও বয়ে নিয়ে যেতে। বেচারা দত্যি সবশুদ্ধ ওকে বয়ে নিয়ে গেল। নাপিত তো অত তাড়াতাড়ি ওকে ছাড়ছে না। বলল, তার ক্ষেতের ধান কেটে নিয়ে আসতে। দত্যি নাচায়, সে ধান কাটছে আর বইছে। ও ধান কাটছে তো আরেক দত্যি যাচ্ছে সে পথে। সে শুধাল, ব্রহ্মদত্যি করছেটা কি! ব্রহ্মদত্যি বলল, সে এক মহাধূর্তের পাল্লায় পড়েছে তো! যা বলেছে সব না করলে তার পরিত্রাণ নেই।

এ দত্যি হেসে বাঁচেনা। বলছে, 'দোস্ত! তুমি কি ক্ষেপে গেলে? আমরা, দত্যিরা, মানুষের চেয়ে অনেক উঁচু, ক্ষমতাও ধরি বেশি। মানুষ আমাদের ওপরে ক্ষমতা খাটায় কি করে? বেটার বাড়িটা দেখাতে পার?'

—'পারি। তবে দূর থেকে। সব ধান কাটা না হ'লে ওখানে যাবার সাহস নেই আমার।' নাপিতের বাড়ির পথ ও দেখিয়ে দিল।

এদিকে নাপিত এই হঠাৎ-পাওয়া ধনদৌলত নিয়ে উৎসবে মেতেছে। নেমন্তন্ন হবে, পেল্লায় এক মাছ কিনেছে। কিন্তু ভাঙা জানলা দিয়ে এক বেড়াল ঢুকে সে মাছের অনেকটা খেয়ে নিয়েছে।

নাপিত বউ রেগে আগুন, বেড়ালটাকে ও মারবেই। তেড়ে গেল তো ভাঙা জানলা দিয়েই বেড়াল পালাল। বেড়লের স্বভাব তো বউ জানে। আঁশবঁটি হাতে নিয়ে ও ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

দ্বিতীয় দৈত্য চুপে চুপে এসেছে। তার বন্ধুর প্রাণপাখি কে ধরেছে, তাকে দেখবে। ঝাঁকড়াচুলো মাথাটা ঢুকিয়েছে ভাঙা জানালা দিয়ে। আর অমনি ঝপ করে আঁশবঁটি নামিয়েছে নাপিত বউ। দৈত্যের নাকটাই কাটা গেল।

ভয়ে আর যন্ত্রণায় দত্যি পালিয়েছে। কোন লজ্জায় নাককাটা মুখটা দেখাবে?

প্রথম দত্যি সব ধান কেটে এসে রাখল। মুক্তির জন্যে তার কতই মিনতি।

নাপিতও ওকে হাত-আয়নায় উলটো পিঠ দেখিয়ে দিল। ব্রহ্মদৈত্য দেখল, না! আর তাকে দেখা যাচ্ছে না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হালকা মনে ও নাচতে নাচতে চলে গেল।

মাছ হাসল কেন?

কাশ্মীরী
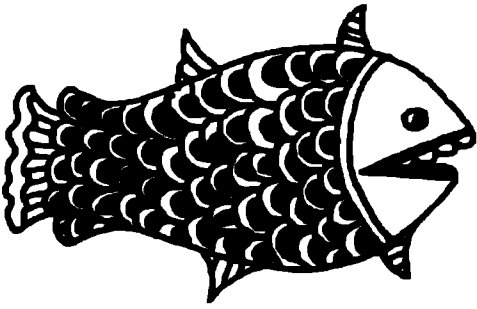
এক জেলেনী মাছ বেচতে বেরিয়ে প্রাসাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছে। জানলা দিয়ে রানী তাকে কাছে আসতে বলছেন। ঠিক তখনি মাছের ঝুড়ি থেকে এক মস্ত মাছ লাফ খেল।

রানী বললেন, 'মাছটা মদ্দা, না মাদী? আমি একটা মাদী মাছ কিনতে চাই।'

এ কথা শুনে মাছটা হো হো করে হাসল।

জেলেনী বলল, 'এটি মদ্দা মাছ গো!' সে আবার চলতে থাকল।

রানী রাগে মটমট করতে করতে নিজের ঘরে ঢুকলেন। সন্ধেবেলা রাজা এসেই বুঝলেন, কিছু একটা হয়েছে। তিনি শুধোলেন, 'ব্যাপার কি? তোমার কি অসুখ হয়েছে কোন?'

—'আমি ভালই আছি। কিন্তু একটা মাছের বেয়াড়াপনায় ভারি বিরক্ত হয়েছি। জেলেনী মাছটা দেখাল। শুধোলাম, ওটা মদ্দা না মাদী। মাছটা বিচ্ছিরি ভাবে হাসল।'

—'মাছ হাসল? অসম্ভব! স্বপ্ন দেখেছ তুমি।'

—'আমি বোকা নই। স্বচক্ষে মাছও দেখেছি, স্বকর্ণে তার হাসিও শুনেছি।'

—'আজব কথা তো! ঠিক আছে, আমি খোঁজ নিচ্ছি।'

পরদিন সকালে রাজা তাঁর উজীরকে সব বললেন। বললেন তদন্ত করা হোক, ছয় মাসের মধ্যে জবাব চাই। নচেৎ মৃত্যুদণ্ড হবে।

উজীর যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বললেন। কোথা থেকে যে শুরু করেন! পাঁচটি মাস প্রাণপণ চেষ্টা চালালেন, মাছ কেন হাসল সে কারণ জানতে। সর্বত্র গেলেন, সকলকে শুধোলেন। জ্ঞানী, বিদ্বান, জাদু ও ধাপ্পা জানা মানুষ, সবরকম লোককেই বললেন। হাসন্ত মাছের রহস্য কেউই ব্যাখ্যা করতে পারল না। অবশেষে ভগ্নহৃদয়ে ফিরলেন বাড়ি। বিষয় সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা শুরু করলেন। এবার তো নিশ্চিত মৃত্যু। রাজাকে তিনি ভালোই চেনেন। রাজা মিছে হুমকি দেন না। নিজের ছেলেকে বললেন দেশ ঘুরতে যেতে, যতদিন না রাজার রাগ পড়ে।

তরুণ ছেলেটি দেখতে যেমন খাসা, বুদ্ধিও তেমনই ধরে। ভাগ্যের ওপর ভর করে ও হেঁটেই বেরিয়ে পড়ল। ক'দিন বাদে এক বুড়ো চাষীর সঙ্গে দেখা। কোথাও যাত্রা সেরে বুড়ো গ্রামে ফিরছে। উজিরজাদার ওকে বেশ লাগল। জানতে চাইল, সে সঙ্গী হতে পারে কিনা। বুড়ো চাষী রাজী হ'ল। দুজনে এখন হাঁটছে। দিনটাও গরম, পথও লম্বা, একঘেয়েও বটে।

উজিরজাদা বলছে, 'মাঝে মাঝে এ-ওকে বইতাম, সেটা অনেক ভালো হত না?'

বুড়ো ভাবল, 'কি বোকা রে ছেলেটা!'

তারপর ওরা যাচ্ছে পাকা গমের ক্ষেত দিয়ে। ফসল কাটার সময়, ক্ষেতটি যেন সোনা ঝলমলে।

—'এগুলো খায়, না খায় না?'

বুড়ো ভেবে পেলনা কি বলবে। বলল, 'আমি জানি না।'

তারপর ওরা এল এক মস্ত গ্রামে। উজিরজাদা চাষীকে একটি ছুরি দিয়ে বলছে, 'নাও হে বন্ধু! দুটো ঘোড়া নিয়ে এস, ছুরিটা ঘুরিয়ে আনতে ভুলো না। এটা বড়ই দামী।'

বুড়ো চাষী খানিক মজা পাচ্ছে, খানিক রেগে যাচ্ছে। ছুরিটা ঠেলে দিয়ে ও বিড়বিড় করছে, তরুণ বন্ধুটি হয় পাগল, নয় বোকা সাজছে। তার জবাব যেন শোনে নি, এমনই ভান করল তরুণটি, অনেকক্ষণ মুখও খুলল না। শেষমেষ, বুড়োর গ্রামের কাছাকাছি এক শহরে পৌঁছল। ওরা বাজার ঘুরে পৌঁছল এক মসজিদে। কেউই কিন্তু ওদের সঙ্গে কথা কইছে না, বা ভিতরে এসে খানিক জিরোতে বলছে না।

ছেলেটি বলল, 'বিরাট কবরখানা!'

বুড়ো ভাবছে, 'ছেলেটা বলতে. চায় কি? মানুষ বোঝাই এমন এক শহর কবরখানা?'

শহর ছেড়ে পথ চলেছে এক কবরখানা দিয়ে। সেখানে কিছু লোক একটি কবরের পাশে প্রার্থনা করছে। তাদের প্রিয় মৃতজনের নামে পথচারীদের বিলোচ্ছে

রুটি। এই দুই পথচারীকেও ওরা ভরপেট রুটি দিল।

উজিরজাদা বলল, 'কি চমৎকার শহর!'

বুড়ো ভাবছে, 'এ নির্ঘাৎ পাগল! এর পরে কি করে বসবে কে জানে? জমিকে জল বলবে, জলকে জমি! আঁধারকে আলো, আর আলোকে আঁধার।'

তবে মনের কথা মনেই রাখল।

একটি ছোট নদী পেরোতে হচ্ছে। গভীর জল, তাই বুড়ো তার জুতো আর পাজামা খুলে নদী পেরোচ্ছে। তরুণটি সব পরেই নদী পেরোল।

বুড়ো মনে মনে বলল, 'এমন উজবক আর দেখিনি। যেমন কথায়, তেমন কাজে!'

তবু ছেলেটাকে ভালোও লাগছে। বেশ মার্জিত, বড়ঘরের মতো ধরণ ধারণ! বুড়োর বউ মেয়েকে ও আনন্দই দেবে। তাই ছেলেটাকে বাড়িতে আসতে বলল।

ছেলেটা ওকে ধন্যবাদ জানাল, শুধোল, 'আপনার বাড়ির কড়িবরগা বেশ শক্তপোক্ত তো?'

বুড়ো বিড়বিড়িয়ে জবাব দিল, 'আপনমনে হাসতে হাসতে অন্দরে খবর দিতে গেল।

বাড়ির লোকজনকে একান্তে পেয়ে ও বলল, 'এই ছোকরা অনেকটা পথ আমার সঙ্গে এসেছে। ওকে এখানে থাকতেও বলেছি। তবে ছেলেটা এত বোকা, যে কি যে বলে, কি যে করে, আমি বুঝে উঠতে পারি না। জানতে চাইছিল বাড়ির কড়িবরগা শক্তপোক্ত কি না! পাগল একটা!

চাষীর মেয়ে বেশ জ্ঞানবুদ্ধি রাখে, ভারি ধারালো মেয়ে। সে বলল, 'এ লোক আর যা হোক, বোকা নয়। ও জানতে চাইছিল তুমি ওর আতিথ্য করতে পারবে কি না!'

চাষী বলল, 'সে তো পারবই। বুঝলাম! তুমি হয়তো ওর অন্যান্য রহস্যের সমাধানও করতে পারবে। হাঁটতে হাঁটতে বলছিল, আমরা এ-ওকে বইব কিনা। তাতে নাকি পথ চলতে মজা লাগবে।'

—'অবশ্যই, ও বলতে চাইছিল, পরস্পরকে গল্প বললে সময়টা কাটত ভালো।'

—'ও! তা এক গমক্ষেতের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, ও বলল, এগুলো খাওয়া হয়, না হয় না?'

—'বাবা! এটাও বুঝলে না? ও জানতে চাইছিল, ক্ষেতের মালিক ঋণগ্রস্ত, না নয়। ঋণগ্রস্ত হলে তাকে তো গিলে রেখেছে। ও শস্যের সবটাই যাবে ঋণদাতার গোলায়।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে। এক গ্রামে ঢুকে একটা ছোট ছুরি দিয়ে দুটো ঘোড়া

আনতে বলল, আবার ছুরিটাও ঘুরিয়ে আনতে বলল।'

—'পথ চলতে ঘোড়া যেমন, লাঠিও তেমন কাজে লাগে না? ও বলেছিল, দুটো মোটা লাঠি কেটে আনো, ছুরিটা যেন আনতে ভুলো না।'

—'তাই বটে, তাই বটে! আসছি শহর দিয়ে, কোন চেনাজানা মানুষও দেখি না, কেউ একমুঠো খেতেও বলে না, শেষে পৌঁছলাম কবরস্থানে। সেখানে ক'জন লোক ডেকে আমাদেরকে হাতে রুটি গুঁজে দিল। ছেলেটা শহরকে বলছে কবরস্থান, কবরস্থানকে বলছে শহর।'

—'দেখ বাবা! অতিথবিতিথকে যারা সাহায্য করে না, তারা তো মরার বাড়া! তাদের শহরও এক কবরস্থান। আবার কবরস্থান তো মরা মানুষে বোঝাই। সেখানে ভালো লোকরা তোমাদেরকে ডেকে কথা কইল, খেতেও দিল।'

চাষী ক্রমেই তাজ্জব হয়ে যাচ্ছে। সে বলল, 'নদী পেরোবার কালে জামাজুতো পরেই জলে নেমে গেল!'

—'সত্যিই জ্ঞানবুদ্ধি আছে ওঁর। আমার তো প্রায় মনে হয়, ওই খরস্রোতা নদীতে নেমে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে খালি পায়ে পাথর বেয়ে ওঠে যারা, তারা বোকা! একটু হোঁচট খেলেই উলটে পড়বে জলে, হাবুডুবু খাবে। তোমার সঙ্গীটি জ্ঞানী ও বিচক্ষণ। আমি ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

—'বেশ! ওকে নিয়ে আসছি।'

—'বোলো, বাড়ির কড়িবরগা শক্তপোক্ত, তবেই ও আসবে। আমি উপহার পাঠাচ্ছি, ও বুঝবে যে অতিথি এলে আমাদের অসুবিধে হয় না।'

এক বাটি পায়েস, বারোটা রুটি, এক পাত্র দুধ সাজিয়ে মেয়েটি এক চাকরকে ডাকল। তাকে বলতে বলল, 'বন্ধু! এ চাঁদ পূর্ণিমার চাঁদ। বারো মাসে এক বছর হয়, আর সমুদ্রে ভাসাভাসি জল।'

নিয়ে যেতে যেতে চাকরটির দেখা তারই ছোট্ট ছেলের সঙ্গে। খাবার দেখে ছেলে তো চাইল। বোকা লোকটি ছেলেকে অনেক পায়েস, একটা রুটি আর খানিক দুধ দিল। উজিরজাদাকে ও খাবার দিল, কথাগুলোও বলল।

উজিরজাদা বলল, 'তোমার মালকিনকে নমস্কার জানিও। তাঁকে বলো, এ হ'ল নতুন চাঁদ, দেখছি এগারো মাসে বছর হয়, আর সমুদ্র মোটেই জলে ভর্তি নয়।'

কথাগুলোর মানে না বুঝেই ভৃত্যটি কথাগুলো আওড়াল। তার কাজও ধরা পড়ল। সে শাস্তিও পেল। কিছুক্ষণ বাদে তরুণটি বুড়ো চাষীর সঙ্গে এসে হাজির। রাজকীয় অভ্যর্থনা পেল সে, যেন সে কোনো কেউ-কেটার ছেলে। চাষী অবশ্য তার পরিচয় জানে না। কথায় বার্তায় ছেলেটি ওদের সবই বলল। মাছের হাসি, বাবার প্রাণদণ্ডের হুমকি, ওর নির্বাসন। পরামর্শ চাইল, কিং কর্তব্যম!

মেয়েটি বলল, 'মাছের হাসি থেকে জানা যাচ্ছে, ওই হাসিই তো সব গণ্ডগোলের

গোড়ায়! জানা যাচ্ছে, অন্দরমহলে কোন পুরুষ আছে, রাজা তা জানেন না।

উজিরজাদা বলল, 'চমৎকার! সত্যি চমৎকার! তাহ'লে সময় আছে! আমি ফিরতেও পারব বাবাকে এ অপমানকর মৃত্যু থেকে বাঁচাতেও পারব।'

পরদিনই সে ফিরল দেশে, সঙ্গে চলল চাষীর মেয়ে। পৌঁছেই দৌড়ল প্রাসাদে। বাবাকে সব কথাই বলল। বেচারা উজির মৃত্যুভয়েই আধমরা। পালকি চেপে তিনি রাজার কাছে গেলেন। ছেলে যা বলেছে, সবই বললেন।

—'রানীমহলে বেটাছেলে? হতে পারে না।'

—'তাই হয়েছে মহারাজ! যা শুনলাম তা সত্যি কি না পরখ করা যাক। রাজবাড়ির সব সখী-দাসী-মহিলাদের ডাকুন। একটা বড়সড় গর্ত খোঁড়ান। সবাই লাফিয়ে ওটা পেরোবে। বেটাছেলেটা ধরা পড়বেই।'

গর্ত খোঁড়া হ'ল। রাজার হুকুমে সব মেয়েরা এল। গর্তটা লাফিয়ে পেরোতে চেষ্টা করল সবাই। পারল একা একজন। সে এক পুরুষ মানুষ।

রানীও সন্তুষ্ট।

উজিরের প্রাণও রক্ষা পেল।

কিছুকাল বাদেই উজিরজাদা চাষীর মেয়েকে বিয়ে করল।

বিয়ে ভারি সুখের হয়েছিল।

টিয়ার নাম হীরামন

বাংলা

এক পাখধরা আর তার বউয়ের অভাব মোটে যেন ঘোচেনা। একদিন বউ বলল, 'আমরা কেন গরিব তা আমার কাছে শোন। যে পাখিটাই ধরি, তুমি বেচে দাও। আমরা যদি কয়েকটা খাই, তো কপাল ফেরে। লোকে তো তাই বলে। আজ যে পাখিটি ধরি, সেটি রেঁধেবেড়ে খাব।'

পাখধরা রাজী হ'ল।

জাল আর পাখধরা নলকাঠি নিয়ে দুজনে বেরিয়েছে। সেদিন সাঁঝ গড়িয়ে যায়, একটি পাখি মিলল না। ঘরে ফেরার পথে ওরা ধরল মরকত মণির মতো ঝলমলে সবুজ এক টিয়া। মলক্কা দ্বীপের এ টিয়ার নাম হীরামন।

পাখধরার বউ ভয়ে নির্জীব পাখিটার গায়ে হাত বুলোচ্ছে আর বলছে, 'কি ছোট

পাখি! এক গরাস মাংসও হবে না গো! একে মেরে কাজ নেই।'

হীরামন বলছে, 'মা! আমায় মেরো না গো! রাজার কাছে বেচে দাও, তিনি অনেক টাকা দেবেন।'

স্বামী-স্ত্রী তাজ্জব! টিয়া এমন কথা কয়? তারা বলছে, কত দাম চাওয়া যাবে?

হীরামন বলছে, 'সে তোমরা আমার ওপর ছেড়ে দাও। রাজা দাম জানতে চাইলে বোলো, পাখি নিজেই দাম বলবে। তখন আমি মোটা টাকা চাইব।'

পরদিন পাখধরা পাখি নিয়ে রাজবাড়ি গেছে বেচতে। অমন মরকত সবুজ টিয়া দেখে রাজা ভারি খুশি। জানতে চাইছেন, কত দাম হবে এর।

পাখধরা বলছে, 'মহারাজ ওকেই শুধোন। ও নিজেই দাম বলবে।'

—'সে কি? এ পাখি কথাও বলে?'

যেন ঠাট্টা ভরেই রাজা শুধোচ্ছেন, 'কি গো হীরামন! দাম কত তোমার?

—'মাপ করবেন মহারাজ! আমার দাম দশ হাজার টাকা! ভাববেন না এ অনেক টাকা। পাখধরাকে টাকা দিন। আমি আপনার অনেক কাজে লাগব।'

রাজা হেসে বলছেন, ছোট্ট পাখি! ছোট্ট পাখি! কি কাজে লাগবে গো তুমি?'

—'সময় আসুক, মহারাজ দেখবেন।'

রাজা চমৎকৃত পাখির কথার ধরণ ধারণ শুনে। খাজাঞ্চিকে বললেন দশ হাজার টাকা গুনে গুনে পাখধরাকে দিতে।

রাজার ছয়টি রানী। কিন্তু পাখি নিয়ে এমন মেতে উঠলেন, যে রানীদের কথা ভুলেই গেলেন। তাঁর রাতদিন কাটে হীরামনের সঙ্গে, রানীরা বাদ। রাজার সব প্রশ্নের জবাব দেয় হীরামন প্রখর বুদ্ধির সঙ্গে। আবার হিন্দুদের তেত্রিশকোটি দেবদেবতার নামও শোনায়। সে নামাবলী শোনাও পুণ্যের কাজ।

রাজা অবহেলা করছেন, রানীরা ঈর্ষা করছেন হীরামনকে, ঠিক করছেন ওটাকে মেরেই ফেলবো। সুযোগ পেতে সময় লাগছে। হীরামন তো রাজার সঙ্গে চব্বিশঘণ্টা থাকে।

একবার দু'দিনের জন্যে রাজা শিকারে গেছেন। ছয় রানী ভাবলেন, এই তো সুযোগ! পাখিটাকে মেরে ফেলা যাক। তাঁরা এ-ওঁকে বলছেন, 'যাব, পাখিকে শুধোব ওর চোখে আমাদের মধ্যে কে সব চেয়ে সুন্দরী! যাকেই বলবে সবচেয়ে কুচ্ছিত, সেই ওর গলাটি টিপে মারবে।' ছয়রানী হাজির পাখির ঘরে। রানীরা মুখ খোলার আগেই হীরামন মিষ্টি গলায়, ভক্তিভরে তেত্রিশ কোটি দেবদেবতার নাম বলছে। ছয় রানীর মনই গলে গেল। পাখির পালকটি না ছুঁয়ে তাঁরা চলে এলেন।

পরদিন আবার মনে হিংসে, কুমৎলব ফিরে এল। পাখিটা অমন বশ করে ফেলল বলে নিজেদের বোকা মনে হ'ল। মন শক্ত করলেন রানীরা, ভাবলেন, ঢুকব আর মারব।

তাঁরা বললেন, 'অ হীরামন! শুনি যে তুমি জ্ঞানী খুব, তোমার বিচার, ন্যায়বিচার। দয়া করে বলো দেখি, আমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে রূপসী, আর কে সবচেয়ে কুচ্ছিত?'

পাখি তো ওঁদের মৎলব বুঝেছে। সে বলল, 'খাঁচায় বসে এ প্রশ্নের জবাব দিই কেমন করে? ন্যায়বিচার করতে গেলে আপনাদের প্রত্যেককে খুঁটিয়ে দেখতে হয়। একটি একটি করে দেহের অঙ্গ, সামনে থেকে, পিছন থেকে। আমার রায় যদি শুনতেই চান, আমাকে আগে ছেড়ে দিন!'

প্রথমটা রানীদের ভয়, ছাড়লে পাখি পালায় যদি? তারপর ঘরের দোরজানলা বন্ধ করে খাঁচার দোর খুললেন। পাখি তো আগেই ঘরটা খুঁটিয়ে দেখেছে। ঘরের কোণে জলের নর্দমা, ও ঠিক পালাতে পারবে। রানীরা বারবার শুধোচ্ছেন, তো হীরামন বলল, 'দূর দূর! সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে আছে এক রাজকন্যে। তোমাদের সকলের চেয়ে তার পায়ের কড়ে আঙুলের রূপ বেশি!'

রানীরা রেগে আগুন! তাঁদের রূপকে এমন তুচ্ছ করা? তেড়ে গেলেন সবাই। পাখিকে টুকরো টুকরোই করে ফেলবেন। তাঁদের হাত এড়িয়ে পাখি নর্দমা দিয়ে পালাল, এক কাঠুরের কুঁড়েঘরে গিয়ে উঠল।

শিকার থেকে ফিরে রাজা দেখেন, হীরামন উধাও। রানীদের শুধোন, শোনেন, তাঁরা কিচ্ছুটি জানেন না। প্রাসাদে খোঁজেন, পাখি তো নেই। রাজা হলেন পাগল পাগল। সারাদিন বলেন, 'ও আমার হীরামন! ও আমার হীরামন! কোথায় গেলি তুই?'

মন্ত্রীরা ভয় পেলেন, রাজা পাগলই হয়ে যাবেন। তাঁরা রাজ্য জুড়ে ঢোল-সহরৎ দিলেন, যে রাজার হীরামনকে এনে দেবে, সে দশ হাজার টাকা পাবে।

কাঠুরে সে ঢোল শুনেছে। অমনি হীরামনকে এনেছে ও প্রাসাদে। হাতে হাতে পুরস্কার! রাজাকে হীরামন বলছে, রানীরা তাকে কেমন করে মারতে যাচ্ছিলেন। রাগে জ্বলতে জ্বলতে রাজা ছয় রানীকেই পাঠালেন বনবাসে। ক'দিনে জানা গেল, তাঁরা বাঘ সিংহের পেটে গেছেন।

ক'দিন বাদে রাজা বলছেন, 'অ হীরামন! তুমি না কি বলেছ, সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে যে রাজকন্যে থাকেন এ রানীদের তাঁর পায়ের কড়ে আঙুলের তুল্য রূপও নেই? তাঁকে পাই কি করে, বলতে পার?'

—'অবশ্যই পারি। তাঁর প্রাসাদের দোরে নিয়ে যাব আপনাকে। আমার কথা মেনে চলুন, রাজকন্যে আপনারই হবেন। তিনি তো আপনার অপেক্ষাতেই আছেন, যদিও এখনো তা জানেন না।'

—'যা বলবে, তাই করব। বলো কেমন করে শুরু করব?'

—'আপনার চাই পক্ষীরাজ, পাখাওয়ালা ঘোড়া। একটি পেলে তার পিঠে চেপে

আমরা নিমেষে সাতসমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে যাব।'

—'আমার আস্তাবল তো বিশাল। চলো না গিয়ে দেখি, পক্ষীরাজ জাতের কোন ঘোড়া আছে কি না!'

রাজা আর হীরামন আস্তাবলে সব ঘোড়া পরখ করে দেখছেন। টগবগে, তেজস্বী, চমৎকার সব ঘোড়া ছেড়ে একটা ন্যালপেলে বিশ্রি বাচ্চা ঘোড়ার মাথায় বসল হীরামন।

বলল, 'এই ঘোড়াটি চাই। এ একেবারে খাঁটি পক্ষীরাজ। ছ'মাস একে সেরা দানা খাওয়াতে হবে। তা' বাদে ও আপনার মনোমত কাজ করতে পারবে।' রাজা তখনি তার জন্যে আলাদা আস্তাবল করালেন। নিজে দেখেন, রাজ্যের সেরা দানা তাকে খাওয়ানো হচ্ছে কি না। ঘোড়ার চেহারাই পালটে গেল। ছ' মাসেই সে সওয়ার নেবার মতো এক চমৎকার ঘোড়া হ'ল।
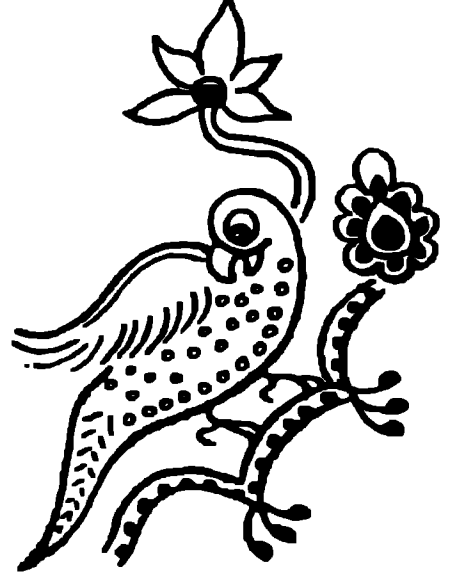
হীরামন বলল, এখন এ তৈরি।

তারপর রাজাকে বলল, রুপোর স্যাকরারা যেন এক বস্তা রুপোর হালকা খই বানায়। আরো বলল 'একটা কথা বলাই দরকার। ঘোড়ায় চেপে একবার মাত্র আস্তে চবুক মারবেন। দু'বার মারলে এ শূন্যে ঝুলে থাকবে। জীবনেও আমরা ঠিকানায় পৌঁছব না। রাজকন্যেকে নিয়ে আসার কালেও একবার চাবুকটা ঠেকাবেন। দু'বার মারলে আধো আকাশে আটকে থাকব।'

রাজা হীরামনকে নিয়ে পক্ষীরাজে চাপলেন। সঙ্গে রইল রুপোর খই। আস্তে চাবুক ছোঁয়াতে পক্ষীরাজ নিমেষে শূন্যে উঠল, বিদ্যুৎবেগে উড়ে চলল। অগণিত দেশ, সাত সমুদ্দুর আর তেরো নদী পেরিয়ে রাজকন্যের প্রাসাদের দোরে নামল।

ফটকের কাছে এক মস্ত গাছ। হীরামন বলল, পক্ষীরাজকে আস্তাবলে রাখতে, রাজাকে বলল, গাছে চড়ে লুকিয়ে থাকতে। ও নিজে রুপোর খই ফেলতে ফেলতে চলল। গাছের গোড়া থেকে প্রাসাদের যত ঢাকা বারান্দা। এমন কি রূপবতী রাজকন্যের ঘরের দোর পর্যন্ত।

মাঝরাতের পর রাজকন্যের খাসদাসী ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে রুপোর ছোট ছোট খই। ও তো রাজকন্যেকে ডেকেছে। অবাক হয়ে রাজকন্যে খই কুড়োতে কুড়োতে, কুড়োতে কুড়োতে, পৌঁছেছেন গাছের নিচে। পাখির কথামতো রাজা লাফিয়ে নেমে রাজকন্যেকে তুলেছেন পক্ষীরাজে, হীরামন বসেছে তাঁর কাঁধে, চাবুক ছোঁয়াতেই পক্ষীরাজ আকাশে।

ঘরে ফেরার তাড়ায় রাজা তো নির্দেশ ভুলে ঘোড়াকে আরো চাবুক মেরেছেন। ব্যস, হীরামন বলল, 'কি করলে মহারাজ! দু'বার চাবুক মারলে, এখন দেখ কি বিপদ!'

যা হবার, সে তো হয়েই গেছে। পক্ষীরাজের ক্ষমতা উপে গেল, ঘর থেকে অনেক দূরে এরা বিজন বনে। ঘোড়া থেকে নেমে দেখে জনমানব নেই কোথাও। সে রাতটা ফলমূল খেয়ে ভূমিশয্যায় কাটিয়ে দিল সবাই।

পরদিন সকালে সে দেশের রাজা শিকারে বেরিয়েছেন। এক হরিণকে তীর বিঁধেছেন। সেটিকে তাড়া করতে করতে রাজা এখানে উপস্থিত। রাজকন্যের চোখধাঁধানো রূপে তাঁর চোখ যেন ঝলসে গেল। এ কন্যেকে তো চাই। রাজা শিস দিলেন। তাঁর অনুচররা এসে ঘিরে ফেলল। রাজার চোখ গেলে দিয়ে রাজকন্যেকে নিয়ে চলে গেলেন। রাজকন্যের জন্যে রাজা সাতসমুদ্দুর তেরো নদী পেরোলেন, এখন তিনি অন্ধ, একলাটি পড়ে আছেন। অবশ্য ঠিক একা নন, হীরামন তাঁর সঙ্গে আছে।

রাজকন্যে আর পক্ষীরাজ এই রাজার প্রাসাদে বন্দী। রাজা ঘরে ঢুকতে কন্যে বললেন, ছয় মাস শিবের ব্রত করছেন, এ ছয়মাস রাজা যেন ঘরে না ঢোকেন। ব্রত তো! নিত্য চলে নিত্য পূজা। তা' দেখে শুনে রাজা তাঁকে একটা আলাদা প্রাসাদেই রাখলেন। পক্ষীরাজকেও নিয়ে গেলেন কন্যে, নিত্যি তাকে রাজ্যের সেরা দানা খাওয়ান। কিন্তু হীরামনকে তো দরকার। ভেবে চিন্তে তিনি এক কৌশলই বের করলেন।

দাসীদের বললেন বাড়ির ছাতে চাল-গম আর নানানিধি ডাল ছড়িয়ে দিতে। পাখিরা খাবে। তা হাজার হাজার পাখি আসে ভোজ খেতে, হীরামন তো আসে না। রাজকন্যে হীরামনের পথ চেয়ে থাকেন। কিন্তু হীরামন তো জঙ্গল ছেড়ে বেরোতে পারে না। সে আছে, অন্ধ রাজা আছেন, বনের ফলমূল খেয়েই তো থাকতে হচ্ছে।

অন্য পাখিরা গিয়ে বলে, 'অ হীরামন! জঙ্গলে কত কষ্ট না পাচ্ছিস। কিছুক্ষণের জন্যে চল্‌না আমাদের সঙ্গে? কি ভালো রাজকন্যে! কি ভোজটা না খাওয়ান আমাদের! আমাদের জন্যে এত এত খাবার ছড়িয়ে রাখেন। আমরা খাই, হাজার হাজার পাখি খায়!'

হীরামন ঠিকই বুঝেছে, এ দয়াবতী রাজকন্যে কে! কেন তিনি পাখিদের ঢালাও নেমন্তন্ন খাওয়ান! ভাবছে, একদিন যেতে হচ্ছে।

হীরামন গিয়ে রাজকন্যেকে দেখল, অন্ধ রাজার কথা বলল, জানাল, কি করলে রাজার চোখ সারবে, কন্যে পালাবে কেমন করে।

ছয়মাস তো হয়ে এসেছে। পক্ষীরাজ ওড়ার জন্যে প্রায় তৈরি, রাজার চোখ সারবে কিসে? সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে রাজকন্যের প্রাসাদ! তার তোরণের বাইরে এক গাছ। সে গাছে থাকে বিহঙমা পাখি। সে পাখির বাচ্চার গু এনে লাগালেই রাজার চোখ ভালো হয়ে যাবে। পরদিন ভোরেই হীরামন উড়েছে সেই

উদ্দেশে। পৌঁছতে পৌঁছতে রাত। সাতসকালে ঠোঁটে একটি পাতা ধরে ও বিহঙ্গমাদের

বাসার নিচে। পাখির ছানার গু পাতায় নিয়ে ও লক্ষ যোজন উড়ে এসে রাজার চোখের গহ্বরে সে গু লাগিয়ে দিল। চোখ খুলতে আবার সব দেখতে পাচ্ছেন রাজা। ক'দিনেই পক্ষীরাজও তৈরি।

রাজকন্যে পক্ষীরাজে চেপে চলে গেছেন বনে। রাজা আর হীরামনকে নিয়ে নিমেষে হাজির রাজার প্রাসাদে।

মহাধুমধামে রাজা আর রাজকন্যের বিয়ে হ'ল। মহা সুখে থাকলেন তাঁরা অনেকদিন। ঘর আলো করে এল অনেক রাজপুত্র, অনেক রাজকন্যা।

হীরামন থেকেই গেল। নিত্য নিত্য সে তেত্রিশকোটি দেবদেবতার নাম শোনায়। আর, গল্প হ'ল শেষ!

মহামারী

বাংলা
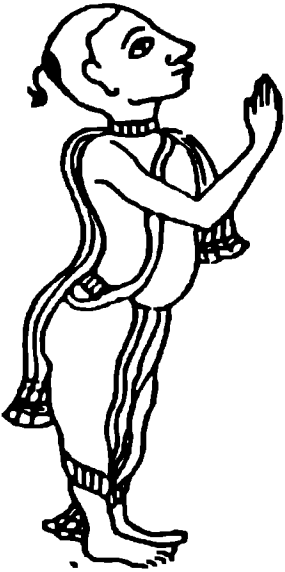
এক সময়ে বিউবোনিক প্লেগের মহামারী এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে, কোটি কোটি মানুষ মরে। ভারতবর্ষের ধর্মপ্রাণ রাজা সাম্রাজ্যের বুড়ো বুড়ো জ্ঞানী পুরুতদের ডাকলেন।

বললেন, 'মহামারী তো আমার রাজ্যের সীমানায় পৌঁছে গেছে। বলুন, কি করলে প্রজাদের বাঁচাতে পারব।'

পুরুতরা অনেক আলোচনা করলেন। অবশেষে তাঁদের মুখপাত্র বললেন, 'মহারাজ! এ হয়েছে দেবাদিদেব মহাদেবের ক্রোধে। রাজ্য জুড়ে পুজোতাজা করে তাঁকে প্রসন্ন করতে হবে।'

রাজা হুকুম দিলেন, প্রতি শিবালয়ে, প্রতি বাড়িতে শিবপূজা, শিবের কাছে প্রার্থনা চলুক। লাগে টাকা, দেবে রাজকোষ!

সাতদিন পূজা চলার পর স্বয়ং শিব দেখা দিলেন প্রধান পুরোহিতকে।

—'বলো, কি চাও!'

প্রধান পুরোহিতের চুল খাড়া-খাড়া। মাটিতে লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তিনি আমতা-আমতা করে বললেন, 'হে শিব! হে বিশ্বের রক্ষাকর্তা! তুমি তো জানো

আমরা কি চাই। মহামারী যে আমাদের রাজ্যপানে এগোচ্ছে। তার হাত থেকে বাঁচাও!'

শিব বললেন, 'অবশ্যই! তোমাদের প্রার্থনায় আমি তুষ্ট হয়েছি। আমার সেবক নন্দী তোমাদের দেশ পাহারা দেবে। সকল অভিশাপ থেকে বাঁচাবে।' বলেই তিনি উপে গেলেন।

পরদিন এ সুখসংবাদ রাজাকে জানানো হ'ল। রাজা প্রতি পুরুতকে পঁচিশটা দুধেল গাই, আর পঞ্চাশ থলে কড়ি দিয়ে বিদায় করলেন।

নন্দীর কাজ, মহামারী যেন সাম্রাজ্যে না ঢোকে সেটি দেখা। তিনি দিনরাত অতন্দ্র পাহারা দিচ্ছেন সীমান্তে। একদিন তিনি পাহারা দিচ্ছেন, মহামারী এক কিম্ভুত দেহ ধরে নন্দীর সামনে দাঁড়াল। এ রাজ্যে সে ঢুকবেই ঢুকবে।

নন্দী ত্রিশূল বাগিয়ে চেঁচাচ্ছেন, 'বেরো চোখের সামনে থেকে বজ্জাত! এক পা এগোলে ফিনিশ করে দেব।'

সে কিম্ভুত কি সহজে নড়ে? দুই অতিকায় মহাবলীর মধ্যে ধস্তাধস্তি লেগে গেল। এ চলল অনেক দিন ধরে। অনেক পাহাড় ধূলিসাৎ হল, অনেক গাছ পড়ল শিকড় উপড়ে। দুই বীর তো তাদের গায়ে গিয়ে পড়ছিলেন! অবশেষে দুজনে ক্ষান্ত দিলেন। সন্ধিও হ'ল একটা।

ঠিক হ'ল প্লেগ মহারাজ একটি দিন থাকবেন রাজধানীতে, একটি মানুষকে নেবেন।

পরদিন সন্ধ্যায় শহরে মহা চেঁচামেচি আর হট্টগোল। জানা গেল, এক নয়, দুই নয়, একশো জন মরেছে প্লেগ মহামারীতে।

রাজা পুরুতদের তলব করে কৈফিয়ৎ চাইলেন। পুরুতরা পড়িমরি দৌড়লেন নন্দীর কাছে। নন্দী সব শুনেমেলে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো দৌড়লেন প্লেগের খোঁজে।

এক ভাঙা বাড়ির মেঝের ধুলোয় বসে আছে প্লেগ। নন্দী তার ঘেঁটি চেপে ধরে চেঁচাচ্ছেন, 'হারামজাদা! তুই তোর প্রতিজ্ঞা ভেঙেছিস। একটা নয়, একশোটা প্রাণ নিয়েছিস! এর দাম দিতে হবে তোকে।'

নন্দী ঘেঁটি ধরে আছেন, তবু প্লেগ হেসে বাঁচে না। সে বলল, ভাই হে! আমি প্রতিজ্ঞা ভাঙিনি। ক্ষেপে যেও না। একটাকেই মারলাম, যেমন কথা ছিল। নিরানব্বই জন ভয়েই মরে গেল? আমি কি করতাম? ওদের সামান্য জ্বর হয়েছিল, ঠাণ্ডা লেগে বগল একটু ফুলেছিল। ওরা ভাবল প্লেগ হয়েছে, ভয়েই মরে গেল। আমি ওদের মারিনি গো!'

নন্দী তাঁর লোহার থাবা আলগা করলেন। প্লেগ পালিয়ে বাঁচল।

বানর ও কুমির

কন্নড়, তামিল

গঙ্গার ধারে এক জামগাছে থাকে এক বানর। সে জাম যেমন রসালো, মিঠে, ফলেও প্রচুর। একদিন সে মনের সুখে জাম খাচ্ছে, তো এক কুমির জল থেকে মাথা তুলেছে।

বানর তাকে চারটি জাম ছুঁড়ে দিয়ে বলছে, 'দুনিয়ার সেরা জাম এগুলো। স্বাদে যেন অমৃত।'

কুমির চপচপ করে জাম খেয়ে ভাবছে, সত্যিই তো চমৎকার! কুমিরে বানরে ভারি বন্ধুত্ব হ'ল। কুমির রোজ আসে দেখা করতে, ওই অমৃতবৃক্ষের ফল খায়, গাছের ছায়ায় গল্প করে।

একদিন কুমির চারটি জাম নিয়ে গেছে কুমিরনির জন্যে। খেয়ে কুমিরনি বলছে, 'চমৎকার! যেম অমৃত! পেলে কোথায় গো?'

—'গঙ্গার পাড়ের একটা গাছ থেকে।'

—'তুমি তো গাছে উঠতে পার না। বালি থেকে কুড়োলে?'

—'এক নতুন বন্ধু হয়েছে যে! এক বানর! সে গাছেই থাকে। সে জাম ফেলে দেয়...আমরা গল্প করি...'

—'তাই ঘরে ফিরতে দেরি হচ্ছে? যে বানর অমন ফল খায়, তার মাংস না জানি কত সুস্বাদু। তার কলজে যেন দেবভোগ্যই হবে। আমি ওর কলজে খাব।'

কথাবার্তার ধরণটা কুমিরের ভাল লাগল না।

—'এ কথা বলো কি করে? সে আমার বন্ধু! তোমার দেওর হয়!'

কুমিরনি গোমড়া হয়ে রইল। তারপর বলল, 'ওর কলজে খেতে চাই। বানরের জন্যে হেদোচ্ছ কেন? উটি বানর, না বানরী? সে যাই হোক, কলজে আমি খাবই। বানরী হলে তো আরোই ভালো। নইলে উপোশ করে মরে যাব, হ্যাঁ!'

কুমিরনির হিংসে আর শত্তুরতা ভোলাতে কুমির কি কম চেষ্টা করল?

কোন কাজ হ'ল না। শেষে ঠিক হ'ল, নেমন্তন্ন খাওয়াবার ছলে কুমির বানরকে পিঠে বয়ে আনবে।

পরদিন কুমির বানরকে নেমন্তন্ন জানাল।

—'আমার বউ তোমার কথা কত না শুনেছে! জাম খেয়ে সে তো মহা খুশি! বড্ড চাইছে যে তুমি একবারটি আমার বাড়ি এসো। গাছ থেকে নেমে আমার পিঠে বোস। আমি তোমায় নিয়ে যাব।'

—'তুমি হলে কুমির, জলের মধ্যে ঘর। আমি সাঁতারও জানি না। ডুবে যাব, মরেও যাব।'

—'আরে না না! যত্ন করে পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যাব। জলের মধ্যে তো থাকি না। নদীর মাঝে একটা রোদঝলমলে দ্বীপে থাকি। চলোনা গো! তোমার মজা লাগবে।'

বানর রাজি হ'ল, নেমেও এল। কুমিরনির জন্যে অনেক জাম নিল।

কুমির জল দিয়ে চলেছে, মনে মনে ভারি মনস্তাপ হচ্ছে। যেন মহাপাপী ও। বিবেক বলছে, বন্ধুকে জানাবও না, ছল করে নিয়ে যাব, বউ ওকে মেরে ওর কলজে খাবে, সেটা ঠিক হয় না।

তাই ও বলছে, 'তোমাকে সাচ্চা কথাটা বলিনি গো! বউ তোমায় আনতে পাঠিয়েছে, সে তোমার কলজেটা খেতে চায়। সে ওটা খাবেই খাবে, আমি ওর কথা অমান্য করতে পারলাম না।'

—'ও মা! আমার কলজেটা খাবে? আগে ভাগে বলবে তো! ওটা পেড়ে এনে তোমার বউকে দিতাম?'

—'তার মানে কি?'

—'কলজেটা নিয়ে ঘুরিনা ভাই! গাছ থেকে নামার কালে ওটা রেখে আসি। চলো, ফিরে যাই, তোমাকে দিয়ে দেব ওটা।'

কুমির ঘুরে গিয়ে পাড় অবধি এল। বানর লাফ দিয়ে তার পিঠ থেকে নামল, আর তড়বড়িয়ে গাছে উঠে প্রাণে বাঁচল।

যখন সত্যি শোনো, তখন কি হয়

তেলুগু

কি যে শোভন, সুন্দর, সভ্যভব্য, সে সম্পর্কে কোন জ্ঞানই ছিল না এক গ্রামবাসীর। তার বউটি একেবারে অন্যরকম। কত না চেষ্টা করেছে সে, স্বামীর যাতে ভালো ভালো ব্যাপারে রুচি জন্মায়, কিন্তু সে লোকের তো সেদিকে মনই নেই।

একবার গ্রামে এলেন, মহান মহাকাব্য 'রামায়ণ'-এর এক প্রখ্যাত কথক। প্রতি সন্ধ্যায় তিনি মহাকাব্যের শ্লোকগুলি আবৃত্তি করেন, গেয়ে শোনান, ব্যাখ্যাও করেন। পুরো গ্রামটা এই মানুষটির কাছে যায়, যেন এ এক মহাভোজ!

সে লোকটার বউ এ জিনিস শোনার জন্যে স্বামীকে আগ্রহী করতে কি চেষ্টাই না করছে! অনেক ঘ্যানঘ্যান করে লোকটাকে যেতে বাধ্যই করল ও। স্বামী যথেষ্ট গজগজ করল বটে, তবে বউয়ের মন রাখতে গেলও ওখানে।

সন্ধ্যেবেলা গেছে, বসেছে সবার পিছনে। গান ও কথকতা চলে সারারাত। ও চোখ খুলে রাখতেই পারল না। গোটা রাতটা টেনে ঘুমোল। ভোরবেলা গানের একটি অধ্যায় শেষ হয়েছে, কথক সেদিনের শেষ শ্লোকটি গেয়েছেন। প্রথা মেনে মিষ্টান্ন বিতরণ চলছে। কে যেন ঘুমন্ত স্বামীর মুখেও মিঠাই গুঁজে দিল।

বউ তো মহাখুশি, যে স্বামী সারারাত গান শুনেছে। সে সাগ্রহে শুধোল, কেমন লাগল রামায়ণ?

স্বামী বলল, 'দিব্যি মিঠে।'

শুনে বউ খুশি হ'ল।

পরদিন বউয়ের জোরাজোরিতে আবার স্বামী শুনতে গেছে। যেখানে কথক ঠাকুর আবৃত্তি ও গান করছেন, সেদিকেই ও এক পাঁচিল ঠেস দিয়ে বসল, ঘুমিয়েও পড়ল। আসরে খুব ভিড়। একটি ছোট ছেলে ওর ঘাড়ে চেপে বসে হাঁ করে কথকতা শুনছে। সকালে যখন সে রাতের কথকতা শেষ হ'ল, সবাই উঠে পড়েছে, স্বামীও উঠেছে।

ছেলেটা আগেই নেমে গেছে। কিন্তু সে তো ঘাড়ে বসেছিল, স্বামীর ঘাড়, পিঠ, ব্যথায় ভারি।

বাড়ি যেতে বউ শুধোচ্ছে, লাগল কেমন।

—'যত ভোর আসে, ততই ভার! বেজায় গুরুভার!'

—'কাহিনীটি তো তেমনই!'

বউ খুশি, যে এতদিনে স্বামী মহাকাব্যের অন্তরের আবেগ ও মহত্ত্ব বুঝতে পারছে।

তৃতীয় দিন শ্রোতাদের সবশেষে বসেও ও ঘুমে কাতর। শেষমেশ শুয়েও পড়েছে, ঘুমের মধ্যে নাকও ডাকছে। ভোর না হ'তে একটা কুকুর ওর হাঁ করা মুখে পেচ্ছাপ করে চলে গেল। একটু বাদে উঠে ও বাড়ি গেছে।

বউ যখন শুধোচ্ছে, আজ কেমন হ'ল, স্বামী মুখ বেঁকিয়ে বলছে, 'বিশ্রি! কি লোনা রে বাবা!'

বউ বুঝেছে, কোথাও গড়বড় হয়েছে। জিগ্যেস করছে, সঠিক বলতে হবে কি হয়েছে। বউ তো নাছোড়বান্দা, অবশেষে স্বামী স্বীকার করছে যে রোজই সে যায় আর ঘুমোয়।

চতুর্থ রাতে বউ গেছে সঙ্গে। প্রথম সারিতে বসিয়েছে ওকে, আর শক্ত গলায় বলছে, যা কিছুই ঘটে যাক, জেগে তাকে থাকতেই হবে।

বাধ্য ছেলের মতো সামনের সারে বসে ও শুনছে। খুব তাড়াতাড়ি ও ওই মহাকাব্যের রোমাঞ্চকর সব ঘটনা, চরিত্রগুলি, এর মধ্যে মজে গেছে।

সেদিন কথক বলছেন মহাবীর হনুমানের কথা। রামের নিশানা আংটি নিয়ে

সমুদ্র পেরিয়ে হনুমান তা পৌঁছতে যাচ্ছেন রামের অপহৃতা স্ত্রী সীতাকে।

হনুমান লাফ মারবেন, আংটি তো পড়ে গেছে সাগরে। কি করেন হনুমান? আংটি তাড়াতাড়ি চাই। রাক্ষসপুরীতে বন্দিনী সীতাকে সে আংটি দিতে হবে। হনুমান বড় দুঃখে হাত কচলাচ্ছেন।

স্বামীটি প্রথম সারে বসে মুগ্ধ চিত্তে সব দেখছে আর শুনছে।

সে চেঁচিয়ে উঠল, 'চিন্তা নেই হনুমান! আমি তুলে আনছি আংটি!' লাফিয়ে উঠে ঝাঁপ মেরেছে ও সাগরতলে, খুঁজে পেয়েছে আংটি, ফিরিয়ে দিচ্ছে হনুমানকে।

সবাই আশ্চর্য, অবাক! তারা ভাবছে, এ লোক তো সামান্য নয়। এর ওপর রাম আর হনুমানের বিশেষ আশীর্বাদ আছে।

সেদিন থেকে সে গ্রামে সকলের কাছে সে এক জ্ঞানী প্রবীণ ব্যক্তি। সকলের শ্রদ্ধা পায় ও। ও নিজেও শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য আচার ব্যবহারই করে।

যখন সত্যি শোনো মন দিয়ে, তখন এ রকমই হয়। বিশেষ করে যদি শোনো 'রামায়ণ'।

তেনালী রাম

কন্নড়, তামিল, তেলুগু
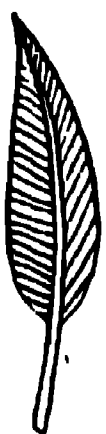
ষোড়শ শতকে দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেবরায়ার সভাবিদূষক ছিলেন তেনালী রাম (কৃষ্ণ)। যেমন বাংলায় গোপাল ভাঁড়, মোগল উত্তর ভারতে বীরবল। এঁর নামে অনেক গল্প আছে দক্ষিণ ভারত জুড়ে, তামিল, তেলুগু ও কন্নড় ভাষায়। কিংবদন্তীসদৃশ এই বিদূষককে নিয়ে ছোটদের বই, কমিক, এমন কি একটি দূরদর্শন সিরিয়ালও হয়েছে।

তেনালী রাম ভাঁড় হ'ল কেমন করে ?

দক্ষিণ ভারতের তেনালী গ্রামে ছিল এক চালাক চতুর ব্রাহ্মণ বালক। তার নাম রাম। এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী আসেন ওদের গ্রামে। ছেলেটির চেহারা ও চালাক চতুর ভাব ওঁর মনে ধরে। ওকে একটা মন্তর শিখিয়ে উনি বললেন, 'যদি কোন রাতে মা কালীর মন্দিরে যাও, এ মন্ত্র ত্রিশ লক্ষবার বলো, দেবী সহস্র বদন নিয়ে তোমার সামনে দেখা দেবেন। যদি ভয় না পাও, তুমি যা চাইবে, তাই দেবেন।'

একটি শুভদিনের জন্যে বসে রইল রাম। দিন এলে গ্রামের বাইরে কালী মন্দিরে গেল। সন্নেসী যা বলেছেন, তাই করল। ত্রিশ লক্ষবার মন্ত্রটি জপার পর সহস্র বদন আর দুটি হাত দিয়ে কালী দেখা দিলেন। রাম তাঁর ভয়ংকরী মূর্তি দেখল বটে, ভয় পেল না। বেজায় হাসতে লাগল ও। এই সাংঘাতিক দেবীর সামনে সাহস করে কেউ হাসেনি।

রীতিমতো অপমানিতা দেবী বললেন, 'হতভাগা! তুই আমাকে দেখে হাসছিস কেন?'

রাম বলল, 'হে জননী! সর্দি লাগলে নাক মুছতে আমাদের, মানে মানুষদেরই ঝামেলা হয়। আমাদের তো দুটো হাত, একটা নাক মাত্তর! আপনার হাজারটা মুখ। আপনার সর্দি লাগলে দু'হাতে হাজারটা নাকের সর্দি মুছবেন কি করে?'

দেবী রাগের চোটে যেন জ্বলে উঠলেন। বললেন, 'আমাকে দেখে হেসেছিস, তোকে লোক হাসিয়েই খেতে হবে। তুই হবি বিকটকবি। ভাঁড়!'

—'ওঃ! বি-ক-ট-ক-বি! দারুণ, দারুণ! ডান থেকে বাঁয়ে, বা বাঁ থেকে ডানে পড়ি, একই উচ্চারণ! বি-ক-ট-ক-বি!'

দেবী প্রসন্না হলেন। তিনি দিলেন শাপ, রাম তার মধ্যেও তামাশা দেখতে পেল। নরম হয়ে তিনি বললেন, 'বিকটকবি হবি বটে, তবে রাজার বিদূষক হবি।' বলেই তিনি অদেখা হলেন।

এর কিছুদিন বাদেই, বিজয়নগরের রাজার বিদূষক হয়ে তেনালী রাম কাজ করতে লেগে গেল।

তেনালী রামের রামায়ণ

এক গণিকা তেনালী রামকে নেমন্তন্ন করল। রাম রামায়ণ আবৃত্তি করবে।

ও গল্প শুরু করল, 'রাম আর সীতা বনে গেলেন।' ব্যস্। চুপ। আর কিছুটি বলে না।

মেয়েটি অপেক্ষায় থেকে থেকে বলে ফেলল, 'তারপর হ'লটা কি?'

—'অধৈর্য হোয়ো না। ওঁরা এখনো জঙ্গলে হাঁটছেন।'

আরেকবার এক অহঙ্কারী গণিকা এক অনুরোধই জানায়। তেনালী রাম ক্ষেপে যায়।

—'আমি তোমায় সত্যি রামায়ণ দেখিয়ে দেব, যেমন ঘটেছিল। রামায়ণে হনুমান ঠিক এমনি করে লঙ্কাপুরীতে আগুন লাগিয়েছিল।' বলে ও গণিকাটির বাড়িতেই আগুন লাগিয়ে দিল।

দুই বোন

সাঁওতালী

এক সাঁওতালের দুটি মেয়ে। একদিন একখানা চ্যাটালো পাথরে ধান শুকোতে দিয়েছে রোদে, দু' বোন জিরোচ্ছে গাছের নিচে। কোথা থেকে একটা কাক উড়ে এসে বসেছে গাছে। তার ঠোঁটে একটি পাকা ফল। মেয়েরা ফলটা দেখে ওটা চাইছে। তখনি কাক ফলটা ফেলে দিল।

মেয়েরা ফলটা তুলে খেয়ে নিল। যেমন খাশা গন্ধ, তেমনি ভালো খেতে। ওরা কাককে শুধোল, অমন ফল মেলে কোথায়। কাক বলল, ওরা ওর সঙ্গে চলুক। ওরাও চলল।

পাহাড় আর জঙ্গলের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে কাক, মেয়েরাও যাচ্ছে। যখনি ওরা শ্রান্ত হয়ে জিরোতে বসে, কাকটাও গাছের ডালে বসে জিরিয়ে নেয়। অনেক দিন বাদে ওরা পৌঁছল এক অজগর জঙ্গলে। সে জঙ্গলের মাঝে একটি গাছ। সে গাছে ফলেছে সেই আশ্চর্য ফল।

দু' বোন যত পারল, তত পাড়ল, আর আশ মিটিয়ে সে ফল খেল।

এখন, বড় বোনের তো খুব তেষ্টা পেয়েছে। সে ছোট বোনকে বলছে, পাতার বাটি বানাতে,—আর পাহাড়ী ঝোরা থেকে জল আনতে। ছোট বোন গেছে জল আনতে, আর কোথা থেকে এল এক বাঘ, ঝাঁপিয়ে পড়ল বড় বোনের ওপর, খেয়ে ফেলল তাকে।

মরতে মরতে বড় বোন আর্ত স্বরে গেয়ে উঠল,
আমার সোনা বোন রে
তোকে জল আনতে পাঠাবার
আর সময় পেলাম না?
এখন তো দেখা হবে না, হবে না আর,
যতদিন না ফিরে জন্মাই আবার!

বোন পাতার পাত্রে জল আনছে, বাতাস গানটি নিয়ে তাকে পৌঁছে দিল।

দিদি বলতে বোন পেল মাথার খুলিটা, আর এক গোছা চুল।

ঝোপ থেকে বাঘ আবার গর্জে উঠল। বোন আতিপিতি উঠল এক গাছে। সাত দিন, সাত রাত, না জল, না ভাত, সে গাছেই বসে থাকল।

একদিন দুটো রাখাল ছেলে যাচ্ছে, তারা মেয়েটাকে দেখল। অনেক মিনতি করে তাকে গাছ থেকে নামাল। তাদেরই একজনের সঙ্গে বিয়ে হ'ল তার, ছেলেপিলেও হ'ল।

দিন আসে, দিন যায়, বর্ষার জল পড়তে বড় বোনের মাথার খুলি থেকে মাথা তুলল একটি চিচিঙ্গা লতা। আর চুলের গোছা থেকে গজাল একটা বাঁশঝোপ। কি সুন্দর আঁকিবুকি বাঁশের গোড়ায়। সময় এলে চিচিঙ্গাগুলো পেকে উঠল, শুকিয়েও গেল। বাঁশঝোপটি ঝাঁপালো হয়ে ঝাড় বাঁধল।

একদিন, বাঁশি বানাতে ওরা একটি বাঁশ কাটল, একটি শুকনো চিচিঙ্গা পাড়ল কেঁদরা বানাবে বলে। কেঁদরা একতারা একটি বাজনা।

যখনি তারা বাঁশিতে ফুঁ দেয়, কেঁদরায় টুং টাং করে, বড় বোনের সেই আর্তগানটি যেন আপনা হতে বেজে ওঠে।

অন্যেরা বোঝেনা এর রহস্য। ছোট বোন বোঝে, তার দিদির আত্মা আশপাশেই আছে। বোঝে, যে মরে গিয়েও দিদি তার ভালবাসার টান কাটাতে পারছে না।

যে রাখালটি বিয়ে করেনি, সেও একটি বাঁশি আর একটি কেঁদরা বানিয়েছিল। কিছুকাল বাদে সে বেশ অবাক। সে যখন থাকে না, কে যেন তার কুটীরটি ঝাঁটপাট দিয়ে নিকিয়ে রাখে। রান্নাঘরে বাসনকোসন মাজা, গোছানো থাকে। সে তো বোঝে না কেমন করে কি হচ্ছে।

তার বন্ধু রাখাল, আর ওর বউকে এ সব কথা বলল। একদিন দু' বন্ধু জঙ্গলে

গেছে, ছোট বোন এই রাখালের কুটীরের কাছে একটি গাছের পিছনে লুকিয়ে আছে। ঘর যখন খালি. জনমানব নেই, তখন কেঁদরা থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে, ঘরের কাজ শুরু করল। এ তো তার বড় বোন!

ছোট বোন ছুটে এসে ঢুকল, জড়িয়ে ধরল দিদিকে, বলল, আর আমাকে ছেড়ে যেতে দেব না।

ঘরে এসে দু' বন্ধুও মহাখুশি। অবিবাহিত রাখালটি বিয়ে করল বড় বোনকে। দুজনে পাশাপাশি মহাসুখে সংসার করতে থাকল। ছেলে, মেয়ে, বউ, জামাই, নাতি নাতনি, নাতির ঘরে পুতি, জমজমাট সংসার হ'ল তাদের।

সুখু দুখু

বাংলা

একজনের দুই বউ, দুজনেরই একটি করে মেয়ে। বড় বউয়ের মেয়ে দুখু, আর ছোট জনের মেয়ে সুখু। বড় বউ আর দুখুর চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসে বাপ ছোট বউ আর সুখুকে।

মেয়েদের স্বভাব যার যার মায়ের মতো। সুখু হল আলসে আর বদমেজাজী। দুখু কেজোকর্মা লক্ষ্মী মেয়ে। সুখু আর তার মা, ওদের মা-মেয়েকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। সুযোগ পেলেই হেনস্থা করে।

ওদের বাবা তো মরে গেল একদিন। এত চিকিচ্ছে, কিছু কাজে লাগল না। ছোট বউ সব সম্পত্তি বাগিয়ে নিয়ে দুখুদের মা-মেয়েকে তাড়িয়ে দিল।

শহরের বাইরে এক পোড়ো কুঁড়েঘর। মা মেয়ে সেখানে থাকে, তুলো থেকে সুতো কেটে দিন চালায়।

একদিন দুখু তো উঠোনে বসে সুতো কাটছে, এমন সময়ে শন্‌শন্ করে বাতাস ধেয়ে এল, দুখুর তুলো উড়িয়ে নিয়ে চলল।

যত পিছু পিছু দৌড়য়, দুখু তো পায়না তুলোর নাগাল। তা সে হাবুডুবু কাঁদছে, তো বাতাস ফিসফিস করে বলছে, 'কাঁদে না দুখু, কাঁদে না। আয় আমার সঙ্গে, যত চাস, তত তুলো দেব তোকে।'

দুখু আর কি করে? সেও চলছে।

যেতে যেতে দেখে এক গাই। গাই বলছে, 'অ দুখু! অমন দৌড়স না রে মা! আমার গোয়ালটা কেড়ে দিয়ে যা! পরে তোকে কত কি দেব!'

দুখু কুয়ো থেকে জল আনছে, ঝাঁটা দিয়ে গোয়াল কেড়ে ধুয়ে পাখলে তকতকে করে ফেলছে।

দুখু দাঁড়ায় তো বাতাসও দাঁড়ায় দুখু চলে তো বাতাসও চলে। যেতে যেতে এক কলাগাছ দুখুকে ডাকছে! বলছে, 'অ দুখু! অ মা! কোথা যাস রে মা! আগাছা লতাপাতায় আমাকে জড়িয়ে মড়িয়ে টেনে ধরেছে! সব ছাড়িয়ে দিবি মা? কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারি খানিক! দিবারাত্তির এমন কোমর ভেঙে কুঁজো হয়ে থাকতে বড় কষ্ট!'

দুখু বলল, 'নিশ্চয় ছাড়িয়ে দোব!'

দুখু লতাপাতা আগাছা টেনে ছিঁড়ে ফেলছে। কলাগাছ যেন মেঘ থেকে বেরোল।

—'ভারি লক্ষ্মী মেয়ে রে তুই! আমিও তোকে একদিন অনেক কিছু দেব।'

—'আহা! কি এমন কাজ করেছি! এ তো সামান্য কাজ!'

দুখু আবার বাতাসের পিছে ছুটছে. তো একটা ঘোড়া তাকে ডাকছে।

—'কোথা যাও মা দুখু? এই লাগাম আর জিনপোশ যে আমার গায়ে কেটে বসছে। ঘাস খাব, তো নিচু হতে পারি না। ওগুলো খুলে নিবি?'

দুখু তখনি তা খুলে নিচ্ছে। গদগদ হয়ে ঘোড়া বলছে, 'দেবো, তোকে ভাল জিনিসই দেব।'

এখন চলতে চলতে বাতাস বলছে, 'ওই যে প্রাসাদ দেখিস, ওখানে থাকে চাঁদের মা বুড়ি! সে তোকে যত চাস তত তুলো দেবে।'

বাতাস বিদেয় নিল।

দুখু প্রাসাদপানে গুটি গুটি যাচ্ছে। প্রাসাদে যেন জনমনিষ্যি নেই। ভয় করছে দুখুর। খানিক থমকে থেকে ও প্রাসাদে ঢুকছে। ভীরু পায়ে ঘুরছে এ ঘর সে ঘর। একটা নেংটি ইঁদুরও দৌড়য় না, বাড়ি যেন শূন্য। হঠাৎ একটা বন্ধ দোরের ও পারে কার সাড়া পেল। এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা দিল। কে বলল, আয়, ভেতরে আয়।'

দোর ঠেলে দুখু দেখে, এক খুনখুনে বুড়ি চরকা কাটছে। কি ঝলমল করছে বুড়ি, যেন পূর্ণিমার চাঁদ সকল জ্যোৎস্না ওর গায়ে ঢেলে দিয়েছে।

দুখু বুড়িকে পেন্নাম করছে আর বলছে, 'দিদিমা গো! বাতাসে আমার তুলো উড়িয়ে নিল। সুতো না কাটলে তো মা আর আমি উপোসে মরব। আমায় চারটি তুলো দেবে?'

চাঁদের মা বুড়ি বলছে, 'যদি বাধা মেয়ে হোস, তুলোর চেয়ে অনেক ভালো সামিগ্রী দোব। ওই পুকুরটা দেখছিস তো? ওতে দুটো ডুব দিয়ে নেয়ে আয়।

তিনটে ডুব দিসনা বাছা।'

দুখু তো পুকুরে গিয়ে একটা ডুব দিয়েছে। জল থেকে মাথা তুলছে তো দেখে রূপে আলো করছে এমন সুন্দরী হয়েছে ও। আবার ডুব দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গে আনারসী বেনারসী, সর্বাঙ্গে ঝলমলে সোনা-হীরে-মুক্তোর গয়না। গলার হারটা এমন ভারি, যেন ও মাথাই তুলতে পারে না। দুখু অবাক।

প্রাসাদে ফিরতে বুড়ি বলছে, 'না জানি কত খিদে পেয়েছে। পাশের ঘরে যা। তোর তরে খাবার সাজিয়ে রেখেছি।'

পাশের ঘরে থরে থরে নানা নিধি অন্ন ব্যঞ্জন পায়েস মিষ্টান্ন সাজানো। এমন সব খাবার তো সে স্বপ্নেও দেখেনি। পেট ভরে খেয়ে মুখ আঁচিয়ে সে বুড়ির কাছে গেছে। বুড়ি বলছে, 'তোর জন্যে সাজানো আছে কত কি!' বুড়ি দেখাচ্ছে তিনটি ঝাঁপি, বড়-মেজ-ছোট। বলছে, 'একটা বেছে নে মা!' দুখু সবার ছোট ঝাঁপিটি নিয়ে বুড়িকে পেন্নাম করে বিদায় নিচ্ছে।

ফেরার পথে সবার সঙ্গে দেখা। ঘোড়া, কলাগাছ, গাই। সবাই তাকে কিছু না কিছু দিতে চাইছে, ঘোড়া একটি পক্ষীরাজের ছানা, কলাগাছ দিল সোনার বরণ একছড়া কলা, আর এক ভাঁড় সোনার মোহর। গাই দিল এক কপিলা গাইয়ের বকনা, যার বাঁটে দুধ শুকোয় না।

সকলকে ধন্যি ধন্যি করে দুখু পক্ষীরাজে চেপে সব নিয়ে বাড়ি এল।

এদিকে মা তো জানে না দুখু কোথায় গেছে। চিন্তায় ছাই ছাই, বারবার ঘর-বার,—দুখু যেই ডেকেছে, 'মা দেখ্ এসে কি এনেছি!'

মায়ের ভ্যাবাচ্যাকা কাটতে সে তো দুখুকে দেখে অবাক! আনারসী-বেনারসী, এত এত সোনার মোহর, এমন গয়নাগাঁটি, পক্ষীরাজ ঘোড়া, কপিলা গাইয়ের বকনা, মায়ের বাক্যি হরে গেল।

শেষে সম্বিত ফিরে পেয়ে মা বলছে, মেয়ে এমন নানানিধি কুবেরের ঐশ্বর্য পেল কোথা! দুখু তো বলছে সাতকাণ্ড রামায়ণ, বাতাস, গাই, গাছ, ঘোড়া, চাঁদের মা বুড়ি, সব কথা! শেষে বলছে, 'কথা ফুরোয়নি রে মা! দেখ্, কেমন ঝাঁপি এনেছি!'

ঝাঁপিতে বুঝি সোনাদানা, মণিমুক্তো আছে। সাবাধানে আলতো হাতে যেমন ঝাঁপি খুলেছে, বেরিয়ে এসেছে সাজপোশাকে ঝলমল এক রাজার কুমার!

আর বেরিয়েই বলছে, 'তোমাকে বিয়ে করতে পাঠিয়েছে গো আমায়!'

তড়িঘড়ি দিন দেখা, আত্মীয়-কুটুমের নেমন্তন্ন, জাঁকজমকে ধুমধামে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে দেখতে এল না শুধু সুখু, আর সুখুর মা।

দুখুর মায়ের অন্তরটি তো ভালো। আচম্বিতে তার অনেক ঐশ্বর্য, অনেক মানসম্মান, কিন্তু তার তো মাথা ঘুরে যায় নি। সুখুর মা আর মেয়েকে তো সে আপনজনই ভাবে। দুখুর গয়নার পাহাড়, সুখুকে চারটি দিতে গেল। সুখুর মা তো অপমানে

জরোজরো। গালে হাত রেখে সে বলছে, 'তোদের জিনিস কেন নিতে যাব লা! সুখু কি গয়না ভিক্ষে চেয়েছে? তবে কি! ঠাকুর যদি চাইত যে সুখু গয়না পরুক, সুখুর বাপকে বাঁচিয়েই রাখত। আমার সুখু বিনে সাজেই সুন্দরী। গয়নার দরকার কি তার? তবে হ্যাঁ, পেঁচামুখী পেতনিদের শাড়ি গয়না পরে সাজতে হয়।'

এদিকে সে খোঁজ নিচ্ছে, কেমন করে দুখু রাজার ঐশ্বর্য পেল! সব যখন জেনে নিল, তখন মনে মনে বলছে, 'দেখাচ্ছি মজা! সৌভাগ্যে মটমট করছে! আমার মুখে ঝামা ঘষতে চায়! আমার সুখুর শতগুণ ঐশ্বর্য হবে।'

অমনি সুখুর মা চরকা কিনছে, বাতাস যখন শনশনে, সুখুকে উঠোনে বসাচ্ছে তুলা কাটতে। বলছে, 'মন দিয়ে শোন রে মা! বাতাস যেমন তোর তুলো উড়িয়ে নেবে, বাতাস যতক্ষণ না বলে তার পিছনে দৌড়তে, খুব চেঁচাবি, খুব কাঁদবি। পথে যার সঙ্গে দেখা হবে, খু-ব মিষ্টি করে কথা কইবি। যতক্ষণ না চাঁদের মা বুড়ির ঘরে পৌঁছস, বাতাসের পিছু ছাড়িস না।'

—'তুই যা বলবি, তাই করব রে মা!' বলেই সুখু সুতো কাটতে বসেছে।

আর বাতাস তার তুলোর পাঁজ উড়িয়ে নিয়েছে। সুখু একেবারে মড়াকান্না কাঁদতে শুরু করল।

বাতাস বলল, 'অ সুখু! চারটি তুলোর জন্যে অত কেঁদো না। আমার সঙ্গে চলো, যত তুলো চাও, সব দেব।'

দুখুর মতো সুখুও বাতাসের পিছনে যাচ্ছে। গাইয়ের সঙ্গে দেখা, সে, গোহাল কেড়ে দিতে বলল।

সুখু মাথা নেড়ে বলল, 'তোর দুর্গন্ধ গোহাল কাড়ব আমি! কখ্‌খনো না। আমি বলে চাঁদের মা বুড়িকে দেখতে যাচ্ছি!'

গাছের সঙ্গে দেখা হতে সুখু বলছে, 'তোমার লতাপাতা ছেঁড়ার সময় নেই আমার। এর চেˆ দরকারী কাজ আছে। তাড়া আছে না আমার? চাঁদের মা বুড়িকে দেখব না?'

ঘোড়াকেও কি খোয়ারটা না করল সুখু। 'ঘোড়া নয়তো বোকা গাধা একটা! কি পেয়েছিস আমাকে? তোর সহিসের মেয়ে, না কি?'

ওরা বলল না কিছু, কিন্তু মনে ব্যথা পেল। ভাবল আসবে, আমাদেরও দিন আসবে।
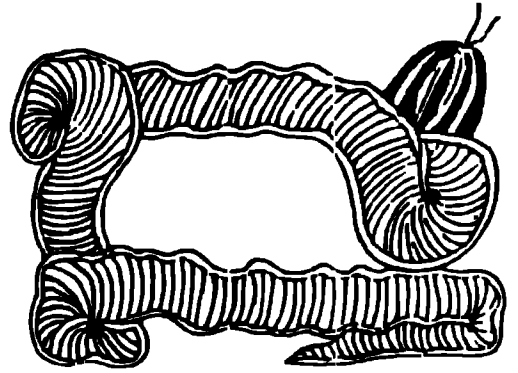
সে প্রাসাদ তো অনেক দূর। হেঁটে হেঁটে সুখু তখন যেমন হয়রান, তেমন বিরক্ত। প্রাসাদে ঢুকলই জ্বলতে জ্বলতে। মায়ের শেখানো সব কথা ভুলে গিয়ে সুখু বুড়ির দরজা ধড়াম করে ঠেলে ঢুকে চেঁচাতে থাকল, 'বাতাস আমার তুলো উড়িয়ে নিয়েছে। ভাল চাস, তো দে খানিক তুলো। নইলে সব ভেঙে চুরে একশা করব।

দেরি করিস না, ব'লে দিলাম!'

বুড়ি একটু ও চেঁচাল না। নরম গলায় বলল. 'এত অধীর কেন গো? তুলোর চেয়ে অনেক ভালো জিনিস দোব। আগে আমার কথা শোন, তবে তো! জানালা দিয়ে পুকুরটা দেখছ? যাও, দু' ডুবে নেয়ে এসো। দুটোর বেশি ডুব দিলে পস্তাতে হবে কিন্তু।'

সুখু দৌড়ে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছে। এক ডুবে সে সুন্দরী। আবার ডুব দিয়েছে। দু' ডুবে সে গয়নায় ঝলমলে, পরনে বেনারসী!

তখন সুখু ভাবছে, 'দিই আরেকটা ডুব। দুখুর চেয়ে অনেক সুন্দরী হব, আরো নানানিধি জিনিস পাব। সে তো বুড়ি চায় না। তাই আমাকে আর ডুব দিতে নিষেধ করেছে। কিন্তু আমি আরেকটা ডুব দেবই দেব।'

এই ভেবে সুখু আবার ডুব দিয়েছে। তখন কি হল? জল থেকে মাথা তুলে সুখু দেখে, হায় হায়! কোথা গেল ঝলমলে শাড়ি আর ঝকমকে গয়না? কোথায় গেল রূপ? নাকটা হাতির শুঁড়ের মত লম্বা, সর্বাঙ্গে ফোস্কা, বড় বড় ফোড়া!

চাঁদের মা বুড়িকে তেড়েমেড়ে বলছে সুখু, 'কি করেছিস আমার, দেখ্!'

বুড়ি বলছে, 'আমার কথা তো শোন নি বাছা! তিনটে ডুব দিয়েছ, হাতে হাতে ফল পেয়েছ! যে শাস্তি পেলে, তা নিজের কর্মফলেই হয়েছে। যাক! আরো একটা জিনিস দেব তোমাকে।'

বুড়ি দেখাচ্ছে বড়-মাঝারি ছোট তিনটি ঝাঁপি। বলছে, একটি বেছে নিতে, সুখু বড় ঝাঁপিটাই নিল।

সুখুর মা তো মেয়ের পথ চেয়ে চেয়ে অস্থির। শুধু ভাবছে, 'কখন আসবে গো। মণিমুক্তো দেখে চোখ জুড়োব।' আর তখনি সুখু ডাকছে, 'মা!'

মা তো আতিপিতি দৌড়ে গেছে। কিন্তু মেয়েকে দেখে সে একেবারে বোবা। সুখুর নাকটা যেন হাতির শুঁড়! সর্বাঙ্গে ঘা আর ফোড়া, মণিমুক্তো কোথায়?

—'কি হ'ল তোর সুখু? কি হ'ল? কেন হ'ল? কি করেছিলি রে মা!'

সুখু শুধু ঝাঁপি দেখায়। বলে, বুড়ি বলল, যেটি পছন্দ, তুলে নাও, আমিও নিলাম।

মা ভাবছে, 'বুড়ি নিশ্চয় ছলনা ছলেছে। ঝাঁপির মধ্যে না জানি কত কি আছে! অবাক করে দেবে আমাদের! আমার সুখুকে এত কষ্ট দিয়েছে, সে দুঃখ মনে থাকতে দেবে না।'

কি উদ্বেগ! বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটছে কে। মা আর মেয়ে ঝাঁপি খুলল। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বেরিয়ে এল এক পেল্লায় সাপ। সুখুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে গিলেই ফেলল। ঠিক যেমন করে অজগর ছাগল গেলে, তেমনি করে।

সুখুর মা উন্মাদ পাগল হয়ে গেল। মরেও গেল ক'দিন বাদে।

এক, দুই, তিন

সাঁওতালী
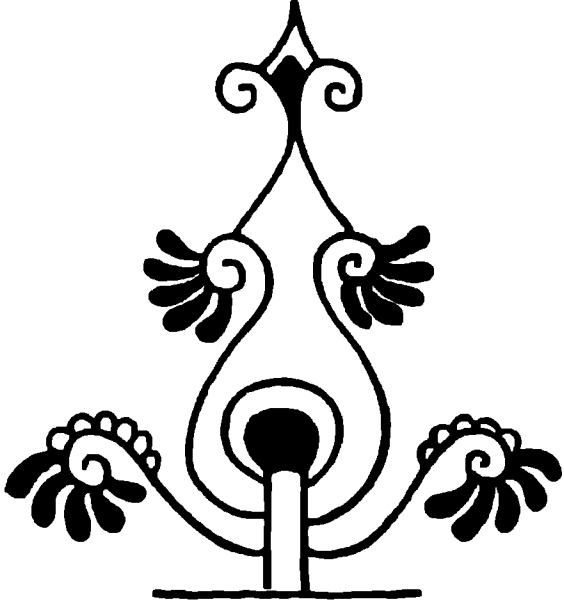
এক বেজায় ধনী আর ভীষণ শক্তিশালী রাজার বিশ্বাস, যে দুনিয়াতে তাঁর মতো ক্ষমতাশালী মানুষ দুটি নেই। একদিন তাঁর বেজায় চিন্তা হল, তিনি যা ভাবেন তা অন্যেরা আঁচ করতে পারছে কি না।

তখনি তাঁর মন্ত্রী-আমলা-চাকর বাকর, সবাইকে ডেকে বললেন, তিনি কি ভাবছেন, ওরা বলুক। অনেকে অনেক রকম বলল বটে, তবে কারো জবাবেই রাজা খুশি হলেন না।

রাজা তাঁর দেওয়ানকে হুকুম দিলেন, তাঁর মনের কথা আঁচ করতে পারে, এমন কাউকে চাই। ঠিক একমাসের মধ্যে এই আশ্চর্য মানুষটিকে চাই।

দেওয়ান বিশ্বভুবন তন্নতন্ন করে খুঁজে সারা। এদিকে মাস শেষ হয় হয়, তিনি তো মরিয়া হয়ে উঠলেন। তাঁর ছিল এক মেয়ে। সে বলল, ঠিক দিনে ঠিক মানুষটিকে সে হাজির করবে। এ কথা শুনে দেওয়ান খানিক খুশি হলেন। বললেন, 'বেশ তো! দেখা যাক কাকে হাজির করো তুমি!'

কাজটি তিনি মেয়েটিকে সঁপে দিলেন।

দিনটি যখন এল, মেয়ে এনে হাজির করল এক বোকাসোকা মানুষকে। সে তাদেরই রাখাল। মেয়ে বাপকে বলছে, ওকে রাজার কাছে নিয়ে যেতে। দেওয়ান তো মেয়ের কাণ্ড দেখে মুচ্ছো যান যান। কিন্তু মেয়ে বলছে এই বোকসোকা রাখালই সংকট তরাবে। দেওয়ানের তো আর কিছু করারও নেই। তিনি মেয়ের ওপর আস্থাও রাখেন। অগত্যা রাখালকে নিয়েই দরবারে গেলেন।

দরবারে সবাই হাজির। রাজাও অপেক্ষা করছেন। দেওয়ান রাখালটিকে রাজার সামনে আনলেন। রাখাল যখন রাজার চোখে চোখে তাকাল, রাজা একটা আঙুল তুললেন।

রাখাল তুলল দুটো আঙুল।

রাজা তুললেন তিনটে আঙুল।

রাখাল জোরে জোরে মাথা নাড়ছে আর পালাবার চেষ্টা করছে।

রাজা হেসে বাঁচেন না। তিনি খুব, খুব খুশি। দেওয়ানকে দারুণ প্রশংসা করলেন। কি বুদ্ধিমান মানুষকেই যে এনেছেন তিনি! দেওয়ানকে অনেক বখশিসও দিলেন।

দেওয়ান ঘাবড়ে হতভম্ব। কি যে ঘটে গেল, কিছুই তো বোঝেননি তিনি। মিনতি করে বললেন, রাজা একটু খোলসা করে বুঝিয়ে দিন।

রাজা বললেন, 'যখন একটা আঙুল তুলেছি, আমি শুধিয়েছি, আমি একাই কি রাজা? দু' আঙুল তুলে ও মনে করিয়ে দিল, ভগবানও আছেন। আমার যত ক্ষমতা, তাঁর অন্তত সেটুকু ক্ষমতা আছে! তারপর জিগ্যেস করলাম, তিন নম্বর রাজা কেউ আছেন কি? ও প্রবল ভাবে জানিয়ে দিল, নেই। লোকটা আমার মনের কথা ধরে ফেলেছে। আমি ভাবতাম, আমি একাই সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা ধরি। ও মনে করিয়ে দিল, আরেকজনও আছেন, তিনি ভগবান! তবে তৃতীয় কেউ নেই।'

তারপর যে-যার ঘরে গেল। রাতে দেওয়ান বোকা রাখালকে শুধোচ্ছেন, রাজার সঙ্গে তার কি মনের কথা হ'ল!

রাখাল বলছে, 'প্রভু! আমার নিজের মোটে তিনটে ভেড়া। আপনি রাজার কাছে নিলেন আমাকে, রাজা একটা আঙুল তুললেন। বুঝলাম, একটা ভেড়া চান। তা এত্ত বড় রাজা! আমি দুটো দিতে চাইলাম। তিনটে আঙুল তুলে যখন জানাল, যে তিনটে ভেড়াই চায়, মনে হ'ল বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে এটা। তাই ভাগতে চেষ্টা করছিলাম।

যে বউ হার মানে নি

কাশ্মীরী

কাশ্মীরের এক বিশাল ধনী বণিকের ছিল এক বেজায় বোকা আর মূর্খ ছেলে। দেশের সেরা সেরা মাষ্টারদের রাখলেন বাপ। ছেলে কিছুই শিখল না। শেখালে শিখবে কি! সে যেমন আলসে, তেমনি ট্যালা, আর বেজায় মাথামোটা। শুয়ে আর গড়িয়েই সে সময় কাটায়। বাপ ছেলের আশাভরসা ছাড়লেন। তাকে তাচ্ছিল্যও করতেন। ছেলের মা অবিশ্যি ছেলের সব কিছুরই সাফাই গাইতেন।

ছেলের বিয়ের বয়স হ'ল। মা পীড়াপীড়ি করলেন। একটি যোগ্য বউ আনা হোক। বণিক মনে মনে স্থির করেছেন, ছেলেকে বিয়ে দেবেন না। নির্বোধ ছেলের জন্যে কিছু করার কথা ভাবলে তাঁর লজ্জাও হয়, বিব্রতও বোধ করেন।

মা কিন্তু ঠিক করেছেন, বিয়ে দেবেনই দেবেন। ছেলের বিয়ে না-দেওয়া বড় লজ্জার কথা। ওঁদের সমাজের প্রথা, ওঁদের ধর্ম, সেখানেও এটা চলে না। তাই তিনি

ছেলের হয়ে অনেক 'গপ্পো' বলতে থাকলেন। তিনি মাঝে মধ্যে ছেলের বুদ্ধি ও জ্ঞানের ঝলক দেখতে পাচ্ছেন।

এ সব গপ্পো বণিক যত শোনেন, ততই ক্ষেপে যান। শেষমেশ বউকে বললেন, 'এ কেত্তন তো অনেক শুনলাম, এ মূর্খের প্রলাপ মাত্র। মায়েরা স্নেহে অন্ধ হয়। তবে লোকটাকে আরেকবার সুযোগ দিচ্ছি আমি। ওকে ডাকো, এই তিন 'পান্‌সা' দাও। বলো, বাজারে খেয়ে নিজের জন্যে এক পান্‌সায় কিছু কিনুক। আরেকটা ফেলে দিক নদীতে। শেষ পান্‌সাটি দিয়ে কম করে পাঁচটা জিনিস আনতে হবে। কিছু খাওয়ার, কিছু পান করবার, কিছু চিবোবার, কিছু বাগানে পুঁতবার, গরুর খাবার খানিকটা।' বউ তাই করল। ছেলেটা তিনটে তামার পয়সা নিয়ে বোরোল।

বাজারে গিয়ে এক পান্‌সার খাবার কিনে খেল। অতি সহজ কাজ সেটা। তারপর নদীর ধারে এসে পান্‌সা ফেলতে যাবে, হঠাৎ মনে হ'ল এ এক অদম্ভুত ব্যাপার।

বেশ জোরে হেঁকে বলল, 'এ কাজ করে লাভ কি? পান্‌সাটা ফেলে দিলে একটা থাকে। তা দিয়ে কি কিনব, যা খাওয়া যায়, পান করা যায়, মা যা যা বলেছে, সব করা যায়! আবার, না ফেললে পরে অবাধ্যতা করা হয়!'

সে তো বলেই চলেছে, এক কামারের মেয়ে এসে শুধোচ্ছে, ব্যাপারখানা কি?

ছেলেটা বলল, মা কি করতে বলেছে। বলল, সে কথা মানলে বোকামি করা হবে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কি করে তা হ'লে? মার অবাধ্য হতেও তো চায় না।

মেয়েটি বলল, 'আমি বলছি কি করবে। এক পান্‌সায় একটা তরমুজ কেনো, আরেকটা পকেটে রাখো, নদীতে ফেলো না। যা যা দরকার, পাঁচটা জিনিসই মিলবে তরমুজ থেকে। কেনো, মাকে দাও, তিনি খুশি হবেন।'

ছেলেটা তাই করল।

তরমুজ দেখে বণিক বিস্মিত। 'আমি বিশ্বাসই করিনা ছেলে স্ববুদ্ধিতে এ কাজ করেছে। ওর মাথায় আসতই না। কেউ নিশ্চয় পরামর্শ দিয়েছে।'

ছেলেকে শুধোল, 'কে বুদ্ধি জোগাল?'

—'এক কামারের মেয়ে।'

বণিক বলছেন, 'দেখলে তো? জানতাম এটা ওই গাধার কম্মো নয়। এখন মনে হচ্ছে, ওর বিয়ে দেওয়া যাক। যদি তুমি রাজী থাকো, ও নিজেও চায়, কামারের মেয়েকেই বিয়ে করুক। ছেলেটাকে কিছু মমতা দেখিয়েছে, মনে হচ্ছে বেশ বুদ্ধিমতী!'

বউ তাড়াতাড়ি বলল, 'তাই হোক। তাই সব চেয়ে ভালো হবে।'

বণিক গেলেন কামারের ঘরে। তরুণী মেয়েটিকে বললেন, 'তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

মেয়ে ঝটপট বলল, 'বাবা একটা কড়ি নিয়ে চুনী কিনতে গেছেন, মা গেছেন

চারটি কথা বেচতে। তবে ওঁরা এলেন বলে। বসুন না আপনি।'

কথাবার্তা শুনে বণিক গেছেন ঘাবড়ে। বলছেন, 'বেশ! আমি বসছি। কিন্তু বাবা-মা কোথায় গেছেন বললে?'

—'বাবা গেছেন এক কড়ির চুনী কিনতে। মানে পিদিমের তেল কিনতে গেছেন। মা গেছেন চারটি কথা বেচতে, মানে কারো বিয়ের চেষ্টা করতে গেছেন।'

মেয়েটির বুদ্ধি দেখে বণিক চমৎকৃত, তবে মুখে কিছু বললেন না।

খানিক বাদেই ঘরে ফিরলেন কামার আর কামারনী। তাঁদের ছোট্ট কুটীরে অমন বড় ব্যবসায়ীকে দেখে তাঁরা অবাক। সসম্ভ্রমে সেলাম করে বললেন, 'গরিবের এ ভাগ্যি হ'ল কেন?'

বণিক বলছেন, তাঁর ছেলের এখানে বিয়ে হোক, এই ইচ্ছে তাঁর। অবাক হলেও এঁরা রাজী হলেন। বিয়ের দিনও ঠিক হ'ল।

বাতাসের মুখে খবর ছড়াল। সবাই বলছে এতবড় মানুষটা তুচ্ছ এক নগণ্য কামারের মেয়ের সঙ্গে বেটার বিয়ে দিচ্ছে? ক'জন গায়ে পড়ে বণিকের ছেলের কাছে গিয়ে তার মন বিগড়োতে চেষ্টা করল। বলল, কনের বাপকে সাবধান করে দাও। সে যদি বিয়েতে মত দিয়ে থাকে, বিয়েটা যদি হয়ও, বর কিন্তু কনেকে দিনে সাতবার জুতো পেটা করবে। এরা ভাবল, কামার ঘাবড়ে যাবে, বিয়ে ভেঙে যাবে।'

বলল, 'যদি ঘাবড়ে না যায়, বিয়ে যদি হয়ও, বউয়ের সঙ্গে অমনটি করা ঠিকই হবে। সে তোমার বশে থাকবে, কখনো ঝামেলা করবে না।'

বোকাটা ভাবল, চমৎকার বাৎলেছে এরা।

তড়িঘড়ি কামারকে গিয়ে সব বলল। কামার তো ঘাবড়ে গেল। মেয়েকে ডেকে সবই বলল। অমন লোকের সংস্পর্শে আসা ঠিক হবে না। বলল, 'যে লোক তোমাকে ঘোড়াচোরের মতো পেটাবে, তার সঙ্গে বিয়ে হবার চেয়ে না হওয়া ভালো।'

মেয়ে বাপকে সান্ত্বনা দিল।

—'আমার জন্যে ভেব না বাবা! নিশ্চয় কিছু শয়তান ওকে উসকেছে। ও এসে ছাতামাথা বকেছে। এ আমি হতেই দেব না। মুখে বলা, আর সে কাজ করা, দুয়ে ফারাক থাকেই বাবা। ভয় পেও না। যা বলছে তার কিচ্ছু হবে না।'

শুভদিনে বিয়ে হ'ল। ফুল শয্যার রাতে মাঝরাতে বর উঠেছে। বউ ঘুমোচ্ছে ভেবে জুতো তুলেছে ওকে পিটবে বলে।

বউ চোখ খুলে বলছে, 'ও কাজও কোর না। বিয়ের দিনেই ঝগড়া! সে বড়
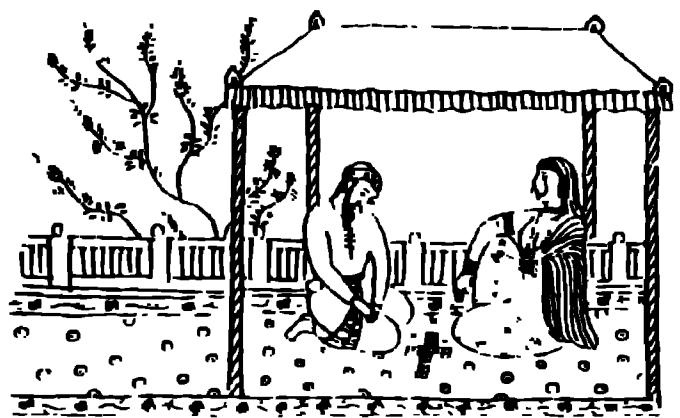
কুলক্ষণ। কালও যদি মারতে ইচ্ছে হয়, মেরো। তবে আজ ঝগড়া কোর না।'

বরের মনে হ'ল, এতো যুক্তিপূর্ণ কথা। কিন্তু পরের রাতে জুতো তুলতে বউ বলছে, 'বিয়ের প্রথম সপ্তাহে বর কনে বিবাদ করলে সেটা যে অলক্ষুণে. তা জান না? জানি, তুমি জ্ঞানী গুণী লোক। আমার কথা মানবে। আটদিন সবুর করো, তারপর সাধ মিটিয়ে মেরো।'

বর মেনে নিল সে কথা। জুতো ছুঁড়ে ফেলল। সব মুসলিম কনেরা সাতদিনের দিন বাপের বাড়ি যায়, কামারের মেয়েও চলে গেল।

ওর বন্ধুরা বরকে বলছে, 'বোকা-বানাল তো? কি গাধা তুমি, কি গাধা! জানতাম, এ রকমই হবে।'

এদিকে বণিকের বউ ছেলের জন্যে কত কি না ভাবছে। এই তো সময়। ওর তো স্বাধীন হওয়া উচিত!

স্বামীকে বলছে, 'কিছু সওদা দাও। ঘুরে ঘেরে বেচুক, অভিজ্ঞতাও হবে।

—'কখনো না।' ওর হাতে টাকা দেওয়াও যা, টাকা জলে ফেলে দেওয়াও তা! নিমেষে সব খুইয়ে বসবে।'

—'তা হোক না! এই করতে করতেই বুদ্ধি হবে। কিছু টাকা দাও। দেশবিদেশে ঘুরুক। যদি টাকা করতে পারে, টাকার দামও বুঝবে। যদি সব খুইয়ে ভিখিরি হয়, ভরসা করব, সব ফিরে পেলে তার দাম বুঝবে। লাভ যাই করুক, খানিক জ্ঞান হবেই, সেটাই লাভ। হাতে কলমে কাজ না করলে ও অপদার্থই থেকে যাবে।'

বণিককে এ কথা মানতেই হ'ল। ছেলেকে দিলেন কিছু টাকা, মালপত্র, ক'জন ভৃত্য। সাবধানে চলতে বলে বিদায় দিলেন ছেলেকে।

সওদাপত্তর আর ভৃত্যবাহিনী নিয়ে ছেলে তো চলেছে। পাশের দেশে ওদের কাফিলা ঢুকেছে সবে, দেখে এক বিশাল বাগান, খুব উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। ছেলে জানতে চায় জায়গাটা কি রকম! ভৃত্যদের পাঠিয়েছে ভিতরে। তারা দেখে এসে বলছে, অপূর্ব এক বাগানের মাঝে বিশাল এক প্রাসাদ।

ছেলে নিজেই গিয়ে ঢুকেছে সেখানে। এক রূপসী মেয়ে তাকে সাদরে ডেকে নিয়ে গেল ভিতরে। বলল, এক হাত নার্দ খেলা যাক। নার্দ এক জাতের জুয়া খেলা। মেয়েটি পাখোয়াজ জুয়াড়ী। প্রতিদ্বন্দ্বীর টাকাপয়সা বাগাবার সব কৌশলই সে জানে। খেলার সময়ে পোষা বেড়ালটাকে বসিয়ে রাখে। তার শিক্ষা পেয়ে, ইশারা পেলেই বেড়ালটা বাতির গা ঘেঁষে চলে যায়। বাতি নিভে যায়। জুয়াতে হারলেই মেয়েটি এ কাজ করে। এমন নানা কৌশলে মেয়েটি প্রচুর দৌলত কামিয়েছে।

বণিকের ছেলে এমনিতেই হারছিল। বেড়ালের সাহায্যে মেয়েটি ওকে দেউলে বানিয়ে ছাড়ল। টাকা, সওদাগরী মাল, ভৃত্যের দল, এমন কি নিজেকেও বাকি রেখে হেরে গেল। তারপর কয়েদখানা, সেখানে প্রচণ্ড মারধোর, খেতেও পায় আধমুঠো,

প্রায়ইসে গলা তুলে আল্লাহ্‌কে ডাকে। এই নিষ্ঠুর দুনিয়া থেকে তাকে নিয়ে যেতে বলে।

একদিন দেখে কয়েদখানার ফটকের বাইরে একটি লোক। বণিকের ছেলে তাকে ডেকে শুধোচ্ছে তার দেশ কোথা.। জবাব পেয়ে বুঝেছে সে তার দেশেরই বাসিন্দা।

বলছে, 'খুব ভালো। আমার একটা উপকার করো না ভাই! এখানে তো আমি বন্দী। কর্জ শোধ না করলে খালাস পাব না। দুটো চিঠি দিচ্ছি, একটা আমার বাবাকে, আরেকটা আমার বউকে দেবে? আমি চিরঋণী হব ভাই, দেশে ফিরলে মোটা বখশিসও দেব।'

লোকটা রাজী হয়ে চিঠি দুটো নিল।

বাবার চিঠিতে ছেলে সব সত্য কথাই খুলে মেলে লিখেছে।

বউয়ের চিঠিতে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা লিখেছে। সে না কি অনেক টাকা করেছে, শীঘ্রই ফিরবে। ফিরেই আচ্ছা করে জুতো পেটা করবে, বিয়ের আগেই যে কথা ছিল!

চিঠিগুলো নিয়ে গেল যে, সে লেখাপড়া জানে না। বাপের চিঠি বউকে দিল। বউয়ের চিঠি বাপকে। বাপে তো চিঠি পড়ে খুব খুশি। তিনি শুধু বুঝলেন না, বউকে লিখল কেন। চিঠি তো তাঁর। ফিরে এসে আশ মিটিয়ে জুতো পেটার কথাও বুঝলেন না।

বউ স্বামীর চিঠি পেয়ে স্বামীর দুর্ভাগ্যে দুঃখ পেল, তবে চিঠিটা শ্বশুরের নামে কেন এল, তা বুঝল না। বিভ্রান্ত হয়ে ও শ্বশুরের কাছে গেল। দুটো চিঠি একসঙ্গে পড়ে ওদের ধাঁধা লেগে গেল।

বউ বুদ্ধিমতী, সাহসীও বটে! ঠিক করল, নিজেই যাবে স্বামীকে দেখতে, পারলে ছাড়িয়েও আনবে। বণিক রাজী হলেন, ওকে কিছু টাকাও দিলেন।

বউ ঝটপট পুরুষের ছদ্মবেশ পরল। ঝটপট চলে গেল সেই রূপসী জুয়াড়ীর প্রাসাদে। খবর পাঠাল, সে এক ধনী বণিকের ছেলে। নার্দ খেলার নেমন্তন্নও পেয়ে গেল। এও রাজী হ'ল। খেলা হবে সন্ধ্যায়। এর আগেই এই ছদ্মবেশী বণিকপুত্র সোনাদানা ঘুষ দিয়েছে জুয়াড়ীর লোকজনকে, অনেক কথা বের করে নিয়েছে ওদের পেট থেকে।

ওরা ফিসফিস করে বলে দিল, ওদের মালকিন প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারাবার জন্যে কি কি কৌশল করে। বেড়ালের ব্যাপারটাও বলে দিল। সন্ধ্যেবেলা ছদ্মবেশী বণিকপুত্র যখন খেলতে এসেছে, আস্তিনের হাতার ভাঁজে এনেছে একটা নেংটি ইঁদুর।

খেলা শুরু হ'ল। অতিথি খেলছে চমৎকার। জিতেও যাচ্ছে। ওই নির্দয় জুয়াড়ী মেয়েটি পরাজয় সইতে পারে না। সে ইশারা করছে বেড়ালকে। বেড়াল বাতির কাছাকাছি, তো নতুন খেলুড়ে দিয়েছে ইঁদুরটা ছেড়ে। আর কি! ঘর জুড়ে

ইঁদুর দৌড়য় পালাতে, বেড়াল ছোটে ধরতে।

—'আমরা খেলা চালিয়ে যাই না কেন?'

নতুন খেলুড়ী শুধোয়। সে এ দানটা জিতল, দ্বিতীয়টা, তৃতীয়টা, চতুর্থটা...ওর হাঁদাবোকা স্বামী যা খুইয়েছিল, সে সব তো বটেই, আরো পেল এই জুয়াড়ী সুন্দরীকে, তার প্রাসাদ, দাসদাসী, সব।

এ সব ধনরত্ন বাক্সে বোঝাই করে নিজের ঘোড়ার পিঠে চাপাল ও। কয়েদখানায় গিয়ে সব বন্দীদের মুক্ত করল। অন্যদের সঙ্গে ওর স্বামীও এল ওকে কৃতজ্ঞতা জানাতে। কিন্তু ছদ্মবেশের কারণে ওকে চিনতে পারল না।

এ কিন্তু স্বামীকে খাতির দেখাল। বলল, ও তার সর্দার হতে রাজী আছে কি না। বেজায় খুশি সওদাগর পুত্র তখনি রাজী। মেয়েটি তাকে পরিস্কার জামাকাপড় দিল। আর ওর ছেঁড়াখোঁড়া জামাকাপড় একটা বাক্সে রেখে নিজের কাছে রাখল। তারপর সবাই রওনা হ'ল। জুয়াড়ী মেয়েটিও সঙ্গে চলল।

দেশের কাছাকাছি এসে বউ বলছে, 'আমার খানিক কাজ আছে। এ সব জিনিসপত্তর নিয়ে শহরে যাও। নিজের বাড়িতেই যত্ন করে রেখো। তোমার বাবাকেও চিনি, তোমাকেও বিশ্বাস করি। বিশ দিনের মধ্যে না ফিরলে ও সবই তোমার।'

ঘুরপথে ও গেল বাপের ঘরে। ওর সর্দার সব লোকজন, ধনরত্ন, সব নিয়ে গেল নিজের বাড়ি। ঘরে পৌঁছে মেয়েটি বাপকে সব বলল, নিজের সাফল্যের কথা। বারবার বলল, বাবা যেন এ সব কথা ফাঁস না করে। তারপর গেল শ্বশুরবাড়ি।

ওকে দেখেই স্বামী পায়ের জুতো খুলছে আর বলছে, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ? মনে আছে, কতবার পেটাতে হবে তোমায়?'

ওর বাপ-মা বলল, 'থামো দেখি! বাড়ি আসার আনন্দ নষ্ট করবে না কি অসভ্যতা করে?'

বউ বলল, 'বুঝলাম এতদিনে। এত কষ্ট পেয়ে খানিক বুদ্ধি হয়েছে ভেবেছিলাম। না, কিচ্ছু না। আগের মতো নিরেট বোকাই আছ। যাও, ওই ছোট বাক্সটা আনো। এই নোংরা জামাকাপড় কার? তাকিয়ে দেখ, ভাবো, কয়েদখানায় কেমন ছিলে! কেমন পেটাত তারা, কি কদর্য খাবার একমুঠো দিত! কি গালাগাল দিত! এখন কাঁপ ধরেছে, তাই না? ভালো! শোনো, আমি সেই ধনী বণিক পুত্র, যে তোমাকে খালাস করেছে। বাবাকে যে চিঠি লিখেছিলে, সেটা আমি পাই। তোমার বিপদের কথা জানলাম। বণিক পুত্রের ছদ্মবেশে গেলাম ওখানে। যে মেয়ে তোমাকে বোকা বানিয়েছিল, তার সঙ্গে জুয়া খেললাম। যা কিছু খুইয়েছিলে, সব উদ্ধার করলাম। এই মেয়েটা আর তার সম্পত্তিও জিতে নিলাম। শুধোও না, মেয়েটা আমাকে চিনতে পারছে কি না!'

মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

বণিকের ছেলের মুখে তো তালাচাবি। বণিকের বউ পুত্রবধূকে অনেক আশীর্বাদ করল।

বণিক নীরব ছিলেন। ছেলের নির্বোধিতায় হতাশ তিনি, রাগ চড়ছে।

বউকে বললেন, 'এখন মানবে তো, তোমার ছেলে একটা আকাট বে'কা? বউমা এ সব ধনরত্ন নিজের কাছে রাখুক। এই ছেলের অমন বউ! এত ভালো!'

রাক্ষসী রানী

কাশ্মীরী
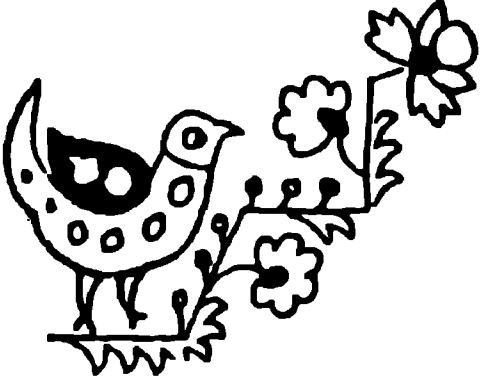
মানুষ এক রাজার গল্প বলে, তাঁর সাতটি রানী, তবু তিনি নিঃসন্তান। বড় রানীকে বিয়ে করলেন ছেলের আশায়, হ'ল না। মেজ রানীকে বিয়ে করলেন, হ'ল না। সেজ, ন', ফুল, মণি, ছোট, একে একে সাতটি রানী এলেন। রাজপুরী শূন্যই রইল।

মনের দুঃখে বনে গেছেন রাজা, দেখেন এক পরীর মতো রূপবতী কন্যে।

সে বলছে, 'কোথায় যাচ্ছ গো?'

—'আমি বড়ই দুঃখী মানুষ! সাত সাতটা বউ, একটা ছেলে নেই, নিজের বলতে কেউ নেই যে সম্পত্তি দিয়ে যাই। আশায় আশায় বনে এসেছি, কোনো সাধু মহাত্মার দর্শন যদি মেলে! তাঁর আশীর্বাদে বেটার বাপ হই!'

হাসতে হাসতে রূপসী বলছে, 'নিজন বিজন বনে তেমন লোক খুঁজতে এসেছ? আমি ছাড়া এখানে কেউ থাকে না। তবে হ্যাঁ, সাহায্য আমি করতে পারি। কি দেবে গো, যদি তোমার ইচ্ছে পূরণ করি?'

—'ছেলে দাও, অর্ধেক রাজত্ব দেব।'

—'তোমার সোনাদানা, রাজত্ব কিচ্ছু চাই না, তোমাকে চাই। আমাকে বিয়ে করো, ছেলে পাবে, সে সিংহাসনে বসবে।'

রাজী হয়ে রাজা রূপসীকে নিয়ে ফিরলেন। সাতদিন না যেতে বিয়ে হ'ল।

এর ক'দিন বাদেই সাত রানীর পেটে সন্তান এল। রাজার আনন্দ কিন্তু নিমেষে ফুরাল। যে রূপসীকে বিয়ে করেছেন, সে তো এক রাক্ষুসী। রাজাকে ভোলাবে, তাঁর প্রাসাদে নয়ছয় করবে সব, এ জন্যেই অমন রূপ ধরেছিল।

রোজ রাতে রাজপুরীতে সবাই যখন ঘুমে পাথর, রূপসী উঠে হাতিশাল-ঘোড়াশাল-

উটশাল ঘোরে। গরাসে গরাসে হাতি, উট, ঘোড়া, ভেড়া খায়। কাঁচা মাংস আর টাটকা রক্তে পেটটি ভরিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

রাজার হাতি-ঘোড়া কমে যাচ্ছে. রক্ষীরা তো আগে এ কথা বলতে পারেনি ভয়ে। কিন্তু যখন ক্রমেই বেশি বেশি পশু নিখোঁজ হতে থাকল, তারা রাজাকে জানাল।

রাজা অনেক সেপাই শাস্ত্রী মোতায়েন করলেন। পাহারাদারী পড়ল। কিন্তু এদিকে যে-কে-সেই! হাতিশাল-ঘোড়াশাল, ফাঁকা হতে থাকল।

হতবুদ্ধি রাজা রাতে ঘরে পায়চারি করছেন, রূপসী বললেন, 'চোর ধরে দিলে কি দেবে?'

—'সব দেব, স-ব।'

—'বেশ! এখন ঘুমোও। সকালে চোর ধরিয়ে দেব।'

রাজা গভীর ঘুমে নিথর। রূপসী গেল ভেড়াশালে। একটা ভেড়া মারল, এক কলসি রক্ত নিল। তারপর সাত রানীর ঘরে ঢুকে ওঁদের মুখে, কাপড়ে রক্ত লেপে দিল।

ভোর না হতে রূপসী রাজাকে ডেকে তুলেছে। বলছে, 'বললে বিশ্বাস যাবে না, কিন্তু তোমার সাত রানী হ'ল আসল অপরাধী। ওরা জ্যান্ত হাতি ঘোড়া খায় গো! মানুষ নয় তো! সব ক'টা রাক্ষুসী! সাবধান! তোমাকেই কি ছেড়ে দেবে? যাও না, যাও! স্বচক্ষে দেখ আমার কথা সত্যি কি না!'

রাজা গেলেন। রানীদের মুখে আর কাপড়ে রক্ত দেখে নিজেই ভয় পেলেন যত, ক্ষেপলেনও তত। তাঁর হুকুমে সাত রানীর চোখ উপড়ে শহরের বাইরে এক শুকনো কুয়োতে তাঁদের ফেলে দেয়া হ'ল। মরুক, না খেয়ে মরুক!

সাতদিন না যেতে এক রানীর ছেলে হ'ল। খিদেয় পাগল পাগল সাতরানী সে ছেলের মাংস খেলেন। এমনি করে ছয় রানীরই ছেলে জন্মাল, মায়েদের পেটেও গেল। ছোট রানী, মাংসের টুকরো জমিয়ে রাখতেন। তাঁর যখন ছেলে হ'ল, তিনি সেগুলো দিয়ে বললেন, এগুলো খাও। আমার ছেলেটার প্রাণটি রাখো।

এই একটা ছেলে বাঁচল।

সে ছেলে দিনে দিনে বাড়ে, যেমন জোয়ান, তেমন রূপবান ছেলে। ছয় বছরেরটি হ'ল, তো মায়েরা ভাবছে, বাইরের দুনিয়াটা দেখাই। কেমন করে তা হবে? কুয়ো যে পাতাল গভীর। শেষে এ-ওর কাঁধে দাঁড়াল, সে-তার কাঁধে। সবার ওপরে যিনি, তিনি ওকে কুয়োর পাড় টপকে ও পাশে দিলেন।

ছোট্ট মানুষটি দৌড়দৌড়ি করতে করতে প্রাসাদে ঢুকে পড়েছে। রান্নাঘরে ঢুকে খাবার চাইছে। পেল একরাশ এঁটো কাঁটা। ও খানিক খেল, খানিক মায়েদের জন্যে আনল।

এ রকমই চলল কিছুকাল। ও আরো বড় হল। আরো লম্বা। একদিন রাঁধুনী

বলল, আজ থাকো, রাজার জন্যে রাঁধো। রাঁধুনীর মা মরেছে, ও দাহ করতে যাবে। ছেলেটা বলল, যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। রাঁধুনী তো চলে গেছে। রাজা সেদিন খেয়ে বেজায় খুশি। সব কিছু পরিপাটি রান্না হয়েছে, তেল মশলা ঠিক পরিমাণে পড়েছে, পরিবেশনও চমৎকার।

সন্ধেবেলা রাঁধুনী ফিরেছে। রাজা তাকে রান্নার জন্যে প্রশংসা করছেন আর বলছেন, রোজ যেন রান্না ও রকমই হয়। রাঁধুনী মানুষটা সাচ্চা। সে স্বীকার করল ওর মা মারা গেছেন, গোটা দিনটা ও ছিলই না। একটা ছেলেকে ভাড়া করেছিল রাঁধার জন্যে।

এ কথা শুনে রাজা বেজায় চমকে গেলেন। রাঁধুনীকে বললেন, তড়িঘড়ি ছেলেটাকে রান্নাঘরে পাকাপাকি বহাল করা হোক। সেদিন থেকেই রাজার খাওয়াদাওয়ায় ভারি মন, কি সুন্দর পরিবেশন! রাজার খুশি যতই বাড়ে, ছেলেটাকেও তেমন নানা পারিতোষিক দেন। এখন ছেলে রাজার কাছে যা পায় তার সব, এত এত খাবারদাবার নিয়ে যায় মায়েদের জন্যে।

যখনি যায়, এক ফকিরকে দেখে। ফকির তাকে আশীর্বাদ করে, হাতটি পাতে, ছেলে যা পারে তা দেয়। দিনে দিন যায়, মাসে মাস, বছরে বছরে কয়েক বছরও গেল। সেই ছেলে এখন লম্বা চওড়া সা জোয়ান, রূপবান এক যুবক।

রাক্ষসী রানী হঠাৎই তাকে দেখল।

রানী তো জানতে চাইছে তার আদ্যোপান্ত পরিচয়। ছেলে তো জানে না যে রানী আসলে কি বস্তু। সে গড়গড়িয়ে সবই বলছে।

আর তখন থেকেই রানীর মৎলব, এ ছেলেকে মারতে হবে। অসুখের ভান করে রানী শয্যা নিয়েছে। হাকিমকে ডেকেছে। তাকে ঘুস খাইয়ে পাখিপড়া করে শেখাচ্ছে। হাকিমও সেইমতো রাজাকে বলছে, রানী তো মরমর, এখন বাঘিনীর দুধ না পেলে তিনি বাঁচবেন না।

রাজা আতিপিতি রানীর কাছে।—'অ আমার চাঁদবদনী, হাকিম বলছে, তোমার ভারি ব্যামো। তোমাকে নাকি বঘিনীর দুধ খেতে হবে? সে পাব কোথায়? কার এ কাজ করতে সাহসে কুলোবে?'

—'এ কাজ করার সাহস আছে, এমন একজনকে জানি গো! ওই যে ছেলেটা রান্নাঘরে কাজ করে, সে! সাহস রাখে, বিশ্বাসীও বটে। তুমি ওর জন্যে কত না করেছ। ওকে যা বলবে, তাই করবে। কৃতজ্ঞতা নেই একটা?'

রাজা বলতে না বলতে সে ছেলে বাঘিনীর দুধ দুয়ে আনতেও রাজী। তার মায়েরা কত না কাঁদল, মিনতি জানাল, তবু সে ছেলে বেরিয়ে পড়ল পরদিন। ফকির তো পথেই বসে থাকে। সব শুনেমেলে ফকির বলছে, 'যাস না। অমন সর্বনেশে কাজ করবি কেন?'

ছেলে তো রাজার মন পেতে চায়। আবার দুঃসাহসের নেশাও আছে। তখন ফকির বলছে, 'যাবি তো আমার কথার মান্যতা করিস, কাজ হবে। কোথায় যাবি, তাও বলে দিচ্ছি। বাঘিনীকে দেখলেই তার মাইয়ের বোঁটায় ছোট্ট একটা তীর মারবি। তীর লাগলেই বাঘিনী শুধোবে কেন মারলি। তুই বলবি, মেরে ফেলব বলে তো মারিনি। ওই যে ফুটো হ'ল, ছানাগুলো বেশি বেশি দুধ পাবে। বলবি, ছানাগুলো রোগা, হাড় জিরজিরে, দেখে তোর মনে দয়া হয়েছে। ওদের দেখলে মনে হয়, আহা! ওরা যদি আরো দুধ পেত!'

ফকিরের দোয়া নিয়ে ছেলে বনে যাচ্ছে বাঘিনীর খোঁজে। যেই দেখেছে বাঘিনী ছানাপোনা নিয়ে বসে আছে, সে তো তীর মেরেছে। বাঘিনী রাগে গর্জে বলছে, কেন, কেন, কেন? ফকিরের শিক্ষামতো ছেলে সবই বলছে। তারপর বলছে, রানী যায় যায়, বাঘিনীর দুধ না পেলে বাঁচবে না।

বাঘিনী বলছে, 'মরুক, রানী মরুক! জানিস না, সে এক রাক্ষসী! তোকে মারবে তোর রক্ত খাবে।'

ছেলে বলছে, 'আমার ভয় কি? রানী তো আমার শত্তুর নয়।'

—'বেশ! দুধ তোকে দেবো। তবে রানীকে সাবধান! দেখ! এই পাথরে আমার দুধ পড়ুক এক ফোঁটা, কি কাণ্ডটা হয়!'

বাঘিনীর দুধও পড়ল, পাথরটা চড়চড়িয়ে হাজার টুকরো হয়ে ফেটে গেল।

—'আমার দুধের শক্তিটা দেখলি? রানী যদি আমার সবটুকু দুধও চুষে খায়, ওর কিচ্ছু হবে না। রাক্ষসী যে! যা! স্বচক্ষে দেখ্‌গে যা!'

ছেলে ফিরে গিয়ে রাজাকে সে দুধ দিল, রাজা দিলেন রানীকে, রানী সবটুকু দুধ খেয়ে বললেন, রোগ সেরে গেছে।

রাজা ভারি খুশি। তখনি ছেলেকে উচ্চ পদে বসালেন। রানীর মাথা থেকে মৎলব যায় না। ক'দিন যেতে না যেতে আবার তাঁর ব্যামো হ'ল। তিনি রাজাকে বললেন, 'আবার ব্যামো হ'ল বটে, তবে চিন্তা কোর না। যে জঙ্গলে বাঘিনী, সে জঙ্গলেই আমার দাদু থাকেন। তাঁর কাছে আছে আশ্চর্য দাওয়াই। ছেলেটাকে পাঠাও, নির্ঘাত নিয়ে আসবে।'

আবার ছেলে বেরোল। আবার ফকিরের সঙ্গে দেখা। ফকির বলছে, 'যাস কোথায়?'

ছেলে তো সবই বলছে।

—'যাস না, যাস না। সে বেটা এক রাক্ষস, নির্ঘাৎ মারবে তোকে।'

ছেলে তো শোনে না।

—'যাবিই যাবি? যা, তবে মন দিয়ে শোন। রাক্ষসকে দেখলে 'দাদু' বলে ডাকবি। যখন তার পিঠ চুলকোতে বলবে, খর নখে আঁচড়ে দিবি।'

সব কথায় রাজী হয়ে ছেলে বনে ঢুকল। বড়ই ভীষণ জঙ্গল, আর তেমনি ঘন। অবশেষে দাদুর বাড়ি দেখতে পেয়ে সে চেঁচাচ্ছে, 'অ দাদু গো! আমি তোমার ছেলে গো! মায়ের ভারি ব্যামো, তোমার কাছেই নাকি দাওয়াই আছে? মা আমাকে আনতে পাঠাল।'

—'বেশ তো! দেবো দাওয়াই। আগে পিঠটা চুলকে দে তো! বড় চুলকোচ্ছে।'

এ তো মিছে কথা। পিঠ তার চুলকোচ্ছে না। সে শুধু পরখ করে দেখতে চায় ছেলেটা খাঁটি রাক্ষস কি না! ছেলে তো খর নখ বিঁধিয়ে রাক্ষসের পিঠ ফালাফালা করছে। রাক্ষস মনে মনে খুব খুশি। তখনি দাওয়াই এনে দিয়েছে ছেলেকে।

রাজা তো রানীকে দাওয়াই দিলেন। রানীর কলজে রাগে ফেটে যায়। রাজা কিন্তু আরোই খুশি। ছেলেকে এত এত উপঢৌকন দিলেন।

রানী ভেবে কূলকিনেরা পায় না। এ ছেলেকে নিয়ে কি করে। মেরে ফেলতেও চায়. রাজাকে জানাতে চায় না। বাঘিনীর থাবা, দাদুর গ্রাস, সব জয় করে ফিরে এল? পারল কি করে? এখন রানী করে কি? পাঠাই ওকে দিদিমার কাছে। 'সেখানে থেকে বেঁচে ফিরতে হচ্ছে না, মনে মনে বলছে।

রাজাকে বলছে, 'খুব দামী চিরুনি গো! দিদিমার বাড়ি ফেলে এসেছি। ছেলেটাকে পাঠাও না গো? আমি বরং চিঠি লিখে দেব।'

রাজা রাজী হলেন. ছেলেও রওনা হ'ল। ফকির তো বসেই ছিল। ছেলে কোথায় যাচ্ছে শুনে নিয়ে বলছে, 'রানীর চিঠিটা পড়েই দেখি।'

চিঠি পড়ে বলছে, 'যাচ্ছ তো মরতে। চিঠিতে তোমাকে খুন করবার হুকুম আছে। শোনই না।' চিঠি নিয়ে যাচ্ছে আমার শত্তুর। ও বেঁচে থাকতে আমার নিশ্চিন্দি নেই। ও পৌঁছলেই ওকে মেরে ফেলো।'

চিঠি শুনে ছেলে ভয়ে শিউরে উঠল। কিন্তু প্রাণ যায় যাক। রাজার কথা তো মানতেই হবে। ফকির তখন রানীর চিঠি কুচিকুচি করে ছিঁড়ল। নতুন চিঠি লিখল। তাতে লিখছে, 'এ আমার ছেলে। আমার বড় সাধ, ও মায়ের দিদিমাকে দেখুক। খুব যত্নআত্তি কোর, আনন্দে রেখো।' এ চিঠি দিয়ে বলছে, 'ওকে বুড়ো দিদিমা বলবি, মোটে ভয় খাবি না।'

হেঁটে হেঁটে, হেঁটে হেঁটে, ছেলে তো বুড়ী রাক্ষসীর ঘরে পৌঁছেছে। বুড়ো 'দিদিমা গো' বলে ডেকে চিঠিও দিয়েছে. বুড়ী চিঠি পড়ে আহ্লাদে আটখানা। কত না আদর, কত না চুমো খাচ্ছে। শুধোচ্ছে, কেমন আছে তার আদরের নাতনি আর রাজা নাতজামাই। আদরে যত্নে কত না দামী জিনিস দিচ্ছে নাতিকে। এক টুকরো সাবান, মাটিতে ছুঁড়লে সেটাই হবে হিমালয়ের মতো পাহাড়। এক কৌটো সুঁচ, মাটিতে ছড়িয়ে দিলে গজিয়ে উঠবে কাঁটা বন। এক শিশি জল, মাটিতে ফেললে নিমেষে দেখা যাবে এক অতলান্ত ঝিল।

কত জাদু-জিনিস দেখাচ্ছে, তার মানে বোঝাচ্ছে। 'এই সাতটা মোরগের মধ্যে আছে তোমার সাত মামার প্রাণ। তারা সব এখানে ওখানে। মোরগগুলো বেঁচে আছে তো ওরাও বেঁচে থাকবে। এই চরকার মধ্যে আমার প্রাণ। এটি ভাঙল তো আমিও পটল তুললমা। পায়রাটার মধ্যে তোর দাদুর জান, ময়নাটার মধ্যে তোর মায়ের প্রাণ। এই ওষুধটা দেখ্, এক ফোঁটা দিলে অন্ধের চোখ ভালো হয়ে যায়।'

ছেলে বুড়ো দিদিমাকে কত না সোহাগ দেখাচ্ছে, কত আবদার না করছে। সকালে রাক্ষসী যখন নদীতে নাইতে গেছে, ছেলে তো সাতটা মোরগ আর সেই পায়রা, সবগুলোকে আগে কেটেছে। তারপর চরকাটা আছড়ে ভেঙেছে। রাক্ষস রাক্ষসীর বংশ ধ্বংস করে ছেলে ময়না পুরেছে খাঁচায়, অন্ধ চোখে দৃষ্টি আনার অবাক দাওয়াই নিয়েছে, ফেরত পথে হাঁটতে লেগেছে।

পথে কুয়োর কাছে দাঁড়িয়ে আগে মাদের চোখে দিল ওষুধ। দৃষ্টি ফিরে পেতে তারা উঠে এল একে একে, ছেলের সঙ্গে চলল প্রাসাদে। রানীদের একটা ঘরে বসিয়ে রেখে সে গেল রাজার কাছে।

বলছে, 'হে মহারাজ! অনেক গোপন কথা বলব আমি, শুনুন দয়া করে।

আপনার রানী এক রাক্ষসী। তিনি জানেন যে আমি আপনার ছয় রানীর এক রানীর ছেলে। সে জন্যেই আমাকে মারার কৌশল করে চলেছেন। মনে আছে? সাত রানীকে কুয়োতে ফেলে দেন? আমি ছোট রানীর ছেলে। রাক্ষসী রানীর ভয়, আপনি সে কথা জেনে যাবেন, আমাকে বসাবেন সিংহাসনে, উনি চান, আমি মরে যাই।

'আমি ওঁর বাবা, মা, সাত ভাইকে মেরে তবে এসেছি। এখন মারব ওঁকে। ওঁর প্রাণ তো এই ময়না পাখিতে।'

এ কথা বলেই ছেলে ময়না পাখির ঘাড় মটকে দিয়েছে আর রাক্ষসী রানীও ঘাড় ভেঙে পড়লেন, আর মরলেন। মরে চিতিয়ে পড়ে রইল এক বিকট রাক্ষসী।

'এখন আসুন আমার সঙ্গে।' ছেলে বাপের হাত ধরে নিয়ে গেল রানীদের কাছে। বলল, 'এঁরাই তো আপনার সত্যিকারের রানী! সাত সাতটা ছেলে হয়েছিল আপনার। ওই যমপুরীর কুয়োর মধ্যে ছয়জনকেই খিদের জ্বালায় খেয়ে ফেলেন এঁরা। একা আমি বেঁচে গেছি।'

—'ও হো হো! এ কি করেছি আমি! ঠকিয়েছে আমাকে, অন্ধ হয়ে ছিলাম যেন! রানীরা কোন দোষে দোষী নন, তাঁদেরই জল্লাদের মতো শাস্তি দিলাম?' রাজা কত না বিলাপ করলেন, কত না কঁদলেন!

রাজা রাজত্ব দিলেন ছেলেকে, তাঁর একমাত্র চিহ্নকে। যুবক রাজা ভারি সুশাসক

হলেন। সেই জাদু সাবান; সূঁচ আর জলের সাহায্যে আশপাশের নানা রাজ্য জিতে নিলেন। বুড়ো রাজা সাত রানীকে নিয়ে বাকি জীবনটা খুব সুখে শান্তিতে কাটালেন।

বাঘের হাতে মৃত্যু

সাঁওতালী
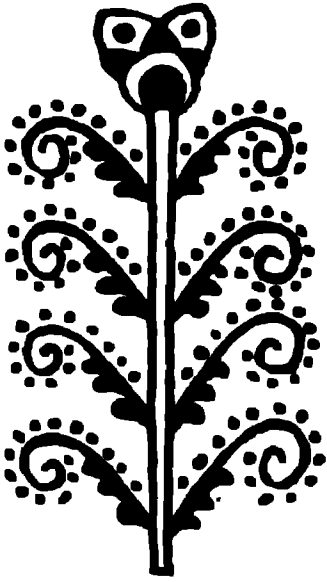
বনের বাইরে একটি ছোট মাটির ঘরে থাকে এক ভাই, এক বোন। বাপ-মা কবেই মরে গেছে। বোনটির জন্যে একটি ভালো বর জোগাড় করা তো দাদার কাজ।

একদিন হয়েছে কি, অনেক দূরের গ্রাম থেকে এক যুবক শিকার করতে এসেছে এদের জঙ্গলে। পথ হারিয়ে ঘুরে ঘুরে মাঝরাতে সে হাজির এদের কুটিরে। সেখানেই আশ্রয় পেল, আর মেয়েটি খু-ব ভালবেসে ফেলল একে। দুজনের বিয়ে হয়ে গেল। বোন তার স্বামীর সঙ্গে অনে-ক দূরের এক গ্রামে ঘর করতে গেল।

মাসের পর মাস যায়, দাদার বড় ইচ্ছে বোনকে দেখে আসে। পথের জন্যে নিল ফল, মূল, কন্দ। পথে যে গ্রাম পড়ে, বোনের গ্রামের পথ জেনে নেয়। কত জঙ্গল আর পাহাড় আর উপত্যকাই না পেরোল ও। তা সাঁঝ নেমে এল এক জঙ্গলে।

গায়ে জোর আছে, সঙ্গে আছে তীর ধনুক আর কুড়োল। তবু দাদার বড় বাঘের আর অন্য বুনো জানোয়ারের ভয়। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ও বসেছে এক মহুয়া গাছের নিচে, তা গাছ বলছে দাদা গাছ বেয়ে উঠুক, ডালপালার মধ্যে ঘুমোক।

গাছে উঠে দাদা একটা মোটা ডালের খাঁজে বসেছে। গাছের তলার মাটিতে বাঘ, ভালুক, সাপ চলার চিহ্ন।

এমন সময়ে এক বাঘ এসে মহুয়া গাছকে ডাকছে।—'চলো হে, গ্রামে যাই। সেখানে একটা ছেলে জন্মাবে। দেখা যাক ছেলেটার মৃত্যু হবে কিসে।'

গাছ বলছে, সে রাতে যাওয়া যাবে না। বাড়িতে এক অতিথি এসেছেন তো! তবে বাঘ যেন খবরটা নেয়, আর সকালে গাছকে বলে যায় ছেলেটার কথা।

গাছে বসে দাদার মন আনচান। গ্রামের নামটা তো তার বোনেরই গ্রামের নাম। বোনের কি ছেলে হয়েছে? সারারাত জেগে রইল সে, এক ফোঁটা ঘুম এল না। সকালে বাঘ আর অন্য জানোয়াররা ঘুরে এসে গাছকে বলছে, সদ্য যে ছেলে জন্মাল,

সে মরবে তার বিয়ের দিনে, বাঘের হাতে। ছেলেটার বাবা গ্রামের মোড়ল বটে।

দাদা তো বুঝছে কার কথা হ'ল। বোনের বর তো গ্রামের মোড়ল। বড় উদ্বেগে সে ধেয়ে চলল। গ্রামে পৌঁছেই জানল, রাতে বোনের একটা ছেলে হয়েছে। হায়, ছেলেটা কখন মরবে, কি ভাবে মরবে, তা বনের প্রাণীরা জানে। ছেলের বাপ-মা জানে না।

এই তো প্রথম বোনের বাড়ি এল দাদা। খাতির যত্ন হ'ল খুব। বিদায় নেবার সময় হলে দাদা বারবার বলল, ছেলের বিয়ের সময়ে তাকে জানাতে যেন ভুল না হয়।

অনেক বছর কেটে গেল। গাছের পাতা আর বনের ফুলও কতবার ঝরে পড়ল মাটিতে। সেই ছেলে এখন এক তাগড়া তাজা সুশ্রী ছেলে। বাপ-মা সর্বদিকে যোগ্য এক মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করল। মামাকেও খবর দিল।

মামা তড়িঘড়ি দৌড়ল। এত যে ভোজ আর নাচগান, তাতে সে নেই। সে বরের গায়ে সেঁটে আছে। তীর ধনুক, কুড়োল, সব রেখেছে, দরকার পড়লেই মারবে। যে ঘরে ভাগনে ঘুমোচ্ছে, সারারাত সে ঘরের বাইরে পাহারা জাগছে মামা।

মামার নিষেধ না শুনে সকালে ভাগনে দৌড়েছে মাঠে। বাঘ তো অপেক্ষাতেই ছিল, ঝোপ থেকে ঝাঁপ মেরেছে ভাগনের ওপর। এত বছর ধরে মামা তো এই মুহূর্তটির অপেক্ষাতেই ছিল।

সেও ঝাঁপ মেরেছে বিদ্যুৎ গতিতে, কুড়োল কুপিয়ে বাঘটাকে মেরেই ফেলেছে।

এখন সে ভাগনে আর অন্যদের বলছে সেই রাতে সে কি ভবিষ্যৎ বাণী শুনেছিল। বোন আনন্দে দরদর ধারে কাঁদল। দাদাকে কত না কৃতজ্ঞতা জানাল। ছেলের জীবন তো দাদাই বাঁচাল।

ভাগনে মরা বাঘটা দেখে বলছে, 'ইনিই আমাকে খেতেন, অ্যাঁ?'

বাঘের মাথায় সে মেরেছে লাথি। ওর পা পড়ল বাঘের হাঁ মুখে, দাঁতের ধারে পা গেল কেটে। অমনি গলগল করে বেরোতে থাকল রক্ত।

সে আর বন্ধ হ'ল না। রক্তপাতের ফলেই ছেলেটা মারা গেল।

ভাগ্যের ওপর টেক্কা

তামিল

এক ব্রাহ্মণ তরুণ ছিল জ্ঞান পিপাসু। সে জানতে পারল, যে এক মহাজ্ঞানী মুনি থাকেন জঙ্গলের গহীনে। শহর থেকে অনে-ক দূরে।

তাই জঙ্গলের কাঁটা ঝোপ, জীবজন্তুর ভয়, সব কিছুর মধ্য দিয়ে সে অনেক দিন ধরে অনেক পথ হাঁটল। তারপর পৌঁছল নদীতীরে এক একলা কুটিরে। মুনি সেখানেই থাকেন।

বৃদ্ধ মুনি এই তরুণকে স্বাগত জানালেন। তাকে নিজের শিষ্য করে নিলেন, নিজ কুটিরে তাকে থাকতেও দিলেন। তরুণটি মুনি ও মুনি পত্নীকে নানা সেবা করে, বাড়ির কাজও করে দেয় আর গুরুর কাছে যথাসম্ভব শেখে।

বৃদ্ধ মুনি তখনো বেশ বলিষ্ঠ। এই বুড়ো বয়সে তাঁর স্ত্রীর প্রথম সন্তান সম্ভাবনা হ'ল। তাঁর পেটে আট মাসের গর্ভ, মুনির সাধ জাগল, যে পুণ্য নদীর তীরে থাকেন, তার উৎস দেখতে যাবেন। স্ত্রী কেমন করে যান? তাঁর শিষ্য, আর আরেক মুনি পত্নীর হাতে স্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

যথা সময়ে মুনি পত্নীর প্রসব বেদনা শুরু হল। প্রতিবেশিনী মুনি পত্নী কুটিরের ভেতরে রইলেন, শিষ্য রইল বাইরে। মনে মনে সে বলেই চলেছে, যেন সুভালাভালি একটি সুস্থসবল শিশু জন্মায়।

এখন হিন্দুদের বিশ্বাস, প্রতি শিশুর জন্মলগ্নে সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা হাজির থাকেন। শিশুর কপালে লিখে দেন ভাগ্যলিপি। মায়ের পেট থেকে সন্তান বেরিয়ে আসে যখন, সেই মুহূর্তে তাঁর থাকার কথা। মানুষ তাঁকে দেখতে পায় না। তবে শিষ্যের চোখ তো সাধারণ চোখ নয়। গুরু তাকে অনেক বিদ্যা, অনেক ক্ষমতা দিয়েছেন।

যে ঘরে সন্তান জন্মেছে, সে ঘরে একটা লোককে ঢুকতে দেখে সে ঘাবড়ে গেল।

—'এই! আর এক পা এগোবে না।'—শিষ্য ক্ষেপেই গেছে। দেবতা কেঁপেঝেঁপে অস্থির। চিরকাল এক কাজই করে বেড়ান, কোনদিন কেউ তাঁকে দেখতে পায় না, থামতে বলে না।

পরের কথাবার্তা শুনে তিনি অবাক যত, ঘাবড়েও গেলেন তত।

—'ও হে বুড়ো বামুন! ভেবেছটা কি? আমার গুরুদেবের কুটিরে ঢুকছ কোন অনুমতি না নিয়ে। তাও আবার আমার চোখের সামনে? গুরুপত্নী প্রসব করছেন। ওখানে ঢুকতে পাবে না।'

ব্রহ্মা তড়িঘড়ি বোঝাচ্ছেন তিনি কে, কি কাজে যাচ্ছেন। সন্তান তো বেরিয়ে

আসছে, হাতে সময় কোথায়? শিষ্য যখন শুনল ইনি কে, সে যেমনটি শ্রদ্ধা জানাবার নিয়ম বড়দের আর দেবতাদের, তেমন নিয়মে ধুতি তুলে কোমরে বেঁধে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। ক্ষমাও চাইল।

ব্রহ্মার বেজায় তাড়া। তাঁকে যেতেই হবে। শিষ্য তো ছাড়বে না। শিশুর কপালে কি লিখবেন, তাকে বলতে হবে।

ব্রহ্মা বললেন, 'বাছা! আমিও জানি না আমার কলমে কি লেখা বেরোবে। শিশুটি বেরিয়ে আসে, আমি কলমের নিব তার কপালে ছোঁয়াই, কলম বিচার করে শিশুর পূর্বজন্মের কর্মফল, ভাগ্যলিপি লেখে। আর দেরি করিও না। আমাকে এখনি যেতে হবে।'

—'তবে বেরোবার কালে বলে যেতেই হবে, কি লিখলেন আমার গুরুদেবের সন্তানের কপালে।'

—'তা বলব।' ব্রহ্মা নিমেষে ঢুকলেন, নিমেষে বেরোলেন, শিষ্য শিশুর ভাগ্যলিপি জানতে চাইল।

—'বাছা! বলছি ভাগ্যলিপি। তবে দ্বিতীয় জনকে বলেছ কি তোমার মাথা ফুটিফাটা হয়ে যাবে। ছেলে হয়েছে ওঁর। ছেলের জীবন বড় দুঃখকষ্টের হবে। একটি মোষ আর এক বস্তা চাল ও সর্বসাকুল্যে পাবে। তাই নিয়েই বাঁচতে হবে। কি করা যাবে বলো!'

—'কি? হে পিতামহ ব্রহ্মা! এ যে এক মহান মুনির ছেলে। তার কপালে এই?'

—'আমার কি করার আছে বাপু? পূর্বজন্মের কর্মফল এমনই। গত জন্মে যেমনটি ফসল বুনেছ, এ জন্মে তাই কাটতে হবে। তবে মনে রেখো, এ কথা ফাঁস করলেই তোমার মাথা ফুটিফাটা হবে।'

বলেই ব্রহ্মা অদৃশ্য হলেন। গুরুর ছেলের কপালে কি আছে, তা ভেবে শিষ্য অস্থির। এ কথা বলাও যাবে না কাউকে।

গুরু তীর্থশেষে ফিরলেন। বউও ছেলেকে ভালো দেখে খুবই খুশি। বৃদ্ধ মুনির সান্নিধ্যে থেকে শিষ্যটিও তার দুঃখ ভুলে গেল।

তিন বছর চলল গভীর জ্ঞানচর্চা। আবার বৃদ্ধ মুনি ঠিক করলেন, এবার তিনি তুঙ্গভদ্রা নদীর পুণ্য উৎসে যাবেন। আবারও তাঁর পত্নী গর্ভবতী। শিষ্য ও আরেক মুনিপত্নী রইলেন দায়িত্বে। প্রসব মুহূর্তে ব্রহ্মা আবার হাজির, শিষ্যও তাঁকে চেপে ধরলেন। আবারও ব্রহ্মা কথা দিলেন, দ্বিতীয় সন্তানের ভাগ্যলিপি জানিয়ে যাবেন।

বেরোবার সময়ে ব্রহ্মা শিষ্যকে বললেন, 'মেয়ে হয়েছে। আমার লেখনী লিখেছে, একে বেশ্যাবৃত্তি করে রোজগার করতে হবে প্রতি রাতে। গতবার যা বলেছি, মনে

রেখো। দ্বিতীয় জনকে বলেছ তো মাথা ফুটিফাটা হবে, ভুলে যেও না।'

ব্রহ্মা গেলেন। শিষ্য আঘাতে বিবশ। এক পবিত্রতম মানুষের মেয়ে বেশ্যা হয়ে জীবন কাটাবে! এমন ঘা খেল ও, মুখে আর কথা সরে না। অনেকদিন ধরে এ নিয়ে ভাবল। শেষে ভাবল, ভাগ্যই মানব জীবনে সব কিছু।

বৃদ্ধ মুনি তীর্থ সেরে ফিরলেন। শিষ্য আরো দু' বছর কাটাল। ছেলের বয়স পাঁচ, মেয়ের বয়স দুই, শিষ্য ঠিক করল সে হিমালয়ে যাবে তীর্থে তীর্থে। এই ছেলেমেয়েরা বড় হবে, ভয়ংকর দুর্গতিতে পড়বে, এ চিন্তাতে বেদনা যত, ক্রোধও তত। মনকে বোঝাল। ভাগ্যকে লংঘন করবে কে?

গুরুর অনুমতি নিয়ে শিষ্য সে কুটীর, গুরুর পরিবার, সব ছেড়ে চলে গেল হিমালয়ে। অনেক নগরী ঘুরল, বহু বিদ্বান মানুষকে জানল, অনেক মুনির কাছে জ্ঞানলাভ করল। বিশ বছর ধরে ঘুরল ও। দেখল দুনিয়া, মানুষকে জানতে শিখল, ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝতে চেষ্টা করল। নদীতীরে যে কুটিরে সে অধ্যয়ন শুরু করেছিল গুরুর সেই আবাসে ফেরার মন হ'ল তার।

ফিরে দেখে মুনি নেই। মুনিপত্নী নেই। এ সংবাদে বুকটা বেদনায় ভার, সে গুরুর ছেলেমেয়ের খোঁজে গেল কাছের শহরে। চলছে, চলছে, দেখে এক কুলি একটা মোষ নিয়ে চলছে। সে তো চিনেছে, এই গরিব লোকটাই গুরুর ছেলে। ব্রহ্মার লোহার লেখনী ওর কপালে যা লিখেছিল, তাই ঘটেছে। শিষ্যের বুক আরোই গুরুভার বেদানায়। তার মহান গুরুর ছেলে আজ এক গরিব হতভাগ্য, একটা মোষ তার সম্বল!

লোকটির পিছন পিছন ও গুরু পুত্রের কুটিরে গেল। সেখানে আছে তার বউ। দুটো আনাহার শীর্ণ ছেলেমেয়ে। ঘরে আছে শুধু এক বস্তা চাল। রোজ গভীর বিপন্নতায় ওরা চারটি চাল বের করে, তুষ উড়িয়ে সে চাল রাঁধে আর খায়। বস্তা খালি হয়ে যায়। কুলিগিরির রোজগারে গুরুপুত্র আরেক বস্তা চাল কেনে। ব্রহ্মা যা লিখেছেন, তাই ঘটছে।

শিষ্য গুরুপুত্রের নাম ধরে ডাকছে আর বলছে, 'আমাকে চিনতে পার?'

একেবারে অচেনা লোক নাম ধরে ডাকে? গুরুপুত্র তো অবাক। শিষ্য নিজের পরিচয় দিল, অনুনয় করে বলল, 'আমার কথামতো কাজ করো।'

শিষ্য এখন প্রৌঢ়, চেহারাও সাধুসন্নেসীর মতো। গুরুপুত্রের সম্ভ্রম হ'ল।

শিষ্য বলল, 'বাছা! যেমনটি বলি, তেমনটি করো। ভোরে উঠে বাজারে যাও। মোষটা, আর চালের বস্তা বেচে দাও, যা পাও তাতেই হবে। একবারও দোনামোনা কোর না। তোমাদের চারজনের মতো এক ভোজের ব্যবস্থা করো। স-ব খেয়ে ফেলো সন্ধ্যের মধ্যে। আগামীকালের জন্যে এক কণাও রেখ না। বাকি টাকায় কাঙালী ভোজন করাও, শহরের সেরা সেরা বামুনদের পেন্নামী দাও। দেখবে,

আখেরে লাভ হবে। আমি তোমার বাবার শিষ্য। তোমার ভালোর জন্যে বলছি, বিশ্বাস করো।'

গুরুপুত্র বিশ্বাস করে কোন ভরসায়?—'সব চাল বেচে দিলে চারটে প্রাণী খাবে কি? তোমরা, বামুনরা, সর্বদা গরিবদের বলো, সব দাও বামুনদের। তুমি তো বলবেই, তুমিও যে পাবে।'

কথাবার্তা ওর বউও শুনেছে। সে বলছে, 'এঁকে দেখেই মনে হয় জ্ঞানী, ওঁর যিনি গুরু, তোমার সেই বাবারই মতো। উনি হয়তো কিছু জানেন, যা আমরা জানি না। একদিন ওঁর কথা শোনাই যাক, দেখা যাক কি হয়।'

বউয়ের কথা শুনে গুরুপুত্রের মন থেকে সংশয় চলে গেল। পরদিন ও চালের বস্তা আর মোষ বেচে এল। যে টাকা পেল তাতে নিজেরা আর পঞ্চাশ বামুন এ বেলা-ও বেলা ভোজ খেল। জীবনে প্রথম ও কোনো বাইরের মানুষকে খাওয়াচ্ছে।

এই অসম্ভব, স্বপ্নের মতো দিনের শেষে ঘুমোতে গিয়ে ঘুম তো হয় না। মাঝরাতে উঠে দেখে ওর ঘরের সামনে মাটিতে শুয়ে আছেন শিষ্য মশাই। ও বলছে, 'মশাই! যা বললেন, সে তো করলাম। শীঘ্রই ভোর হবে। বউ ছেলেমেয়ে উঠলে বলব কি? কি খেতে দেব? কিছু নেই ঘরে, একটা পয়সা, এক মুঠো চাল, মোষও নেই যে দুধ দেবে।'

শিষ্য ওকে দেখাল, একটা মোষ আর এক বস্তা চাল কেনার পয়সা ওর আছে। বলল, গিয়ে শুতে, ভোর অবধি ঘুমোতে, দেখা যাবে তারপর।

সারারাত দুঃস্বপ্ন দেখল লোকটা, ভোরবেলা উঠে পড়ল। কুয়োতে মুখ ধুতে গিয়ে ও বারবার ওর যেমনতেমন গোহালটি দেখছে। রোজ সকালে প্রথম কাজ মোষকে খড় খাওয়ানো। হঠাৎ মনে হ'ল, মোষও নেই, খড়ও খাওয়াতে হবে না। কিন্তু কি তাজ্জব কাণ্ড! একটা মোষ তো দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে।

সে ভাবল, 'ঝ্যাটা মারো গরীবীকে। মোষ নেই, স্বপ্নে মোষ দেখাচ্ছে?'

তখনো আঁধার। ঘরে গিয়ে একটা পিদিম জ্বেলে এনে ও ভালো করে দেখছে। সত্যিই একটা মোষ! পাশে এক বস্তা চাল! আনন্দে বুক নাচছে, ও গিয়েছে ওর বাবার শিষ্যের কাছে।

খবর পেয়ে বিরক্ত হয়ে শিষ্য বলছে, 'বাছা! অত ভাবছ কেন? এত আনন্দের আছে কি? ঠিক কালকের মত মোষ আর চাল বেচে এসো। পরিবারকে আর বামুনদের ফাটিয়ে খাওয়াও।'

গুরুপুত্রের মনে আর 'কিন্তু নেই। সে তখনি মোষ আর চাল বেচল, ভোজের সামগ্রী আনল, নিজেরা খেল, বামুনভোজন করাল, কিছু সঞ্চয় রাখল না।

এখন থেকে নিত্যি সকালে গোহালে মোষ বাঁধা থাকে, পাশে চালের বস্তা। এ

ভাবে একমাস গেল। শিষ্য বুঝল, যাক! গুরুপুত্রের জীবনে এখন সুসময় এসেছে, সুমসয় থাকবেও।

একদিন বলল, 'যখন জানলাম আমার মহান গুরুর ছেলে দুর্দশায় পড়ে আছে, বুঝলাম কিছু একটা করতে হয়। যা পারলাম, করলাম। তুমি আরামেই আছ, থাকবেও। যা করছ তাই করো। এক কণাও বাঁচাতে যেও না। সে কাজ করলে সুখের দিন ফুরাবে। এ টাকা জমাতে চাইলে সৌভাগ্য ছেড়ে যাবে তোমাকে।'

গুরুপুত্র তো সেটা নিজেই বুঝছে। শিষ্যের কথা মেনে চলতে সে খুব রাজী। অক্ষরে অক্ষরে মানবে। এখন শিষ্য বলল, 'আরেকটা কাজ বাকি আছে আমার। বলো, তোমার বোন কোথায়। বাইশ বছর আগে তাকে শেষ দেখি। তখন সে দু' বছরেরটি, এখন থাকে কোথায়?'

কান্নায় গুরুপুত্রের গলা বন্ধ হয়ে গেল।—'ওর কথা বলবেন না। আমাদের দুনিয়া থেকে ও নির্বাসিত। এমন সুখের দিনে ওর কথা ভাবতেও চাই না।'

শিষ্যের তো মনে আছে, মেয়েটির কপালে ব্রহ্মা কি লিখেছিলেন। সে বলছে, 'ছেড়ে দাও সে কথা। শুধু বলো, সে কোথায়!'

—'পাশের গ্রামে। গ্রাম বেশ্যা ও।' বড় কষ্টে কথাগুলো বলল গুরুপুত্র।

গুরুপুত্র, তার বউ আর ছেলেমেয়েদের বারবার আশীর্বাদ করে বিদায় নিল।

গুরুকন্যাকে খুঁজে পেতে হবে। তাকে সাহায্যও করতে হবে। সন্ধ্যা হতেই সে পাশের গ্রামে পৌঁছল। গুরুকন্যার দোরে টোকা দিল। তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে গেল। টোকা পড়লে দোর তো খুলতেই হয়। দোরে এক সন্ন্যেসী দেখে গুরুকন্যা অবাক!

—'চেনো আমাকে? শিষ্য শুধাল। গুরুকন্যা তো চেনে না। শিষ্য নিজের পরিচয় দিল। তারই বাবার শিষ্য। গুরুকন্যা কেঁদে ফেলল। অত বড় এক মুনির মেয়ে বেশ্যাবৃত্তি করছে, এ লজ্জায় কাঁদতে কাঁদতে শিষ্যের পায়ে পড়ল। বলল, দারিদ্রই তাকে এ পথে নামিয়েছে, সে বড় হতভাগিনী।

সান্ত্বনা দিয়ে শিষ্য বলল, 'বাছা! দুঃখের জ্বালায় এ পথে নেমেছ দেখে বুক পুড়ে যাচ্ছে আমার। তবে তুমি কিছু করতে পারবেই। আমার কথা মেনে চললে তোমার জীবনই পালটে যাবে। রাতে দোর বন্ধ রাখো। বোল, যে তোমাকে স্ফটিক হেন জলের মুক্তো এক ঝাঁপি দেবে, শুধু তাকেই দোর খুলে দেবে। আজ রাতে এই করো, সকালে কথা বলব।'

নিজের জীবনে ঘেন্না এসে গেছে মেয়েটার। শিষ্যের কথা অক্ষরে অক্ষরে মানতে সে খুব রাজী। দোর বন্ধ করে বসে রইল ও। যেই টোকা মারে, তাকেই বলে, দাম বেড়ে গেছে ওর। এক ঝাঁপি মুক্তো আনবে যে, এ ঘরে ঢুকবে সে! যারা এসেছিল, তারা ভাবল, মেয়েটা পাগল হয়ে গেছে. এদিকে রাত শেষ হয় হয়, মেয়েটি চিন্তায় পাগল। এ গ্রামে কার এমন ট্যাকের জোর আছে যে অত মুক্তো আনবে?

কিন্তু ব্রহ্মাকে তাঁর বিধিলিপির নির্দেশ পূর্ণ করতেই হবে। মর্ত্যের মানুষ এল না তো তিনিই সাজলেন তরুণ। অনেক মুক্তোও নিলেন সঙ্গে, মেয়েটির ঘরে থাকলেনও রাতে। এখন তার প্রণয়ী এক দেবতা।

চলে গেলেন ভোরে। গুরুকন্যা শিষ্যকে বলছে, কাল রাতে এক আসামান্য পুরুষ এসেছিলেন মুক্তো নিয়ে।

শিষ্য বুঝেছে তার কথায় কাজ হয়েছে। সে বলছে, 'আজ থেকে মেয়েদের মধ্যে তুমি পরিবত্রতমা। দুনিয়াতে কম মানুষই এক ঝাঁপি মুক্তো নিয়ে আসতে পারে। তাই কাল যে মুক্তো এনেছে, সে রোজই নিয়ে আসবে। সে তোমার একমাত্র প্রণয়ী। তোমার স্বামী! আর কেউ তোমাকে স্পর্শ করবে না। যেমন বললাম, তেমনি কোর। রোজ উনি যত মুক্তো আনবেন, সকালে সব বেচে দেবে, গরিবদের খাওয়াবে। এক দানাও জমিয়ে রেখো না। সব দিয়ে দাও, বিলিয়ে দাও। যেদিন এর অন্যথা করবে, স্বামীকে হারাবে, আবার ফিরতে হবে পুরনো জীবনে। যা বললাম, তা করবে তো?'

গুরুকন্যা সানন্দে সম্মত। শিষ্য তখন গুরুকন্যার ঘরের কাছে এক গাছের নিচে আশ্রয় নিল। দেখতে হবে তার পরিকল্পনা মতো কাজ হচ্ছে কি না। দেখল তা হচ্ছে।

গুরুর ছেলে ও মেয়ের জীবনে সুখশান্তির ব্যবস্থা করে শিষ্য গুরুকন্যার কাছে বিদায় নিয়ে তীর্থযাত্রায় চলল।

যাবার দিনে ঘুম ভাঙল তাড়াতাড়ি, আকাশে তখনো চাঁদ। মোরগ ডেকেছিল, সে ভেবেছিল ভোর হয়েছে।

উঠে ও চলতে শুরু করল। খানিকদূর যেতেই দেখে এক রূপবান যুবক আসছেন। তাঁর হাতে মোষের দড়ি, মাথায় চালের বস্তা, কাঁধে এক পোঁটলা মুক্তো।

—'কে আপনি মহাশয়? জঙ্গলে এ সব নিয়ে হাঁটছেন?'

যুবকটি বস্তাটা মাটিতে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'দেখ! রোজ রাতে ওই কুলির ঘরে মাথায় এক বস্তা চাল বইতে বইতে আমার মাথায় টাক পড়ে গেছে। এই মোষ টানতে টানতে ওর গোহালে যাব। তারপর সেজেগুজে মুক্তো নিয়ে যাব ওর বোনের বাড়ি। আমার কলমই ওদের ললাটলিখন লিখেছিল। আর তুমি এক হতভাগা! তোমার ধূর্তামির জন্যে ওদের জন্মকালে যা যা দেবার কথা ছিল, সব পৌঁছতে হচ্ছে। কবে আমাকে রেহাই দেবে, কবে?'

ব্রহ্মা কাঁদতে থাকলেন ভেউভেউ করে, তিনি ব্রহ্মাই তো বটেন।

শিষ্য বলল, 'যতদিন না ওরা সাধারণ একটা ভালো জীবন পায়, সুখে থাকে, ততদিন! লিখে দিন সেটা।'

ব্রহ্মা তাই করলেন অগত্যা তারপর এ দু'জনের বোঝা ঘাড় থেকে নামালেন। এমনি করেই ব্রহ্মা আর ভাগ্যের ওপর টেক্কা মারা হয়েছিল।

এক রাজা, চার কন্যা

পাঞ্জাবী

এক রাজা দিনে বসেন সিংহাসনে, রাজদরবারে, রাতে ছদ্মবেশে ঘোরেন রাজধানীতে রোমাঞ্চের খোঁজে।

এক সন্ধ্যায় দেখেন চার কন্যা বাগানের এক গাছের নিচে বসে কথা কইছে. রাজা আড়ি পেতে সে কথা শুনছেন।

প্রথম কন্যা বলছে, 'স্বাদ যদি বলো, মাংসের স্বাদ সবচেয়ে ভালো।'

দ্বিতীয় কন্যা বলছে, 'এ আমি মানি না। সুরার মতো স্বাদ আর কিসে আছে?'

তৃতীয় কন্যা বলছে, 'না না, দু'জনেই ভুল বললে। প্রেমের স্বাদ সবচেয়ে মিষ্টি।'

চতুর্থ জন বলল, 'মাংস, সুরা, প্রেম, মিষ্টি তো সবই। কিন্তু মিছে কথা বলার যে স্বাদ, তার জুড়ি নেই।'

বাড়িতে ডাক পড়ল, মেয়েরা চলে গেল। রাজা গভীর আগ্রহে ওদের কথা শুনছিলেন। ওরা কে কোন বাড়িতে গেল, দরজায় খড়ির দাগে চিহ্ন করলেন, তারপর প্রাসাদে গেলেন।

পরদিন উজীরকে ডেকে রাজা বলছেন, 'বাগানের ওপারের সরু রাস্তাটায় পাঠাও কাউকে। যে সব বাড়ির দরজায় খড়ি দিয়ে গোল চিহ্ন আছে, সে সব বাড়ির মালিকদের নিয়ে এসো।'

উজির নিজেই গেলেন, আনলেন চারজনকে। রাজা বললেন, 'তোমাদের চারজনেরই একটি করে মেয়ে আছে, তাই না?'

—'হ্যাঁ হুজুর।'

—'ওদের নিয়ে এস। ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

বাপেদের ভয়, মেয়েদের যদি ক্ষতি হয়? তারা বলল, 'কুমারী মেয়েদের প্রাসাদে আনাটা ঠিক হবে না।'

রাজা বললেন, 'কথা দিচ্ছি, তোমাদের মেয়েদের কোন ক্ষতি হবে না। ওরা

নিরাপদেই থাকবে। কোন ঢাকঢোল না পিটিয়েই ওদের আনতে পার।'

পর্দা ঢাকা চারটে পালকি গেল চার বাড়ি। চারটি মেয়ে ঢুকল প্রাসাদেব দরবার ঘরে। রাজা তাদের একজন একজন করে ডাকছেন। প্রথম মেয়েটিকে বলছেন, 'মা! কাল রাতে গাছের নিচে বসে বোনদের সঙ্গে কি বলাবলি করছিলে?'

—'মহারাজ! আপনার নামে কিছু বলিনি।'

—'তা নয়, তা নয়। কি বলছিলে সেটুকুই বলো।'

—'মাংসের স্বাদ সবচেয়ে ভালো, এই মাত্তর বলেছি।'

—'তুমি কার মেয়ে?'

—'এক ভাবরার মেয়ে।'

—'ভাবরা ঘরের মেয়ে তুমি, মাংসের স্বাদ জানো কি করে? ভাবরারা মাংস ছোঁয় না। তারা এমন গোঁড়া যে জলটিও কাপড়ে ছেঁকে খায়, পাছে কোন পোকামাকড় খেয়ে ফেলে।'

—'সে কথা সত্যি। কিন্তু আমার মতে মাংস নিশ্চয় পরম সুস্বাদু। আমাদের বাড়ির কাছে এক মাংসের দোকান। দেখেছি, মানুষ যখন মাংস কেনে, তার কিছুই ফেলা যায় না। খুব উৎকৃষ্ট জিনিষই হবে। মানুষ মাংস খেল কুকুর খায় হাড়। হাড় একেবারে চিবিয়ে চুষে খায়। তারপর কাক এসে সব নিয়ে যায়। কাকের খাওয়া হল, তো পিঁপড়ে এসে যায়, এ জন্যেই মনে করি, মাংসের স্বাদ চমৎকারই হবে।'

রাজা ওর যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে খুব খুশি। বললেন, 'হ্যাঁ মা! মাংস সত্যিই খেতে খুব ভালো।'

দামী উপঢৌকন দিয়ে একে বাড়ি পাঠালেন।

দ্বিতীয় মেয়েটি এসেছে তো রাজা বলছেন, 'গত রাতে গাছের নিচে বসে কি বলা হচ্ছিল?'

—'আপনাকে নিয়ে কিছু বলিনি মহারাজ!'

—'তা তো জানি, কিন্তু কি বলছিলে বলো তো?'

—'বলেছিলাম, সুরার স্বাদের তুলনা নেই।'

—'কার মেয়ে গো তুমি?'

—'এক পুরুতের মেয়ে।'

—'এ তো বেজায় তামাশা! পুরুতরা মদের নামকেও ঘেন্না করে। তুমি সে স্বাদের জানো কি?'

—'এ কথা সত্যি, জীবনেও সুরা স্পর্শ করিনি। তবে এ যে কি চমৎকার তা সহজেই বুঝি। আমার বাবার বাড়ির ছাতে দাঁড়িয়েই তা বুঝেছি। নিচে সব মদের দোকান। একদিন দেখি দিব্যি ভদ্র পোশাকে সুসজ্জিত দুই ভদ্রলোক মদ কিনলেন, ওখানে বসেই খেলেন। উঠে যখন চলে যাচ্ছেন, ওঁরা টলতে টলতে যাচ্ছেন, আমি

ভাবছি, দেখ কাণ্ড! লোকগুলো টলতে টলতে যাচ্ছে, টাউরি খেয়ে দেয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে, এই পড়ছে, এই উঠছে। নিশ্চয় ওরা আর কখনো মদ ছোঁবে না। সে তো আমার ভুল! পরদিনই এল ওবা, একই রকম কাণ্ডবাণ্ড করল। তাই নিজেকেই বলি, মদের স্বাদ নিশ্চয় অমৃতসমান। নইলে লোকগুলো মদ খেতে আসত না আবার!'

—'ঠিকই বলেছ বাছা! মদের স্বাদ অতি লোভনীয়।'

নানা উপঢৌকন দিয়ে রাজা তাকে বাড়ি পাঠালেন। ডাকলেন তৃতীয় মেয়েটিকে।

—'কাল রাতে গাছতলায় কি বলছিলে?'

—'আপনার বিষয়ে নয়, মহারাজ!'

—'জানি জানি। কিন্তু বলছিলে কি?'

—'বলছিলাম ভালবাসাবাসির মতো মধুর আর কি আছে দুনিয়াতে।'

—'তুমি তো কচি মেয়ে গো! ভালবাসাবাসির জানো কি? কাদের মেয়ে গো তুমি?'

—'এক চারণকবিব মেয়ে। বয়সে কচি হতে পারি। তবে চোখ আর কান তো আছে। যা দেখেছি, মনে হয় ভালবাসাবাসি নিশ্চয় ভারি আনন্দের। আমার ছোট ভাইটা জন্মাল। মা কি কষ্টটা না পেল! বাঁচবে বলেও ভাবেনি। কিন্তু ঝটপট মা ফিরে গেল তার জীবনে, নাচওয়ালীর পেশায়। আগের মতই স্বাগত জানাতে থাকল তার প্রণয়ীদের। তাই মনে করি, ভাববাসার টান অপ্রতিরোধ্য।'

—'যা বলেছ', বলে রাজা তাকেও অনেক উপহার দিয়ে বাড়ি পাঠালেন।

চতুর্থ মেয়েটিকে একই প্রশ্ন করলেন রাজা। এ মেয়েটিও বলল, রাজার বিষয়ে কিছু বলে নি।

—'তা না বলো, বলছিলে কি!'

—'বলছিলাম, যারা মিথ্যা কথা বলে, নিশ্চয় তা বলতে ভালবাসে।'

—'তুমি কাদের মেয়ে।'

—'এক কৃষকের মেয়ে?'

—'কেন মনে হল, মিছে কথা বলতে ভারি মজা?' চটপটে মেয়েটি বলল, 'সবাই মিছে বলে, আপনিও একদিন বলবেন। হয়তো বলেওছেন।'

—'তার মানে?'

—'আমাকে দু' লাখ টাকা আর ছ' মাস সময় দিন। আমি এ কথা প্রমাণ করে দেব।'

রাজা কৌতূহলী হলেন। মেয়েটিকে টাকা দিলেন, সময়ও দিলেন।

ছ' মাস বাদে তাকে ডেকে পাঠালেন। মনে করিয়ে দিলেন শর্তের কথা। ইতিমধ্যে রাজার টাকা দিয়ে মেয়েটি এক আলিশান বাড়ি বানিয়েছে। ছবি, মূর্তি, রেশম, সাটিনে সাজানো বাড়ি।

মেয়েটি বলল, 'আমার সঙ্গে চলুন, ভগবানকে দেখতে পাবেন।'

দুই মন্ত্রী নিয়ে রাজা সেই সন্ধ্যাতেই হাজির।

মেয়ে বলছে, ' এহ'ল স্বয়ং ঈশ্বরের আবাস গৃহ। তবে একবার একজনকেই দেখা দেন তিনি। তবে দেখা দেন না বেজন্মাকে, যার বাপ-মার বিয়ে হয়নি। যান. একজন করে ঢুকুন।

—'বেশ! আগে আমার মন্ত্রীরা যাক। আমি সবার শেষে যাব।'

প্রথম মন্ত্রী ঢুকলেন এক শান্ত, চমৎকার ঘরে। চারদিক দেখে তিনি ভাবছেন, 'ঘরের মতো ঘর বটে! ঈশ্বর থাকার যোগ্য ঘর। কে জানে তাঁর দেখা পাব কি না? হয়তো আমি এক বেজন্মা। কে জানে!'

খুব চোখ বিঁধিয়ে দেখল, তবে ঈশ্বরের দেখা পেল না। তারপর ভাবল, 'ঈশ্বরের দেখা পাই নি, এতো বলতে পারব না। ওরা ভাববে আমি বেজন্মা। তাই বলতেই হবে যে ঈশ্বরকে দেখেছি।'

মন্ত্রী বেরিয়ে এলেন। রাজা শুধোতে বললেন, 'আপনাকে যেমন দেখেছি, তাঁকেও স্পষ্ট দেখলাম।

—'সত্যি দেখলে?'

—'সত্যি দেখলাম।'

—'কি বললেন তোমাকে?'

—'বললেন, যা বলেছি, তা কাউকে বলবে না।'

রাজা দ্বিতীয় মন্ত্রীকে পাঠালেন।

ইনি ঢুকলেন বটে, তবে চৌকাঠ পেরোবার সময়ই সন্দেহ জাগল, 'আমি বেজন্মা নয় তো?'

অপরূপ সে ঘরে ঢুকে চারপাশে চেয়ে দেখলেন। ঈশ্বরকে দেখতে পেলেন না। তাঁর কোন চিহ্নও নয়। ভাবলেন, 'আমি এক বেজন্মা। এ খুবই সম্ভব। কেন না আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছি না। এ কথা স্বীকারই বা করি কি করে, সে লজ্জা সই বা কি করে? ভান করা যাক যে তাঁকে দেখেছি।'

ফিরে এসে রাজাকে বললেন, 'ঈশ্বরকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে কথাও কয়েছি।'

এখন রাজার পালা। কোন দ্বিধা না রেখে তিনিও ঘরে ঢুকলেন। চারদিকে যতই তাকান, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে তো দেখতে পান না। ভারী মুশকিলে পড়লেন, নিজেকেই সন্দেহ হতে থাকল।

—'আমার দুই মন্ত্রীই ঈশ্বরকে দেখেছে, তা স্পষ্ট। ওরা ওদের বাপের বেটাই বটে! এ কি সম্ভব, যে আমি রাজা! অথচ আমি বেজন্মা? এ কথা স্বীকার করলেও তো মহা গণ্ডগোল! তাই বলতে হবে, দেখেছি! তাঁকে দেখেছি!'

মন ঠিক করে তিনি বেরিয়ে এলেম।

মেয়েটি বলল, 'মহারাজ! আপনিও তাঁকে দেখলেন?'
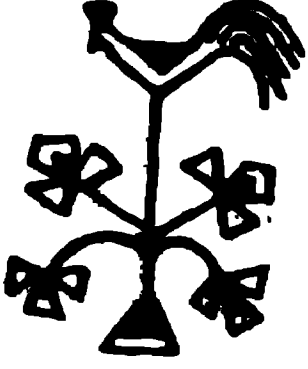
—'হ্যাঁ, দেখলাম বই কি! ভগবানকে দেখলাম!'

—'সত্যি?'

—'নিশ্চয়।'

বারবার তিনবার মেয়েটি প্রশ্ন করল, একই উত্তর পেল। রাজা স্পষ্ট মিছে কথা সপাটে বলে গেলেন।

—'অ রাজামশাই! আপনার কি বিবেক বলে কিছু নেই? ঈশ্বরকে দেখবেন কি করে, তাঁকে কি দেখা যায়?'

এখন রাজার মনে পড়ল, মেয়েটি বলেছিল, একদিন তিনিও মিছে কথা কইবেন। হো হো করে হাসলেন রাজা, স্বীকার করলেন যে ঈশ্বরকে দেখেন নি। খুবই লজ্জিত, খুবই বিপন্ন দুই মন্ত্রীও সত্যটা স্বীকার করলেন।

মেয়েটি বলল, 'রাজামশাই! প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আমাদের, গরিবদের, মাঝে মাঝে মিথ্যে কথা বলতেই হয়। কিন্তু আপনার ভয়ের আছেটা কি? তাই, মিছে কথা বলার একটা নিজস্ব মজা আছে, অনেকেই বলে। তাদের কাছে মিথ্যার স্বাদ বড় মনোরম।'

মেয়েটি যে ঠকাল, তাতে রাজা কিছুই মনে করলেন না। মেয়েটির বুদ্ধি আর আত্মবিশ্বাস দেখেই তিনি মুগ্ধ। ওকে বিয়ে করতে চাইলেন, করলেনও। কি রাজ্যের কাজে, কি ব্যক্তি জীবনে, মেয়েটি তাঁর বিশ্বাসী পরামর্শদাতা। তার জ্ঞানও বাড়ল, দেশে দেশে ছড়াল তার খ্যাতি।

তুমি নয়? তবে নিশ্চয় তোমার বাপ

কন্নড়
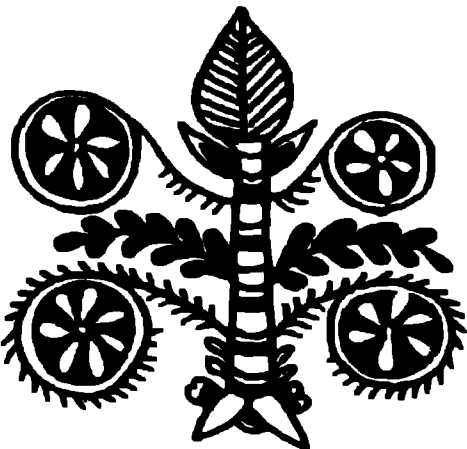
এক সময়ে এক পাহাড়ী ঝর্ণায় একটি ভেড়ার ছানা জল খাচ্ছিল। একটা বাঘ ঝর্ণার ওপর পাড়ে জল খেতে এল। ভেড়ার ছানাকে দেখেই সে বলছে, 'আমার জল ঘোলা করছ কেন হে?'

ভেড়ার ছানা বলছে, 'তুমি আছ ওপরে, আমি আছি নিচে। তোমার জল ঘোলা করছি আমি? কি করে?'

—'গতকাল তো করেছিলে।'

—'কাল এখানে আসিই নি।'

—'তবে তোমার মা এসেছিল।'

—'মা বেশ কিছুদিন হ'ল মারা গেছে। মাকে নিয়েও গেছে।'

—'তবে নিশ্চয় তোমার বাবা।'

—'বাবা?' আমি জানিই না কে আমার বাবা!'

ভয়ের চোটে ভেড়ার ছানা পালাতে চায়।

—'কিচ্ছু এসে যায় না আমার। তোমার ঠাকুরদা, অথবা ঠাকুরদার বাপ আমার জল ঘোলা করেছে। অতএব, তোমাকে আমি খাব।'

বাঘ ঝাঁপ দিল ভেড়ার ছানার ওপর, টুকরো টুকরো করল তাকে। আর গপাগপ গিলে ফেলল।

শ্রোতারা হাসে কাঁদে কেন?

পাঞ্জাবী
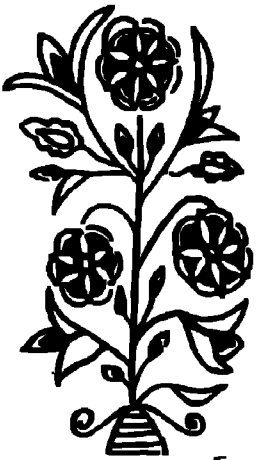
পাপীরা জাহান্নমে কী ধরনের নির্যাতন ভোগ করবে। তা নিয়ে খুব বলছিলেন এক মুসলিম প্রচারক। যত বলছেন, মিনিটে মিনিটে তাঁর ভাষণ আরও জ্বালাময় হচ্ছে। এমন সময়ে দেখেন শ্রোতাদের মধ্যে এক গরিব চাষী কাঁদছে। তার গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

প্রচারক মহা খুশি। তাঁর ভাষণ শ্রোতাদের মর্মভেদ করছে যাকে বলে।

—'কত পাপ করেছ, তাই ভেবে কাঁদছ তো? আমার কথা মর্মে বিঁধেছে, তাই না?' জাহান্নমের নির্যাতনের কথা বলছি, যত পাপ করেছ সব মনে পড়ছে, এই তো?

চোখ মুছে লোকটি বলল, 'না না। পাপের কথা ভাবিনি গো! আমার বুড়ো পাঁঠাটার কথা ভাবছিলাম। অসুখ হয়ে গত বছর মরেই গেল। কি লোকসানটা না হ'ল! পাঁঠাটার দাড়ি বড় খাশা ছিল, ঠিক আপনার মতো। জীবনে এমন দুই দাড়ির অবিকল মিল দেখিনি।'

এ কথা শুনে গ্রামবাসীরা হাসিতে ফেটে পড়ল। আর প্রচারক মুখ লুকোলেন কোরাণে।

আকবর আর বীরবল

উর্দু

মহান মোগল সম্রাট আকবরের দরবারে ছিলেন এক হিন্দু রাজা। ভাঁড়, পরামর্শদাতা, জ্ঞানী, মূর্খ, এমন নানা ভূমিকা ছিল তাঁর। তাঁর নাম ছিল বীরবল। বীরবলের উপস্থিত বুদ্ধি, কৌতুক বোধ, জ্ঞান ও মাঝেসাঝে বোকামি নিয়ে অনেক গল্প আছে। এখানে তার কয়েকটি দেওয়া গেল।

সেরা ফুল

একদিন আকবর সভাসদদের শুধোলেন, 'কোন ফুলটি সবার সেরা?'

কেউ বলতে পারল না।

অবশেষে বীরবলের পালা এল।

তিনি বললেন, 'সব ফুলের মধ্যে সেরা সেই ফুল, যা থেকে সারা দুনিয়ার কাপড় বোনা হয়।

খুশি হয়ে আকবর এ কথা মেনে নিলেন।

ছোট করো
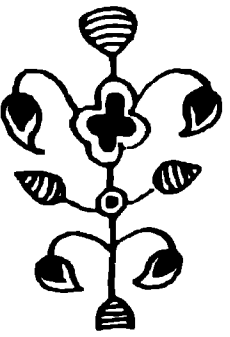
একদিন আকবর স্বহস্তে সভার মেঝেতে একটা লাইন আঁকলেন। হুকুম দিলেন, 'এটাকে ছোট করো, তবে একটুও মোছা চলবে না।'

সবাই হতভম্ব হয়ে রইল।

বীরবলের পালা এল যখন, তক্ষুণি তিনি এই লাইনটার পাশ দিয়ে একটা লম্বা লাইন আঁকলেন। ওটা ছুঁলেন না।

দরবারে সবাই বলল, 'ঠিক হয়েছে। প্রথম লাইনটা তো আরো ছোট।'

চারটে আনো

একদিন আকবর বীরবলকে বললেন, 'চারটে লোক আনো। একজন লাজুক, একজন নির্লজ্জ, একজন কাপুরুষ, একজন বীর।

পরদিন বীরবল একটি স্ত্রীলোককে এনে বাদশার সামনে দাঁড় করালেন।

আকবর বললেন, 'বললাম চারটে মানুষ আনো, তুমি আনলে একজনকে। অন্যেরা গেল কোথায়?'

বীরবল বললেন, 'হে দুনিয়ার শরণস্থল! চারজনের যে যে গুণ দরকার, এ

স্ত্রীলোকের সবই আছে।'

—'বটে! কেমন করে?'

—'ইনি যখন শ্বশুরবাড়ি থাকেন, লজ্জায় মুখটি খোলেন না। যখন কারো বিয়েতে অশ্লীলতা, আপমানজনক কথায় রচিত বিয়ের গান করে, এঁর বাবা, ভাইরা, শ্বশুর বাড়ির সবাই, জ্ঞাতগুষ্টির লোকজন বসে তা শোনেন, উনি লজ্জা পান না। রাতে যখন স্বামীর কাছে, একা একা ভাঁড়ার ঘরেও যান না। বলেন, 'আমার ভয় করছে।' কিন্তু যদি কাউকে মনে ধরে, প্রণয়ীর সঙ্গে মিলিত হতে নির্ভয়ে চলে যান মাঝরাতে, অন্ধকারে, একেবারে একা। চোর-ডাকাত, ভূত-প্রেত, কোন ভয় থাকে না।'

শুনে আকবর বললেন, 'যথার্থ বলেছ।'

বীরবলকে পুরস্কার দিলেন তিনি।

জামাইদের গল্প

একদিন আকবর আর বীরবল গেছেন শিকারে। সম্রাট একটি গাছ দেখিয়ে বলছেন, 'এটা এমন বেঁকাতেড়া কেন হে!'

বীরবল বললন, 'জঙ্গলের সব গাছেরই জামাই তো! তাই বেঁকাতেড়া।'

—'এ কথা বললে কেন?'

বীরবল একটি প্রবাদ আওড়ালেন, 'কুকুরের লেজ আর জামাই, সর্বদাই বেঁকা হয়।'

—'আঁ্যা? আমার জামাইও সে রকম?'

—'নিশ্চয়, সম্রাট!'

—'বটে! তবে তাকে ক্রুশ বিদ্ধ করো।'

কিছুদিন বাদে বীরবল তিনটে ক্রুশ করালেন। সোনার, রুপোর আর লোহার।

দেখে আকবর বললেন, 'তিনটে ক্রুশ করালে কেন?'

—'সম্রাট! একটি আপনার জন্যে, একটি আমার, আরেকটি জাঁহাপনার জামাইয়ের জন্যে।'

—'আমরা কেন বধ হতে যাব?'

—'আহা! আমরা প্রত্যেকেই তো কারো না কারো জামাই!'

আকবর হাসতে হাসতে বললনে, 'তা হ'লে আমার জামাইকে ক্রুশে চড়িও না।'

রাতকানা জামাইয়ের গল্প

কন্নড়

এক বিধবা বুড়ির মোটে একটা ছেলে। সেও আবার রাতকানা। বুড়ি কিন্তু ভালো ঘরের চমৎকার একটি মেয়ের সঙ্গেই ছেলের বিয়ে দিয়ে ফেলেছে। শ্বশুরঘরে জানতে দেয়নি যে ছেলে রাতকানা। কিন্তু কতদিন আর সত্য ধামাচাপা রাখা যায়?

দেওয়ালীর সময়ে শ্বশুরবাড়ি প্রথম নেমন্তন্ন পেল ছেলে। মা তো মহাচিন্তিত। মা বলছে, 'খুব সামলে চলবে। সূর্য ডুবলে কিছু দেখতে পাওনা। রাত ঘনালে এদিক-সেদিক ঘুরো না। দিনে পথ চলবে, শ্বশুরঘরে থাকবে মোটে এক রাত।'

আঁধার হবার আগেই তো ছেলে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছতে চায়। তাই সে চলেছে হনহনিয়ে। কিন্তু গ্রামের সীমানায় পৌঁছতে না পৌঁছতে নেমেছে সাঁঝ। চোখে তো সে ঝাপসা দেখতে শুরু করেছে। মা কি বলেছে তা মনে রেখে ও এক জায়গায় বসল। এমনই কপাল, বসবে তো বসল ওরই শ্বশুরবাড়ির জঞ্জাল ফেলার আস্তাকুঁড়ে। যেমন বসেছে, তেমন ওর শাশুড়ি বেরিয়ে এসে একগাদা জঞ্জাল ওর মাথায় ঢেলেছে ধপ করে। আগে তো জামাইকে দেখতে পায়নি। জামাই হাঁউমাউ করতে শাশুড়ি চিনেছে। হায় হায়, এ কি হ'ল?। এ তো আর কেউ নয়? এ যে তারই সাধের জামাই! নতুন জামাইকে ঠাকুরপূজো করতে হয়, সে কি করে বসল? অসম্ভব লজ্জা পেয়ে শাশুড়ি আঁচলে মুখ ঢেকে সে বাড়ির দিকে দৌড়ল। পথে দেখে তার দশ বছরের ছেলে মোষ নিয়ে ফিরছে। শাশুড়ি বড় ব্যস্ত হয়ে বলছে, 'বাছা! দাঁড়াও। তোমার জামাইবাবু এসেছে। কেন জানি না আমাদের আস্তাকুঁড়ে বসে আছে। বোধহয় পেচ্ছাপ করছে। আমি না-দেখে ওর মাথায় জঞ্জাল ঢেলে দিয়েছি। ক্ষেপে গেছে নির্ঘাত! দৌড়ে যা বাছা! যত্নআত্তি করে নিয়ে আয় ওকে। তোকে তো পছন্দ করে!'

ছেলেরও নতুন জামাইবাবুকে ভারি পছন্দ। সে দৌড়চ্ছে আর ডাকছে, 'অ জামাইবাবু! আপনি কোথায়?'

দেখে কি! জামাইবাবু জঞ্জালের গাদাতেই বসে আছে।

—'ওখানে বসলেন কেন? আসুন, বাড়ি চলুন!'

ছেলেটা জামাইবাবুর হাত ধরে টানছে। জামাই রাতকানা হলে কি হয়, বুদ্ধি ধরে মাথায়। সে বলছে, 'শুধুমুধু বসে ছিলাম না রে! ভাবছিলাম, তোদের জঞ্জাল থেকে ক' গাড়ি সার হয়। তা, বিঘা ছয়েকের মতো সার হবে।'

স্নেহভরে ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে ও চলছে। কালো কালো মোষ আবছা আবছা দেখে ও লাফিয়ে উঠেছে. 'ও বাবা গো! ওগুলো কি?'

—'আমাদের মোষগুলো। চরাতে নিয়ে গেছলাম।'

—'তাই বলো! দিব্যি বড়সড় আর রিষ্টপুষ্ট তো!'

জামাই একটা মোষের লেজ ধরে চলছে এখন। যেতে যেতে মোষটা পৌঁছেছে এক খাদায়। খাদা হল মাটিতে কাটা গর্ত, যাতে মোষের জন্যে কলাইভূষি ঢালা থাকে। জামাই তো খাদার মধ্যে পড়েছে।

ছেলে বলছে, 'আবার কি হ'ল? আপনি কি চোখে কম দেখেন?'

—'আরে না, না। দিব্যি দেখি। দেখছিলাম তোদের খাদাটা গভীর কত! বাড়িতে একটা বানাব তো! নে, হাতটা ধর দেখি লক্ষ্মী ছেলে!'

এবার জামাই শক্ত ডাঙায় উঠেছে। বাকি পথটা চলছে দেয়াল ধরে ধরে।

শালা বলেছ, 'জামাইবাবু! দেয়াল ধরে ধরে হাঁটছেন কেন? আপনার চোখ কি খুব খারাপ?'

—'ছি ছি! কি যে বলিস! মেপে দেখছিলাম, তোদের সদরের পাঁচিলটা লম্বা কত! জানতে সাধ যায় তো!'

সদর দরজায় পৌঁছেই জামাই একটা ভেড়ার গায়ে পড়েছে। ভেড়াটা দাঁড়িয়েই ছিল। ভেড়াও ওকে ঠেসে গুঁতিয়েছে। জামাইবাবু পপাত ধরণীতলে। শালা ভেড়াটাকে ঠেঙাল, জামাইবাবুর হাত ধরে তুলল, বলল, 'ভেড়াটা দাঁড়িয়ে আছে, চোখে পড়ল না?'

—'আহা! পড়েছিল, পড়েছিল। দিব্যি দেখতে, ভাবলাম গা-টা থাবড়ে দিই। হতভাগা কি করল দেখ। বাইরের লোককে গুঁতোতে শিখিয়েছিস কেন রে?'

রাত তো হয়েই গেছে। সবাই খেতে বসেছে মেঝেতে। সামনে পিঁড়ির ওপর তামার কলাই করা থালা সাজানো। শাশুড়ি নিজেই হাজির। এ একটা দিনের মতো দিন। নানা ব্যঞ্জন পরিবেশন করতে হবে।

শাশুড়ির শাঁসালো অবস্থা। তার পায়ের আঙুলে চুটকি, পায়ে মল। হাতে চুড়ি, কাঁকন, কত কি। গয়না বাজছে ঝুমঝুমিয়ে যেমন সে পা ফেলে এগোচ্ছে।

জামাই ভেবেছে সেই সর্বনেশে ভেড়া আবার ঢুকেছে, আবার তাকে গুঁতোবে। কিছু না ভেবেই ও নিজের থালা রাখার পিঁড়েটা তুলে ছুঁড়ে মেরেছে সামনে। ও তো জানে ভেড়াকে মারছি।

শাশুড়ি ভয়ে রান্নাঘরে গিয়ে শেঁধিয়েছে। সে ভাবছে, তখন যে মাথায় জঞ্জাল ঢেলেছে, তাতেই জামাই খাপ্পা হয়ে আছে। অন্যেরা ভাবছে, জামাই খাপ্পা, কেন না সে চায় শাশুড়ি নয়, বউই পরিবেশন করুক। শেষমেশ বউই এসে পরিবেশন করল।

খাওয়াদাওয়া সেরে সবাই শুতে গেছে। এরা স্বামী-স্ত্রী শুয়েছে একটা ছোট ঘরে। ছোট শালা শালীরা শুয়েছে বারান্দায়। মাঝরাতে তো জামাইয়ের বাইরে যাওয়া দরকার।

উঠেছে কোনমতে, এ বাড়ির কি-কোথায় তা মনে করে করে হাতড়ে হাতড়ে গেছে। কাজটি সেরে ফেরবার সময়ে পথ গুলিয়ে ফেলেছে। শ্বশুর আর শ্বাশুড়ি যে ঘরে ঘুমোচ্ছে, সে ঘরে ঢুকেছে। হাত বাড়িয়ে হাতড়াচ্ছে বউ কোথায়। হাতটা পড়েছে শাশুড়ির পায়ে। সে তো ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে। বলছে, 'কে? কে?'

—'আমি, আমি!'

—'এমন সময়ে তুমি এ ঘরে কেন?'

জামাই নিজের ভুল বুঝেছে, বলছে, তেমন কিছু নয়। তবে পরিবেশনের সময়ে আপনাকে পিঁড়ে ছুঁড়ে মারলাম! তাই আপনার পা ধরে মাপ চাইত এসেছিলাম। বড় অন্যায় করেছি। দয়া করে মাপ করুন।'

শাশুড়ি জামাইয়ের কথায় লজ্জা পেয়েছে, বিব্রতও হয়েছে।

—'ঠিক আছে, ঠিক আছে। নিজের ঘরে যাও বাছা, ঘুমিয়ে পড়ো।'

জামাই পা ছাড়বে না। সে শুধু বলছে, 'বলুন, মাপ করেছেন? দয়া করে মাপ করুন।'

এত হইচই শুনে বউ উঠে পড়েছে। সে ভাবছে, 'গেল পেচ্ছাপ করতে, ঢুকেছে মায়ের ঘরে, বারবার মাপ চাইছে। পাড়াপড়শি ভাববে কি?'

বউ মায়ের খাটের কাছে এসে বরকে বলছে, 'চলো চলো। সকালে কথা হবে খ'ন। এখন ঘুমোনো যাক।' হাতে ধরে ও স্বামীকে নিজেদের ঘরে নিয়ে এল।

রাত ফুরাল, ফর্সা হ'ল। জামাই সাতভোরে উঠেই বলছে, তার বেজায় তাড়া। ঘরে ফিরতে হবে, সাত কাহন কাজ আছে তার। বউ, শ্বশুর-শাশুড়ি, শালা-শালী, সবার কাছে বিদায় নিয়ে সে ঘরের পথ ধরল। সব বিপদ পেরিয়ে এসেছে, কারো সন্দেহ হয়নি যে ও রাতে একটি কানা ছুঁচো, তাতে জামাইয়ের খুশি যত, গর্বও তত!

আমার আসল চেহারা দেখাব?

তামিল

এক ভয়ংকর বাঘ কেমন করে যেন যেমন খুসি তেমন রূপ ধরার বিদ্যে শিখেছে। তার ভারি সাধ যে একটি বামুনের মেয়ে বিয়ে করে। মাংস খায়, মাংস বিনা বাঁচতেও পারে না। কিন্তু বামুনদের ঘরে নিরিমিষ রান্না হলেও তার গন্ধ বাঘের ভারি পছন্দ।

একদিন সে এক বিদ্বান বামুন যুবকের রূপ ধরেছে। সে 'রামায়ণ'ও পড়তে পারে! সে গেছে এক বামুন ঘরে। বাড়ির সবাই ওকে ভক্তি ভরে ডেকেছে, ভাত-তরকারি, আমের আচার আর দইয়ের ভোজ খাইয়েছে।

বাঘ কি আর দেরি করে? সে বলে ফেলেছে মনের বাসনা। এ বাড়ির মেয়েটিকে সে বিয়ে করতে চায়। বিদ্বান বামুনের গলার স্বরে, সংস্কৃত জ্ঞানে বাড়ির সবাই মুগ্ধ। তড়িঘড়ি বিয়ের ব্যবস্থা। তাড়াটা বরেরই বেশি। বরপক্ষে কেউ নেই যাকে নেমন্তন্ন করবে, ক'দিন বাদেই জামাই বলছে ঘরে যাব। জঙ্গল পেরিয়ে তার ঘর, আর এ বাড়ির অনুমতি পেলে নতুন বউকেও সে নিয়ে যাবে।

বুড়ো বাপ বলছে, 'বাছা! তুমি ওর স্বামী, ও তো তোমারই। বড় যত্নে মানুষ করেছি। বিদায় দিচ্ছি, যেন বনবাসে পাঠাচ্ছি। তবে জানছি যে তুমি তাকে যত্নে রাখবে।'

জামাই পরদিনই বেরিয়ে পড়ল। শাশুড়ি পথের জন্যে নানা মিষ্টান্ন আর পিঠে তৈরি করে দিয়েছে। পথে পিশাচ রাক্ষস কুনজর দিতে পারে বলে প্রতিটিতে দিয়েছে নিমপাতা। মেয়ের চুলেও নিমপাতা গুঁজে দিয়ে সে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করল, বিদায় দিল, তার চোখে জল।

পথটা মোটামুটি ভালই যাচ্ছে ওরা, কিন্তু মেয়েটি যেই কোন পুকুরপাড়ে বা গাছের নিচে জিরোতে চায়, বর খেঁকিয়ে বলে, 'বাধ্য মেয়ের মতো গুটিগুটি আসবে তো এসো। নইলে আমার আসল চেহারা দেখাব!'

এ কথার মানে না বুঝুক, হুমকিটা দিব্যি বুঝল মেয়ে। চুপচাপ সে চলল। আবার জলাশয় আর গাছ দেখে একটু জিরোতে চাইল।

বর আবার খ্যাঁকালো, 'চুপচাপ আসবি? দেখাব না কি আসল চেহারাখানা!'

মেয়ে দেখছে, জঙ্গলের গহীনে যত ঢুকছে, বরের ধরণ-ধারণ কেমন যেন। বারবার এক কথা শুনে সেও তিতিবিরক্ত। তাই বলছে, 'ঠিক আছে! দেখাও, আসল চেহারা দেখাও!'

যেমন বলা, বর কোথায় গেল? চারটে ঠ্যাং, হলদে-কালো ডোরাকাটা মস্ত শরীর, ইয়া ইয়া গোঁফ! এ তো মানুষ নয়, বাঘ!

বাঘ বলছে, 'তোমার স্বামী বাঘ! কখনো ভুলো না। শীঘ্রই বাড়ি পৌঁছে যাব। যা দরকার, এনে দেব সব। সবজি-চাল-মশলা, আমার জন্যে মাংস। রাঁধবে বাড়বে, ঘর সামলাবে। অবাধ্য হয়েছ কি দেখেছ।'

জঙ্গলে এক ঘরে রইল ওরা। সময়ে মেয়েটার পেটে একটা বাঘের বাচ্চা হ'ল। কিন্তু মেয়ের অবস্থা বড় দুঃখের। এক হিংস্র মানুষখেকো বাঘের সঙ্গে জীবন কাটাবে। বাঘ ঘরে আনবে মাংস আর নাড়িভুঁড়ি, এমন জীবন তো সে স্বপ্নেও চায় নি।

একদিন ঘরে বসে কাঁদছে. তো একটা কাক এসেছে খুঁটে খুঁটে ভাত খেতে। কান্না দেখে সে শুধোচ্ছে, ব্যাপারখানা কি! মেয়েটা কাকটাকে সবই বলছে। তারপর মিনতি করছে। কাক কি তার একটা চিঠি নিয়ে যাবে?

কাল বলছে, 'তোমার জন্যে যা বলো তা করব।'

তালের পাতায়, লোহার পেরেকে মেয়েটা লিখছে বনবাসে তার দুঃখের কথা। মিনতি জানাচ্ছে, ভাইরা এসে তাকে উদ্ধার করুক!'

কাক উড়ে গিয়ে ভাইদের সামনে নেমেছে। কাকের গলায় বাঁধা তালপাতা দেখে খুলে নিয়ে পড়ছে চিঠি। তারা তিন ভাই তখনি বেরিয়ে পড়েছে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কাক।

বনে ঢুকেই দেখে একটা ঘরছুট গাধা। ছোট ভাইটা নেংচে হাঁটে, রঙ্গরসেও মজবুত। সে গাধাটাকে সঙ্গে নিতে চাইল। ভাইরা খানিক ওজর আপত্তি করল বটে, কিন্তু ও গাধাটা নিয়েই চলল।

আরো পথ চলে এরা দেখে এক সর্বনেশে কালো কুচকুচে বিষ-পিঁপড়ে। মেজভাই সেটিকে এক নারকেলের খোলে ভরে নিয়েছে।

কাছেই একটা উপড়ে পড়া তালগাছ। বড় ভাই সেটা তুলে নিয়েছে। বাঘের সঙ্গে লড়তে হলে এটা কাজে লাগবে।

দুপুর গড়িয়ে গেল, খাবার মতো কিছু নেই। একটা পুকুরের ধারে বসে তিন ভাই বলতে গেলে পুকুরটাই শুষে নিল। আবার হাঁটা দেবে, দেখে ধোপাদের কাপড় সেদ্ধ করার একটা বিশাল মেটে ভাটা। ঠিক যেন কোন ভুঁড়িওয়ালার নাদা পেট। সেটাও নিয়ে নিল ওরা।

বোনের বাড়ি পৌঁছে গেল তারপর, বোন তো মহা স্বস্তি পেল। বলল, 'তোমরা এসেছ, বাঁচলাম! তবে বাঘ তো এসে পড়বে এখনি। মাচানে উঠে লুকিয়ে পড়ো। ও চলে গেলে আমরা পরামর্শ করব এখন!'

ওরা জিনিসপত্র নিয়ে উঠে গেল। বাঘ ঘরে ঢুকে চারপাশ শুঁকছে আর বলছে,

'মানুষের গন্ধ পাঁউ!'

বউ বলছে, 'পাবে না তো কি পাবে? মানুষের মেয়ে বিয়ে করেছ না?'

—'আরে বাবা! তোমার গন্ধ চিনি। এ যেন অন্যরকম।'

—'বাঘের খিদে পেয়েছে, সে এখন বামুনবাড়ির রান্না খাবে। বউ কলাপাতায় ভাত দিচ্ছে তো মাচানে বসে ছোট ভাই ফিশফিশিয়ে বলছে, 'আমি পেচ্ছাব করব! আর চেপে রাখতে পারছি না!'

বড়ভাই বলছে, 'করবে তো করো, তবে নিঃশব্দে।'

ছোটভাই কাজটি করছে, খানিক পড়ল নিচে বাড়া ভাতের ওপর।

বাঘ সন্দেহ-সন্দেহ গলায় বলল, 'ওটা কি?'

—'ওটা? মাচানে একটা ভাঁড়ে ঘি রেখেছিলাম, তাই হয়তো ভাঁড় উলটে নিচে পড়েছে!'

এখন ছোটভাই বলছে, 'আমি পায়খানা করব।'

বড়ভাই বলছে, 'করো গে!'

ছোটভাই কাজটি করেছে। খানিক পড়েছে বাঘে কলাপাতে। বাঘ এবার গর্জে বলছে, 'এ কি? মনে হচ্ছে এটা পায়খানা!'

বউ বলছে, 'ভাতের পাতে নোংরা কথা বোল না তো! খানিক ডাল পিষে রেঁধে মাচানে রেখেছিলাম না? ওখানে বেড়াল-টেড়াল কিছু উঠেছে।'

বাঘ সেটা খেয়েও নিয়েছে। ভেবেছে এ হয়তো ডাল ভিজিয়ে, বেটে মশলা দিয়ে রাঁধা।

হঠাৎ মাচান থেকে কে হেঁকে বলছে, 'বাঘ! তোমার মরণ ঘনিয়েছে। আমি তোর শালা! তোমাকে খাব এবার!'

বাঘ ঘাবড়ে গিয়ে মাথা উঁচিয়ে বলছে, 'তুমি কোথায়?'

বড়ভাই বলছে, 'মাচানের ওপরে! আমার গর্জন শোনো!'—ছোটভাই সেই বিষপিঁপড়ে ছেড়ে দিয়েছে গাধার লেজের তলায়। নরম জায়গায় বিষকামড় খেয়ে গাধা পরিত্রাহি ডাকছে।

এখন বাঘের ভয় হয়েছে।

—'এই রকম গলা তোমার? তোমার ঠ্যাং দেখি?'

বড়ভাই মাচান থেকে তালগাছের গুঁড়িটা দোলাচ্ছে। বাঘ বলছে, 'আরিব্বাপ! অমন ঠ্যাং তো দেখিনি?

বাঘ ভয় পেয়েছে বুঝে মেজভাই বলছে, 'আমার ভুঁড়ি দেখেছ? তুমি ঢুকে যাবে।'—সে দেখাচ্ছে ধোপার ভাঁটা।

বাঘ কেঁপেঝেঁপে বলছে, 'অমন গলা! অতবড় গোদা পা! অতবড় ভুঁড়ি! জন্মে দেখিনি এ জিনিস!'

সে প্রাণের ভয়ে পালাল।

তখন রাত হয় হয়। বাঘ যতক্ষণ ভয়ে ঘরছাড়া তার মধ্যেই এরা তো বাড়ি ফিরতেও চায়।

ওরা ঝটপট চারটি খেয়ে নিল। বাঘের ছানাটাকে দু' টুকরো করে কাটল। ঝুলিয়ে দিল ওপরে। নিচে জ্বলন্ত উনুন, তাতে চাটু চাপানো। তারপর তিন ভাই বোনকে নিয়ে ভেগে গেল।

সদর দরজা বন্ধ করে ওরা খিড়কির দরজা দিয়ে ভেগেছে। মরা বাঘের ছানার রক্ত টপটপ করে পড়ছে চাটুতে, আর হিস্ হিস্ চট্‌পট শব্দ হচ্ছে। রাতে বাঘ পা টিপে টিপে ফিরে দেখে সদর দরজা বন্ধ। চাটুর ওপর রক্তের ফোঁটার শব্দ শুনে ও ভেবেছে, বউ বুঝি গরম গরম দোসা বানাচ্ছে।

—'দোর বন্ধ করে ভাইদের জন্যে দোসা বানানো হচ্ছে কেমন? দেখি কেমন হচ্ছে?'

পাছদুয়োর দিয়ে ঢুকে কি দেখল? সাধের ছানাটিকে মেরে রেখে গেছে ওরা। বউ তো ভেগেছে। বাড়ির সব দামী জিনিস নিয়েই ভেগেছে। যত পথচারীকে বাঘ মেরেছে, তাদের সোনাদানা তো ঘরেই রেখেছিল।

ছানার নিষ্ঠুর মৃত্যুতে বাঘ মর্মাহত, বউয়ের বেইমানিতে রেগে আগুন। প্রতিশোধ নিতে হবে। বউকে ধরে আনবে, টুকরো টুকরো করবে, যেমনটি ওরা ছানাটাকে করেছে।

কেমন করে? যে জাদু মন্তর জানে, তাই খাটিয়ে ও আগের সেই ব্রাহ্মণ যুবকের বেশ ধরল। গেল শ্বশুরের গ্রামে। ওর বউ আর শালারা ওকে আসতেও দেখেছে, তৈরিও আছে।

ও যেমন পৌঁছেছে, শ্বশুর-শাশুড়ি ওকে যত্ন করে ভেতরে নিয়ে এল। শালারাও দৌড়দৌড়ি করে যত্ন করছে। ভোজের জন্যে আনছে চাল-সবজি-গুড়। বাঘ তো একটা শালাকেও দেখছে না যার বিকট গলা, বিশাল ঠ্যাং আর বৃহৎ ভুঁড়ি? বাড়ির সবাই ছোটখাট, গলাও নরম।

বাড়ির পিছনে এক পোড়ো কুয়ো। বড়ভাই তার মুখটা ডালপালা আর ঘাসে ঢেকেছে। উপরে বিছিয়েছে রেশমের মাদুর, খাবার আগে জামাইকে তেল মাখিয়ে গরম জলে স্নান করানোই নিয়ম ওখানে। তিন শালা বাঘ-বামুনকে বলছে মাদুরে বসতে, তেল মাখাতে তো হবে।

বাঘ গিয়ে যেমন বসেছে, তেমনি মাদুর-ডালপালা-ঘাস, সব নিয়ে পড়েছে কুয়োর অতলে।

বাঘ তো পড়লই। শালারা তখনি পাথর, জঞ্জাল মাটি দিয়ে কুয়ো ভরাট করে ফেলল।

বাঘের দফা রফা হ'ল।

(তামিল প্রবাদ, 'চুপ করবে? নইলে আমার আসল চেহারা দেখাব' বোঝবার জন্যেই গল্পটি বলা হ'ল)

কিছুতে যে খুশি হত না

কাশ্মীরী

একদিন এক খুঁতখুঁতে লোক একটা কাঠবাদাম গাছের নিচে বসে আছে। চোখে পড়ল একটি তাজা পুরুষ্টু কুমড়ো ফলে আছে।

সে বলল, 'হায় ঈশ্বর! এ কি মূর্খতা! অত বড় গাছকে দিলে ক্ষুদে ক্ষুদে ফল, আর ল্যাকপেকে লতাটাকে ওই পেল্লায় কুমড়ো! বাদাম গাছে কুমড়ো, আর কুমড়ো গাছে বাদাম ফললে আপনার জ্ঞানের পরিচয় পেতাম, প্রশংসাও করতাম।'

যেই এ কথা বলেছে, একটা কাঠবাদাম খসে পড়েছে তার মাথায়। সে তো ঘাবড়ে গেছে।

বলছে, 'হে ঈশ্বর! তুমি ঠিক কাজই করেছ। অত উঁচু থেকে মাথায় কুমড়ো পড়লে আমি মরেই যেতাম। কি ভালো তুমি! কি অগাধ জ্ঞান তোমার!'

চিলের মেয়ে

অসমীয়া

এক বেজায় ধনী কুমোর। তার একটাও ছেলে নেই। বউয়ের শুধু মেয়ে হয়। আবারও যখন পেটে সন্তান এল, কুমোর বলল, 'আবার মেয়ে না হলেই ভালো। হলে পরে তোমাকে বেদেদের কাছে বেচে দেব।'

সময় হয়ে এলে কুমোরের বউ গেছে তার মায়ের কাছে। এ রকমই নিয়ম। তবে বড়ই দুঃখের কথা, এবারও মেয়ে হ'ল।

কুমোর বউ ভয়ে সারা। স্বামী খবর পাবার আগেই সে মেয়েকে একটা শাড়িতে

ঢেকে ঢুকে একটা মাটির গামলায় শুইয়ে আরেকটা শাড়িতে গামল'র মুখ ঢাকা দিয়ে নদীর জলে গামলাটি ভাসিয়ে দিল।

এক ধোপা ঘাটে কাপড় কাচছিল, সে সাঁতার দিয়ে গামলা ধরেছে। কিনারে এনে ঢাকনা খুলে সে তো আবাক! বউকে কেমন করে এ মেয়ে দেব? কি করব? এই যখন ভাবছে তখন এক বিশাল চিল ছোঁ মেরে মেয়ে নিয়ে চলে গেল। মহীরুহ এক বটগাছের মাথায় তার বাসা। এক নজর দেখেই মেয়েটাকে ভালবেসেছে চিল, ওকে মানুষ করবে।

গাছের আরো ওপরে সে বাঁধল দিব্যি বড়সড় বাসা। মানুষের সংসারের কোন জিনিস যখনি ওর চোখে ভাল লাগে, তখনি সেটি ছোঁ মেরে নিয়ে আসে মেয়ের জন্যে। খাবার, পোশাক, খেলনা, কোন অভাব নেই মেয়ের। ক্রমে মেয়ে সুন্দরী এক বালিকা হয়ে দাঁড়াল।

একদিন চিল দেখে রাজকন্যে নেমেছেন নদীর ঘাটে। গয়না, কাপড়, সব আছে ঘাটে, আর কি! সব চলে এল চিলের মেয়ের জন্যে। চিরুনি, আয়না, তেল, কুমকুম, কিছুর অভাব রইল না তার।

সুন্দরী বালিকা হ'ল সুন্দরী তরুণী। গাছই তার ঘরবাড়ি, তো চিল একদিন বলছে, 'বাছা! এখন তুমি বড় হয়েছ। একলাটি থাকো, বড় চিন্তা হয়। মাঝে মাঝে অনেক দূরে যাই তো! তাই বলি, কখনো কোন বিপদ বুঝলে, এই গানটি গাইবে বাস্!

> ও বাতাস!
> এই বটগাছের পাতায় তোলো মর্মর
> আমার মা'কে এনে দাও
> আমার চিল্নি মা!

আমি যেখানেই থাকি, গান শুনতেও পাব, এসেও পড়ব!'

এক গ্রীষ্মের দিনে এক সওদাগর বসেছে গাছের নিচে। পথ চলার শ্রম, রোদের তাত, একটু জুড়োতে। জঙ্গল নিশুত একেবারে, জনমনিষ্যির সাড়া নেই কোথাও। হঠাৎ এক গাছা লম্বা চুল হাওয়ায় ভেসে এসে তার কোলে পড়েছে। রেশমের মতো কোমল, সাত হাত লম্বা চুল।

অবাক হয়ে সওদাগর মুখ তুলে চেয়েছে। দেখে, গাছের ডালে আরাম্‌সে বসে এক সুন্দরী মাথা আঁচড়াচ্ছে। সওদাগর বিস্ময়ে হতবাক বললে হয়। সে বলছে, 'কে তুমি? দেবী না মানবী? না কোন পিশাচী? তুমি কি?'

মেয়ে চিল্নি মায়ের কাছে মানুষের কথা শুনেছে, কোনদিন মানুষ দেখেনি! প্রথম দেখায় ও ভয় পেয়েছে, কি জবাব দেবে তাও জানে না। তাই ও পাঠিয়ে দিল ওর গান,
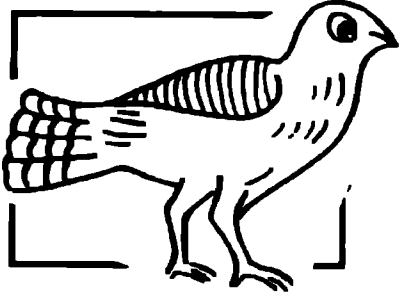
ও বাতাস!
এই বটগাছের পাতায় তোলো মর্মর
আমার মাকে এনে দাও
আমার চিল্‌নি মা!

তখনি চিল উড়ে এসে পড়েছে, 'কি হয়েছে বাছা, কি?'

মেয়ে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, গাছের নিচে মানুষ। চিলও তাকে দেখল। যে কোনো মায়ের মতই মনে মনে একটা ভেবে নিল, 'দেখতে যত ভালো, মানুষটা যদি তেমনি হয়, আমার মেয়ের স্বামী হিসেবে ভালই হবে।'

চিল নেমে এসে বসল রূপবান সওদাগরের কাছে। মেয়েটির আদ্যোপান্ত ইতিহাস খুলে বলল।

সওদাগর বলছে, 'দুনিয়ার ধনদৌলত সব আছে আমার। সাতটি বউও আছে। তাতে আপত্তি না থাকে তো তোমার মেয়েকে বিয়ে করব। কথা দিচ্ছি, ওকে ভালবাসব, যত্ন করব, কোন কিছুর অভাব হবে না ওর। নিমেষের তরেও কষ্ট পাবে না কোনো।'

সোজাসুজি, সম্মানজনক জবাব পেয়ে চিল খুশি। একটু ভেবেচিন্তে ও সম্মতি দিল। তাকে ছেড়ে সওদাগরের সঙ্গে যেতে মেয়েকে রাজী করাতে বেগ পেতে হ'ল। তবু চিল মেয়েকে মানিয়ে ছাড়ল।

এই শুভদিনের আশায় কনের সাজ, গহনা, সব তো জোগাড় করে রেখেছিল মা। সাজিয়ে গুজিয়ে মেয়েকে সওদাগরের হাতে সম্প্রদান করল ও! দু' চোখে ধারাজল, মা বলছে সওদাগরকে তার নয়নপুতলি মেয়েকে যেন আগলে রাখে। মেয়েকে কানে কানে বলছে, ওই গানটি গাইলেই মা এসে পড়বে।

সওদাগর বউ নিয়ে বাড়ি ফিরল। খুব ভালবাসে তাকে, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে নজর রাখে। তাতে তো সাত সতীন হিংসেয় জ্বলে মরে। ছোট বউয়ের এত রূপ? স্বামী তো তাদের ভুলে যাবে, এই ভয়। সাত সতীনই ছোট বউকে হেনস্তা করবে বলে কোমর বাঁধল।

একদিন সাত সতীন এসে বলছে, 'আহা হা! তুমি যেন রানী, আর আমরা দাসী, তাই ভেবেছ? নিজে খাবে আর ঘুমোবে। আমাদের কাজ সংসার ঠেলা, রাঁধা, বাসন মাজা, ঘর সাফসুতরো করা? যাও রানাঘরে! আজ রাঁধো আমাদের জন্যে।'

হতভাগী তো জীবনে হাঁড়িহেঁসেল জানে না। রান্নাঘরে বসে ও খানিক কাঁদল। তারপর মনে পড়ল চিল্‌নি মাকে। বাড়ির পিছনে ফলবাগানে গিয়ে ও গান পাঠিয়ে দিল বাতাসে। তখনি চিল উড়ে এসে পড়ল।

—'ডাকলি কেন মা? চোখে কেন জল?'

সব শুনে সে বলছে, 'এই কথা? এ কি এমন কাজ, যে আমরা পারব না?

তোকে দেখাই, কেমন করে রাঁধবি। এক হাঁড়িতে জল নে। এক দানা চাল ফেলে দে। এক কড়াইয়ে জল নে। খানিক শাকসবজি ফেলে দে। দুটোই বসা উনোনে। ক'টা কাঠ গুঁজে দে নিচে। ব্যস্! আর কিচ্ছুটি না করে হেঁসেল ছেড়ে বেরিয়ে যা! ফিরে এসে ঢুকবি যখন, দেখবি এত এত ভাত তরকারি রান্না হয়ে আছে। কে কত খাবে, খাক না। অন্নব্যঞ্জন ফুরোবেও না। গোটা সংসারটা খাক না। রান্না হবে অমৃত সমান, দেখে নিস!'

চিল উড়ে গেল। মেয়ে তো মায়ের কথামতো সব করল। নিমেষে দেবভোগ্য অন্নব্যঞ্জন তৈরি হ'ল।

সাত সতীনে খেতে বসেছে। তাদের থালার নিচে গর্ত। চেয়ে নিচ্ছে, গর্তে ফেলেছে। যত ফেলুক, অন্নব্যঞ্জন তো ফুরোয় না। খেয়ে দেখছে, আহা! বড়ই ভালো।

সাত সতীনই হার মানল।

আরেকদিন ওরা বলছে, গোহাল ঝাঁটপাট দিতে। মেয়ে তো জন্মে ঝাঁটা ধরে নি। সে কলাগাছের নিচে দাঁড়িয়ে গান ভাসিয়ে দেয় বাতাসে!

অমনি মা চলে আসে। সব শুনেমেলে বলে, 'এ কি একটা কাজ হল? ঝাঁটার একটা কাঠি নিয়ে গোহালের এদিক থেকে ওদিক বুলিয়ে যা। দেখ, কি হয়!'

মায়ের কথায় মেয়ে কাজ করে। গোহাল এমন ঝকঝকে হ'ল, এমনটি কেউ দেখেনি এতদিনে। সওদাগর ভারি খুশি। ছোট বউকে সে আরোই ভালবাসে।

'চৈত বিহু' পরবের দিন কাছে আসছে। সওদাগর আট বউকেই পাঁচ বস্তা তুলো দিয়েছে একটি করে। বলেছে সওদাগরের জন্যে পরবের পোশাক বানাতে। বলছে, সে দেখবে কার তৈরি পোশাক সবার সেরা হয়।

সাত সতীন কাজে নেমে পড়েছে। তুলো ধুনছে, কাপাস বীজ বেছে ফেলছে, সুতো কাটছে, তাঁতে বুনছে। ছোটবউও ওদের মতো এ কাজ করতে চায়। জানে না তো, মুখটি কালো করে ঘরের কোণে বসে আছে। সাত সতীন খুশিতে বলছে, 'এবারে ওর জারিজুরি ধরা পড়েছে। সুতো কাটতেও জানে না, বুনতেও জানে না। সওদাগর এবার ওকে খেদিয়ে দেবে, এ একেবারে খাঁটি কথা।'

রাতে মেয়ে ফলবাগানে গিয়ে কাঁদছে, গান গেয়ে ডাকছে মাকে। মা আত্তিপিত্তি উড়ে এসেছে ব্যাকুল হয়ে।

—'কি হ'ল সোনা? এমন সময়ে ডাকলি কেন?'—মেয়ে বলছে তাকে সুতো কাটতে হবে, বুনতে হবে, সে তো জানে না।

চিল বলছে, 'ভাবিস না। আমি চলে যাই, চারটে বাঁশের ঝাঁপিতে তুলো ঠেসে রাখ। ডালা এঁটে দে। অমনি রেখে দিবি। সোয়ামি যখন চাইবে, ওই বন্ধ ঝাঁপি হাতে তুলে দিবি।'

মেয়ে তো মায়ের কথামতো সব করেছে। সতীনরা তাঁত বুনছে ঠকঠকিয়ে, বাহার দিয়ে। এ মেয়ে কিছুই করছে না দেখে ওরা আনন্দে আটখানা। এ-ওকে বলছে, 'এ হাবি তো সুতো কাটতে, তাঁতে বুনতে মোটে জানে না। সওদাগর যখন পোশাক চাইবে বিহুর দিনে, মজাটা দেখব তখন! আর সবুর সইছে না গো!'

উৎসবের দিন সাত সতীন স্বামীকে তাদের বোনা পোশাক-আশাক দিয়েছে। মেয়ে দিচ্ছে চারটি ঝাঁপি। সতীনরা হাসে খল্‌খল্‌। সওদাগরও খানিক বিরক্ত।

—'এগুলো কি? আমার পোশাক কোথায়?'

—'ঝাঁপি খোলো, খুলে দেখ।'

ঝাঁপি খুলে সওদাগর থ'! কি অপরূপ না পোশাক! কাপড়ের জমিন এমন মিহি বুনোটের, অন্য পোশাকগুলো তার কাছে যেন চট! সওদাগর কেন, সতীনদেরও তাই মনে হ'ল। সাত সতীনের বানানো পোশাক সওদাগর ছিঁড়ে কুটে ফেলে দিল। অনেকদিন ধরে চিলের মেয়ের দেওয়া পোশাকই পরল।

ক্রমে ক্রমে সাত সতীন জেনেছে, ছোট বউ যে জাদুমন্তরে সব কাজ করে, তাকে সাহায্য করে এক চিল।

ওরা মন্ত্রণা করে চিলকে নিকেশ করার একটা উপায় বের করল। একজন ছোটবউয়ের পিছু পিছু ছায়ার মতো ঘুরে সেই গান শিখে নিল, যে গান গেয়ে ও চিলকে ডাকে।

তারপর গোহালে গিয়ে ছোট বউয়ের গলা নকল করে গানটি গাইল। যেমন গাওয়া, তেমন চিল উড়ে এসে পড়েছে। যেমন এসেছে, তেমন এই সতীন কাঁটা পেটা করে চিলকে মেরে ফেলেছে। মরা চিল গোবরগাদায় পুঁতে দিয়েছে তখনি।

চিলের মেয়ে তো জানে না কিছু। মা মরে গেছে তাও জানে না। কতবার গান পাঠায় বাতাসে, মা তো আসে না। ক্রমে তার মনে হ'ল কোথাও ঘটে গেছে অঘটন! একদিন বুঝল, সতীনরাই মেরে ফেলেছে চিল্‌নি মা'কে। শোকে সে উন্মাদিনী।

আর এমন সময়েই সওদাগরকে কাজে বিদেশ যেতে হ'ল। সাত বউকে বলে গেল, ছোট বউকে ওরা যেন দেখে।

সওদাগর যাবার ক'দিন বাদে নৌকো চড়ে এক ব্যাপারী এসেছে বেসাত নিয়ে। মেয়েদের মনোমত চিরুনি, আয়না, তেল, সিঁদুর, কত কি! সাত সতীন গিয়ে এত এত সওদা করেছে। আর ব্যাপারীকে বলছে, দাম হিসেবে ওরা এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী মেয়েকে দিতে পারে। অমন রূপ ব্যাপারী জীবনে দেখে নি। রূপের ব্যাখ্যানা করছে এত ছাঁদে, যে ব্যাপারীও অধীর সে কন্যা পেতে।

সাত সতীন ছোট বউকে লোভাচ্ছে ব্যাপারীর বেসাত দেখতে। ছোট বউ বলছে, 'না রে দিদিরা! ও সব আমি চাই না। আর সোয়ামি বলে গেছে যেন ঘর ছেড়ে কোথাও না যাই!'

সতীনরা কি ছেড়ে দেবার পাত্র? তারা তুইয়ে তুইয়ে ওকে রাজী করিয়েছে।

ঘাটে গেছে ওরা, উঠেছে ব্যাপারীর নায়ে। ছোট বউ বেসাত দেখে. ওরা নেমে এসেছে, ঈশারা করেছে, তা বুঝে নিয়ে মাঝিমাল্লা নৌকোর কাছি কেটে দিল, ব্যাপারী ছোট বউকে নিয়ে চলে গেল না' বেয়ে।

নিজের ঘরে নিয়েই বলে কাজ করতে। ঘর তার নদীর ধারে। ছোট বউ সারাদিন রোদে বসে সুঁটকি মাছ পাহারা দেয়। বসে বসে মনের দুঃখে রোজ গায় এক গান,—

আমার মা ছিল কুমোরের বউ
আমাকে ভাসিয়ে দেয় নদীতে
আমার চিল্‌নি মা আমাকে মানুষ করল
রাজপুত্তুর হেন সওদাগরকে স্বামী পেলাম
সাত সতীনে বেচে দিল এক জেলের কাছে
তাই বসে থাকি, সুঁটকি মাছ সামলাই।।

অনেকদিন বাদে সওদাগর ঘরে ফিরছে নৌকায়। গান শুনেই ও গলা চিনেছে। মাঝিদের বলেছে নাও বাঁধতে। আনন্দে বিবশ সওদাগর, গান গাইছে তো তার ছোট বউ।

আতিপিতি কাছে গিয়ে শুধোচ্ছে, এখানে সে কেমন করে এল?

বউ স-ব খুলেমেলে বলেছে।

সওদাগর তো বউকে নৌকায় তুলে বাড়ি ফিরছে। বাড়ি ফিরে বউকে রেখেছে মস্ত সিন্ধুকে. তাতে শ্বাস নেবার জন্যে ছিদ্দির করা।

সাত বউকে ডেকে বলছে, ছোট বউ কোথায়?

তারা তো এক সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলছে, সে গেছে তার মায়ের বাড়ি, আর তো ফেরেনি।

সওদাগর বলছে, 'সন্দ' করি, তোমরা তাকে কিছু করেছ। সত্যি বলছ, না মিথ্যে, পরখ করে দেখতে হচ্ছে। তোমাদের পরীক্ষা নেব।'

তার হুকুমে এক পাতাল সমান গর্ত খোঁড়া হল। তাতে ঢালা হল কাঁটা। গর্তের এদিক-ওদিক টান টান বাঁধা হল সুতো। সওদাগর বউদের বলছে, সুতো দিয়ে হেঁটে গর্ত পার হতে।—'যদি নির্দোষী হও, কিচ্ছু হবে না। যদি দোষী হও, পড়বে আর মরবে।'

বউরা অনেক চেষ্টা করল, সওদাগর নিরস্ত হ'ল না। বউদের পরীক্ষাটি দিতেই হ'ল। সুতো দিয়ে হেঁটে গর্ত পেরোতে গিয়ে ছয় বউ পড়ে গেল। শেষবার সুতো ছিঁড়ে পড়ল। তো নতুন সুতো বাঁধা হ'ল। সাত নম্বর বউই নির্ভয়ে পেরিয়ে গেল।

সে তো দোষীই নয়। হেঁসেলে কাজে ব্যস্ত ছিল, ছোট বউকে ব্যাপারীর নাওয়ে

তোলার ব্যাপারে ও ছিল না কোথাও। ও সাতবার পারাপার করল. সুতো কিন্তু ছেঁড়ে নি।

ছয় বউকে 'হেঁটে কাঁটা ওপরে কাঁটা' গর্তে পুঁতে সওদাগর সাত নম্বর বউ আর চিলের মেয়েকে নিয়ে সুখে ঘর করতে লাগল।

আ-র! আমরা চলে এলাম বাড়ি। ধোপা বাড়িতে কাপড় পাঠাতে হবে তো!

কুসুমিত গাছ

কন্নড়
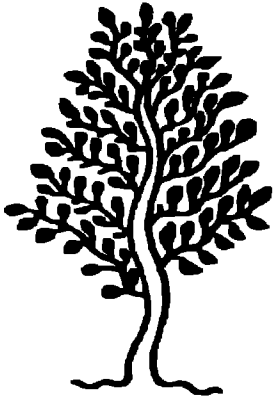
এক নগরে এক রাজা, তাঁর দুই মেয়ে, এক ছেলে। বড় মেয়েটির বিয়ে হয়েছে।

সেই নগরেই এক বুড়ি, তার দুই কন্যে। দাসীবৃত্তি করে বুড়ি এদের খাওয়ায়, পরায়, মানুষ করে। যৌবন এলে ছোটবোন বলে, 'দিদিরে! একটা কথা ভাবছি। আমাদের জন্যে মা খেটে মরছে রে! বড় সাধ, মা'কে খানিক সাহায্য করি। আমি হব এক ফুলে ভরা গাছ। তুই ফুল কুড়োবি, ভালো দামে বেচবি।'

অবাক বড় বোন শুধোয়, 'কেমন করে ফুলে ভরা গাছ হয়ে যাবি রে?'

—'পরে বলবখ'ন। তুই গোটা বাড়িটা ঝাঁট দিয়ে সাফ করে ফেল। তারপর নেয়ে ধুয়ে কুয়োতলা যাবি। দু' ঘড়া জল আনবি খুব সাত্ত্বিক ভাবে, জলে নখ ছোঁয়াবি না।'

বড়বোন অবাক-অবাক থেকেই সব করে ফেলল। জল আনল দু' ঘড়া।

ওদের বাড়ির সামনে একটা গাছ আকাশপানে মাথা তুলেছে। ছোটবোন সে গাছতলা ঝেঁটোল, নিকোল, লেপল। দু' বোন গেল সেখানে। ছোটবোন বলছে, 'দিদিরে! গাছের নিচে আমি ধ্যানে বসছি। এক ঘড়া জল ঢেলে দিবি আমার গা-মাথা ধুইয়ে। আমি হয়ে যাব এক ফুলে ভরা গাছ। যত চাস, তত ফুল তুলিস, ডালটি ভাঙবি না, পাতাটি ছিঁড়বি না। ফুল তুলে নিয়ে গাছে আরেক ঘড়ার জল ঢালবি, আমি মানুষ হয়ে যাব।'

ছোটবোন বসে ঈশ্বরের ধ্যান করছে, বড়বোন এক ঘড়া জল তার মাথায় ঢালল। সঙ্গে সঙ্গে ছোটবোন এক আশ্চর্য কুসুমিত গাছ। সে গাছ যেন মাটি থেকে আকাশকেও ছুঁয়েছে।

বড়বোন বড় সন্তর্পণে ফুল তুলছে। ডালটি ভাঙে না, পাতাটি ছেঁড়ে না, ওর

সাজি ভরে ওঠে, ফুল তোলা হয়ে গেলে ও অন্য ঘড়ার জল ঢেলে দেয়। কোথায় গাছ? এ তো তার ছোট বোনটি। দু' বোন ফুল আনে ঘরে। স্বপ্নের মতো নরম সুবাস সে ফুলে। দু' বোনে মালা গাঁথে।

—'কোথায় বেচব রে?'—বড়বোন শুধোয়।

—'দিদি, সব নিয়ে যা না কেন রাজবাড়িতে? ওরা দাম দেবে ভালো! মা কি সব যা তা কাজ করে বেড়ায়! আমরা খানিক টাকা জমিয়ে মাকে আবাক করে দেবো।'

বড়বোন ফুলের ঝুড়ি নিয়ে রাজবাড়ি গেছে। ডেকে বলছে, 'ফুল চাই, ফুল? কে নেবে ফুল?'

রাজকন্যে ফুল দেখে বলছে, 'মা! মা! কি সুবাস এ ফুলে। দাও না কিনে আমাকে?

—'বেশ! ফুলওয়ালীকে ডাকো!' রানী আর রাজকন্যে দেখছেন কি অপরূপ ফুল। রানী শুধোচ্ছেন, 'কত চাও গো মেয়ে?'

—'আমরা তো গরিব। যা মন চায়, দেবেন।'—ওরা একমুঠো টাকাপয়সা দিয়ে স-ব মালা কিনে নিলেন।

দিদি ঘরে আসতে বোন বলছে, 'দিদি, দিদি! মাকে বলিস না রে! পয়সা লুকিয়ে রাখ্।'

পাঁচদিন ফুল বেচল ওরা, পাঁচ মুঠো পয়সা পেল।

—'মাকে দেখাব?—দিদি বলছে।

—'না না, মা রেগে যাবে, মারবে আমাদের।' দু' বোন ভাবল টাকা করে নিই খানিক।

একদিন রাজপুত্তুর দেখেছে ফুল। অপরূপ সুগন্ধ সে ফুলে। অমন ফুল সে কোথাও দেখেনি। সে ভাবছে, 'এ কি ফুল? কোথায় এ ফোটে, কেমন সে গাছ? কে আনে ফুল?'

যে ফুল আনে, তাকে সে দেখল। পিছু পিছু গিয়ে বুড়ির বাড়িও দেখে এল। কিন্তু কোথাও কোন ফুলে ঝলমলে গাছ দেখল না। ঘরে ফিরছে আর ভাবছে, 'কোথায় ওরা এমন নন্দন কুসুম পায়?'

পরদিন আঁধার না কাটতে রাজপুত্তুর গিয়ে সেই উঁচু গাছটায় উঠে লুকিয়ে আছে। দেখছে দু' বোন গাছতলা ঝাঁট দিল, জল ঢেলে ধুয়ে দিল। ছোট বোন হয়ে গেল ফুলে ভরা গাছ। বড়বোন সন্তর্পণে ফুল তুলে নিল। গাছটা আবার হয়ে গেল ছোটবোন। রাজপুত্র স্বচক্ষে সব দেখছে।

বাড়ি ফিরে উপুড় হয়ে মুখ ঢেকে সে বিছানা নিল। বাপ আসে, মা আসে, কি হয়েছে তা শুধায়। ছেলের মুখে কথা নেই। রাজপুত্রের বন্ধু মন্ত্রীপুত্র শুধোচ্ছে,
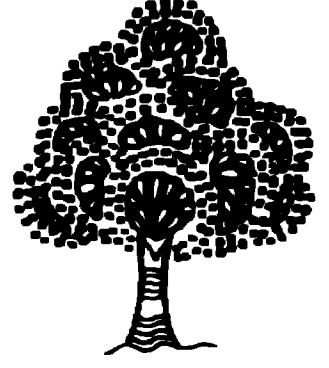
'ব্যাপার কি? তোমার মনে আঘাত দিয়ে কেউ কি কিছু বলেছে? কি চাও? আমাকে বলো!'

রাজপুত্র বলছে সুন্দরী কন্যের ফুলগাছ হয়ে যাবার কথা। মন্ত্রীপুত্র বলেছে, 'ও! এই কথা?'

সে তড়িঘড়ি গিয়ে রাজাকে সবই বলছে। রাজা ডাকলেন মন্ত্রীকে, মন্ত্রী ডাকল বুড়িকে। বুড়ি ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে এল। ছেঁড়াখোঁড়া কাপড় পরনে, দোরের কাছে দাঁড়াল। অনেক বলতে তবে বসল। রাজা ওকে শান্ত করে মিষ্টি গলায় বললেন, 'তোমার দুটি মেয়ে আছে, একটি দেবে আমাকে!'

বুড়ির ভয় বেড়ে গেল।—'রাজা আমার মেয়েদের কথা জানল কি করে?'

তারপর কোনমতে তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে বলল, 'হ্যাঁ মহারাজ! আমার মতো গরিবের পক্ষে একটা মেয়ে দিয়ে দেওয়া কোন ব্যাপার নয় তো! কোন ব্যাপার না কি, আপনি তো চাইছেন একটিকে।'

রাজা রুপোর থালায় বুড়িকে পানসুপারি দিলেন। এটা বিয়ের আশীর্বাদের প্রথাও বটে, যাকে বলে পাকা দেখা। পান নিতে ভয় পাচ্ছিল বুড়ি, রাজার কথায় তা নিতেই হ'ল। সেও ফিরে গেল বাড়ি।

বাড়িতে ফিরেই বুড়ি মেয়েদের ঝাঁটাপেটা করছে। বলছে, 'হারামজাদী! কোথা গিয়েছিলি তোরা? রাজা তোদের চেয়ে পাঠাচ্ছে। কোথায় গিয়েছিলি?'

বেচারী মেয়েরা বোঝে না কিছুই। তারা কেঁদে ভাসাচ্ছে, 'মা! এত মারছ ,এত গাল পাড়ছ কেন?

'তবে কি পরকে মারতে যাব? গিয়েছিলি কোথায়? রাজা কেমন করে তোদের কথা জানল?'

বুড়ির রাগ আর পড়ে না। তখন ভয়ে কাঁটা কাঁটা মেয়েরা সব কথা বলল। কেমন করে ছোটমেয়ে হয়ে যায় এক কুসুমিত গাছ, ওরা ফুল তোলে, বেচে, পয়সা জমায়, মাকে অবাক করে দেবে বলে। পাঁচ মুঠো টাকাপয়সাও দেখাল ওরা।

'আমি একটা গুরুজন রয়েছি বাড়িতে, তোরা এ সব করার সাহস পেলি কি করে? ওঃ, মানুষ হবে ফুল গাছ! কে কবে এমন কথা শুনেছে? সব মিছে কথা। দেখা, দেখা কেমন করে তুই ফুলগাছ হোস?'

চেঁচিয়েই যাচ্ছে বুড়ি, মেরেই যাচ্ছে মেয়েদের। অবশেষে তাকে শান্ত করার জন্যে ছোট মেয়ে মায়ের চোখের সামনে এই হ'ল ফুল ভরা গাছ, আবার হ'ল ছোট মেয়ে।

পরদিন রাজার লোকজন এসেছে বুড়ির বাড়ি। দরবারে ডাকছে তাকে। বুড়ি গেছে সেখানে। বলছে, 'মহারাজ! আমার কাছে কি চান আপনি?'

—'বলো, বিয়ের দিন ঠিক করবে কবে?'

—'কি বলব মহারাজ? আপনি যা বলবেন. তাই হবে।' বুড়ি কিন্তু মনে মনে খুশি এখন।

বিয়ের তোড়জোড় শুরু হ'ল। আকাশের মতো বড় বিয়ের মণ্ডপের মেঝে, তাতে দেয়া হ'ল আলপনা। বিয়ের কলাত্ত যেন পৃথিবীটা ঢেকে ফেলবে। সব আত্মীয়কুটুম এলেন। আর যে মেয়ে জানে এক কুসুমিত গাছ হয়ে যেতে, তার সঙ্গে শুভদিনে শুভলগ্নে রাজপুত্তুরেরর বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর দম্পতিকে রাখা হ'ল একটি আলাদা মহলে। ওরা নিজের মতো থাকুক। কিন্তু বরও যেমন এড়োছাড়া, বউও তাই। দুটি রাত কেটে গেল। বউ ভাবছে, ও আগে কথা বলুক! বর ভাবেছ, ও আগে ও আগে কথা বলুক!

আর দুজনেই মুখটি খুলছে না।

তৃতীয় রাতে বউ ভাবছে, 'একটি কথাও কয়নি আমার সঙ্গে। আমাকে বিয়ে করল কেন?'

মুখে বলছে, 'এ রকম সুখশান্তির জন্যেই আমাকে বিয়ে করেছিলে না কি?'

রাজপুত্র রাগী-রাগী গলায় বলল, 'তবেই কথা কই, যদি যা বলি তাই করো।'

—'সোয়ামি যা বলবে তা করব না না কি? বলেই ফেল কি চাও।'

—'তুমি তো জানো ফুলে ভরা গাছ হয়ে যেতে, জান না? দেখাও আমাকে, ফুল ভরা গাছ হয়ে যাও। আমরা ফুলের শযোয় শোব, অঙ্গে ফুলের চাদর বিছাব। সে কি চমৎকার না হবে।'

—'প্রভু! আমি দেবী বা দানবী নই। সবার মতো আমিও এক সাধারণ মানুষ! মানুষ কি পারে ফুলগাছ হতে?'

—'এ সব ধাপ্পা মারা মিছে কথা চাই না। সেদিন স্বচক্ষে দেখেছি তুমি ফুলগাছ হয়ে গেলে। আমার জন্যে ফুলগাছ হতে পার না? কার জন্যে হবে?'

শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে বউ বলছে, 'আমার ওপর রেগে যেও না। এত চাইছ যখন, যা বলছ তা করব। দু' ঘড়া জল আনো।'

রাজপুত্তুর জল আনল। বউ সে জলে মন্তর পড়ল। কুমার ঘরের দোর জানলা বন্ধ করল।

বউ বলল, 'সাবধানে ফুল তুলো আশ মিটিয়ে। তবে একটি ডাল ভেঙো না, একটি পাতা ছিঁড় না।'

ও যখন মেঝেতে বসে ঈশ্বরের ধ্যান করবে, তখন কিভাবে ঘড়ার জল ঢালতে হবে, বউ বলে দিল।

সেইমতো কুমার জল ঢেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল এক কুসুমিত গাছ। ফুলের সুবাস ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। কুমার আশ মিটিয়ে ফুল তুলল। তারপর আরেক ঘড়ার জল ঢালতেই গাছ হয়ে গেল বউ। মাথার চুল ঝাঁকিয়ে বউ হাসল।

সে ফুল ওরা ছড়িয়ে দিল, বিছিয়ে দিল, ফুলে ঢেকে নিল নিজেদের, যখন শুয়ে পড়ল। দিনের পর দিন ওরা এই কাজই করে। সকালে জানলা দিয়ে ফেলে দেয় বাসি ফুল। ফুল জমে যেন পাহাড়।

রাজার ছোট মেয়ে সে বাসি ফুলের স্তূপ দেখেছে। দেখে রানীকে বলছে, 'মা! দাদা বউদি এত এত ফুলে সাজে, ফেলেও দেয়। ফুল জমে যেন পাহাড়! আমাকে একটি ফুল দেয় না গা!'

রানী সান্ত্বনা দিচ্ছে, 'দুঃখ করিস না। বলব ওদের, তোকে দেবে ওরা।'

তো রাজকন্যে চুপিসাড়ে উঁকি দিয়ে ফুলের গোপন রহস্য জেনে নিয়েছে। একদিন কুমার কোথায় গেছে, তো রাজকন্যে ডেকেছে তার সখীদের, বলছে, 'চল আমরা 'সুরাহোন্নে' বাগানে ঝুলা ঝুলতে যাই। আমার বউদিকেও নিয়ে যাব। দেখিস, সে কেমন হয়ে যাবে ফুল ঝলমলে গাছ। সবাই আয়! সকলকে আমি আশ্চর্য সুগন্ধ ফুল দেব!'

রাজকন্যে মায়ের অনুমতি চাইছে। রানী বলছে, 'নিশ্চয় যাবি। এমন কথায় কেউ 'না'বলে?'

—'আমি একলা যেতে পারি না। বউদিকেও পাঠাও না!'

—'দাদার অনুমতি নিয়ে ওকে নিয়ে যা।'

তখনি ঘরে ঢুকেছে কুমার। বোন বলছে, 'দাদা! দাদা! আমরা সবাই 'সুরাহোন্নে' বাগানে ঝুলা ঝুলতে যাচ্ছি। বউদি যাবে আমাদের সঙ্গে?'

দাদা বলছে, 'আমার কথায় কি এসে যায়? এ তো মা বলবেন, কি হবে।'

রানীর কাছে রাজকন্যে নালিশ করছে, 'মা! দাদাকে বলি, তো সে তেমার কাছে পাঠায়। তবে তুমি তো বউদিকে পাঠাতে চাও না। তাই নানা অছিলা করছ। মা! বউ বড়, কি মেয়ে বড় তোমার কাছে?'

রানী তিরস্কার করে বলছে, 'এ আবার কেমন বিশ্রি কথা? ঠিক আছে, বউমাকে নিয়ে যাও, তবে ওর ওপর খেয়াল রেখো। ভালোয় ভালোয় ওকে সন্ধ্যের আগেই ফিরিয়ে এনো।'

বড় অনিচ্ছায় রানী বউকে পাঠাল।

সবাই গেল 'সুরাহোন্নে' কাননে। একটা বড় গাছে দোলনা বেঁধে সবাই মহানন্দে দুলতে থাকল।

হঠাৎ রাজকন্যে দোলনায় দোলা বন্ধ করে দিল। সকলকে নামাল দোলনা থেকে। তারপর ভাইবউকে ঘিরে ধরেছে।

—'বউদি! তুমি তো ফুলে ভরা গাছ হয়ে যেতে পার, পার না? দেখ, আমাদের

কারো চুলে পরবার ফুল নেই।'

বউদি রেগে বলছে, 'কে তোমায় বলল এ সব আজগুবি রাবিশ? তোমাদের মতই আমিও মানুষ নই? অমন যা-তা বোক না তো!'

রাজকন্যে ওকে ঠুকে ঠুকে বলছে, 'আরে বাবা! আমি সবই জানি। আমার সখীদের চুলে পরতে ফুল নেই। বউদিকে বলছি, ফুলগাছ হও! চারটি ফুল দাও! দেখ, কত ঢং না করছে! আমাদের জন্যে ফুলগাছ হতে পার না, কেমন? সে কি হও, তোমার প্রেমিকদের বেলা।'

'ছি ছি! তুমি ভারি জঘন্য মেয়ে। এখানে আসাটাই ভুল হয়েছিল আমার।'

বড় দুঃখে, অশান্ত মনে ও ফুলগাছ হতে রাজী হ'ল।

দু' ঘড়া জল আনাল ও, জলে মন্তর পড়ল। মেয়েদের পই পই করে বোঝাল, কখন জল ঢালতে হবে, আর ধ্যানে বসল। মেয়েগুলোর মাথায় কিছু নেই, তারা মন দিয়ে শুনলও না। জল ঢালল ছ্যাড়ব্যাড়া করে, সবটা গা ভিজলও না। ফলে বউটি গাছ হ'ল বটে, সে যেন আধখানা গাছ।

সন্ধ্যে হয়েছে, বাজ বিজুলী হেনে বৃষ্টি নেমেছে। ফুলের লোভে মেয়েরা ডাল ভাঙছে, পাতা ছিঁড়ছে, ফুল নিচ্ছে। ঘরে ফেরার তাড়ায় ওরা যেমন তেমন করে দ্বিতীয় ঘড়ার জল ছিটিয়ে দিয়ে পালাল। গাছ হয়ে গেল মানুষ। তার হাত নেই, পা নেই, মাথা আর ধড়টা আছে। সেও ক্ষতবিক্ষত একটা মৃত প্রায় মাংসপিণ্ড।

বৃষ্টির জল প্লাবনে গড়িয়ে গড়িয়ে ও পড়ল এক নালায়। সে নালার বাঁ আটকে থাকল। কোথায়, কত দূরে তার বাড়ি!

পরদিন সকালে তুলো বোঝাই সাত আটটা গাড়ি যাচ্ছিল। এক গাড়োয়ান দেখেছে মাংসপিণ্ড সদৃশ একটি মানুষ নালায় পড়ে গোঙাচ্ছে। এক গাড়োয়ান বলল, 'কিসের আওয়াজ? দেখ তো!'

আরেক জন বলছে, 'ছেড়ে দাও তো! আমরা চলে যাই। হয়তো বাতাস গোঙাচ্ছে, নয় কোন প্রেতিনী বিলাপ করছে, কে জানে?'

শেষ গাড়িটির গাড়োয়ান গাড়ি থামিয়ে ঘুরে দেখল। মাংসস্তূপ পড়ে আছে একটা, ঢুলঢুলে মুখটি এক সুন্দরী মেয়ের। সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

—'হায় রে হতভাগিনী!' লোকটি তার পাগড়ি খুলে মেয়েটাকে জড়িয়ে নিয়ে তার গাড়িতে তুলল। সঙ্গীদের অসভ্য হাসিঠাট্টা গায়ে মাখল না।

শীঘ্রই পৌঁছল শহরে। গাড়ি দাঁড় করিয়ে ওরা এক ভাঙা মন্দির মণ্ডপে মেয়েটাকে শুইয়ে দিল। গাড়ি ছাড়ার আগে গাড়োয়ানটি বলল, 'কেউ না কেউ দেখতে পাবে তোমাকে, খেতেও দেবে। তুমি বেঁচে যাবে।'

ওরা চলে গেল।

রাজকন্যে একা ঘরে ফিরতে রানী শুধোচ্ছে, 'তোমার বউদি কোথায়? দাদা

বলবে কি?'

রাজকন্যে খুব সহজ ভাবে বলল, 'কে জানে? আমরা সবাই তো পথ চিনে বাড়ি ফিরলাম। সে কোথা গেল, কেমন করে জানব?'

রানী ঘাবড়ে গেছে। মেয়ের পেট থেকে কথা বের করতে চেষ্টা করছে। বলছে, 'ছি ছি! অমন কথা বলতে নেই। দাদা ক্ষেপে যাবে। বলো কি ঘটেছে।'

রাজকন্যে যা-খুশি, যেমন-খুশি বকে যাচ্ছে। রানী তো কিছুই বুঝল না। মনে সন্দেহ হ'ল, মেয়ে কোন অন্যায় করেছে।

কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। রাজপুত্র ডাকছে, 'মা! অ মা!'

—'কি হ'ল বাছা?'

—'আমার বউয়ের হ'লটা কি? বোনের সঙ্গে ঝুলায় ঝুলতে গেল, ফিরেই এল না?'

—'হায় রামচন্দ্র! আমি ভাবছি সে তোর শোবার ঘরে। এখন আমাকে শুধোচ্ছিস?'

রাজপুত্র ভাবল, 'নিশ্চয় কোন ভীষণ বিপদ হয়েছে ওর।' সে মনের দুঃখে বিছানা নিল।

পাঁচদিন, ছ'দিন করে পনেরো দিন কেটে গেল, বউয়ের খবর নেই। তার খোঁজই মিলল না।

মা'কে, দাসদাসীকে রাজপুত্র শুধোচ্ছে, 'গাধা মেয়েগুলো তাকে পুকুরে ফেলে দিল? কুয়োতে ফেলে দেয়নি তো? কি করে এল ওরা?'

কে কি জবাব দেবে? সবাই চিন্তিত, ভয়ে স্তম্ভিত। দুঃখে ও হতাশায় রাজপুত্র সন্নেসীর গেরুয়া পরে বেরিয়ে গেল। কোথায় যাচ্ছে খেয়াল নেই, সে শুধু হাঁটতে থাকল।

এদিকে, যেমন করেই হোক সেই না-মানুষটা পৌঁছেছে সেই শহরে, যেখানে তার বড় ননদের বাড়ি। প্রাসাদের দাসীরা জল নিতে যেতে-আসতে ওকে দেখে। নিজেরা বলাবলি করে, 'কি ঝলমলে মুখ' যেন কোনো রাজার মেয়ে!'

একজন আর সইতে পারল না, রানীর কাছে গেল।

—'মা ঠাকরুন! ওকে দেখতে একেবারে আপনার ছোট ভাইয়ের বউয়ের মতো। আয়না দিয়ে দেখুন!'

রানী দেখল। মুখখানা তো বড়ই চেনা-চেনা। এক দাসী বলল, 'মা ঠাকরুন! ওকে প্রাসাদে নিয়ে আসব?'

রানী উড়িয়ে দিল সে কথা।—'খাওয়াতে হবে, সেবাযত্ন করতে হবে। রাখো তো!'

পরদিন দাসীরা বলাবলি করছে, কাতরোক্তিও করছে, 'এমন সুন্দরী! প্রাসাদে ও

এলে যেন আলো জ্বলে উঠবে। ওকে নিয়ে আসব?'

—'ঠিক আছে বাবা। আনতে চাও তো আনো। তবে বাড়ির কাজে ফাঁকিদারি চলবে না, আর ওর দেখাশোনা তোমরাই করবে, হ্যাঁ!

তাতেই রাজী হয়ে ওরা না-মানুষটিকে বয়ে আনল প্রাসাদে। তেল মাখিয়ে নাইয়ে ধুইয়ে ভাল পোশাকে সাজিয়ে দরজায় বসিয়ে রাখল। রোজ মলম লাগিয়ে ওর ঘা সারাল। কিন্তু ওকে তো গোটা করা গেল না। ও সেই আধখানাই থেকে গেল।

এদিকে রাজপুত্র নানাদেশে ঘুরতে ঘুরতে ও শহরে পৌঁছেছে। বসেছে তার দিদির প্রাসাদেরই বাইরে।

চেহারা উন্মাদের মতো। দাড়িগোঁফে জঙ্গল হয়ে গেছে। জল আনতে যেতে-আসতে দেখে দাসীরা এসে বলছে, 'রানী মা! ফটকের বাইরে বসে আছে একটা লোক। দেখতে ঠিক আপনার ছোট ভাইয়ের মতো। দূরবীন দিয়ে দেখুন!'

গজর গজর করতে করতে বারান্দায় বেরিয়ে রানী চোখে দূরবীন লাগিয়েছে। দেখে তো সে বিস্ময়ে হতবাক!—'এ তো একেবারে যেন আমার ভাই! কি হ'ল ওর, যে গেরুয়া পরে বেরিয়ে পড়েছে? ও কি সন্নেসী হয়ে গেছে? অসম্ভব!'

দাসীদের পাঠিয়েছে ওকে ভেতরে ডাকতে। দাসীরা বলছে, 'রানীমা আপনাকে দেখতে চান।'

—'কেন? আমাকে দেখতে চান কেন?'

—'না দেবন! সত্যিই দেখতে চান! আসুন, দয়া করে আসুন।'

অনেক চেষ্টায় ওরা তাকে ভেতরে এনেছে, রানী একবার চেয়েই বুঝেছে, এ তারই ছোট ভাই।

রানীর হুকুমে প্রাসাদের দাসরা হাঁড়ি হাঁড়ি জল গরম করছে, কড়াই কড়াই তেল গরম করছে, ভাইকে নাওয়ানো ধোয়ানো হবে। নিত্যি নতুন নতুন ব্যঞ্জন পরিবেশন করে, নিত্যি নতুন পোশাক পরায়। সবই হয়, ভাই কিন্তু দিদির সঙ্গে একটি কথা বলে না। জিগ্যেসও করে না, 'তুমিই বা কে? আমি আছি বা কোথায়!'

অথচ দুজনেই মনে জানছে আমি ভাই, ও দিদি!

রানী ভাবছে, 'এমন রাজার আদরে রেখেছি, মোটে কথা কয় না কেন? কারণ কি? কোনো ডাইনি বা পিশাচ কি জাদু করেছে ওকে?'

একেকটি সুন্দরী দাসীকে একেক রাতে ভাইয়ের শোবার ঘরে পাঠায়। তারা কত আদর করে, গায়ে হাত বুলায়, কুমার কারো হাতটাও ধরে না, কথাও বলে না।

রানীও তিতিবিরক্ত। তাঁর অনুমতি নিয়ে দাসীরা সেই আধখানা মানুষ বা না-মানুষকে বসিয়ে দিয়েছে কুমারের বিছানায়।

সে তো তার নুলো হাতের কনুই কুমারের পায়ে বোলাচ্ছে, আর গোঙাচ্ছে।

কুমার ধড়মড়িয়ে উঠে ওকে নিরীখ করে দেখতে দেখতে বুঝল, এ তারই হারিয়ে যাওয়া বউ!'

সে শুধোল, কি হয়েছিল।

এতগুলো মাস মুখে বোল ছিল না যার, এখন সে কথা কইছে। কার মেয়ে, কার বউ, কপালে কি ঘটল, সব বলছে।

কুমার বলছে, 'এখন আমরা করি কি?'

—'কি আর করার আছে? চেষ্টা একটা করতে পারি। দু' ঘড়া জল আনো, তাতে নখের ছোঁয়া যেন না লাগে।'

সকলের চুপিসাড়ে কুমার জল আনল। সে জলে মন্তর পড়ে বউ বলছে, 'এক ঘড়া জল ঢাললে আমি গাছ্ হয়ে যাব। একটি ভাঙা ডাল দেখবে, জুড়ে দিও। একটি পাতা ছেঁড়া থাকলে বেঁধে দিও। তারপর গাছের মাথায় জল ঢেলো।'

এবারে ও ধ্যানে মগ্ন হ'ল।

কুমার প্রথম ঘড়ার জল ঢালল। বউ গাছই হ'ল বটে, কিন্তু ডালপালা তার ভাঙা, পাতাগুলো ছেঁড়া। সব সযত্নে মেরামত করল কুমার। আর ধীরে ধীরে গাছকে উবুচুবু স্নান করাল ঘড়ার জলে। আবার সে এক সম্পূর্ণ মানুষ। দাঁড়িয়ে উঠে, চুল থেকে জল ঝেড়ে স্বামীর পায়ে পড়ল।
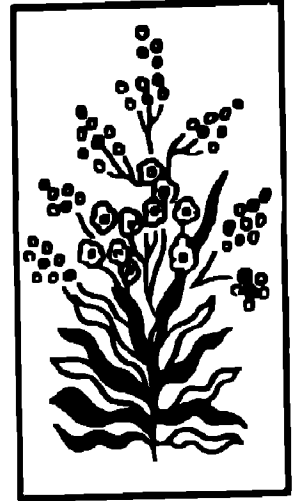
তখনি গিয়ে ও বড় ননদকে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলে প্রণাম করল। বিস্মিত রানীকে বলল সব কথা। রানী কাঁদছেন আর ওকে বুকে জড়াচ্ছেন।

তারপর বর কনেকে সিংহাসনে বসিয়ে 'হাসে' প্রথা পালন করলেন। অনেকদিন রাখলেন কাছে, তারপর অনেক উপঢৌকন দিয়ে বাপের বাড়ি পাঠালেন।

যারা হারিয়ে গিয়েছিল, সেই ছেলে, সেই বউ পেয়ে রাজার আনন্দ দেখে কে? নগর তোরণে ওদের স্বাগত জানিয়ে ওদের নিয়ে হাতির পিঠে বসিয়ে শহরের পথে বের করলেন এক জমকালো শোভাযাত্রা। প্রাসাদে কুমার আর বউরানী, রাজা ও রানীকে সকল সত্য কথা খুলে বললেন। রাজা এক গর্ত কাটালেন। তাতে সাত পিপে ফুটন্ত চুন ঢাললেন, আর তার মধ্যেই ফেলে দিলেন ছোট মেয়েকে। যারা দেখল, তারা বলল, 'পাপ করলে পাপের শাস্তি পেতেই হয়।'

সঙ্গীতপ্রিয় দৈত্য

তামিল

এক ভারি গরিব বামুনের গরিবিতে ঘেন্না ধরে গেল। সে পুণ্যধাম কাশীতে চলল তীর্থ করতে। তাতাপোড়া রোদ্দুরে যোজন যোজন হেঁটে সে বসেছে এক ছায়াঢাকা কাননে। একটু জিরোবে, চারটি পান্তা ভাত খাবে। গাছের নিচে বসেছে হিসি করতে, একটা গভীর অমানুষী গলা গর্জে বলল, 'কোর না।' ঝটপট দাঁড়িয়ে উতিউতি চাইছে, গলাটা এল কোথা থেকে! কাউকেই তো দেখতে পায় না। কাছাকাছি এক পুকুরে গেছে মুখ ধুতে, আবার সেই গলা, 'কোর না!' এখন ও হাত মুখও ধু'ল, কোন হুঁশিয়ারি মানল না। ভাতের পোঁটলা খুলে খেতেও বসল। আবার শোনে, 'খেও না!' কানটিও না দিয়ে ও ভাত খেল। বন ছেড়ে চলে যাচ্ছে যখন, শোনে, 'যেও না।' দাঁড়িয়ে পড়ে বামুন এদিক-সেদিক চায়। জনমনিষ্যি তো দেখে না। সে হেঁকে বলছে, 'কে হে তুমি? এমন চেঁচাচ্ছ বা কেন?'

—'ওপর বাগে তাকাও, আমাকে দেখতে পাবে।' স্বরটা ওপর থেকেই আসছে বটে। ওপর বাগে চেয়ে বামুন দেখে, এক বেম্মদত্যি বামুনকে তার জীবনের করুণ কাহিনী শোনাচ্ছে। 'গতজন্মে জন্ম হ'ল বামুনের ঘরে। গানবাজনায় দারুণ এলেম আমার। সঙ্গীতে যত জ্ঞান হল, সব চেপে রেখে দিলাম। কারুকে শেখাই নি, সেই পাপেই এ জন্মে বেম্মদত্যি হয়েছি। এ হ'ল ভগবানের দেওয়া শাস্তি। একটু পথ গেলে দেখবে এক ছোট্ট মন্দির। সেখানে এক বংশীবাদক সারাদিন বিশ্রি বাঁশি বাজায়, একদম বেসুরো। এ যে কি অত্যাচার! আমি সইতে পারি না। মনে হয় কেউ কানে ঢালছে গরম সীসে। একেকটা ভুল সুর আমাকে তীরের মতো বেঁধে। আমার সর্বাঙ্গ ব্যথায় টনটনে। ওই ভয়ঙ্কর অ-সুর যেন দেহ ফুটো ক'রে দিচ্ছে। এ যদি চলতে থাকে, আমি ক্ষেপে যাব, প্রলয় কাণ্ড করে বসব। দত্যি হয়ে গেছি, আত্মহত্যা করতেও পারি না। এ গাছে আটকা পড়ে আছি। ভাই বামুন! তোমার পায়ে ধরি, আমাকে পাশের জঙ্গলে নিয়ে চলো, যাতে কিছু শান্তি পাই। আমার খানিক ক্ষমতাও ফিরে পাব। তোমার মতই বামুন ছিলাম। এখন হয়েছি বেম্মদত্যি, আমাকে সাহায্য করলে তোমার খু-ব ভালো হবে।

বামুনের মন বড় কাতর হ'ল। কিন্তু কাঙাল থাকতে থাকতে তার চালাকিও গজিয়েছে খানিক। সে বলল, 'বেশ! তোমায় পাশের জঙ্গলে নিয়ে যাব। কিন্তু আমার কি মিলবে? প্রতিদানে তুমি কি আমার জন্যে কিছু করবে?'

—'অবশ্যই! উপকার করব তোমার। আপাতত এটুকু কাজ করো!' মন্দির থেকে অনেক দূরে বেম্মদত্যিকে নিয়ে গেল বামুন। বেম্মদত্যি আবার একটা গাছে

বসল ঠ্যাং ঝুলিয়ে। দত্যি খুশি তো বটেই, জায়গা বদলের সঙ্গে সঙ্গে খানিক ক্ষমতাও ফিরে এসেছে ওর। বামুনকে আশীর্বাদ করে ও বলছে, 'জানি তুমি বড় গরিব, বড় হতভাগা। যেমনটি বলি, তেমনটি করো, আর কোন দুঃখ থাকবে না। কোনদিন পয়সার কষ্ট হবে না। এখন আমি গিয়ে মহীশূরের রাজকন্যের ঘাড়ে চাপব। রাজা অনেক রোজা-ওঝা-গুনীন-জাদুকর আনবেন। আমি চেপেই থাকব। তুমি গেলেই আমি ছেড়ে চলে যাব। রাজকন্যের ভূত ছাড়লে রাজা এত খুশি হবেন, যে তোমাকে অগাধ ধনরত্ন দেবেন। একটা জীবন কেটেই যাবে। তবে হ্যাঁ, শর্ত আছে, এরপর যদি কারো ঘাড়ে চাপি ভায়া, নাকটি গলিও না। তখন আমার ধারে কাছে এলে তোমাকে শেষ করে দেব।'

বামুন কাশী গেল, গঙ্গাস্নান করল, মন্দির দর্শন করল। তখন অনেক কষ্ট করে পৌঁছেছে মহীশূরে। উঠেছে এক বুড়ির বাড়ি। পয়সা দিলে সে থাকতে খেতে দেয়। বামুন যখন শুধোচ্ছে, শহরের টাটকা খবর কি, বুড়ি বলছে, 'আমাদের রাজকন্যের ওপর এক দত্যি ভর করেছে। কোন জাদুকর তাকে ছাড়াতে পারছে না। রাজা বলেছেন, রাজকন্যের ঘাড় থেকে যে দত্যি নামাবে, তাকে অনেক টাকা দেবেন।'

এই না শুনে, বামুন তো বুঝেছে যে তার সুসময় এসেছে, শনির দশা কেটে গেছে। সে রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজাকে বলছে, দত্যি ছাড়াবার, আর রাজকন্যের আপাই দূর করবার বিদ্যে তার জানা আছে। কারো তো বিশ্বাস হয় না এই বেঁটেখাটো বামুন কিছু করে উঠতে পারবে। মনে সংশয় নিয়েই রাজা রাজী হলেন।

যেমন তাকে রাজকন্যের মহলে নেওয়া হল, সে তো সকলকে বেরিয়ে যেতে বলছে। যেমন সবাই চলে গেছে, রাজকন্যের গলায় বেম্মদত্যি বলছে, 'কবে থেকে তোমার জন্যে বসেই আছি। কথা দিয়েছিলাম, এখন আমি যাচ্ছি। তবে যা বলেছি তখন, ভুলেও ভুলে যেও না। এখন যেখানে যাচ্ছি, তার ধারে কাছে গেলেও মেরে ফেলে দেব।'

তারপর বিকট শব্দে প্রাসাদ কাঁপিয়ে বেম্মদত্যি রাজকন্যেকে ছেড়ে ভুশ্ করে মিলিয়ে গেল। রাজকন্যের ঘাড় থেকে দত্যি নেমেছে, প্রাসাদে সবাই খুশি। রাজা বামুনকে অনেক টাকা, অনেক গ্রাম দিলেন। বামুন একটি মনোমত মেয়েকে বিয়ে করল, ছেলেপুলে হ'ল, বামুন সুখেই আছে।

বেম্মদত্যি মহীশূরের রাজকন্যেকে ছেড়ে সিধা গেছে কেরালা। ত্রিবাঙ্কুরের রাজকন্যের ঘাড়ে চেপেছে। রাজা কত না জাদুকর-গুণী হেন তেন আনছেন মেয়েকে

সারাবার জন্যে। সবই বৃথা হচ্ছে, দত্যি তো চেপে বসে আছে।

রাজাকে কে যেন বলল মহীশূরের রাজকন্যাকেও বেম্মদত্যি ধরেছিল। যে গুণী বামুন তাঁকে ভূত ছাড়ায় সে মহীশূরেই থাকে।

খবর পেয়েই ত্রিবাঙ্কুরের রাজা মহীশূর রাজাকে পত্র দিলেন। জানালেন, সে বামুন যদি এই হতচ্ছাড়া বেম্মদত্যিকে রাজকন্যের ঘাড় থেকে নামাতে পারে, তিনি তাকে অনেক পুরস্কার দেবেন।

মহীশূররাজ বামুনকে ডেকে পাঠালেন। আদেশ দিলেন ত্রিবাঙ্কুররাজের কাছে যেতে, রাজকন্যেকে সাহায্য করতে।

বেম্মদত্যির সঙ্গে আবার মোলাকাত? বামুন তো ভয় পেয়েছে। না পারে রাজাদেশ উপেক্ষা করতে, না পারে বেম্মদত্যির পৈশাচিক রাগের সামনাসামনি হতে। অনেক ভেবে চিন্তে ও স্ত্রী-ছেলেমেয়ের ব্যবস্থা করল, যদি ফিরতে না পারে তাই ভেবে। রওনা হল ত্রিবাঙ্কুরে। সেখানে গিয়ে ভয়ের চোটে, অসুখ হয়েছে বলে দু' মাস ঘরে বসে রইল। তবে এ ছল তো বেশিদিন চলল না। তাকে দত্যি ছাড়াতে যেতেই হল। মন স্থির করে ও সাহসে বুক বাঁধল। ভগবানকে ডাকল যেন তিনি তাকে রক্ষা করেন। তারপর রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজকন্যের মহলে গেল। তাকে দেখেই দৈত্য চেঁচাচ্ছে। 'মেরে ফেলব! টুকরো করে ফেলব! কেন এলে এখানে?' এক লোহার নোড়া নিয়ে সে বামুনকে মারতে যাচ্ছে।

বামুন বাঁচবে বলে আশা করেনি। দুঃসাহসে মরিয়া হয়ে সে বুদ্ধি খাটাচ্ছে। বলছে, 'ওহে কুচ্ছিত দৈত্য! ভালয় ভালয় যাবে? না মন্দির থেকে সেই বংশীবাদককে আনব? সে এখানে বসে অষ্টপ্রহর বাঁশি বাজাবে।'

এ কথা শুনেই সঙ্গীত প্রেমিক বেম্মদত্যি ভয় পেয়েছে। বিকট চেঁচিয়ে বলছে, 'তাকে এনো না, তাকে এনো না, আমি যাচ্ছি!'

বিকট শব্দ করে রাজকন্যেকে ছেড়ে সে মিলিয়ে গেল।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজকন্যে সেরে উঠলেন। ত্রিবাঙ্কুররাজ তাকে এত গাড়ি বোঝাই টাকা দিলেন, যে মহীশূরে বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে বামুন এখনো সে টাকা গুনছে!

অন্য জীবন

কাশ্মীরী
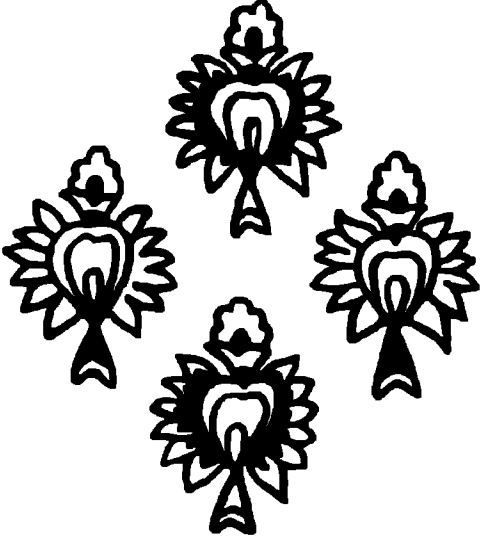
বহু বছর ধরে এক বামুন জপ-তপ উপোস -কাপাস করছে, দেবতাদের পুজো দিচ্ছে। সে জানতে চায় মানুষ মরলে কি হয়!

অবশেষে দেবতারা তুষ্ট হলেন।

এক সকালে বামুন নদীতে নাইতে গেছে। তার আত্মা তাকে ত্যাগ করে অস্পৃশ্য এক মুচির ছেলের দেহে ঢুকল। সে ছেলে বড় হ'ল। বাবার কাজ শিখল। বিয়ে করল, মস্ত বড় সংসারের কর্তা, অনেক ছেলেপুলে। একদিন হঠাৎ মনে পড়ল, আসলে সে তো বামুন! স-ব ফেলে রেখে সে গেল অন্য দেশে।

সে দেশের রাজা সবে মারা গেছেন, সিংহাসনে বসবার জন্য কাউকে না রেখে। আর সে সময়ে মুচিও পৌঁছেছে সেখানে। তখন মন্ত্রীরা আর জ্ঞানী বৃদ্ধরা দেশের প্রথা মতো একটি হাতি আর একটি বাজপাখিকে ছেড়ে দিয়েছে। হাতি আর বাজপাখি যাকে আনবে, তাকেই রাজা বলে মানবে সবাই। অবাক, অবাক কাণ্ড, মুচির শরীরে ঢুকেছে যে বামুন তারই সামনে বসে পড়ল হাতি, আর বাজপাখি বসল তার ডানহাতে। এতেই সকলের সামনে ঘোষণা হয়ে গেল, যে সেই হবে রাজা।

ক' বছর বাদে মুচি বউ সবই জেনেছে, সে চলে এসেছে স্বামীর কাছে। তখন মানুষের মুখে মুখে কথা ছড়াল, শীঘ্রই সবাই জেনে গেল রাজা, এবং তার বউ, দু'জনেই জাতে মুচি।

মানুষ ক্ষেপে গেল। কেউ শুরু করল দাঙ্গা, কেউ বা পালাল, কেউ বসে গেল প্রায়শ্চিত্ত করতে, অন্যেরা আগুনে ঝাঁপ দিল। সকলের ভয়, সমাজে একঘরে হবে। রাজারও এত লজ্জা, এত গণ্ডগোল সইছিল না, তিনি আগুনে ঝাঁপ দিলেন।

তৎক্ষণাৎ তাঁর আত্মা গিয়ে ঢুকল বামুনের মৃতদেহে। দেহটি নদীতীরেই পড়ে ছিল।

সে বাড়ি গেল। বউ তাকে ঢুকতে দেখে বলছে, 'কি তাড়াতাড়ি ফিরে এলে? খুব তাড়াতাড়ি স্নান সেরেছ, প্রভাতী পূজাপাট সেরেছ।'

বামুন নির্বাক। সে বিস্মিত। মনে মনে ভাবছে, 'মানুষ মরলে কি এমনই হয় নাকি? এ সব কি সত্যি, না আমি স্বপ্ন দেখছিলাম?'

এর ঠিক এক সপ্তাহ বাদে একটি লোক এসেছে বামুনের উঠোনে। বলছে, পাঁচদিন উপবাসে আছে, কিছু খেতে চায়। বলছে, ঝড়ের বেগে পালিয়েছে দেশ

ছেড়ে, কেন না সে দেশে এক মুচি রাজা হয়েছে, সমগ্র রাজ্যকে করেছে কলুষিত।

সে বলছে, অভিশাপের কোপ এড়াতে সে দেশের লোক হয় পালাচ্ছে, নয় আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে। বামুন তাকে খেতে দিল। কিন্তু কথাটি কইল না।

ভাবল, 'এ কি করে সম্ভব? আমি ছিলাম মুচি। কতদিন ধরে কত বড় সংসার গড়ে তুললাম। তারপর কতদিন ধরে রাজত্ব করলাম। মেনে নিয়েছিলিম, এ সবই আমার স্বপ্ন মাত্র! কিন্তু এই যে লোকটি এসেছে, তার কথা থেকে জানা যাচ্ছে, তা স্বপ্ন নয়, সত্যি!

'আবার আমার বউ বলছে আজ সকালে আমি কম সময়ই ছিলাম বাড়ির বাইরে। তার কথাও বিশ্বাস করি। তার বয়স তো একদিনও বাড়ে নি, বাড়িতেও সব যেমন-কে-তেমনই আছে।

'হয়তো মানুষের চিন্তা, কথা ও কাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের যে সত্তা, তার মধ্য দিয়েই আত্মা চলাচল করে। আর জীবনশেষে যে মহাকাল, সেখানে সময়ের মাপটাই অন্যরকম। সে মাপে, একটি দিন মহাকাল সদৃশ, আর মহাকাল যেন একটি দিনের সমান! তাই হবে!'

শুয়োর হয়েই বেঁচে থাকা

তেলুগু
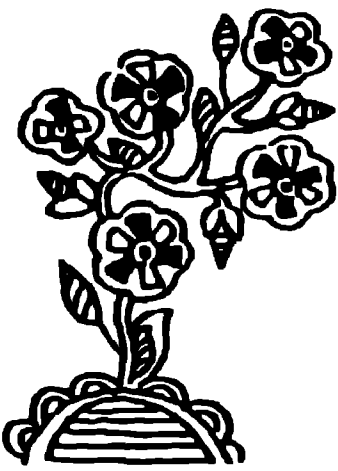
একদিন এক গুরু যেন এক ঝলকে দেখতে পেলেন পরজন্মে তিনি কি হবেন। প্রিয় শিষ্যকে ডেকে বললেন, গুরু যে এত করেছেন, প্রতিদানে শিষ্য কি দেবে। শিষ্য বলল, গুরু যা করতে বলবেন, সে তাই করবে।

এ প্রতিশ্রুতি পেয়ে গুরু বলছেন, 'কি করতে হবে, বলছি। শীঘ্রই আমি মরব। এখনি জানলাম, মৃত্যুর পর আমি হব শুয়োর। হ্যাঁ, ওই যে শূকরী উঠোনে জঞ্জাল খাচ্ছে, ও এরপর যখন বাচ্চা দেবে, আমি জন্ম নেব ওর চার নম্বর বাচ্চা হয়ে। কপালে একটা চিহ্ন দেখেই চিনবে আমাকে।

'ও বাচ্চা দিলে, চার নম্বর বাচ্চাটাকে চিনবে। তুলে নেবে, ছুরির এক চোপে ওটাকে মেরে ফেলবে। তখন শুয়োর জীবন থেকে আমি মুক্তি পাব। এ কাজটা করবে তো?'

শিষ্য বড় দুঃখ পেল, তবে কাজটা করতে রাজী হ'ল।

এ সব কথাবার্তার পরে গুরু মারা গেলেন। শূকরীর এক সঙ্গে চারটে বাচ্চা হ'ল। একদিন শিষ্য তার ছুরি শানিয়েছে, চার নম্বর শুয়োরছানাকে তুলে ধরেছে। ছানাটার কপালে চিহ্নও আছে। ছানার গলায় ছুরি বসাতে যাবে, ছোট্ট ছানাটা হঠাৎ চেঁচাচ্ছে, 'থামো! মেরো না আমায়।'

শুয়োরকে মানুষের গলায় কথা কইতে শুনে শিষ্য হতভম্ব। ছানাটা বলছে, 'মেরো না! শুয়োর হয়েই বেঁচে থাকব। যখন আমাকে মারতে বলেছিলাম তখন তো জানতাম না শুয়োরের জীবন কেমন হয়। দেখছি দিব্যি জীবন! খাসা!'

মুখের মধ্যে সারস

বাংলা
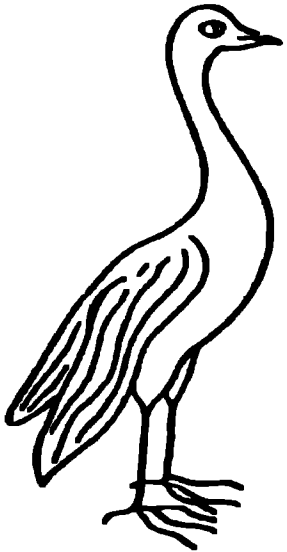
বাড়ি ফেরার সময়ে এক পণ্ডিত মাঠ পেরোলেন। হঠাৎ কাসি এল, মাটিতে থুথু ফেললেন। অবাক হয়ে দেখেন কফের মধ্যে একটা সারসের পালক।

কি হ'ল কিছুই বুঝে পান না। চিন্তাও হ'ল খুব। ভাবছেন আর ভাবছেন। চিন্তার গুরুভার যেন আর সয় না। বাড়ি ফিরেই বউকে ডেকেছেন। বলছেন, 'ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কাউকে বলা দরকার, তাই তোমায় বলছি। তবে প্রতিজ্ঞা করো, এ কথা কারুক্যে বলবে না।'

—'দিব্যি কেড়ে বলছি, কারুক্যে বলব না।'—তখন পণ্ডিত বলছেন, থুথু আর কফের মধ্যে সারসের পালকের কথা।

বউ তো কথাটি না ব'লে পারছে না। তার মনেও দুশ্চিন্তা। তাই যেই দেখেছে এক পড়শীকে, সবচেয়ে আগে যে কথা বেরোল মুখ থেকে, তা হ'ল, 'একটা কথা মন থেকে যাচ্ছে না তাই! কথা দে, কারুক্যে বলবি না। আমিও আমার সোয়ামিকে কথা দিইছি, কারুক্যে বলব না।'

পড়শী বলছে, 'সে আর বলতে। জানিস তো আমার পেট থেকে কথা বেরোয় না। কারুক্যে বলব না। কি কথা ভাই?'

—'বলবি না তো?'

—'অতই যদি অবিশ্বাস, বলিস নি। কবে তোর কোন গোপন কথা কাকে বলিছি বল?'

—'ঠিক আছে বোন, বলছি। তুই আমার কত ভালো বন্ধু, সে কি জানিনা।

শোন. আমার সোয়ামি যখন মাঠ দিয়ে ঘরে ফিরছিল, থুথু ফেলেছে। থুথুতে কি বেরোল জানিস? খালি সারসের পালক বেরুচ্ছে, এত এত! ভারি চিন্তায় পড়েছি ভাই। কি যে হ'ল ওর!'

--'নে, এই নিয়ে অত ভাবিস না। এমন সব বিপদ ঘটেও, কেটেও যায়। তবে কারুকো না বলাই ভালো। নানা গুজব ছড়াবে।

কিন্তু আরেকজনকে বলতে না পারলে পড়শীরও পেট ফাটছে। যেই এক বন্ধুর দেখা পেয়েছে, অমনি বলছে, 'কারুক্যে বোল না ভাই। পণ্ডিতের বউকে কথা দিইছি, এ কথা ফাঁস করব না। জানো, আজ কি হয়েছে? পণ্ডিত মাঠের মধ্যে একটা গোটা সারস উগরে ফেলেছে। আমি জানতাম পণ্ডিতরা মাছ মাংস খায় না। কিন্তু কে সত্যি কথা জানবে বলো?'

--'একটা গোটা সারস! সে যে পেল্লায় পাখি গো! খেল কি করে? আশ্চর্য মানুষ বটে! তবে ভেবো না। এ কথা আমি কারুকো বলব না।'

এর পরেই আরেক পড়শী শুনল, পণ্ডিতের মুখ থেকে ফরফরিয়ে ডানা ঝাপটে এক ঝাঁক সারস বেরিয়েছে, উড়েও গেছে।

দিন শেষ হবার আগে সেখানে সবাই জেনে গেল, পণ্ডিতের মুখ থেকে বড় বড় পাখি, যেমন সারস, বক, ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়েছে আর উড়ে গেছে।

আশপাশের গ্রামেও গুজব ছড়াল। সে সব গ্রামের মানুষরা গাড়িতে বলদ যুতে হাঁকিয়ে চলে এল পণ্ডিতের গ্রামে এ অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে। হয়তো এ কোন অলৌকিক ঘটনাই হবে। শোনা যাচ্ছে নানা রঙের, নানা আকারের, দূরদূরান্তেরও পাখির ঝাঁক পণ্ডিতের মুখ থেকে বেরোচ্ছে আর উড়ছে। আকাল দেখা যাচ্ছে না, এত পাখি!

বেচারী পণ্ডিত পাগল হবার উপক্রম। ঘর ছেড়ে পালিয়ে এক গাছের কোটরে ঢুকলেন। যতদিন না এ তাজা খবর বাসি হ'ল, আরেকটা গরম গুজব ছড়াল, তিনি কোটর থেকে বেরোন নি।

তেনালী রাম ছবি আঁকল

কন্নড়, তামিল, তেলুগু
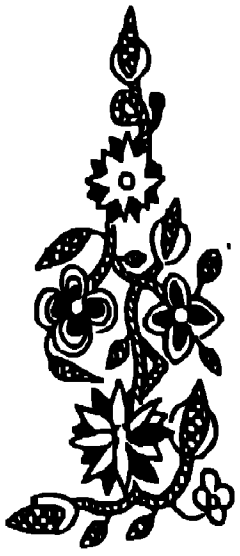
একবার সাধ গেল রাজার, প্রাসাদের দেয়ালে ছবি চাই। এক শিল্পীকে তলব করলেন, সে দেয়ালে চিত্র করবে। সে সব ছবির খুব প্রশংসা হ'ল বটে, কিন্তু তেনালী রাম খুঁতখুঁত করছে। একটি মানুষের পার্শ্বচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে ও বলছে, 'এ কি? অন্য পাশটা গেল কোথায়? সেগুলো তো দেখতে পাচ্ছি না?' রাজা হেসে বলছেন, 'এও জানো না, ওটা কল্পনা করে নিতে হয়।'—'ও! অমনি করেই ছবি আঁকে বুঝি? এখন বুঝলাম।'

ক' মাস বাদে তেনালি রাম রাজাকে বলছে, 'ক' মাস ধরে রাতদিন ছবি আঁকছি। আপনার দেয়ালে কিছু আঁকতে চাই।'—চমৎকার! পুরনো ছবিগুলো রং চটে গেছে। ওগুলো মুছে ফেলে আঁকো।'

পুরনো ছবির ওপর চুনকাম করে তেনালি রাম নতুন ছবি আঁকতে লেগে গেল। এখানে একটা পা, সেখানে একটা চোখ, দূরে একটা আঙুল! দেয়াল ভরে ফেলল মানুষের দেহের এমন টুকরো টুকরো অঙ্গ এঁকে। রাজাকে ছবি দেখতে ডাকল।

দেয়ালে খণ্ড খণ্ড মানব শরীর দেখে রাজা অবাক, আশাহতও খানিক।

—'এ কি এঁকেছ? ছবি কোথায়?'

—'ছবির বেলা বুঝলেন, কল্পনা করে নেবেন, কল্পনা! এখনো আমার সেরা ছবিটা দেখেন নি।'

রাজাকে নিয়ে গেল এক সাদা দেয়ালের সামনে। সাদার ওপর কিছু সবুজ ছোপ।

—'এ কি?' রাজা বিরক্ত হয়েছেন।

—'কেন, গরু ঘাস খাচ্ছে।'

—'গরু কোথায়?'

তেনালি রাম বলল, 'ঘাস খাওয়া হয়ে গেছে তো! গরু গোহালে ফিরে গেছে।'

শিল্পীর কাজ কি ফুরোয়?

গুজরা'তি

এক রাজার মেয়ে রূপবতী, গুণবতী, ঘোড়ায় চেপে বনে শিকার করতে বড় ভালবাসে। একদিন এক হরিণের পেছনে ধাওয়া করেছে, সহসা বুঝল জঙ্গল গভীর, সে একা। একটা গাছে চড়ে দেখছে, অনুচরদের দেখতে পায় কি না। মগডালে উঠে ও আতঙ্কে থ! বনে জ্বলছে এক ভয়ংকর দাবানল।

আগুন ছড়িয়ে পড়ছে গাছে-ঝোপে-ঘাসে। আগুনের লকলকে জিভ গ্রাস করছে পশু ও পাখির বাসা ও আবাস। আগুন এগোচ্ছে পথের সব কিছু খেতে খেতে। হরিণ ও অন্য জন্তুর পাল প্রাণভয়ে দৌড়চ্ছে। নানা জাতের পাখি ধোঁয়ায় দম আটকে মরছে। আর্তনাদ করতে করতে তারা আগুনে জ্বলে যাচ্ছে।

এই ভয়ংকর দৃশ্যের মধ্যে একটি টুকরো ছবি রাজকন্যার হৃদয়কে স্পর্শ করল। এক জোড়া বুনো হাঁস, বাচ্চাদের বাঁচাতে আকুল! হায়, বাচ্চাদের পাখা গজায় নি। আগুন এগোচ্ছে অমোঘ নিয়তির মত, হাঁসটি মরিয়া হয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল। মা-হাঁস ডানায় ঢেকে নিল ওর বাচ্চাদের। আগুন ওদের গ্রাস করল।

রাজকন্যা নিরাপদেই বাড়ি ফিরল। যা দেখল তাতে সে বিচলিত যত, ক্রুদ্ধ তত। নিজেকেই বলল, 'পুরুষরা স্বার্থপর। নির্ভর করা চলে না ওদের ওপর। নিশ্চয় গোটা দুনিয়ার পুরুষ জাতটা এ রকমই। সে পাখি, পশু, মানুষ, যাই হোক না কেন। কোন সংস্পর্শ রাখব না ওদের সঙ্গে, বিশ্বাসও করব না ওদের।' তখনি সে প্রতিজ্ঞা করল, জীবনে বিয়ে করবে না।

ওর অনুচররা ওকে খুঁজে মরছিল। এখন সবাই একসঙ্গে ঘরে ফিরল।

সেদিন থেকে রাজকন্যা অন্য মানুষ। গম্ভীর, পুরুষদের এড়িয়ে চলে, বাবা-মাকে জানিয়ে দিয়েছে, ও বিয়ে করবে না কখনো। বৃদ্ধ পিতামাতা খুবই বিচলিত। কেন মেয়ে এমন কঠোর সংকল্প করল, তা বলার জন্যে মিনতি জানালেন। রাজকন্যা নীরব। কোন কথা খুলে বলতেও নারাজ। সর্বত্র বার্তা রটে গেল, যে রাজকন্যা বিয়ে করবে না। তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল যারা, তাদের সংখ্যাও কমে গেল।

একদিন এক প্রখ্যাত শিল্পী এলেন সভায়। প্রাসাদের জন্য কিছু সুন্দর ছবি আঁকলেন। চলে যাবার আগে রাজকন্যাকে একটি ঝলক দেখেছিলেন মাত্র। তাঁর একটি ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন। রাজকন্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হ'ল। শিল্পী বড় যত্নে আঁকলেন তার অবিকল প্রতিকৃতি। আঁকা হয়ে গেলে, ছবিটা নিয়েই চলে গেলেন।

আরেক রাজা, ছবি বড় ভালবাসেন, তাঁর কাছে শিল্পী ছবিটি বেচলেন। অনেক টাকাও পেলেন। রাজদরবার ঘরে টাঙানো রইল ছবিটি। যে দেখে, সেই তারিফ জানায়, আর এ নিয়ে আলোচনা করে। রাজকন্যার সৌন্দর্যে তারা মুগ্ধ। ইনি কে, তা নিয়ে ভাবে।

রাজার একমাত্র ছেলে এতদিন মৃগয়া করছিল। ফিরে এসে ছবিটি দেখে ও ছবির প্রেমে পড়ল। ছবিটা কার, তা জানতেও চাইল না। যখন জিজ্ঞাসা করল, কেউ বলতে পারে না ছবি কার, এ মেয়ে থাকে কোথায়। প্রেমিক রাজপুত্র জীবনে সব কিছুতে আনন্দ ভুলে গেল। কারো সঙ্গ চায় না, নীরব নিশ্চুপ, থাকে নিজের মহলে, বিষাদে ডুবে গিয়ে। বাপ, ছেলের অবস্থা দেখে ভারি চিন্তিত। কারণটাও ক্রমে জানলেন। ছেলের স্বাস্থ্য নিয়েও উদ্বেগ। তারপর সেই শিল্পীর খোঁজে লোক পাঠালেন। শিল্পী তো কবেই দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। শিল্পীরা তো এমন করেই থাকে।

কুমারের শরীর ভাঙছে, মেজাজ চড়ছে, যে কাছে আসে, সে তার ওপরেই ক্ষেপে ওঠে। বুড়ো প্রধানমন্ত্রী, তিনি রাজপরিবারের বিশ্বাসী বন্ধুও বটে,---তা তিনি কুমারকে তার বিষাদের দিবাস্বপ্ন থেকে ডেকে সচেতন করলেন। কুমার ক্রোধে ল-ব-ড জ্ঞান হারিয়ে তাঁকেই মৃত্যুদণ্ড দিয়ে বসল।

প্রাসাদে কুমারই হাকিমহুকুম। বুড়ো মন্ত্রীর তো বাঁচার পথ রইল না। রাজা এ কথা শুনে কুমারকে ডেকে পাঠালেন। প্রধানমন্ত্রী যাতে বাড়ি গিয়ে বিষয়-আশয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন, সে জন্যে কোতলের দিন পেছাতে রাজী করালেন কুমারকে। বুড়ো মন্ত্রীকে এ সময়টা বাড়ি যেতে দেওয়া হ'ল।

মন্ত্রী এ নিয়ে মুখটি খোলেন নি, কিন্তু বাড়িতে সবাই জানে তাঁর কপালে কি আছে। ছোট মেয়ে তাঁর বড় আদরের। সে ওঁকে সান্ত্বনা দিল, মনের দুঃখে প্রলেপ দিল এ ভাবে। তারপর তুতিয়ে পাতিয়ে জেনে নিল কুমারের ক্রোধ ও বিষাদের কারণটা কি!

এ মেয়ে বড় বুদ্ধিমতী, খুব কেজোকম্মা। বাবাকে বাঁচাবার একটা পথ ও বের করল। কুমারের কাছে চলে গেল, দেখাও করল। খুব মিনতি করে বলল, বাপের জীবনটা কিছুদিন থাকতে দিন। সে নিজে দেশবিদেশ ঘুরে এ ছবি যার, তার হদিশ বের করবে। ওই চমৎকার ছবি থেকেই তো গণ্ডগোলের সূত্রপাত!

কুমার খুবই খুশি। এ মেয়ের পরিকল্পনাটা অসম্ভব মনে হচ্ছে না। এতদিন যা ছিল পলাতকা স্বপ্ন মাত্র, তা সত্যি হয়ে উঠতে পারে। এমন আশাও হ'ল। তখন দয়া হ'ল তার। মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাহার করল। বুড়ো মন্ত্রী আবার প্রাসাদে এলেন কাজ করতে। রাজা খুব স্বস্তি পেলেন। মন্ত্রীর ছোট মেয়েকে বারবার আশীর্বাদ করলেন, যেন সে সফল হয়।

এখন, মন্ত্রীর মেয়েও তো চিত্রবিদ্যায় নিপুণ। সে ওই ছবিটির নকল আঁকল। তারপর ছবিটি ঝোলায় পুরে, পুরুষের পোশাকে বেরিয়ে পড়ল, যেন সে এক ভ্রাম্যমাণ শিল্পী। কোথায় যাবে, কাকে শুধোবে, কিছুই সে জানে না। শুধু জানে, যে বাবাকে বাঁচাতে হবে। অনেকদিন ধরে সে দিকে দিকে গেল। যেখানেই এক রাত্তির থাকে, সেখানেই সকলকে দেখায় রাজকন্যার ছবি। জনে জনে জিগ্যেস করে। কেউ বলতে পারে না এ ছবি কার। এমনি করে একটি বছর গেল। ঘুরে ঘুরে সে হতক্লান্ত। পৌঁছেছে, সেও এক দূরের, অজানা দেশে। কি আনন্দ, কি আনন্দ তার। সবাই জানে ছবির মানুষটি কে। এ তো তাদের রাজকন্যার এক অবিকল ছবি। রাজকন্যার বিষয়ে সবাই বলল, ইনি হচ্ছেন 'সেই রাজকন্যা, যিনি বিয়ে করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন।'

—'কখনো বিয়ে করবেন না? কি ব্যাপারটা ওঁর? কোন ভংয়কর কিছু ঘটেছিল কি?'

—'কেউ জানে না। ওঁর বাবা-মাও জানেন না।'

মন্ত্রীর মেয়ের উৎসাহ খানিক দমে গেল। রাজকন্যা যদি বিয়ে করবেন না বলে ঠিক করে থাকেন, সে অচেনা এক সামান্য মানুষ! যে রাজপুত্র তার জন্যে মরছে, তার সঙ্গে বিয়েতে একে রাজী করাবে কি করে?

তবু, সে তো হিম্মতওয়ালী মেয়ে। যে ভাবেই হোক, রাজকন্যার কাছে পৌঁছবার একটা না একটা পথ বের করতেই হবে। প্রাসাদের সামনে সে এক বাড়ি ভাড়া নিল। সেখানেই খুলল তার চিত্রশালা।

প্রাসাদের এক বড় জানালার সামনে সে বসে, আর ছবি আঁকে। ক্রমে সভাসদরা তো বটেই, স্বয়ং রাজাও তার বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

একদিন, রাজা তাকে দরবারে ডাকলেন, ছবি দেখাতে। দেখে তাঁর ভাল লেগে গেল। কয়েকটি কিনলেনও। বললেন, তাঁর মেয়ের জন্যে এক নতুন প্রাসাদ বানাচ্ছেন। সেখানকার জন্য কিছু ছবি আঁকতে। ইতিমধ্যে রাজকন্যাকে কয়েকবার দেখেছে মন্ত্রীকন্যা। এখন সে স্থির বুঝেছে, সে ছবির মানুষ এই রাজকন্যা। সে ছবি রাজপুত্রকে খুব বিচলিত করেছে, তাকে পাগল করে দিয়েছে প্রায়।

নতুন প্রাসাদের দেওয়াল তৈরি হয়ে গেলে শিল্পী সুন্দর সুন্দর নকশা মানুষের মূর্তি আঁকতে শুরু করল। ছাতের সিলিং, খিলান, সবই চিত্রিত এখন। প্রত্যেকটা ছবিই ভাবিয়ে তোলে। প্রতিটি ছবি গল্প বলে। এখন রাজবাড়ির মেয়েরাও আসতে থাকল। এদের মধ্যে কেউ কেউ রাজকন্যার পরিচারিকা, কেউ বা বন্ধু।

মন্ত্রীকন্যা ভাবল, যদি কেউ জানে, তো এরাই জানবে রাজকন্যা কেন পুরুষদের দেখতে পারে না, বিয়ে করতে চায় না। ওদের সঙ্গে সে খুব ভাব জমিয়ে ফেলল। এত সুন্দর ছবি আঁকে, এমন মার্জিত ব্যবহার তার! শেষে একটি মেয়ে ফাঁস করে

দিল রহস্য। রাজকন্যা তাকে খুব বিশ্বাস করে। সেই বলল, জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে রাজকন্যার অভিজ্ঞতার কথা, প্রকৃতির সৃষ্টিতে যারাই পুরুষ তাদের সম্পর্কে মোহভঙ্গের কথা। এ টুকুই তো মন্ত্রীকন্যা জানতে চায়। এবার বসার ঘরের দেয়ালে সে এক ছবি আঁকল, যা রাজকন্যার অভিজ্ঞতার একেবারে বিপরীত এক কাহিনী বলে। এ ছবিতে দেখানো হ'ল, মেয়েরা কত চঞ্চলমতি, পুরুষরা কি আত্মত্যাগী। সেই বুনো হাঁসের বদলে সে আঁকল হরিণ ও হরিণী। রাজকন্যার বদলে আঁকল এক তরুণ, সাহসী, অসমসুন্দর এক রাজপুত্র। সে সব মেয়েরই চিত্ত জয়ে সক্ষম।

ছবিটি আঁকা হলে মন্ত্রীকন্যা রাজকন্যার বন্ধুদের বলল অনুরোধ জানাতে, যাতে রাজকন্যা একবার এসে ছবিগুলো দেখেন।

রাজকন্যা এল। ছবির পর ছবি দেখছে। শিল্পীকে তারিফ করছে। হরিণ দম্পতি ও রাজপুত্রের ছবির সামনে এসে তার পা আর চলে না। দেখছে আর ভাবছে, দেখছে, আর ভাবছে। শেষে শিল্পীকে বলছে, 'এ ছবির গল্পটা কি?'
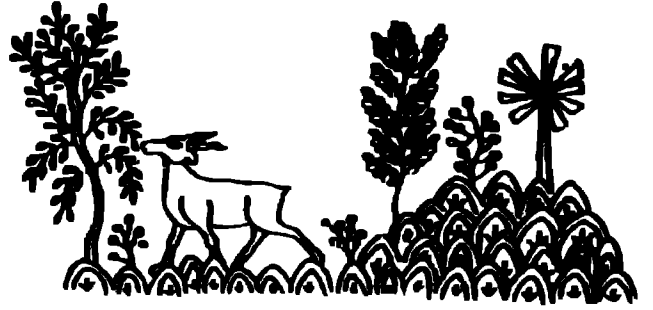
সুযোগ পেয়ে মন্ত্রীকন্যা বলছে, 'রাজকন্যা! এ ঘটনা আমাদের রাজপুত্রের জীবনে সত্যি ঘটেছিল। তিনি বনে মৃগয়া করতে যান। বনে জ্বলে দাবানল। তখন এ দৃশ্য তিনি স্বচক্ষে দেখেন। এতে ওঁর জীবনটাই পালটে গেল। সেদিন থেকে নারী মাত্রকেই উনি বেইমান ভাবেন, বিয়ে করতে চান না। ছেলের এ হেন সিদ্ধান্তে রাজা ও দরবারের সকলে মর্মাহত। কিন্তু উপায় যে কি, তাও তো কেউ জানে না।'

শিল্পীর কথা শেষ হতে না হতে রাজকন্যা বলছেন, কি আশ্চর্য! পুরুষরা বিশ্বাসী, মেয়েরা বিশাসঘাতী। এখন বুঝছি, সব প্রশ্নেরই দুটো দিক থাকে। একটি ঘটনাই দেখেছি আমি। সিদ্ধান্তও নিই বড় দ্রুত। এখন নতুন করে ভাবতে হবে।'

শিল্পী সানন্দে বলল, 'এ কথা বললেন শুনে বড় ভাল লাগল রাজকন্যা! ইশ! আমাদের রাজপুত্র, আপনার মতো যদি নিজের ভুলটা দেখতে শিখতেন! তবে আপনি তো তাঁর মতো একগুঁয়ে নন!'

রাজকন্যা বললো, 'কারো তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার বলে মনে করি। হয়তো আমার মতোই তাঁর মতেও পরিবর্তন আসবে। তাঁর জীবনের একটি ঘটনা থেকে আমি লাভবান হলাম। আমার জীবনের একটি ঘটনা হয়তো ওঁকেও লাভবান করবে। অনুগ্রহ করে আমার কথা তাঁকে বলবেন। দেখুন, তাঁর মনে পরিবর্তন আসে কি না!'

—'নিশ্চয় দেখব। সানন্দে। বাড়ি ফিরে যাই একবার।' এ অযাচিত সাফল্যে মন্ত্রীকন্যার হৃদয় নাচছিল বললেও হয়।

সেদিন থেকেই মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল, যে রাজকন্যা বিয়েতে অসম্মত নন আর। আবার পাণিপ্রার্থীরা আসতে থাকল। রাজকন্যা তাদের আমলও দেয় না।

সকলকে দেখেই সে নাক কুঁচকোয়। তার প্রধান আনন্দ এখন শিল্পীর মুখে ওই রাজপুত্রের গল্প শোনার মধ্যে, ওই ছবি দেখার মধ্যে।

মন্ত্রীর মেয়ে তো জানে কিংকর্তব্যম্ এখন। রাজপুত্রের পৌরুষ, শৌর্য, গুণাবলীর কথা বলে বলে সে আগুনে ফুঁ দিয়ে আগুন বাড়িয়ে তুলল। শেষে রাজকন্যার আর একদিন সবুর সয় না। সে রাজপুত্রকে দেখতে চায়।

মন্ত্রীকন্যা এটাই চাইছিল। সে রাজকন্যাকে কথা দিল, দেশে ফিরে গিয়ে রাজপুত্রকে তড়িঘড়ি এনে ফেলবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে ও। রাজকন্যার গল্প বলবে, কুমারও উদগ্রীব হবে আগ্রহে।

সে যখন দেশে ফিরে সব কথা বলল, রাজা প্রধানমন্ত্রী, কুমার তো ধন্য ধন্য করল। প্রধানমন্ত্রী তাকে জড়িয়ে বলে, মেয়ে আমার জীবনটা রাখল। কুমার তাকে উপঢৌকনে ঢেকে দিল।

একদিনও দেরি না করে কুমার, এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে সিপাহীসালার নিয়ে রাজকন্যার বাবার কাছে রওনা হ'ল। রাজকন্যা যে তাকে সসম্মানে বরণ করল, আর দু' রাজ্যের ঐশ্বর্য দিয়ে যে একটা দেখবার মতো বিয়ে হ'ল, সে কি আরো বলতে হবে?

সারস ছেলে

তুলু

এক মায়ের এক ছেলে। ছেলে বড় হয়েছে তো বিয়ে দিল তাকে। কিন্তু বর বউতে তো বনে না। বউ ঘুমোয় না বরের খাটে। বর ঘুমোয় না বউয়ের খাটে।

একদিন বাইরে ঘুরে এসে বর চেয়েছে ফেনাভাত। বউ তাই এনেছে। বর তাকে কি দোষ পেল কে জানে, সে যেয়ে বসল ঘরে। বসেই চাইছে সুপুরি। বউ রাগে অভিমানে ধপ করে নামিয়ে রাখল সুপুরির থালা। বর বসে সুপুরি চিবোচ্ছে তো বউয়েরও সাধ গেল বরের পাশে বসে সুপুরি চিবোতে। বর সুপুরি দিল, বউ পান আনল। তবে চুন তো চাই! দেয়ালপানে চেয়ে দেখে, চুনের মত সাদা কি গড়াচ্ছে। আঙুলে খানিক নিয়ে, পানে লাগিয়ে বউ সুপুরি দিয়ে খেল। জানো, সে কি খেল? ধানক্ষেতে যে সারস বসে, তারই পুরীষ।

কিছুদিন বাদে বউয়ের মাথা যেন হালকা লাগে, পেট যেন গুলোয়। কেন এমন

হচ্ছে? বউয়ের যে ছেলেপুলে হবে। সবাই খুব খুশি। বউয়ের জন্যে প্রথামতে ধুমেধামে 'বায়াক' উৎসবও হ'ল। সবাই ওকে 'রায়াকে' বা খাবার সাধ মিটাতে নানানিধি খাবার, জামা, শাড়ি, গয়নাগাঁটি দিল। সত্যি বড় ধুম হয়েছিল। 'রায়াকে' হয়ে গেলে স্বামী আর শ্বশুরবাড়ির সবাই ওকে মায়ের ঘরে পাঠাল। সেখানে ও জন্ম দিল এক সারসকে। খুব মন খারাপ ওর, ও বলল, 'আমার মা'র পেটে বাচ্চা হ'ল, আমার ভাজের পেটে বাচ্চা হ'ল, ভগবান দেখ! আমার পেটে দিল একটা সারস!'

এর মধ্যে বরের কাছে খবর গেছে, যে 'তোমার বউয়ের সন্তান হয়েছে।'

শাশুড়ি তো এসে পড়েছে বাচ্চা দেখবে বলে। মাদুরে এ সারস ছানা দেখে বলছে, 'বাচ্চা কোথায় গো?'

—"অ মা! ওই তো আমার বাচ্চা!'

—'ও মা! এ তো একটা সারস গো! এত কষ্টের পর জন্মাল এক সারস! এ তো ধান-সারস গো! আমাদের ধানক্ষেতে চরে বেড়ায়। কি করে একে নিয়ে? মারতে তো পারি না। বউমা প্রসবের কষ্ট পেয়েছে। পেটে ভার বয়েছে, তবে না বিইয়েছে! নবজাতক সারস হোক না কেন, নতুন মাকে তো যত্ন করতে হয়!'

শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এ ক্ষেত্রে যা যা করে, শাশুড়ি সব করল। যে সব খাবার কেনা উচিত বউয়ের জন্যে, তা কিনল। শিশুর জন্যেও সব কিনল।'

নতুন মা সবই খেল। একমাস আর ক'দিন কাটলে সে প্রথামতো মন্দিরেও গেল। দশ-পনের দিন বাদে তাকে 'দোলনা উৎসবের' জন্য শ্বশুরবাড়ি আনা হ'ল। এক বগলে দোলনা, আরেক বগলে সারস ছেলে, বউ চলল।

স্বামীর বাড়িতেই রইল সে। দু' সপ্তাহ বাদে গ্রামে এক বাড়িতে বিয়ে। বউয়ের জা-ননদ, ভাজ, সবাই গেছে। সারস কোলে বউটি যাবে, এ তাদের পছন্দ নয়। বউ ভাবছে, 'আমি কি করি?'

স্বামী বলছে, 'এত বা ভাবছ কেন? এ আমাদের ভাগ্য। ভগবান এ শিশু আমাদেরই দিয়েছেন, দেন নি? ওকে নাও, চলো যাই। বিয়ের সময় হয়েছে।'

'ঠিক বলেছ।' বউ সারস কোলে বিয়েবাড়ি গেছে। অন্য এয়োদের সঙ্গে সে শসা কুটছে, রাঁধছে, সারস বসে দেখছে, একপাশে শসার থালাটি যখন সরিয়ে রেখেছে, সারস করল কি! লম্বা ঠোঁটে পাকা শসার বীজ নিয়ে উড়ে চলে গেল, অনেক দূরের এক গ্রামে। সেখানে এক উন্মুক্ত প্রান্তর। শসার বীজ বুনে দিয়ে সে ফিরে এল।

মা তো জানেনা সারস বালক চলে যায়, আর বীজ বুনে আসে। কিছুকাল বাদে সারস বালক গেছে ভগবানের কাছে। বলছে, তার মায়ের জন্যে এক মস্ত বাড়ি বানিয়ে দিতে। ভগবান তাকে দেখা দিলেন, কথাও দিলেন।

তখনি সে বাড়ি হ'ল। আর দু'দিকে সে প্রান্তর সবুজে সবুজ। শসা গাছ ফনফনিয়ে উঠেছে। পাতায় পাতায় ফল। যেমন শাঁসালো, তেমন বড়সড়।

তখন সারস বালক মাকে বলছে, 'মা গো! তোমার জন্যে বাড়ি বানিয়েছি। তুমি আর বাবা চলো, আমি দেখাব।'

মা বলছে, 'কত দূরে রে? তুই তো উড়ে যেতে পারিস। আমরা যাই কেমন করে?'

—'কেন, আমি নিয়ে যাব। বাবা আমার ডান-ডানায় বসবে, তুমি বসবে বাঁ-ডানায়। আমি তোমাদের নিয়ে যাব।' ছেলে বাপকেও ডাকছে। বাবা কিছু বুঝতে পারছে না। বলছে, 'বাছা! আমরা যাব কি করে?'

—'চিন্তা কোর না তো বাবা! আমি নিয়ে যাচ্ছি তো! ভয় পেও না। আমার ডানায় বোস।'

—'বেশ।' বাপ আর মা ছেলের দু' ডানায় বসল। বাবা ডানদিকে, মা বাঁ দিকে। সারস উত্তর দিকে উড়ে গেল। উড়তে উড়তে নিয়ে এল সেই বাড়িতে, যার চারপাশে সবুজ সবজি বাগান।

সারস বালক বলল, 'আমাদের সকলের বাড়ি এটা। দেখ বাগানটা। বাড়িতে থাকে যারা। তাদের জন্যেই এ বাগান।'

মাকে দেখাল পাকা শসা, আরো কত রকম সবজি। বলল, 'মা! এ বাগানের সবজি একটিও কাওকে দিয়েছ, তো আমি মরে যাব। এখানে যা দেখছ, কারুক্যে দিও না।'

—'হ্যাঁ বাছা, তাই হবে।'

সারস বালক সবজিক্ষেতে লুকিয়েছে। ভাবছে, 'দেখি! মা কাকে দেয়!'

সে সময়ে লাঠি নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক বুড়ি এল। ক্ষেতের শাকসবজি দেখে ভারি খুশি হ'ল। শেষে বলছে, 'আহা! এ কার ক্ষেত, বাছা?'

—'দিদিমা, এ আমাদের।'

—'একটা, শুধু একটা শসা পেড়ে দেবে আমাকে?'

—'নিশ্চয়।' মা একটা বড়সড় শসা পেড়েছে। বুড়িকে বলছে, 'আমার ছেলে মোটে চায় না বাগানের ফলপাকুড় কারুক্যে দিই। কাউকে দেখিও না, কাউকে বোল না। নিয়ে চলে যাও।'

—'নিশ্চয় নিশ্চয়।' বুড়ি আঁচলে শসাটি ঢেকে রওনা দিল।

কিন্তু সারস বালক সবই দেখল। মা শসা কাটল, বুড়িকে দিল, স-ব! উড়ে এসে পড়ল মায়ের পায়ে। বলল, 'আমার একটা শশা কেটেছ। বললাম কারুক্যে দিও না, তবু তুমি দিলে। আমি শেষ হয়ে গেলাম মা! আমাকে মরতে হবে।' মাটিতে পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে মায়ের পায়েই সে মরল।

সারস মরে গেল, একটি আঠারো বছরের ছেলে উঠে দাঁড়াল।

মা বলল, 'হায় হায়! ওর জীবন তো চলে গেল। কিন্তু দেখ, আমি এক রক্ত মাংসের ছেলে পেয়েছি।'

মা ছেলেকে জড়িয়ে ধরল।

এখনো তারা সেই নতুন বাড়িতেই আছে। সবজি চাষ করে, খায় বাজারে বেচে।

আমাদের গল্প ফুরিয়ে গেল।

বাঘের পুষ্যি ছেলে

দিদায়ি

এক বুড়োবুড়ির না আছে জমিজমা, না আছে ছেলেপুলে। খুবই গরিব তারা। নিত্যি যায় জঙ্গলে, শিকড়-কন্দ-মূল খুঁড়ে বের করে, তাই খায়।

যখন তারা বেশ বুড়ো, বুড়ির হল সন্তানসম্ভাবনা। ক'মাস বাদে যেখানে কান্দামূল তোলে, সেখানেই এক ছেলে বিয়োল বুড়ি। সে বলছে, বুড়ো! ছেলে তো হ'ল। এখন কি করি?'

বুড়ো বলল, 'আমাদেরই খাবার জোটে না। না জামাকাপড়, না কিচ্ছু। একটা বাচ্চা পালব কি করে?'

বুড়ি বলল, 'বুড়ো! এখানে ওকে ফেলে রেখে যাই, চলো। হয়তো কেউ ওকে পালবে পুষবে।'

সেখানে ওকে ফেলেই ওরা ঘরে গেল। বাচ্চা তো কাঁদছে। এক বাঘ ছেলের কান্না শুনে সেখানে গেছে। বাচ্চাটাকে সেই নিয়ে এল। নিজের সন্তানদের মতো তাকেও পালতে থাকল।

ছেলে বড় হয়েছে তো বাঘ ভাবছে, একটা মেয়ে ধরে এনে ওর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া দরকার। সে শুধোচ্ছে, 'তুমি কি চাও, আমি যেয়ে একটা মেয়ে আনি তোমার জন্যে?'

ছেলে বলছে, 'তোমার যা ইচ্ছে বাবা! আমার বিয়েই যদি দিতে চাও, যাও! একটি মেয়ে আনো।'

বাঘ ওঁত পেতে আছে একটা মেয়ের জন্যে। ধরেওছে একজনকে। ফেরার সময়ে মেয়েটার একটা কান খেয়ে নিয়েছে। ঘরে এসে বলছে, 'বাছা! মেয়ে এনেছি। যাও, গিয়ে দেখ!'

ছেলে বেরিয়ে গিয়ে দেখল। বলল, 'একটা কানের খানিকটা নেই।' বাঘকে বলছে, 'বাবা আধখানা কানওয়ালা মেয়ে চাই না।।'

বাঘ বারবার যায়, মেয়েও আনে। আনার আগে মেয়েগুলোর হাত, নয় নাক, নয় কান খেয়ে নেয়। শেষে ছেলে বলছে, 'বাবা! একটি আস্ত, গোটা, নিখুঁত মেয়ে আনো!'

তাই আনব, মনে করেই বাঘ বেরোল। একটি মেয়েকে তুলে আনল বিয়ের আসর থেকে। বিয়েবাড়ির সবাই তো ভয়ে অস্থির। সযত্নে বয়ে এনে মেয়েটাকে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিল।

কিছুকাল বর কনে সুখেই কাটাল। একদিন বউ তরকারি কুটছে, তার হাত গেল কেটে, পাতায় রক্ত মুছে ও পাতাগুলো ছুঁড়ে ফেলেছে। রক্তের গন্ধ পেয়ে বাঘ সে পাতা থেকে রক্ত চেটে খেয়েছে। বাঘ ভাবছে, 'ওদের রক্তে যদি এত সোয়াদ, না জানি মাংস আরো কত ভাল হবে? আমি ওদের খাবোই খাবো।'

হয়তো মনের কথা বলে ফেলছিল, কিংবা ওর চোখের চাহনি দেখেই মতলব বোঝা গেল, যাই হোক, ছেলে আর বউ জেনে গেল যে বাঘ ওদের খাবে।
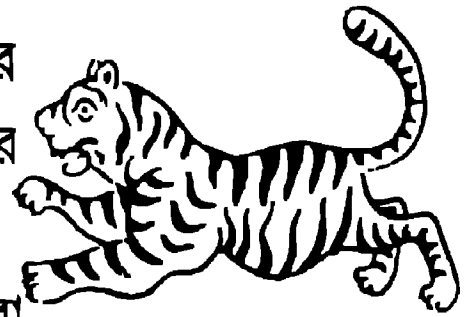
সে রাতেই দুটোতে পালাল। সকালে বাঘ দেখে ওরা ওখানে নেই। খুঁজতে খুঁজতে পেল ওদের পায়ের ছাপ। তাই দেখে চলল।

ছেলে আর বউ গাছের মাথায় চেপে নীরবে দেখে যাচ্ছে। বাঘ যেমন ধাওয়া করল, ছেলেটা তরোয়াল দিয়ে তাকে মেরেই ফেলল।

তারপর ওরা বউয়ের গ্রামে গেল। সেখানে ছিল বউয়ের বাবা, মা, আর ভাই। ওদের দেখা পেয়ে শ্বশুর শাশুড়ি তো খুব খুশি। ওরা ভেবেছিল, বাঘ মেয়েকে নিয়ে গেছে, খেয়েও ফেলেছে।

সেদিন থেকে ছেলে আর বউ ওখানেই থেকে গেল।

এক আধলায় জীবন যাপন

কোঙ্কনী (গোয়ার সলসেট্ থেকে)

এক বুড়ির এক বিয়ের যুগ্যি মেয়ে। মাকে বাড়ির কাজে সাহায্য করারও যুগ্যি। তবে বেজায় আলসে কুঁড়ে তো! সংসারে কুটো ভেঙে দুটো করে না। মা ভোরে উঠে ঝাঁটপাট, ধোয়াধুয়ি, রাঁধাবাড়া সব করে। মেয়ে শুয়েই থাকে। রোজ সকালে মা ডাকে,—'অ ভারো, উঠে পড়। সূর্য যে মন্দির ছুঁল।

মেয়ে বলে, 'সূর্য যদি অদ্দূর উঠে থাকে উঠুক গে! আমি ফিতে আর চিরুনি ছাড়াই চুল বাঁধতে জানি, এক দাম্ড়ি পেলেই চালিয়ে নিতে জানি।' এরপর উঠে ধীরে সুস্থে ও নায় ধোয়, খায়, সাজে, চুল বাঁধে।

এমনিই চলতে থাকে দিনের পর দিন। একদিন রাজপুত্র সে পথে যাচ্ছে, শুনল, বুড়ি বলছে, 'অ ভারো! সকাল হয়েছে। সূর্য যে মন্দিরের চুড়ো ছুঁল।'

আর মেয়ে বলছে, 'সূর্য যদি অদ্দূর উঠে থাকে, উঠুক না! চিরুনি বা ফিতে ছাড়াই চুল বাঁধতেও জানি, এক দাম্ড়ি পেলেই চালিয়ে নিতেও পারি।'

শেষের কথাগুলো কুমারের মনে ধরল। সে ঠিক করল, ভারোকে বিয়ে করবে, বাজিয়ে দেখবে। একটা একরত্তি তামার পয়সা দিয়ে ও জীবন চালায় কি করে। দাম্ড়ি তো সবচেয়ে কম দামী মুদ্রা, যাকে বলে আধলা।

কুমার তো জানে, তার পক্ষে এক গরিব বুড়ির মেয়েকে বিয়ে করা সহজ হবে না। ঘরে ফিরে বাবার আস্তাবলে এক ঘোড়ার খাঁচায় ও পড়ে থাকল। প্রাসাদে সবাই তাকে খুঁজে ফিরছে। সন্ধ্যেবেলা দাসীরা ঘোড়াকে দানা, ছোলা, মটর খাওয়াতে এসেছে। রাজকুমার দেখছে, সেগুলো ওরাই খাচ্ছে, ঘোড়াকে দিচ্ছে খোসাটা। কুমার রাগ চেপে রাখতে পারল না। উঠে এসে বলল, 'ও হো! নিজেরা খাও ছোলা, ঘোড়াকে দাও খোসা! তোমরা মুটিয়ে যাচ্ছ, আমার ঘোড়াগুলো রোগা হচ্ছে। এত অবাক হবার কি আছে?'

দাসীরা সে কথায় কানই দিল না। তারা চেঁচিয়ে উঠল, 'কুমার! এখানে আপনি কি করছেন? ওরা আপনার খোঁজে রাজ্য তোলপাড় করছে, আপনি আস্তাবলে পড়ে আছেন?'

কুমার বললেন, তিনি কোথায় আছেন তা বলে দিলে ওদের পেটাবেন। বজ্জাত মেয়েগুলো শাসানি খেয়ে মোটেই দমল না। হাসতে হাসেত ওরা রাজাকে বলছে, 'মহারাজ! একটা বলব, না দুটো বলব?'

রাজা তো ছেলের জন্যে বড়ই অধীর। বললেন, 'তোমাদের কিসে কি এসে

যায়? এই খাচ্ছ, এই চেঁচাচ্ছ! আমি ছেলের কথা ভাবছি।'

—'মহারাজ! শুনেই দেখুন, সুসংবাদই আছে।'

—'সে একটা হোক, বা দুটো হোক, যা বলবার ঝটপট বলো।'

দাসীরা বলল, ঘোড়াকে ছোলা খাওয়াতে গিয়ে ওরা দেখেছে যে কুমার আস্তাবলে শুয়ে আছেন। রাজা তখনি গেলেন আস্তাবলে। কুমারকে দেখতে পেলেন ও বললেন, 'কি হয়েছে তোমার? কেউ কি মনে ঘা দিয়েছে? যদি কেউ তোমার গায়ে হাত তুলে থাকে, তার হাত কেটে ফেলে দেব। যদি কেউ নজরবাণ ছুঁড়ে থাকে, তার চোখ গেলে দেব। শুধু বলো কি চাও, এনে দেব!'

—'আমার কিছুই হয়নি। কেউ হাত পা তোলেনি গায়ে, কুনজরও হানে নি। একটিই প্রার্থনা আমার। এক বুড়ির মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

—'এই কথা? হবে, যা চাও, তাই হবে। গোমড়া হয়ে থেকো না অত। এসো, খাওয়াদাওয়া করো।'

কুমার আস্তাবল ছেড়ে বাবার সঙ্গে গেলেন। সেই বুড়িকে তলব পাঠাবার আগে রাজা ছেলেকে অনেক বোঝালেন। এমন মূর্খের মত বিয়ে করলে তা বিগড়ানো খুবই সম্ভব। সে কুমার, একদিন দেশের রাজা হবে। ভিখিরি তুল্য একটা মেয়েকে বিয়ে করে কি করে? কিন্তু কুমারও একরোখা। ও মেয়েকে বিয়ে করতে না পারলে তিনি আত্মহত্যাই করবেন।

আর কোন পথ না পেয়ে রাজা এক দূত পাঠিয়ে বুড়িকে দরবারে তলব করলেন। বুড়ি তো ঘাবড়ে গেছে। কি এমন অপরাধ করেছে, যে রাজা ডাকল? ভেবে ভেবে দিশে পায়না বেচারি। রাজার হুকুম, মানতেও হবে। কাঁপতে কাঁপতে গেছে দরবারে।

বুড়ি প্রণাম জানাচ্ছে, রাজা আঙুল দেখাচ্ছেন, চেয়ারে বোস। বুড়ি গরিবস্য গরিব। চেয়ার তার নেই, কখনো বসেও নি। রাজা সযত্নে হাত ধরে তাকে বসালেন। তারপর বললেন, 'তোমার সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে চাই। আমার ছেলের হাতে তোমার মেয়েকে দাও।'

বুড়ি যখন বাকি ফিরে পেল, বলল 'মহারাজ! আমার সঙ্গে তামাশা করছেন? আপনি কে, আর আমি কি! কেমন করে এমন বিয়ে হতে পারে?'

রাজা পইপই করে বোঝালেন, এ কোন তামাশা নয়। বুড়ির মেয়ে ভারো ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে চায় না কুমার।

বুড়ির তো মাথায় সাঁধায় না কিছু। রাজা কি করে ভিখিরির মেয়েকে চাইছেন? আর ভারো? সেটা তো কুঁড়ের হদ্দ! বুড়ি 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই না বলে ঘরে ফিরল। কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল।

ভারোর কাছে এ এক নতুন ঘটনা। মা কোনদিন এমন শুয়ে পড়ে না। সে

শুধোল, মায়ের কি দেহগতিক খারাপ? বুড়ি তাকে বেরিয়ে যেতে বলল। ভারো যেন তাকে না জ্বালায়। ভারো ছাড়ার পাত্রীই নয়। শেষ অবধি বুড়ি বলল, রাজা তাকে ডেকে বলেছে ভারোকে বেটার বউ করবে। বুড়ি মহা বিপন্ন, কি করবে ভেবে পাচ্ছেনা।

কুমার বিয়ে করতে চেয়েছে, ভারো তো খুব গর্বিত। সে মাকে ঠেলে তুলে বলছে, এখনি যাও। রাজাকে বলে এসো, আমরা রাজী।

গভীর অনিচ্ছায় একেবারে বিভ্রান্ত বুড়ি আবার গেল প্রাসাদে. রাজাকে সম্মতি জানাল। রাজা কুমারকে খবর দিলেন। কুমার খুব আনন্দিত।

রাজা বিয়ের আয়োজন করলেন রাজকীয়।

বুড়ি তার সামান্য সাধ্যের মধ্যে তার গরিব আত্মীয়দের ডাকল।

বিয়ে হল এক মহোৎসবের বর্ণচ্ছটায়।

মাস দুই বাদে কুমারের মনে পড়েছে ভারোর সদম্ভ উক্তি, 'এক দাম্‌ড়িতেই চালিয়ে নিতে পারি।'

এখন তো কথাটি পরখ করে দেখতেই হয়। কুমার রাজাকে বলল একটা জাহাজ বানাতে দাও, আমি দেশে দেশে বাণিজ্য করব।

রাজা বলছেন, কুমারের ব্যবসাবাণিজ্য করার দরকার নেই। রাজা বুড়ো হচ্ছেন। তিনি চান, কুমার রাজ্যভার নিন। কুমার বললেন, কয়েক মাসের তো ব্যাপার, তাই জাহাজ একটা চাই। অগত্যা রাজা জাহাজ বানাতে আদেশ দিলেন। তাঁর অর্থবল যত, লোকবল তত। যে জাহাজ বানাতে কয়েকমাস লাগার কথা, তা তৈরি হ'ল কয়েকদিনে। জাহাজের কাপ্তেন ও নাবিকরাও নিযুক্ত হল।

পথের জন্যে খাবার দাবার কুমার সামান্যই কিনলেন। ভারোকে নিয়ে নিলেন জাহাজে। ভারো তাঁর মনের কথা বোঝে নি। সে তাঁর সঙ্গে যেতে পেরেই খুশি, কুমার যেখানেই নিয়ে যান না কেন।

সুবাতাস দেখে জাহাজ পাল তুলে তীর ছাড়ল। বহুদিন চলে ওঁরা পৌঁছলেন এক দূর দেশে। সেখানেই নোঙর ফেলা হ'ল। দু' একদিন থাকাও হ'ল। খাদ্যদ্রব্য যখন নিঃশেষ, কুমার ঠিক করলেন, ভারোকে রেখে চলে যাবেন। কাপ্তেন আর নাবিকদের নিয়ে তীরে নামলেন কাজের অছিলায়, এবং ভারোকে একলা ফেলে রেখে উধাও হলেন। ভারোর অজানতে তার শাড়ির আঁচলে বেঁধে দিলেন একটি তামার পয়সা, যা ভাঙালে বড় জোর তিন দাম্‌ড়ি হবে।

স্থলপথে কুমার তাঁর লোকজন নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন।

ওঁরা যাবার ঘণ্টাখানেক বাদে ভারোর ক্ষিদে পেয়েছে। জাহাজের ভাঁড়ারঘরে গিয়ে দেখে এক দানা খাবার নেই। জাহাজে কোথাও নেই কিছু। সে দিন, আর সে রাত তার উপোসে কাটল। পরদিন যখন ভাবছে কি করে, কি করে, আঁচলের খুঁটে

বাঁধা কি যেন হাতে ঠেকল। গেরো খুলে দেখে একটি আধলা পয়সা. যার দাম মোটে তিন দাম্‌ড়ি।

একটা আধলা নিয়ে সে কি করবে? অবশেষে দেখে এক বুড়ো জেলে মাছ ধরতে ধরতে জেলেডিঙি নিয়ে জাহাজের কাছে এসেছে।

ভারো তাকে 'কাকা' বলে ডাকছে। জাহাজ থেকে 'কাকা' ডাক শুনে জেলে বেশ অবাক। সে আরো অবাক, এক তরুণী তাকে ডাকছে বলে। এত বড় জাহাজে এক একলা তরুণী।

সে জেলেডিঙি কাছে আনল। ভারো আধলাটা ছুঁড়ে দিয়ে বলছে চারটি চাল-ছোলাভাজা আনতে। বুড়ো জেলে 'না' বলতে পারল না। সে ডাঙায় গিয়ে চাল-ছোলাভাজা কিনল, ভারোকে দিল, চলে গেল। সেও গেছে, ভারোও খেতে যাচ্ছে ওগুলো। ও মা! হাত ফসকে সব পড়ে গেল জলে।

ভারো কেঁদেই ফেলত, হঠাৎ দেখে ঝাঁকে ঝাঁকে বড় বড় মাছ এসে সেগুলো খেয়ে নিয়েছে। খেয়ে মাছগুলো গেছে তীরের দিকে। আর বালির উপর অঢেল সোনার মোহর বমি করছে। ভারো যেমন অবাক, তেমন খুশি. সে মোহর এনে এনে ও জাহাজ বোঝাই করেছে।

আরো একটা দিন উপোসে কাটল বটে, কিন্তু বুড়ো জেলের জন্যে ও অপেক্ষা করে রইল। সকালে যখন ও এল, ভারো তাকে একটি মোহর দিয়ে বলছে, যত রকম খাবার পাও, কিনে আনো। আর জেলেকে একটা মোহর দিয়েছে বখশিস।

এখন তো অযস্থল খাবার, ভারো পেটটি পুরে তা খেল। পরদিন বুড়ো জেলেকে নিয়ে ও গেল ডাঙায়. ওরই সাহায্যে কিনল খানিক জমি। পরদিন কিনল কাঠের তক্তা, ইট, পাথর, একটা বড়সড় বাড়ি তৈরির সব সরঞ্জাম। বুড়ো জেলে ওকে একটি ছোট কুটীর বানিয়ে দিল। ভারো সেখানে থেকে বাড়ি তৈরির তদারকি করে। জেলের সাহায্যে ও কিনল পুরুষের পোশাক, সাজল পুরুষ।

দু'মাস বাদে কুমার ভাবছে, এক আধলায় ভারো কেমন জীবন কাটাচ্ছে, দেখে আসি, আরেকটা জাহাজ নিয়ে সে তো এসেছে দেখতে। পুরনো জাহাজটি দেখে জনশূন্য। বউকেও দেখতে পায়না। ভাবল হতভাগী বুঝি ডুবে গেছে। জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে দেশে ফিরবে, এমন সময়ে দেখে সমুদ্রতীরে এক প্রাসাদ। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তার নির্মাণ।

জানতে কৌতূহল হল, এ বাড়ি কার।

ডাঙায় নেমে এক কারিগরের পোশাক পরে কুমার ওখানে গিয়ে কাজ চাইল। বুড়ো জেলেই তা কাজ দেখাশোনা করছে, সে কুমারকে নিয়ে গেল ভারোর কাছে।

ভারো তো পুরুষের পোশাকে। কুমার তাকে চিনল না। ভারো চিনেছে বটে, তবে বুঝতে দিলনা। যেন অচেনা লোক। এ ভাবেই তাকে কাজ দিয়েছে। পরিশ্রমসাধ্য

কাজ দিতে একটু বাধল, দেখাশোনার কাজই দিল। তাকে থাকতেও দেয়া হল মনিবের বাড়ি।

রাতে ভারো দাসদের বলছে তার টেবিলেই একেও খেতে দিতে। কুমার সম্ভ্রমের বশে মালিকের সঙ্গে খেতে নারাজ। ভারো জোরাজোরি করছে (হাজার হলেও বউ তো বটে), আর কুমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও খেতে বসেছে। নতুন মনিবের আচরণে সে বেশ ঘাবড়ে গেছে।

এরপর ভারো, বুড়ো জেলে আর কুমারকে দায়িত্ব দিচ্ছে, আসবাব-পত্তর কিনে নতুন বাড়ি সাজাবার। কুমারের আসবাব-পত্তর বিষয়ে শখ যত, রুচিও তেমন। খাসা খাসা আসবাব কিনে সে নিজে সাজাচ্ছে। বাড়ি এখন খুব সুন্দর।

এবার ভারো সব কারিগর-মিস্ত্রি-মজুরের পাওনা মিটিয়ে ছুটি দিচ্ছে। কুমারকে আর ক'দিন থাকতে বলছে।

একদিন, বাড়িতে যখন শুধু তারা দু'জন, ভারো কুমারকে ডাকছে তার শোবার ঘরে। সবচেয়ে সুন্দর শাড়ি আর মণিমুক্তো পরে ভারো বসে আছে। কুমার ঢুকে একেবারে তাজ্জব। সামনে দাঁড়িয়ে ভারো! সে ভাবছে, স্বপ্ন না সত্যি! এ কি ভারো? মুখে বাক্যি ফুটতে সে শুধোচ্ছে ব্যাপারখানা কি?

ভারো তখন সবই বলছে। রাজকুমার তো তাকে ভাসিয়ে চলে গেল। তারপর মোটে একটা দিন সে উপোস করে। আঁচলে আধলা পেল, কেমন বুড়ো জেলেকে বলল, তা নিয়ে চাল-ছোলাভাজা আনতে! যেই খেতে যাবে, সব পড়ে গেল জলে। কেমন এক ঝাঁক মাছ গিলছে চাল-ছোলাভাজা, আর ওগরাচ্ছে মোহর। কেমন সে মোহরগুলো কুড়োল। সেই থেকে কেমন আরামে আছে, কেমন চমৎকার বাড়ি করেছে, আর কুমার কি সুন্দর সাজিয়েছে বাড়ি!

ভারোর কথা তো ফুরোল। এখন কুমার বলছে কেন ভারোকে বিয়ে করেছিল, কেমন কৌশলে। ভারোকে কেমন সঙ্গে আনল। শূন্য জাহাজে একলাটি ছেড়েও গেল কেমন তাকে পরখ করে দেখতে।

এখন তো কুমার খুব খুশি। নিত্যি সকালে ভারো বলত, 'সে একটি ফিতে বা চিরুনি ছাড়া চুল বাঁধতেও জানে, একটি দাম্ড়িতে জীবন চালিয়ে নিতেও জানে।' ভারো তো তা কাজে করে দেখিয়ে দিয়েছে।

সে বাড়ি বেচে দিয়ে টাকাপয়সা, মোহরের গাদা সব নিয়ে ওরা বাড়ি ফিরে গেল। বুড়ো বয়স অবধি সুখে শান্তিতে বাসও করল।
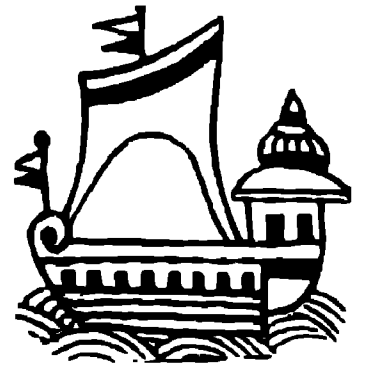
জাদু বাটি

তামিল
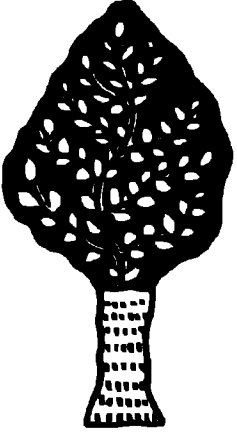
সে এক বেজায়, বেজায়, বেজায় গরিব বেচারি। বউ অষ্টপহর মুখনাড়া দেয়, লোকটা এমন আলসে-কুঁড়ে, কোন কাজের নয় বলে। লোকটা নিশ্চুপে বউয়ের গাল শুনে যায়। যখনি পারে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। সারাদিন বাইরে কাটিয়ে, বিপদ কেটে গেছে মনে হ'লে ঘরে ফেরে।

একদিন বউয়ের রাগ আর বাঁধ মানেনি। বাসনকোসন ঘেঁটেঘুঁটে বাসিপচা যে অন্নব্যঞ্জন পেল, সব একটা নোংরা নেকড়ায় পুঁটলি বেঁধে স্বামীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'যে চুলোয় যাও, যাও! রোজগার করো যা পারো। না করে ফিরবে না।'

দড়াম করে দোর দিল বউ। বাসি ভাতের পোঁটলা নিয়ে মানুষটা গ্রাম ছেড়েই চলে গেল। যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে মাইলের পর মাইল, পৌঁছল এক তেমাথায়, যেখানে তিনটে পথ মিলেছে। সেখানে এক বিশাল প্রাচীন বটগাছ। যুগ যুগ ধরে সে ক্লান্ত পথিকদের ছায়া দেয়।

মানুষটা ভারি হয়রান, পা টাটাচ্ছে খুব। সে গাছের নিচে বসল। ভাতের পোঁটলা বাঁধল গাছের ডালে, তারপর বটগাছের শিকড়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

এখন, সে বটগাছে তো বনদেবতাদের বাস। বনদেবতারা লোকটাকেও দেখেছে, পোঁটলাটাও দেখেছে। ভারি লোভ, লোকটার খাবার খায়। ভাবতে না ভাবতে খেয়েও নিয়েছে. আরো কি! বাসি ভাতে ভারি সোয়াদ লেগেছে। স্বর্গের অমৃত আর দেবভোগ্য খাদ্য তো খায়ই, এ যেন নতুন সোয়াদের জিনিস!

জীবনেও ওরা বাসি ভাত খায়নি। কি চমৎকার না খেতে! নন্দনকাননের ফল, আর স্বর্গের অমৃত তো নিত্যি খায়। একঘেয়ে হয়ে গেছে ও সব। ও বেশ মুখটা বদলানো গেল।

ওই ক'মুঠো বাসি ভাতেই বনদেবতাদের পেট ভরে গেছে। বড় সুখ হয়েছে তো! ওরা ভাবছে, লোকটার খাবার তো খেয়ে নিলাম। বেচারি ঘুমন্ত মানুষটাকে এর বদলে কিছু দেয়া যাক।

ঘুম ভেঙে সে বেচারির বেজায় ক্ষিদে লেগেছে। পোঁটলাটা খুলে দেখে খাবার উধাও। আছে চারটে তেড়াবেঁকা বাটি। ক্ষিদেয় পাগল-পাগল হয়ে বাটিগুলো আছড়ে ফেলেছে মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে চলে এল অপরূপ সুন্দরী মেয়েরা। তারা বয়ে এনেছে দেবভোগ্য সব খাবার। যেন এখনি পরিবেশন করবে। লোকটি তো এমন জাদু দেখে অবাক। কিন্তু খিদের জ্বালা, বড় জ্বালা, কথা কইবার

সময় কই? সে খাচ্ছে, সুন্দরী মেয়েরা কথাটি না বলে পরিবেশন করে চলেছে। তার মনের ইচ্ছে বুঝে বুঝে ঠিক খাবারটি আনছে। যেন ওরা দেবতার সেবা করছে। লোকটির মনে হতে থাকল, ওরা যেন তার দাসী। খাওয়া শেষ হতেই এই অলৌকিক সেবিকারা মিলিয়ে গেল। রেখে গেল চারটে শূন্য বাটি।

সকল দেবদেবীকে কৃতজ্ঞ প্রণাম জানিয়ে সমম্ভ্রমে ও তুলে নিল বাটিগুলো। সেগুলো বুকে আঁকড়ে ধরে ছুটল বাড়ি। গল্পটা বলার জন্যে তার পেট ফুলছে। কাহিনীটি শুনে তার বউ তো আনন্দে বুঝি ফুটির মতো ফেটে যায়।. গৃহদেবতাদের পায়ের কাছে বাটিগুলো রেখে ওরা বারবার দেখছে। আছে তো? সত্যি আছে তো? নিজেদের সৌভাগ্যে বিশ্বাস হয় না যেন। ভাবল, দেবতার দান, যোগ্য শ্রদ্ধাসম্মান দিয়ে ব্যবহার করবে। সর্বসমক্ষে পূজা দেবে, প্রতিবেশীদের মধ্যেও বেটে দেবে দেবতার আশীর্বাদ।

পরদিন ভোর না হতে মানুষটা বেরিয়ে পড়েছে। ধনী-গরিব নির্বিচারে গ্রামের সকলের দোরে ঘুরেছে, নেমন্তন্ন করেছে প্রতিটি পরিবারকে। সকলের মনে সংশয়। কেউ মুখের ওপর হাসছে। কেউ ভাবেছে লোকটা তো পাগলই হয়ে গেল,—গোটা ব্যাপারটা দাঁড়াবে এক তামাশায়। তারা সবার শোনা প্রবাদটা আওড়াল, 'গরিবের বাড়ি গেলে নিমন্ত্রিতরা সাতসকালে বাড়ি ফেরে।'

ওদের ছোট্ট কুঁড়েতে নিমন্ত্রিতরা দুপুরে এসে গেল। অনেকে আগে ভাগে বাড়িতে পেট ভরিয়ে তবে এসেছে। তারা মজা দেখতেই এসেছে, তারপর তো বেজায় অবাক!

গরিব লোকটি আর তার বউ চারটে বেঁকাতেড়া বাটি এনে বাটিগুলোকে সসম্মানে বলছে আমন্ত্রিতদের আশীর্বাদ ধন্য করতে। দেখ! কি আশ্চর্য! অপরূপ সুন্দরী মেয়েরা, এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ! সবাই সহসা আবির্ভূত। তাদের হাতে দেবভোগ্য সব খাবার। আমন্ত্রিতদের সামনে কোথা থেকে চলে এল সার সার রূপোর থালা। পরিবশেন শুরু হল।

অতিথিরা খেয়ে চলেছে, আসছে নতুন নতুন খাবার। মেয়েরা এমন ভাবে পরিবেশন করছে যে প্রত্যেকের মনে হচ্ছে, ঠিক আঁচ করেছে তো আমি কি চাই! অতিথিরা এত খেল, যে তাদের পেটই বুঝি ফেটে যায়। আসন ছেড়ে উঠতে, বাড়ি ফিরতে তাদের কষ্টই হ'ল।

গ্রামে এ খবর দারুন সাড়া জাগাল। সবাইয়ের মুখে এই কথা। গরিবটি তো আর গরিব নয় এখন। তাকে নিয়ে মাতামাতি কিন্তু অনেক দিন চলল।

গ্রামে ছিল এক ধনী, নিজেকে সে ভাবত কেউকেটা। তারই পড়শী, যে কাল অবধি ছিল এক কপর্দকহীন ভিখিরি, তার রমরমা, তার প্রশংসা,—ধনী লোকটির বেজায় ঈর্ষা হল। সে নিজেও একদিন গেল তার ঘরে। দেখল জাদু বাটির মহিমা।

খেয়ে এল সেই সুন্দরীদের হাতে। পড়শীর সঙ্গে সে ভাব করে ফেলল। স্বামী-স্ত্রীকে উপহার দিতে থাকল। ক্রমে ক্রমে রহস্যটি জেনে গেল।

ভাবল, 'এ তো জলের মত সহজ! কোন ব্যাপারই নয়।' ঘরে ফিরে ওর সেরা রাঁধুনিকে বলছে, দারুণ দারুণ ব্যঞ্জন রাঁধতে। পরদিন পালকিতে চেপেছে, বেহারারা দৌড়চ্ছে উর্ধশ্বাসে, শেষে পৌঁছেছে সেই তেমাথায়।

পয়সার জোরে যতদূর পারা যায়, তত খচর করে কেনা পাত্রে উৎকৃষ্ট খাবার সাজিয়েছে। পাত্র রেখেছে এক বিশাল ঝাঁকায়। ঝাঁকা রেখেছে গাছের তলে। তারপর পালকি বেহারাদের বলেছে, সাঁঝ অবধি ছুটি। নিজে শুয়ে পড়েছে যেন ঘুমোবে এবার। অবশ্যই ঘুমোবার মতলব নেই তার। ভীষণ কৌতূহল তার, বনদেবতাদের দেখবে, তারা কি করে, দেখবে। শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময়ে ঘুমিয়েও পড়েছে। ধড়মড়িয়ে জেগে উঠেছে যখন?

তার পাশে চারটে তেড়াবেঁকা বাটি, আর ঝাঁকাটি খালি। তবে সে সফল হ'ল। অবশ্য, 'হবেই' তাতে ওর সন্দেহ ছিল না কোনো। বটবৃক্ষের দেবতাদের জন্য সে তো রাজারাজড়ার যোগ্য খাবারই এনেছিল। সে যা চায়, দেবতারা তা না দিয়ে পারে? এই তো তার চোখের সামনেই জাদু বাটি!

পালকি বেহারাদের তাড়া দিচ্ছে, ঘরে ফেরার বড্ড তাড়া এখন। বাড়ির সকলকে ডেকে গ্রামে ঘরে ঘরে নেমন্তন্ন করতে পাঠিয়েছে।

গ্রাম ঝেঁটিয়ে সবাই এসেছে তার খাবার ঘরে। সেদিন যে ভোজ খেয়েছে, সে কথা মনে পড়লেও তো জিভে জল আসে। আবার দেখ ভোজ, তাও ধনীর ঘরে। অনেকে গোটা দিন উপোসী থেকেছে ভোজের আশায়।

সহাস্যে স্বাগত জানাচ্ছে ধনীটি, বসতে বলছে সকলকে। তারপর দাসরা বাটিগুলো আনল সযত্নে, রাখল একটি বেদীতে। ধনীটির মাথায় মলমলের পাগড়ি, কানে কুণ্ডল আর গোমেদ। সে বাটিগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে হেঁকে আদেশ জানাচ্ছে যে আমন্ত্রিতদের দেবভোগ্য খাবার পরিবেশন করা হোক!

যেমন বলা, তেমনি দেখা গেল বিশাল চেহারার হট্টাকট্টা জোয়ান মানুষদের, চেহারা কুস্তিগীরের মতো। মাংসপেশী যেন লোহার তৈরি, আর চাহনি দেখেলে অতি বড় বাহাদুরেরও পিলে চমকে যাবে। বাটি থেকে বেরিয়ে তারা গৃহকর্তা আর আমন্ত্রিতদের ধরল। একেকজনকে ধরছে, খরধার ক্ষুর বের করে তাদের মাথা মুড়িয়ে বেল করে দিচ্ছে।

এমন করে মাথা চেঁছেছে. যে মাথা চকচক করছে ঘষামাজা ব্রোঞ্জের গামলার মতো। নাপিতদের হাতে মেয়েরাও রেহাই পেল না।

ভয়ে প্রাণপাখি উড়ে যাবার জোগাড়, নেমন্তন্ন খাইয়েরা গুটিসুটি হয়ে পালাচ্ছে,—

দরজায় দাঁড়াল এক ষণ্ডাগুণ্ডা। সে এক মানুষ প্রমাণ আয়না ধরে থাকল। সকলকে দেখতেই হল কেমন দেখাচ্ছে তাদের।

সেই যে তারা পালাল, আর ও বাড়িতে কোনদিন ফিরে আরেকবার আসেনি।

চার যোগী

সাঁওতালী
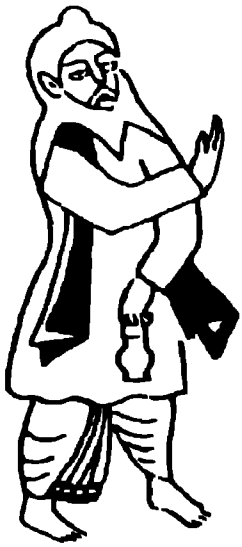
অনেকদিন আগে চার যোগী বেরিয়েছে ভিক্ষে করতে। ঠিক করেছে, এক রাজার কাছেই মাগবে ভিখ। চলতে চলতে পরামর্শও চালাচ্ছে, কেমন করে কাজটা করা যাবে। যেতে যেতে দেখে এক মেঠোইঁদুর। দেখে এক যোগী বলছে, 'বুঝেছি কেমন করে ভিখ মাঙব। বলব, দেখ, দেখ, মাটি খোঁড়ে খপ্ খপ্।' বাকি তিনজনের তো সুরাহা হ'ল না কোন। আর খানিক পথ গেছে, তো দেখে, কয়েকটা ব্যাং লাফিয়ে পড়ল পুকুরে। দেখেই আরেকজন বলছে, 'জানি আমি কি বলব। বলব, বসে পড়ে ধপাধপ।' রইল বাকি দু'জন। চলতে চলতে দেখে, একটা শুয়োর কাদায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। একজন বলল, 'আমি কি বলব জানো? ঘসে চলো ঘ্যাঁসঘ্যাঁস, ফের দাও জল!' চার নম্বর যোগী ভেবেই পায়না কি বলবে। তবে দূর থেকে যেই রাজার শহর দেখেছে, সেই বলছে, 'আমি বলব,—বড় রাস্তা, সরু গলি। শহরখানা বড়! তশিলদার বাবু! ঘুরতে শুরু করো!'

একটা লোককে ধরেছে ওরা। লোকটা কাগজে চার যোগী যা যা বলল, তা লিখেছে। যোগীরা কাগজটা রাজাকে দিয়েছে। রাজা পড়ে তো মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝেন না। যোগীরা দেখেছে রাজা যেন ঘোল খেয়ে গেছেন। তাদের ভয়, রাজা যদি তাদের পড়তে বলেন! তখনি তারা পিঠটান দিয়েছে। তারা তো পড়তে জানে না। কি যে লিখিয়েছে, তাও সঠিক মনে পড়ছে না।

এখন, রাজার আছে এক তহশীলদার, সে হিসেব রাখে। আর আছে এক নাপিত, সে রাজাকে রোজ খেউরি করে।

সেদিন সন্ধ্যায় যোগীরা তো পালিয়েছে। এখন এই তহশীলদার নাপিতকে বলছে, আগামীকাল সকালে রাজার দাড়ি কামাবার সময়ে নাপিত যদি ক্ষুর দিয়ে রাজার গলাটা কেটে দিতে পারে, তবে তহশীলদার আর নাপিত রাজ্যটা ভোগ করতে পারে। নাপিত তখনি রাজী হয়ে গেল।

তহশীলদার সহজে তুষ্ট না। প্রাসাদের দেখাশোনা করেন যে নায়েব, তাঁকে

বলছে, আজ রাতেই রাজপ্রাসাদের সিঁধ কেটে ঢুকে টাকাকড়ি-সোনাদানা সরানো যাক। রাজার ঘরের মাটির দেয়ালে ওরা সিঁধ কাটছে বাইরে থেকে। আর রাজা ঘরে বসে যোগীদের লেখা কাগজটা পড়ে বুঝতে চেষ্টা করছে। হঠাৎ রাজা বলে উঠেছে,

—'মাটি খোঁড়ে খপ্ খপ্!' তখনি তহশীলদাররা বুঝেছে, রাজাতো টের পেয়েছে। তারা বসে পড়ছে গুঁড়িমেরে।

রাজা স্পষ্ট বলল,

—'বসে পড়ে ধপাধপ!'

এখন তহশীলদার আর নায়েব বুঝেছে রাজা ধরে ফেলেছে তাদের। তারা দৌড় মেরেছে।

পরদিন নাপিত এসেছে রাজাকে খেউরি করতে (খেউরি : দাড়ি কামানো, চুল কাটা, নখ কাটা)। ও ক্ষুর ঘষছে শান দিতে, রাজা কাগজ পড়ছে। হঠাৎ রাজা বলল,

—'ঘসে চলো ঘ্যাঁসঘ্যাঁস, ফের দাও জল!'

নাপিত ভেবেছে, দাড়ি কামাবার জন্যে নাপিত যে তাঁর মুখে জল লাগাচ্ছে, রাজা সে কথাই বলছে।

রাজা বলল,—'জানি হে জানি! তুমি কি করতে চাও।'

নাপিত স্থির নিশ্চিত, তহশীলদার ষড়যন্ত্রের কথা বলেই দিয়েছে। এখন রাজার পায়ে পড়ে সে সবই স্বীকার করছে। বলছে, ষড়যন্ত্র তহশীলদারই করেছিল।

তখনি রাজা নায়েবকে ডেকে বলছে, তহশীলদার আর নাপিতকে কারাগারে বন্দী করতে। নায়েব যখন ঢুকেছে, তখনো রাজা আপন মনে বলছে, 'মাটি খোঁড়ে খপ খপ!'

নায়েব ধরে নিল, এটা সিঁধকাটার কথাই বলা হ'ল। নতজানু হয়ে সে সব দোষ স্বীকার করল।

রাজা তো এ সব জেনে তাজ্জব। বাইরে গিয়ে স্বচক্ষে সিঁধকাটার গর্তও দেখল, আর তিন অপরাধীকে পুরল কারাগারে।

এরপর রাজা দিকে দিকে দূত পাঠাল যোগীদের সন্ধানে। তাদের জন্যেই তো রাজার প্রাণ ও রাজত্ব রক্ষা পেল।

কিন্তু যোগীরা এত ভয় পেয়েছিল, এতদূর দৌড়েছিল, যে তাদের হদিশ আর মেলে নি।

বিপদ কালের বন্ধু

মলয়ালম
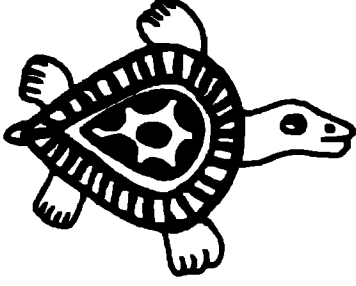
পুকুরের কচ্ছপ আর গুহার শিয়ালে ভারি বন্ধু।

একদিন তারা পুকুরপাড়ে গল্প করছে, হঠাৎ হাজির এক চিতাবাঘ। শিয়াল ভয়ে ভাগল্ বা। কচ্ছপ বেচারা তো তাড়াতাড়ি চলে পালাতে বা লুকাতে পারে না। এক লাফে চিতাবাঘ তাকে ধরেছে। গাছের নিচে বসেছে বেশ জুত করে খাবে ব'লে।

কচ্ছপের খোলা তো খুব শক্ত। চিতাবাঘ দাঁত আর নখ চালিয়েও সে খোলাকে কায়দা করতে পারছে না।

গুহার গর্ত থেকে শিয়াল সবই দেখছে। বন্ধু কচ্ছপকে বাঁচাবার চেষ্টাও ভাবছে। অবশেষে শিয়াল, চিতাবাঘের কাছে গিয়ে সবিনয়ে বলছে, 'কচ্ছপের খোলা ফাটাবার একটা কায়দা জানি আমি। ওকে জলে ফেলে দিন। ভিজতে ভিজতে ওর খোলা নরম হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি। চেষ্টা করে দেখুন না!'

বোকা চিতাবাঘ বলল, 'ভাবিই নি এ কথা! বেড়ে বুদ্ধি তো!' কচ্ছপকে ও পুকুরে ফেলে দিল। কচ্ছপ এর চেয়ে বেশি আর কি চাইতে পারত?

রাজকন্যের মন জয়

তুলু

একদেশে এক রাজা, তিন পুত্তুর তাঁর। তিন জনেই যুদ্ধবিদ্যায় ভারি নিপুণ। একদিন উত্তর দেশ থেকে ডাক এল, তীর ধনুক আর গোলক ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা হবে। ছোটকুমার তখনি তৈরি। দাদারা বাধা দিচ্ছে, বলছে, 'ধনুক টেনে হাত ভেঙো না, গোলকের পিছনে দৌড়তে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙো না।' ছোটকুমার সে সব কথায় কানও দিচ্ছেনা। সে উত্তর দেশে গেল, প্রতিযোগিতায় নাম দিল, সবগুলোতে জিতল, অনেক উপহার, সোনাদানা নিয়ে ফিরল।

ছ'মাস বাদে আবার প্রতিযোগিতার আহ্বান এল। সমুদ্রের ওপর এক মাইল হাঁটতে হবে। আবার ছোটকুমার কোমর বেঁধে তৈরি. বড় ভাইরা বলছে, 'যেওনা যেওনা ভাই, ডুবে যাবে।' কে শোনে কার কথা! সে গেছে, নাম

দিয়েছে, এক মাইল পেরিয়ে ছয় পা হেঁটেছে। এতেও জিতে ও আনল হীরের পদক।

ছ'মাস বাদে একটি ঘোষণা ঝাঁকিয়ে দিল সকলকে। রামরাজ্যের রাজধানীতে আছেন রাজকন্যে কামসন্দাগে। যারাই তাঁকে বিয়ে করতে গেছে, সবাই তাঁর বাগানে মালী হয়ে গাছে জল দিচ্ছে। কেউই জিততে পারেনি। শুনেই ছোটকুমার কোমর বেঁধেছে। এবার বড়কুমার বলছে 'এবার আমি যাব। আমার বিয়ে আগে হওয়া উচিত, তাই চললাম।' ছোটকুমার নীরব রইল।

বড়কুমার গেছে রামরাজ্যের কামসন্দাগের প্রাসাদে। প্রথামতো সোনার জালায় ঢেলেছে সোনা, মুক্তোর জালায় মুক্তো, আর মোহরের জালায় মোহর।

দোরে পা দিয়ে হাত-পা ধুয়েছে। প্রাসাদে ঢুকতে দাসরা এনেছে পান। বলছে, 'পান সুপুরি খাও। তারপর পাকশালার বাইরের ঘরে শয্যে পাতা আছে, জিরোও।'

বড়কুমার যেমনটি শুনল, তেমনটি করল। দোর বন্ধও হয়ে গেল। শয্যেয় বসতেই তার চোখ জড়িয়ে এসেছে ঘুমে। ঝিমোচ্ছে, ঝিমোচ্ছে, ও মা! ঘরের চারকোণ থেকে এগিয়ে এল চারটে পুতুল। কুমারের দুইগালে চটাস চটাস চড় মারতে লেগে গেল। কুমার বন্ধ দুয়ার খুলে দৌড়তে লেগেছে। কামসন্দাগের দাসরা ওকে পাকড়ে ধরে মাথাটি মুড়িয়ে বাগানে জল দেবার কাজে জুতে দিল।

ছ'মাস যায়। বড়কুমার তো ফিরল না। মেজকুমার বলছে, 'যেয়ে দেখতে হয়, দাদার হ'লটা কি!' সে রওনা হ'ল।

বড়কুমারের কপালে যা যা ঘটেছে, মেজকুমারের কপালে অ-বি-ক-ল তাই তাই ঘটল।

ছ'মাস বাদে ছোটকুমার বলছে, 'গিয়ে দেখতে হচ্ছে, ঘটছেটা কি!'

ঘোড়া চেপে সে ছুটেছে। এক মাঠ দিয়ে যাচ্ছে, শোনে পথের পাশে এক গভীর গর্ত থেকে গোঙানি শোনা যাচ্ছে। কে কাঁদছে, 'বাঁচাও গো! রক্ষে করো!'

একপাল রাখাল ছেলে একটা দত্যিকে মেরে ধরে ফেলেছে ওই গর্তে। বড় গভীর সেটা, দত্যি বেরোতে পারছে না।

কুমার গর্তের কানায় গিয়ে বলছে, 'তোমাকে বাঁচাব, গর্ত থেকে তুলব. আর তুমি আমায় মেরে কচকচিয়ে খাবে! না বাবা না, আমি তোমায় তুলছি না।

দৈত্য মহা বিপন্ন। সে বলছে, 'না না, চলে যেও না, বাঁচাও আমাকে। আমি তোমাকে সব বিপদ থেকে বাঁচাব। পথে ষোলটা দত্যি ওঁত পেতে বসে আছে। তারা তোমায় জ্যান্ত ছাড়বে না। আমাকে দরকার হবে তোমার!'

ছোটকুমার মাথার পাগড়িখানা খুলে ঝুলিয়ে দিল। লম্বা পাগড়ি ধরে দত্যি উঠে এল।

বাইরে এসেই দত্যি বলছে, 'তেষ্টায় মলুম বাপ! জল তো চাই।'

—'এই শুকনো মাঠে তোমাকে জল দেব কোত্থেকে?'

—'তোমার ঘোড়াটাকে আমার ঠ্যাং-এর একটা লোমের সঙ্গে বাঁধো। তুমি আমার কাঁধে চাপো। আমি হাঁটতে থাকি। দূরে কোথাও জলের আভাস দেখলে আমায় বোলো।'

ওরা চলল। চলছে যেন ঝড়ের গতিতে। অনেক, অনেক দূর চলে এসেছে।

—'জলের চিহ্নও কি দেখছ?'

—'না। একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখছি।'

—'জল দেখতে পেলে?'

—'হ্যাঁ...দূরে যেন একটা পুকুর!' জলের কাছে গিয়ে দেখে পুকুর নয়, সমুদ্দুর।

দত্যি কুমারকে নামিয়ে দিয়ে বলছে, 'এবারে একগাড়ি চাল আর এক গাড়ি গুড় আনো দেখি!'

বাজারে গিয়ে ছোটকুমার সব কিনে আনল। সমুদ্দুরের ধারে বালিতে বসে দত্যি সেই চাল আর গুড় মাখল। মেখে গবাগব সবটা খেল। আধ সমুদ্দুর জলও খেল। এখন সে তুষ্ট। খিদে তেষ্টা দুই মিটেছে।

তারপর ও বলল, 'যদি তোমার সঙ্গে যাই, মানুষ তো চেহারা দেখে ভয়ে মরবে। আমি বরং একটা মাছি হয়ে তোমার কাঁধে বসি। তুমিও ঘোড়া চালিয়ে শহরে ঢোকো।'

ছোটকুমার চলছে ঘোড়ায়, দত্যি তার কাঁধে মাছিটি হয়ে বসে আছে। পথে কুমার একছড়া কলা কিনেছে।

একটা বাড়ির সামনে ছেলেরা খেলছে। তাদের ডেকে কুমার একটা করে কলা দেয়।

—'কার বাড়ি রে এটা?'

—'এখানে রাজবাড়ির ছুতোর থাকে।'

—'বটে! ডাকো তো তাকে, আমি দেখা করব।'

—'আসতে পারবে না তো! ও তো অন্ধ!'

—'ওর বউকেই ডাকো।'

ছেলেরা দৌড়ে গিয়ে ছুতোর বউকে ডাকছে। বউ বেরিয়ে এসেছে কানা ছুতোরকে নিয়ে। এই ছুতোরই চারটে পুতুল তৈরি করেছিল, যারা কামসন্দাগের ঘর পাহারা দেয়।

এই আশ্চর্য পুতুল তো ও বানাল। রাজকন্যে তো চায় না ও এমন পুতুল আরো বানাক। ও ছুতোরের চোখ উপড়ে ফেলল। ছুতোর দম্পতির ভরণপোষণের জন্যে মোটা মাসোহারা বন্দোবস্ত করল।

ছোটকুমার শুধোচ্ছে, 'কামসন্দাগের প্রাসাদে ঢোকার পথ কি?'

—'সে আমি বলব না।'

কুমার ওকে হাজার টাকা দিল।

--'এ তো নস্যি। আমার একমাসের পানের খরচই উঠবে না।'

কুমার দু' হাজার টাকা দিল।

--'এ তো যৎসামান্য। একমাস কফি আর পকোড়া খাবার পয়সাও হবে না।'

কুমার পাঁচ হাজার টাকা দিল।

--'একবেলার বাজার খরচও হবে না।'

এবার দত্যি স্বমূর্তি ধারণ করল। কুমারের কাঁধ থেকে নেমে ছুতোরের ঘেঁটি চেপে ধরল।

ছুতোর যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছে, 'ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও গো! স-ব বলছি আমি।'

দৈত্য হাতের মুঠ ঢিলা করেছে। ছুতোর তখন কুমারকে বলছে কামসন্দাগের প্রাসাদে পৌঁছবার রহস্য।

কুমার চলল। পথে ও কিনে নিল চারটে কমলালেবু, একটা বাচ্চা মোষ, এক মালা নারকেল, একটা মুরগির ডিম, একটা কাঁচি।

প্রাসাদে ঢোকার মুখে সোনার জন্য জালা, কুমার সোনা ঢালল। মুক্তোর জালায় মুক্তো, মোহরের জালায় মোহর ঢেলে হাত-পা ধুয়ে ভেতরে ঢুকল।

এক দাসী তাকে পান দিচ্ছে। বলছে, 'পান খেয়ে পাকশালার লাগাও ঘরে গিয়ে শয্যেয় বিশ্রাম করো।'

রাজপুত্র শয্যেয় বসেছে, মাথায় রেখেছে চারটে কমলালেবু। চার কোণ থেকে ধেয়ে এসেছে চারটে পুতুল। কমলালেবু দেখে একেকজন একেকটা নিয়ে চলে গেছে কোণে, কমলালেবু খাচ্ছে। খেয়ে দেয়ে কুমারের কাছে এসে চুলে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।

পরদিন দাসী তাকে নিয়ে যাচ্ছে পাশের ঘরে। বলছে, 'কামসন্দাগের মহলে ঢুকতে হলে সাতটা দরজা পেরোতে হয়। তিনটে আমি খুলে দোব, চারটে তুমি খুলো।' তিনটে দরজা পেরোল ওরা।

চতুর্থ দরজা কুমার খুলেছে, কি এক মস্ত চিতাবাঘ ঝাঁপিয়ে এসেছে কুমারকে খেতে। কুমারও তেমনি মোষের বাচ্চাটা এগিয়ে দিয়েছে। চিতাবাঘ মোষের বাচ্চা নিয়েই ভোজ করতে চলে গেল।

পঞ্চম দরজা খুলতে হাঁ করে তেড়ে এসেছে এক বাঘা কুকুর। কুকুরের মুখে ঠেসে দিল ও আধমালা নারকেল।

ষষ্ঠ দরজা খুলতে ফোঁসফোঁসিয়ে আসছে এক গোখরো সাপ। মুরগীর ডিম খেয়েই সে খুশি।

সপ্তম দরজা খুলতে বেরিয়ে এল এক কাঁচি। কুমার নিজের কাঁচিটা ওর দুটো ফলার ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। দুটোই পড়ল মাটিতে। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ভেতরের

ঘরে ঢুকে ও বসল।

কেউ আসে না, আলাপও করে না। কুমার বেশ হেঁকে বলল, 'শুনেছি ইনি এক বিখ্যাত রাজকন্যে। ত্রিভুবনে তাঁর যশ। আর এখানে, তাঁর মহলে অতিথিকে স্বাগত জানাতে, বা পানসুপারি দিতে কেউ নেই?'

তখনি এক দাসী কামসন্দাগের ছদ্মবেশে পানসুপারি থালা আনল, তাঁকে দিল, পাশে বসল।

'পিকদানিটা কোথায়?'

মেয়েটি দৌড়ে গিয়ে পিকদানি আনল। কুমার বুঝল, এ দাসী। রাজকন্যে নয়। তিনটে চড় মেরে ওকে বের করে দিল কুমার।

আবার সে বলল, 'কামসন্দাগের যশ তো সর্বত্র। তাঁরই মহলে অতিথিকে আপ্যায়ন করতে, সঙ্গে দুটো কথা কইতে জনমনিষ্যি নেই?'

আবার আরেক দাসী এসে তার পাশে বসল। ছোটকুমার বলছে, 'এটা না কি বিখ্যাত কামসন্দাগের মহল। সেটা ঝাঁটপাট দেবার কেউ নেই গা?'

দাসী উঠে ঝাঁটপাট দিচ্ছে, ঝাঁটা কোনে রেখে আসছে। কুমার বুঝেছে এ রাজকন্যে নয়, দাসী! তিন থাপ্পড় মেরে তাকে বের করে দিয়েছে।

তারপর ঢুকেছে কামসন্দাগের মা। বলছে, পাশের ঘরে দুটো খাট। দুয়ের মধ্যে তিন গজ ফাঁক। নিজেকে যতবড় বাহাদুর ভাবছ, তা যদি সত্যিই হও, খাট পর্শ না করে পাশাপাশি টেনে আনবে।'

মা বেরিয়ে গেল। রাজকন্যে ঢুকল। দু'খানা খাট, মাঝে তিনগজ ফাঁক, একটা পর্দা ঝুলছে মাঝে। কুমার এক খাটে শুল, অন্য খাটে কামসন্দাগ।

কুমার বলছে, 'বোবা পুতুলের মতো পড়ে না থেকে আমি একটা গল্পও বলতে পারতাম, যদি কেউ 'হুঁ! তা বটে! তাই তো!' এ সব বলত। তা এখানে আর গল্প শুনছে বা কে?'

দত্যি এখন মাছিটি হয়ে পর্দায় বসে আছে। সে বলল, 'আমি শুনব, হুঁ-হ্যাঁ-তাইতো বলব।' কুমার তখন গল্প বলছে।

—'একদিন এক কুমোর, এক তাঁতি, এক স্যাকরা, এক বামুন গেছে তীর্থে। রাতে একজন দু'ঘণ্টা জাগে, রাতপাহারা দেয়, অন্যেরা ঘুমোয়। এক রাতে কুমোর বসে বসে এক মানুষ প্রমাণ মাটির পুতুল গড়ল। সময় হতে তাঁতিকে ডেকে দিয়ে সে গেল ঘুমোতে। তাঁতি একটা কাপড় আর জামা বুনে পুতুলকে পরাল। স্যাকরাকে

ডেকে দিয়ে, সে তো গেল ঘুমোতে। স্যাকরা একটা বিয়ের 'তালি' (পদক সহ মঙ্গল সূত্র) আর কানের রিং গড়ে তাকে পরাল। তারপর বামুনের পালা। বামুন বিদ্যাবলে সে পুতুলে প্রাণসঞ্চার করল। ততক্ষণে সকাল হয়েছে। জেগে উঠে সবাই বলছে, মেয়েটাকে বিয়ে করব। মেয়েটি কার হবে, তা নিয়ে বেজায় ঝগড়া। পর্দা! বলো তো কে এর স্বামী হ'লে ন্যায্য হয়?'

পর্দা বলছে, 'বামুন বিয়ে করলেই ঠিক হয়।'

রাজকুমার বলছে, 'বামুন তো ওকে প্রাণ দিল। ঠাকুরদেবতার মতো কাজ করল।'

কামসন্দাগে ক্ষেপে গেছে। সে বলছে, 'দেখতে পাচ্ছ না, ওই স্যাকরাই ওর ন্যায্য স্বামী?'

রাগের চোটে ও পর্দাটাই ছিঁড়ে ফেলেছে। এমন হিঁচকে ছিঁড়েছে, যে তার খাটটা একগজ সরে এল।

কুমার আবার বলছে, 'কিচ্ছুটি না করে পড়ে আছি, আরেকটা গল্পও বলতে পারি। যদি কেউ 'হুঁ হুঁ' বলে!'

দত্যি মাছি এখন কামসন্দাগের ব্লাউজে বসেছে। সে বলছে, 'গল্প হোক! গল্প হোক! আমি শুনব, হুঁ-হুঁ বলব।'

কুমার গল্প বলছে।

—'এক রাজার এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ের বয়স হলে রাজা বর খুঁজে বিয়ে ঠিক করেছে। পরের মাসের আঠারো তারিখ বিয়ে হবে। মেয়ের মা বা ভাই কিছুই জানে না। এদিকে ভাইকে না জানিয়ে মা, আর মাকে না জানিয়ে ভাই, ওই একই তারিখে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বিয়ে ঠিক করেছে।

পরের মাসের আঠারো তারিখে লেগেছে বিয়ের ধুম। বিশাল ব্যবস্থা হচ্ছে। ধানক্ষেতের মত বড় বড় কানাত পড়েছে। থামে থামে মাঙ্গলিক চিহ্ন, আখগাছ বাঁধা হয়েছে। নারকেল পাতার ঝালর গাঁথা হয়েছে সর্বত্র। পুরো শহরের বাড়ি রং মেরামতি হয়েছে, যেন নতুন বাড়ি সব। নগরঘোষকরা হেঁকে হেঁকে ঘোষণা করছে। যত আত্মীয় কুটুম্ব-সাতগুষ্টি চলে এসেছে।

'এখন তিন দিক থেকে তিনটে বরযাত্রীর মিছিল হাজির। সবাই বিয়ের মণ্ডপের দিকে এগোচ্ছে, মেয়েটি শুনল সব, বুঝল, এ থেকে অনেক ঝামেলা পাকবে। এ চক্রব্যূহ থেকে বেরোনো যাবে না। তার জীবনের প্রিয় যারা, বাবা-মা-দাদা, সকলের মধ্যে ফাটাফাটি ঝগড়া বাধবে। সে লজ্জা থেকে বাঁচতে চায়, ওদের ঝগড়া থেকে বাঁচাতে চায়।

'দাসীদের বলল, খুব বড়ো করে কাঠের পাঁজা সাজিয়ে আগুন দাও। রাতে বেশি আলোর দরকার। সে আকাশছোঁয়া পাঁজা যখন ধূ ধূ জ্বলে উঠল, মেয়েটি তাতে ঝাঁপ

দিল। তিন হবু বরই ছুটে এল। একজন মেয়েটির সঙ্গেই ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরল। আরেকজন দু'হাতে মাথার রগ টিপে বসল কুয়োর পাড়ে। তৃতীয়জন ছুটল পণ্ডিতের খোঁজে, যে কনেকে বাঁচাতে পারবে।

'তেমন পণ্ডিত যখন মিলল, সে লোক খাবার জোগাড় করছে। বর ছুটে আসতে সে সবুর করতে বলছে, দু'জনেই খাবে। বর তো খেতে চায়না। পণ্ডিতও নাছোড়বান্দা। কি রাঁধে, কি রাঁধে ভাবছে, এমন সময়ে একটি শিশু হামা টেনে ঘরে ঢুকল। পণ্ডিত শিশুটিকে জল দিয়ে ধুল, তাকে কাটল, কেটেকুটে মাংসের ঝোল বানাল। হাড়গুলো কোণে ফেলে রাখল।

'খেতে বসে ও হবু বরকে ডাকছে। আতঙ্কে, ভয়ে বর বলছে, শিশুটিকে বাঁচিয়ে না দিলে তো সে খেতে পারবে না।'

—'আহা! সে তো বাঁচিয়ে দিতামই!' বলে পণ্ডিত পিছনের বাগানে গেল, এক মুঠো পাতা আনল। পাতার জল রসটা লাগিয়ে দিল ছেলেটার হাড়ে. শিশু তখনই জ্যান্ত হয়ে উঠে হামা টানতে থাকল। হবুবর পণ্ডিতের হাত থেকে পাতাগুলো নিয়ে ছুট লাগাল। ওই পাতার রস লাগাল রাজকন্যা ও হবু বরের হাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তারা জ্যান্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।'

কুমার ব্লাউজকে শুধোচ্ছে, 'বল তো! তিন জনের মধ্যে কে রাজকন্যাকে বিয়ে করলে ন্যায্য হয়?'

—'যে পাতা এনে ওদের বাঁচাল।'

—'জীবন দিল যে, সে তো বাপের কাজ করল।'

—'তবে যে বসেছিল কুয়োর পাড়ে?'

কামসন্দাগে অধীর হয়ে বলল, 'বুঝছ না? যে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে ওর সঙ্গে পুড়ে মরল, সেই ন্যায্যত ওর স্বামী।'

রাগের চোটে ও এমন হেঁচকা টানে ব্লাউজ ছিঁড়েছে, যে টানের চোটে খাট আরেক গজ এগিয়ে এসেছে।

কুমার বলল, 'কিচ্ছুটি না করে পড়ে থাকার চেয়ে আরেকটা গল্প বলা যেত, যদি কেউ 'হ্যাঁ! তাইতো!' এ সব বলত।

দত্যি মাছি এখন কামসন্দাগের শাড়িতে বসে আছে। সে বলল, 'আমি বলব! আমি বলব!'

—'এক রাজার মেয়ে গুরু পাঠশালে পড়েন। পড়া শেষ হতে গুরু বলছেন, 'কি গুরুদক্ষিণা দেবে গো?'

—'আপনি যা বলবেন।'

গুরু বললেন, বিয়ের রাতটা রাজকন্যা গুরুর বিছানায় কাটাবে।

'কিছুদিন বাদেই মেয়েটির বেশ ভালো একটা বিয়ে হ'ল। মেয়ের তো মনে

পড়েছে গুরুদক্ষিণার কথা। সে কথা ও স্বামীকেও বলেছে। স্বামী বলছে, 'কথা দিয়েছ, কথা রাখো। তাঁর কাছে যাও।'

সেই রাতেই ও বেরিয়েছে গুরুগৃহের উদ্দেশে। পথে যেতে এক ডাকাত ধরেছে তাকে, বলছে সব গহনা দিয়ে যেতে।

—'আমার তো বড্ড তাড়া। একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। যদি সবুর করো খানিক, ফেরার পথে সব দিয়ে যাব।'

—'বেশ, আমি বসে থাকলাম।'

তারপরেই দেখা এক ক্ষুধার্ত বাঘের সঙ্গে। বাঘ তো তাকে খেতে চায়।

—'এখন তো আমার তাড়া আছে, বাঘ! একজনের কাছে যেতে হবে। আমি ফেরা অবধি সবুর সইবে?' তখন আমাকে পুরোটা খেয়ে নিও।'

—'ঠিক আছে। আমি অপেক্ষা করছি।'

তারপর দেখা এক সাপের সঙ্গে। সাপ তো তাকে কাটবেই কাটবে।

—'বড্ড তাড়া আমার গো সাপ! একজনের কাছে যেতে হবে। আমি না-ফেরা অবধি অপেক্ষা কর।'

সাপ রাজী হ'ল।

'রাজকন্যা গুরুর ঘরে দরজা ধাক্কাচ্ছে। গুরু ভয়ে ভয়ে দোর খুলছে। কে জানে, ডাকাত কি না! দোর খুলে রাজকন্যাকে দেখেও অবাক। বিয়ের রাতে কন্যা কেন এসেছে, তা শুনেও হতবাক। গুরু বলছে, 'তখন যদি বলেও থাকি, বিয়ের রাতে আমার কাছে শোবে, এ পাপ আমি করতে পারি? আশীর্বাদই করছি। যাও, স্বামীর কাছে ফিরে যাও।'

তাঁর পায়ে প্রণাম করল রাজকন্যা। সঙ্গে কোন সঙ্গী নিল না। যে পথে এসেছিল, সে পথেই ফিরে গেল।

সাপকে বলল, 'এখন আমাকে দংশাতে পার।'

—'আরে! তুমি তো পয়মন্ত! তোমাকে দেখেছিলাম বলে এতগুলো বনমুরগির ডিম পেলাম। আমার পেট ভরে গেছে গো!'

বাঘকে রাজকন্যা বলল, তাকে খেতে।

—'তুমি তো পয়মন্ত! তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল, তার পরেই একটা বাচ্চা মোষ পেয়ে গেলাম। আমার পেট এখন হেউঢেউ ভর্তি! তুমি এসো গো!'

ডাকাতকে দেখে ও গয়নাগাঁটি খুলছে। ডাকাত বলছে, রোসো, রোসো। তোমার সঙ্গে দেখা, তারপরেই পেয়ে গেলাম একদল ধনী সওদাগরকে। ভারি পয়মন্ত গো তুমি। যাও, বাড়ি যাও।'

মেয়ে তার বরের কাছে ফিরে এল।

'এদের মধ্যে সবচেয়ে পয়মন্ত কে?'

কামসন্দাগের শাড়িতে বসে দত্যি মাছি বলছে, 'কেন? ওই গুরুদেব।'

কামসন্দাগে ক্ষেপে লাল। সে চেঁচাচ্ছে, 'স্বামী যে কত মহৎ, সেটা দেখলে না? সেই তো ওদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ!'

বলতে বলতে ভীষণ আক্রোশে শাড়ি টেনে টেনে ছিঁড়ছে। সেই হ্যাঁচকা টানে ওর খাট একগজ সরে এসে কুমারের খাটের গায়ে লেগে গেল।

কুমার তড়াক করে উটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। অনেক ডাকল তাকে কামসন্দাগে, পাঠাল দাসীদের, কুমার ফিরেও চাইল না। সে যেন রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেল। এখন কামসন্দাগে কুমারের জন্যে পাগল। প্রাসাদ আতিপাতি করে খুঁজে ও কুমারের খোঁজে বেরিয়েই পড়ল।

একদিন ও পৌঁছেছে তিলের ক্ষেতে। যে লোকটি তিল পাহারা দিচ্ছে, মনে হ'ল ও নিশ্চয় কুমার। পরখ করে দেখার জন্যে ও একটা তামার পয়সা দিয়ে বলছে, 'এই পয়সায় তিল, তিল শাক, তিলের ডাল, তিল চাপড়া দাও।'

লোকটি একটা তিলগাছ উপড়ে নিয়ে ওকে দিল। ও বুঝল, ও সেই কুমার, আর কেউ নয়।

মিনতি জানাল ওর প্রাসাদে ফিরে যেতে।

ক্ষেপে গিয়ে কুমার ওকে তিনটে চড় মারল।

তাতেও কামসন্দাগে ওকে ছেড়ে যায় না।

কুমার হো হো করে হাসল। ওর সঙ্গে ফিরল রামরাজ্যে। সবার আগে বাগান থেকে সব কয়েদীদের মুক্তি দিল।

তারপর ওকে বিয়ে করে জাঁকিয়ে রাজত্ব করতে থাকল।

নদী পেরোতে বিপত্তি

কন্নড়, তামিল, তেলুগু

এক নিরেট গুরু তার বারোজন শিষ্যকে নিয়ে তীর্থে যাচ্ছে। পথে পড়ল একটা নদী। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। নদীর দিকে চেয়ে গুরু বলছে,—'পিছিয়ে দাঁড়াও। এ নদী বড়ই সর্বনেশে। অনেক মানুষ খেয়েছে ও। সাবধান হ'তে হবে। ও যতক্ষণ না ঘুমোয়, আমরা অপেক্ষা করব।'

নিরেট গুরু এক শিষ্যকে বলছে, গিয়ে দেখে আসুক নদী ঘুমোচ্ছে, না জেগে আছে।

ওরা ধুনি জ্বেলেছিল। একটা জ্বলন্ত লাকড়ি নিয়ে শিষ্য নদীর জলে ডোবাচ্ছে। তখনি জলে ফোঁস ফোঁস শব্দ হ'ল। লাকড়ি থেকে একটু ধোঁয়াও বেরোল। শিষ্য ভয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলছে, 'গুরুদেব! এখন নদী পেরোনো যাবে না। নদী জেগেই আছে। ওকে ছুঁতেই ও বিষধর সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করল, রাগে জ্বলতে জ্বলতে ধোঁয়াতে থাকল। আমাকে খেয়েই ফেলত। কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে এলাম।'

গুরু বলল, 'পালিয়ে এসেছ বলে খুশি হলাম। ও ঘুমোনো অবধি দেখা যাক। আমরা ওই কুঞ্জবনে বিশ্রাম করি।'

ওরা জিরোচ্ছে, তো এক শিষ্য বলছে, 'আমার ঠাকুরদা ছিলেন বড় ব্যাপারী। দুটো গাধার পিঠে লবণের বস্তা চাপিয়ে উনি একবার এই নদী পেরোচ্ছিলেন। জানেন, এ সর্বনাশা নদী কি করল? গ্রীষ্মকাল তখন। ওঁরা নদীতে নাইলেন। গাধা দুটোকেও নদীতে নামিয়ে নাওয়ালেন। ওপারে উঠে দেখেন, নদীটা সব লবণ খেয়ে নিয়েছে। বস্তার সেলাই খোলে নি, একটা ফুটোও ছিলনা বস্তায়। কিন্তু শয়তান নদী পুরো লবণটা লুটে নিয়েছে। তবু ঠাকুরদা খুশি, যে নদীটা লবণ নিয়েছে বটে, তাঁকে প্রাণে মারেনি। এ নদী শয়তান, হতচ্ছাড়া! আমরা মাইল খানেক দূরে বসে আছি, এতে আমি ভারি নিশ্চিন্ত!'

তারপর ওরা ঘুমোল, জাগল ভোরে। গুরু বলছে, 'আবার দেখ তো হে, নদী ঘুমোচ্ছে কি না।'

সেই শিষ্য, সেই নেভা কাঠটা নিয়েই গেছে। নদীতে ডোবাতে তো ফোঁসর ফোঁসর নেই, ধোঁয়াও ওঠে না।

ও দৌড়তে দৌড়তে এসে বলছে, 'এখনি পার হওয়া যাবে। তবে নিঃশব্দে। নদী এখন গাঢ় ঘুমে।'

এ-ওর হাত ধরে পা টিপে টিপে নদী পার হচ্ছে। মনে ভয়, যদি জেগে ওঠে নদী। যদি তাদের খেয়ে নেয়।

ওপারে উঠে এ-ওর তারিফ করতে লেগেছে। বিপদটা তো কেটে গেছে! তখন একজন বলছে, 'সবাই ঠিক মতো এসেছি তো? এ বড় বেইমান নদী। গুনে দেখা যাক, কতজন আছি।'

সে নিজেকে বাদ দিয়ে সকলকে গুনল। আর বিলাপ শুরু করল, 'মোটে বারোজন কেন? নদী আমাদের একজনকে নিয়েছে।'

গুরু আরেকজনকে গুনতে বলছে। সেও নিজেকে বাদ দিয়ে গুনছে, ফল দাঁড়াচ্ছে বারো। এভাবে সব শিষ্যরাই গুনল। শেষে নিরেট গুরু নিজেও গুনল। পরম দুঃখে বলল, 'আমরা বারোজন হে! একজন নেই।'

সবাই হারাধনের দুঃখে বিলাপ জুড়েছে, অথচ কে যে নেই তা কেউ বলতে পারে না। নদীকে গাল দিচ্ছে, 'শয়তান! বদমাশ! নির্দোষীকে খেয়েছিস! আমাদের গুরভাইকে খেলি, আমাদের ঠকালি! যা, শুকিয়ে যা! তোর চড়ায় গর্ত হোক!'

এক পথিক শুধোয়, এত চেঁচামেচি কেন? তারা সব বলছে। বলছে, যত গোনা হয়, দেখা যায় বারোজন!

লোকটা বুঝল। বলল, 'ভালই হয়েছে আমি এসে পড়েছি। আমি জাদুবিদ্যা জানি, দু' মিনিটে হারানো মানুষটি এনে দেব। তবে পয়সা ছাড়তে হবে।'

গুরু বলছে, 'তুমিতো ঈশ্বর প্রেরিত! শিষ্যকে এনে দাও, যা সম্বল আছে, সব দেব।' ওরা তীর্থের সকল সম্বল বের করে দিল।

লোকটা ওদের এক ঝুড়ি গোবর আনতে বলল। শিষ্যরা গোবর কুড়িয়ে আনল। লোকটা সে গোবর লম্বা লাইনে লেপাল। ওদের বলল, নিচু হয়ে গোবরে নাক ডোবাতে। তারপর বলল, 'নাকের ছাপগুলো গুনে দেখ। বলো কতজন আছ।'

গোবরে নাকের ছাপ তো তেরোটাই, নিরেট গুরু আর শিষ্যরা আনন্দে লাফাচ্ছে আর বলছে, 'আবার আমরা তেরজন! সবাই আছি এখানে। যে ছিল না, সেও এসেছে! ধন্য ধন্য বটে জাদুকর।

সবুর কুমার

গুজরাতি

এক সুলতানের সাত মেয়ে। সকলকেই ভালবাসেন, তবে ছোটমেয়ের আদর বেশি। দিদিরা ওকে ভারি হিংসে করে।

একদিন সুলতান আছেন খোশমেজাজে। সাত মেয়েকে ডেকে শুধোচ্ছেন, আজব প্রশ্ন।– 'তোমাদের সুখ সমৃদ্ধির কারণ কি, বলো তো? এ কি তোমাদের কিসমৎ, না আমার? ঠিক জবাব দেবে, যা মনে করো পষ্টাপষ্টি বলবে।'

তৎক্ষণাৎ সমস্বরে ছয় মেয়ে বলল, 'বাবা! আপনার ভাগ্য সদাই প্রসন্ন। আমাদের সুখের উৎস সেটাই।'

সুলতান সন্তুষ্ট। কিন্তু অবাক কাণ্ড, সবার ছোট, সবচেয়ে আদরের ছোট মেয়ে ওদের গলায় গলা মেলাল না। সে নীরব। বোনরা অমন সরবে কথা বলেছে বলে যেন সংকুচিতও। যেন কি মনে আছে ওর, যেন মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না।

ছোটমেয়ে নিরুত্তর, এতে সুলতান একটু চুপসে গেলেন। তিনি হেঁকে বললেন, 'তুমি নীরব কেন? বোনদের মতেই তোমার মত তো?'

বিব্রত ছোটমেয়ে বলল, 'না বাবা। আমি মনে করি না আপনার ভাগ্য আমাদের ভাগ্যকে চালনা করতে পারে। আমাদের সকলের কিসমৎ স্বতন্ত্র। ভালো বা মন্দ ঘটায় যার যার নিজ ভাগ্য। আমার কপাল ভালো বলে আমি আপনার মেয়ে, আর শাহজাদীও বটে।'

--'তাই না কি? তবে তোমার সুখ, তোমার ভাগ্যের কারণে? যত ভালবেসেছি তোমায়, এমনি করে তার প্রতিদান দিচ্ছ? খুবই অকৃতজ্ঞ তুমি। আমিও দেখছি তোমার কিসমৎ তোমাকে কেমন ভালো রাখে!'

সেপাই শান্ত্রীদের ডেকে বললেন, 'বের করে দাও ওকে প্রাসাদ থেকে। ওর মুখ যেন না দেখতে হয়!'

মেয়ে নিজেই বেরিয়ে গেল। পরনে যা ছিল, তার বাইরে কিছুই নিল না। সেপাইরা শহরের সীমানা অবধি ওর পেছন পেছন গেল।

এর কিছুকাল বাদে সুলতান যাচ্ছেন দূর দেশে। নতুন জাহাজ প্রস্তুত, জ্যোতিষীরা যাত্রার শুভদিন বলে দিয়েছে। যাত্রার দিনে বন্ধু-আত্মীয়কুটুম-প্রজাদের কাছে বিদায় নিয়েছেন। মেয়েদের কাছে বিদায় নেবার কালে জনে জনে শুধিয়েছেন, কার জন্যে কি আনবেন। প্রতি মেয়ে বলেছে সে কি চায়। চারদিকে বাদ্যিবাজনা, সুলতান

জাহাজে চাপলেন তাঁর সভাসদ আর ভৃত্যবাহিনী নিয়ে। পাল তোলা হল, নোঙর তোলা হল, বাতাস বড় অনুকূল, কিন্তু জাহাজ তো নট নড়ন চড়ন, নট কিচ্ছু। যেন এক অবাধ্য ঘোড়া। সবাই অবাক। অনেক পরখ করে দেখা হ'ল, জাহাজে কোথাও কোন খুঁত নেই।

ডাক পড়ল শহরের তা'বড় তা'বড় জ্যোতিষীদের। তারা অনেক গণে গেঁথে, আঁক কষে বলল, রাজা তাঁর একটি কাছের মানুষকে শুধোন নি সে কি চায়। তাতেই এই বিপত্তি। তখনি সুলতানের মনে হয়েছে ছোটমেয়ের কথা। রেগে আগুন তেলে বেগুন সুলতান ভাবছেন, ও রকম একটা নিকৃষ্ট জীবের জন্য জাহাজ ছাড়ছে না? তবুও দূত পাঠালেন। তারা জেনে আসুক, সুলতানের কাছে সে কি উপহার চায়!

অনেক বিফল খোঁজাখুঁজির পর দূতরা তাকে পেল এক জঙ্গলে। একটা বড়গাছের ছায়ায় বসে ছোটমেয়ে আল্লার সেবায় মগ্ন এক তপস্বিনী। সে প্রার্থনা করছে। দূত তারমধ্যেই যথেষ্ট রুক্ষগলায় চেঁচাচ্ছে, তার জন্যে সুলতান কি আনবেন তা বলে দিক।

প্রার্থনা কালে কথা বলা চলে না, তাই ছোটমেয়ে শুধু বলল, 'সবুর', অর্থাৎ 'অপেক্ষা করো।' দূতের বেজায় তাড়া। সে ওটুকু শুনেই দৌড় মেরেছে। সুলতান অধীর, জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। দূত সুলতানকে বলছে, শাহজাদী 'সবুর' চেয়েছে।

সুলতান গজগজ করলেন, 'তা আর চাইবে না? সবুর! নির্বোধ মেয়েটা কি বলতে চায়? একটা অহঙ্কেরে জবাব পাঠাল। ঠিক আছে। যা চায়, তা পাবে।' তাঁর কথা শেষ না হতে জাহাজ ভেসে পড়ল। চমৎকার বিপদহীন যাত্রার পর পৌঁছল গন্তব্যে। নতুন দেশে নামলেন সুলতান তাঁর লোকজন নিয়ে। ক'দিন থাকলেন আরামে। ফেরার আগে ছ'মেয়ে যা যা চেয়েছিল, সবই আনলেন, জাহাজে রাখলেন। ছোটমেয়ে কি চাইল, তা কোথাও মিলল না। যেখানেই গেল লোক, সেখানেই শুনল, 'সবুর' নামে কিছু নেই দুনিয়াতে। সুলতান বললেন, কি হবে সময় নষ্ট করে? চলো, ফেরা যাক।

নোঙর তোলা হ'ল, পাল খোলা হ'ল, জাহাজ তো একটু নড়তেও নারাজ। সুলতান কারণটা বুঝেছেন, ওঁর মেজাজের মিটার চড়ছে। ভৃত্যবাহিনীকে পাঠালেন বড়-মেজ-সেজ-ছোট রাস্তায়,—এঁকা গলি, বেঁকা গলি, কানা গলি, মেঠো পথে। প্রতিটি পথিককে শুধোও, 'সবুর' কোথায় মিলবে!

ভৃত্যবাহিনী ঘুরে ঘুরে হাক্লান্ত, মানুষ শোনে আর হেসে চলে যায়। শেষে এক বুড়ি বলল, 'সবুর? জানি জানি সবুর কি! সে তো একটা পাথর। আমার উঠোনেই আছে। আমার জন্মকাল থেকে আছে। আমরা বলি 'সবুর পাথর। কি দাম দেবে গো?'

ভৃত্যরা মহাখুশি। এত খোঁজার পর হদিশ মিলেছে। ওরা বলল, 'চলো দেখেই আসি। একশো সোনার মোহর দেব গো তোমাকে।'

বুড়ি তো ওই জঞ্জাল স্বরূপ পাথরের বদলে একশো মোহর পাবে বলে খুব খুশি। ওদের নিয়ে গেল বাড়ি। উঠোনের মাটিতে আধেক পোঁতা এক পাথর। বুড়িকে সোনা দিয়ে পাথরটা টেনে তুলল ওরা, আনল জাহাজে, সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ চলতে থাকল। সুলতান ফিরলেন দেশে।

যে দূত আগে গিয়েছিল, তাকে দিয়েই ছোটমেয়েকে পাথরটা পাঠালেন। দূত মাথায় কি বয়ে আনছে দেখে ছোটমেয়ে ভাবল, বাবার মন গলেছে নিশ্চয়। তাই উপহার পাঠিয়েছেন। হয়তো বাড়ি যেতেও বলবেন।

সে আশায় ছাই পড়ল। দূতটি এক বিশাল পাথর নামিয়ে দিয়ে বলল, 'সবুর' চেয়েছিলেন, এটাই সবুর। সুলতান আপনার বোনদের জন্যে আনলেন সেরা সেরা হীরে, এত এত চুনি। আপনার ভাগ্য দারুণ! আপনাকে পাঠালেন একটা এবড়োখেবড়ো কালো পাথর! সামলে রাখবেন। ওতে পিটিয়ে কাপড় কাচতে পারবেন।' দূত চলে গেল।

বেচারি শাহজাদী ওর ব্যঙ্গবিদ্রূপে আঘাত পেল। কাঁদল খানিক! তারপর পাথরটা গড়িয়ে নিয়ে গেল এক কোণে। দূত যা বলেছে, ও তাই করবে। পাথরটা ধুয়েপাখলে ও রোজ তাতে কাপড় কাচে। কাপড় জীর্ণ হচ্ছে দেখে আগের জীবনের কথা মনে হয়, ও কাঁদে। ক'দিন বাদে দেখে পাথরটা ক্ষয়ে যাচ্ছে। পাতলা হচ্ছে খানিক। ভাবল, নরম জাতের পাথর হবে। একদিন পাথরের ওপরটা চড়াৎ করে ফেটে গেল। দেখে ভিতরে আছে এক চমৎকার হাতপাখা। পাখাটা বের করে ও বাতাস খেতে লাগল। অনেকদিন এ সব বিলাসিতা তো ভুলে গেছিল। হঠাৎ কোথা থেকে এক রূপবান, লম্বাচওড়া, জোয়ান রাজপুত্র তার সামনে দাঁড়াল। শাহজাদী পাখাটা ফেলে দিয়ে দৌড়বে,—তো কুমার তার হাত ধরেছে। বলছে, ওই পাখাটার এমন শক্তি আছে যে এপাশে নাড়লে তাকে ছুটে আসতে হবেই হবে। ওপাশে হেলালে তাকে দেশে ফিরে যেতে হবে। তার নাম সবুর কুমার। শাহজাদী এসব শুনে অবাক। পাখাটি তুলে ওপাশে হেলাল, কুমার আর নেই, এপাশে হেলাল, এই তো কুমার।

দুটিতে ভারি ভাবভালোবাসা হ'ল। শাহজাদী পাখাটি সযত্নে রেখে দিল। কুমার তার কাছেই থাকে। ক্রমে কুমার এক প্রাসাদ বানাল। দু'জনে মহাসুখে আছে। কুমারের যখন বাপ-মাকে দেখতে সাধ যায়, শাহজাদীকে বলে। শাহজাদী উলটোবাগে পাখা হেলাল তো কুমার চলে গেল। এছাড়া আর কোন কারণে কুমার শাহজাদীকে ছেড়ে যায় না।

শাহজাদীর কিসমতের এই উজ্জ্বল পরিণামের কথা কেমন করে যেন সুলতান আর বাকি ছ' মেয়ের কাছে চলে গেল। বোনরা হিংসেয় জ্বলে মরল, সুলতান এমনই ঘা খেলেন, যে কেউ তাঁর কাছে ছোট শাহজাদীর নামও করে না। তাঁর অনুমতি না নিয়েই বোনেরা শাহজাদীকে দেখতে গেল। শাহজাদী স্বাগতম জানাচ্ছে, সে তো বেজায় খুশি। বোনরা বসল না, বলে গেল, আরেকদিন আসবে।

ওরা চলে গেল। ওদের ঢুকতে দিয়েছে এতে সবুর কুমার বিশেষ খুশি হ'ল না। সে তো শুনেছে সুলতান কেমন আচরণ করেছেন, বোনেদেরও কত হিংসে ছিল! কুমারের ভয়ে, ঈর্ষার তাড়নায় ওরা শাহজাদীর কোন ক্ষতি করে যদি! তার সুখে যদি ছাই ঢেলে দেয়! শাহজাদী নিষ্পাপ, মানুষকে সে বিশ্বাস করে। বোনরা আসবে বলে সে পথ চেয়ে থাকল।

এক সন্ধ্যায় কুমারের বাপ-মাকে দেখতে ইচ্ছে হয়েছে। শাহজাদী পাখা নেড়েছে, কুমারও উধাও। সে চলে গেলে পরে শাহজাদীর বড্ড একলা-একলা লাগেছ। সবে ভাবছে পাখা উলটো বাগে নেড়ে কুমারকে এনে নেবে কি না। এমন সময়ে, কি আনন্দ! তার বোনরা এসে হাজির। তারা অনেক রাত অবধি থাকল।

শাহজাদী ভারি খুশি, তার মন যেন নাচছে। বোনরা তো তেমন খুশি নয়। একে তো ছোটবোনের ওপর ঈর্ষা! তার ওপর ওরা তৈরি হয়েই এসেছে, এমন কিছু করব, যাতে সবুর কুমারের ক্ষতি হয়, মৃত্যু হলে তো আরোই ভালো। ক'বোন শাহজাদীর সঙ্গে কথা কইছে,—ক'বোন ঢুকেছে সবুরের শোবার ঘরে। বিছানার চাদর সরিয়ে তোশকের ওপর ভয়ংকর বিষ মাখানো কাচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে। তার ওপর আবার চাদর ঢেকেঢুকে বেরিয়ে এসেছে গল্পের আসর জমাতে। মুখ দেখলে মনে হবে, ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না।

অনেক রাতে ওরা বাড়ি ফিরে গেল।

যেমন গেল, তেমনই শাহজাদী পাখা নেড়ে ডেকেছে সবুরকে। তখন রাত গভীর। সবুর বড় ক্লান্ত, ঘুমে ঢলে পড়ছে। সে গেল শুতে। প্রতিরাতের মতো আজও শাহজাদী আল্লার উপাসনা করতে গেল। হঠাৎ শোনে সবুরের আর্তনাদ। —'বাঁচাও! বাঁচাও! কি যেন বিঁধছে সর্বাঙ্গে, কি? তা তো জানি না। নিশ্চয় এ তোমার শয়তান বোনদের কাজ! বলেছিলাম, ওদের আসতে দিও না। তুমি মানলে না। এখন মরে তো যাবই। তুমি সাধ মিটিয়ে ওদের সঙ্গে গলাগলি কোর। পাখাটা হেলাও! আমি বাবা-মার কাছে যাব!'

শাহজাদী দিশাহারা। ছুটে গিয়ে দেখে সবুরের সর্বাঙ্গে কাচের গুঁড়ো। সর্ব শরীরে রক্ত ঝরছে। দেহ নীল হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি অন্য বিছানায় নিয়ে শাহজাদী খুঁটে খুঁটে কাচের গুঁড়ো তুলছে। কুমার যন্ত্রণায় বিকট চেঁচাল, বলল, শাহজাদীর সঙ্গে আর থাকবে না। সে চায়নি, তবু পাখা ওকে হেলাতেই হ'ল। কুমার ফিরে গেল দেশে।

শাহজাদী শোকাকুল হয়ে মাথার চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাঁদল। কত হেলাল পাখা, কুমার তো এল না। বোনদের বিশ্বাস করেছিল বলে নিজেকে শাপশাপান্ত করল। কুমার মরে গেছে বলেই আসছেনা বলে বড়ই কাঁদল।

সারা রাত কাটল জেগে। ভোরে উঠে ও ছদ্মবেশ পরল। যারা বনে বনে ঘুরে বনৌষধি জোগাড় করে আর ঘুরে ঘুরে বেচে, ও যেন তাদেরই একজন। প্রাসাদ ছেড়ে বেরোল ওর ভালোবাসার মানুষকে খুঁজতে।

কোন দেশ থেকে এসেছিল সে, তা তো জানে না। বনে বনে ফেরে, কোথায় সবুর কুমার? ব্যর্থ হতাশায় ও ক্লান্ত, মরে যাবে বলে ঠিক করল।

নদীর ধারে গাছের নিচে জিরোচ্ছে একদিন, ওপরপানে চেয়ে দেখে একজোড়া বুলবুলি পাখি ডালে বসে আছে। কি আশ্চর্য! ঠিক মানুষের মতই কথা কইছে।

একজন বলছে, 'সবুর কুমারের কথা শুনেছ? কাচের গুঁড়ো আর বিষ ওর মাংসে ঢুকে গেছে, বড় কষ্ট পাচ্ছে। কেউ যদি জানত আমার বিষ্ঠার গুণ! একবার মাখালে সব কাচ বেরিয়ে আসবে। দ্বিতীয়বার মাখালে সব ঘা সেরে গিয়ে ও আগের মতো হয়ে যাবে। চামড়ার একটা দাগও থাকবে না।'

—'ওঃ! বলেছ বেশ! ধরো , যদি কেউ তোমার বিষ্ঠা জোগাড়ও করে, এত বড় নদী পেরিয়ে ওপারে যাবে কি করে? ওপারেই তো তার প্রাসাদ!

—'সে তো বেজায় সোজা। যে গাছে বসে কথা কইছি, তার ছাল ছিঁড়ে পায়ের চটি বানাক না কেন? জলের ওপর দিয়ে যাকে বলে হনহনিয়ে চলে যাবে? ঠিক যেমন রাস্তা দিয়ে হাঁটে? আমরা তো এ কাজ করতে পারব না। আহা! যা বললাম, তা যদি কোন মানুষ শুনত!'

কথা কয়ে পাখিরা ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। এ সব কথা শুনে শাহজাদী বুকে বল পেল। এখন তো জেনে গেছে কি কি করতে হবে। তখনি ও উঠে পড়েছে। ছুরি দিয়ে গাছের বাকলের লম্বা একটা ফালি কেটেছে। যেমন তেমন একজোড়া চটি বানিয়েছে। বুনো লতার আঁশ দিয়ে সেটা পায়ে বেঁধে নিয়েছে। তারপর তুলে নিয়েছে পাখির বিষ্ঠা, যতটা পারে, স-ব। সেটা ঝোলায় ভরে। ঝোলা কাঁধে ফেলে ও খরস্রোতা নদীতে পা দিয়েছে সন্তর্পণে। পা ফেলতে কতই ভয়। কিন্তু খরস্রোত পেরিয়েও যেন ভেসে চলে গেল। ওপারে পৌঁছল নতুন দেশে।

সে তো সেজেছে ভ্রাম্যমান বৈদ্য! ওকে ঘিরে ধরেছে মানুষজন। একটু শুধোতেই সবুর কুমারের অবস্থা নিয়ে কথা কইছে সবাই। বলছে, বড় বড় হাকিম, বৈদ্য, সবাই দেখছেন। তবে কুমারের অবস্থার উন্নতি নেই। ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্ছে। পরিবারে সবাই ভেঙে পড়েছে। কুমারের বাবা ঘোষণা করেছেন, দেশবিদেশের

চিকিৎসকরা এসে চেষ্টা করুন। কুমার তো মৃত্যুপথে।

এ কথা শুনে শাহজাদী তড়িঘড়ি গেল প্রাসাদে। খবর পাঠাল, যে কুমারকে আরোগ্য করার ওষুধ তার কাছে আছে। তখনি তাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল কুমারের ঘরে। তার ভালবাসার মানুষটি কত কষ্ট না পাচ্ছে। রোগা হয়ে গেছে, চোখ নিষ্প্রভ। খুব সাহসী-সাহসী মুখে শাহজাদী দাসদের বলল, একটি সাদা, মোলায়েম চাদর আনতে। সেটি মেঝেতে পেতে ও তাতে পাখির বিষ্ঠা মাখিয়ে সেটি কুমারের শরীরে জড়িয়ে দিল।

কুমারের মাথার নিচে বালিশ দিয়ে, হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়াল। সবুরের বাবা-মা অবাক যত, নিশ্চিন্ত তত। এতদিন তো সবুর এতটুকু ঘুমোয় নি।

ওর বিছানার পাশে বসে রইল শাহজাদী। সবুর তো ঘুমোচ্ছে। যখন ঘুম ভেঙে চোখ খুলল, চোখে আর যন্ত্রণা নেই। এত মাসের ব্যথাবেদনা যেন মুছে গেছে। শান্ত এখন কুমার। অনেক সুস্থ।

শাহজাদী গায়ে জড়ানো চাদরটা খুলে নিল। সে চাদরে অগণন কাচের গুঁড়ো, আর বিষাক্ত কি যেন। দেখে সবাই শিউরে উঠল। চামড়া তখনো ক্ষতবিক্ষত। সবাই নাক সিঁটকাল, কিন্তু শাহজাদী ওর সর্বাঙ্গে পাখির বিষ্ঠা আবার লেপে দিল। কয়েক ঘণ্টা না যেতেই কুমার উঠে-হেঁটে বেড়াল।

এ যেন অলৌকিক উপায়ে সারিয়ে তোলা! বাবা-মা আনন্দে দিশাহারা। শাহজাদীর আনন্দ হ'লে কি হয়, সে ডাক্তার-ডাক্তার মুখ করে রইল।

সবুরের বাবা, বুড়ো রাজা ওকে ভ্রাম্যমান বৈদ্যই ভেবেছেন। তাই ওকে এত এত সোনা দিতে চাইলেন। সে তো ও নেবে না। জমি নাও, বাড়ি নাও, যা চাও তাই নাও। এ বৈদ্য কিছুই নেবে না চিকিৎসার জন্য।

তবে হ্যাঁ, স্মৃতিচিহ্ন নিতে পারে। কুমারের হাতের আংটি, কোমরের ছোরা, পকেটের রুমাল। সবুর কুমার সবই দিলেন। সব ঝোলায় ফেলে শাহজাদী বললেন, তিনি এতেই সন্তুষ্ট।

ফেরার সময়ে ওই আশ্চর্য চটি পরেই নদী পেরোল শাহজাদী। অনেকদিন পথ চলে নিজের প্রাসাদেও ফিরল। ছদ্মবেশ ফেলে দিয়ে, দারুণ সেজেগুজে ও পাখাটি হেলাল।

সবুর এল বটে, কিন্তু রাগ তো যায়নি তার। সে শাহজাদীর দিকে তাকালও না। বলল, 'আর কী চাও আমার কাছে? তোমার আদরের বোনদের কাছে পাচ্ছ, সেই তো যথেষ্ট!'

শাহজাদী যেন ওর কথাই বুঝল না। মধুর স্বরে শুধোল, 'সেদিন আমাকে বাধ্য করলে তোমাকে যেতে দিতে। তারপর যা যা হ'ল, স-ব বলো। সেদিন থেকেই আমি বড় দুঃখে আছি গো! কোন বোন আসেনি আর ওরা তোমাকে যা কষ্ট দিল।

ঠিক করেছি, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না আর। মুখই দেখব না ওদের '

কুমার কিছুটা নরম হ'ল। অসুখের কথা স-ব বলল। কত যন্ত্রণা পেয়েছে ক'মাস, মরোমরো অবস্থায় কোথা থেকে এলেন এক ভ্রাম্যমান বৈদ্য। কি এক বিষ্ঠা লাগিয়ে আরাম করলেন তাকে। এ কাজ তো তা'বড় তা'বড় চিকিৎসকরা পারেন নি।

বলল, 'ওই মানুষটিকে আরেকবার দেখব, তাঁকে ধন্যবাদ জানাব, এ জন্যে আমার সর্বস্ব দিতে রাজী আছি। এতবড় উপকারটা করলেন। ভারি নরম মানুষ, আঙুলে যেন জাদু আছে। যে ভাবে ভরসা দিলেন, সারালেন, আমাকে উনি জিতে নিয়েছেন। কিন্তু উনি যেন আমাকে সারাতেই এসেছিলেন। আমার আংটি, ছোরা আর রুমাল ছাড়া কিছুই নিলেন না।'

একটু হাসিতামাশার পর শাহজাদী সেই আংটি, ছোরা ও রুমাল বের করে বলছে, 'এ গুলোই কি তাকে দিয়েছিলে গো?'

কুমার তখনি তা চিনেছে। বলছে, কোথায় পেলে, বৈদ্যকে চেনো না কি!

শাহজাদী বলছে, 'ভালো মতো চিনি।'

সে বৈদ্যের ছদ্মবেশ, চটিজোড়া, সবই দেখাচ্ছে। ওর যা বলবার, তাও বলছে।

কুমারের যেন বিশ্বাস হয় না, ঠিক শুনছে তো? তবে তার প্রিয়তমা শাহজাদীই ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে জেনে ওর আনন্দ যেন ধরেনা। অনেক, আদর করল শাহজাদীকে। কম কষ্ট সয়েছে ও?

ক'দিন বাদে শাহজাদীকে নিয়ে দেশে ফিরে গেল। বাবা-মাকে দেখাল, এই বৈদ্যই তাদের একমাত্র ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছে। বাপ-মাও খুশি। বৈদ্য এক রাজকন্যা, তাঁদের ছেলেকেও ভালবাসে।

এখন মহাধুমধামে বিয়ের আয়োজন শুরু হ'ল। বুড়ো রাজা সকল নৃপতি ও সামন্ত রাজাদের নেমন্তন্ন পাঠালেন। শাহজাদীর বাবা সুলতান সবুরের অনুরোধে বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত।

বিয়ের পর এক জাঁকালো দরবারে সবুরের বাবা রাজা-সুলতান-বাদশা-আমির সকলকে নবদম্পতির সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছেন। সুলতান যখন সামনে এলেন, দেখেন নববধূ তাঁর সেই মেয়ে, যাকে অকৃতজ্ঞ বলে তিনি নির্বাসনে দেন। শাহজাদী বাপের পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলেন। বললেন, আশা করেন, বাবাকে এটা বোঝাতে পেরেছেন, এত দুর্ব্যবহার, সেই নির্বাসনের পরেও এই যে সুখ, এ শাহজাদীর নিজের কিসমতের ফলে।

সুলতান তা মর্মে মর্মে বুঝেছেন। মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। প্রকাশ্য দরবারে মেয়েকে বললেন, অমন অমানবিক ব্যবহার করে তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ। স্বীকার করলেন, এখন তিনি বিশ্বাস করেন যে যার কপালে বাঁচে, ফলাফল ভালো বা মন্দ, যাই হোক।

মৃত্যু রাজ

পাঞ্জাবী
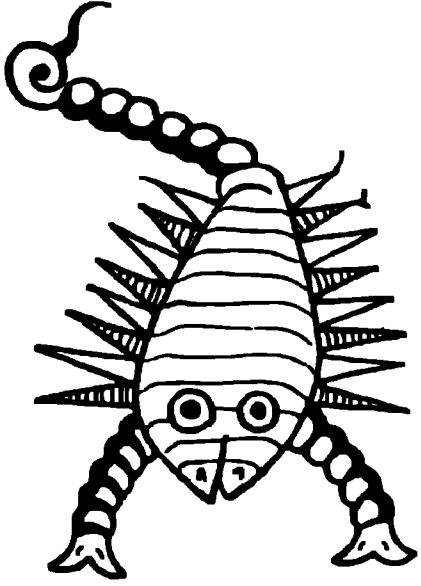
ছিল এক রাস্তা। সে পথে যেই যেত, সেই মরত। কেউ বলত সাপে কাটে, কেউ বলত বিছে কাটে, যে ভাবেই হোক, মরে যেতই মানুষ।

একদিন এক খুনখুনে বুড়ো সে পথে যাচ্ছে। হয়রান হয়ে বসেছে এক পাথরে। হঠাৎ দেখে কি, সামনে এক বিশাল বিছে, মোরগের মতো বড়সড়। সে চেয়ে থাকতে থাকতেই বিছেটা হয়ে গেল সাপ, আর সরসরিয়ে চলতে থাকল। তাজ্জব ব'নে বুড়োও পেছু নিল। দেখতে হচ্ছে ওটা আসলে কী!

সাপ চলছে তো চলছে, দিন যাচ্ছে, রাত আসছে, সাপ চলছে। একবার এক সরাইখানায় ঢুকে সাপটা বেশ কিছু যাত্রীকে কামড়ে মারল। আরেকবার প্রাসাদে ঢুকে রাজাকে মেরে এল। আবার রানীমহলে ফোয়ারা দিয়ে উঠে ওঁদের ছোট মেয়েকে মেরে রেখে এল। যেখান দিয়েই সাপটা যায়, সেখানেই মড়াকান্না ও বিলাপ শোনা যায়। আর খুনখুনে বুড়ো যেন ছায়া! সে চলে পিছনে।

রাস্তাটা হঠাৎ হয়ে গেল এক বিশাল, গভীর নদী। তার পাড়ে বসে আছে কিছু গরিব যাত্রী। খেয়াপারাণির পয়সা দেবার ক্ষমতাও নেই। অথচ নদী পেরোনো দরকার।

তক্ষুনি সাপটা একটা তাগড়া তাজা মোষ হয়ে গেল। গলায় পেতলের থরকি আর ঘণ্টা। নদীর পাড়ে সেও দাঁড়াল। দেখে যাত্রীরা বলছে, 'এ তো নদী পেরিয়ে ঘরে ফিরবে। এর পিঠে চেপে বসে লেজটা ধরি না কেন? আমরাও পার হয়ে যাব?'

তারা পিঠে চেপেছে। মোষও গেছে মাঝনদীতে, জল যেখানে সবচেয়ে গভীর,—মোষ যত পা ছোঁড়ে, তত গা দোলায়। সবাই পড়ে গেল, ভেসে গেল জলে।

বুড়ো তো নদী পেরিয়েছে নৌকোয়। ওপারে গিয়ে দেখে মোষ উধাও, দাঁড়িয়ে আছে এক রিষ্টপুষ্ট ষাঁড়। এমন একটা খাসা ষাঁড়, দেখে মনে হচ্ছে মালিক নেই তেসীমানায়, এক চাষীর মনে তো লোভ! সে ওটাকে নিয়ে যাচ্ছে। দিব্যি শান্ত ভাবে গেল ষাঁড়টা, গোহালে অন্য গোরু মোষের মতো দড়িও পরল গলায়। কিন্তু মাঝরাতে ষাঁড় নেই কোথাও। সে তখন এক সাপ। যত গরু-মোষ-মানুষ-জন, সবাইকে বিষছোবলে মেরে ফেলে সে আবার চলতে থাকল। বুড়ো কিন্তু পিছু ছাড়েনি, ছায়ার মতো চলেছে।

আরেকটা নদীর কাছে এসেই সাপ হয়ে গেল এক সুন্দরী মেয়ে। সর্বাঙ্গে কত না গয়না তার! কিছু বাদে দু'ভাই সেপাই, সেখানে এসেছে। ওদের দেখেই মেয়েটা মাথা কোটাকুটি করে কাঁদছে।

ভাইরা শুধোল. 'হয়েছেটা কি? আর তুমি এক রূপসী যুবতী, এখানে একলাটি বসে আছ বা কেন?'

—'আমার বর আমাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল। খেয়ানৌকার জন্যে বসে আছি তো ও গেল হাত মুখ ধুতে। পাথরে পা পিছলে নদীতে ডুবে গেল গো! কেউ নেই আমার! আত্মীয়স্বজন থাকে তেপান্তরে!'

বড় ভাই ওর রূপ দেখে মজেছে। সে বলছে, 'ভয়ের কি আছে? আমার সঙ্গে এসো। তোমাকে বিয়ে করব, দেখব শুনব!'

—'দুটো শর্ত আছে বাপু। কোনদিন ঘরগেরস্তীর কাজ করতে বলবে না। আর, যা চাইব, তা দিতে হবে।'

—'আমি তোমার গোলাম হবো।'

—'তাহলে ওই কুয়ো থেকে এক ঘটি জল এনে দাও। তোমার ভাই বরং এখানে থাকুক।'

যেমন বড় ভাই পিছন ফিরেছে, মেয়েটা ছোট ভাইকে বলছে, 'চলো, দুটিতে পালাই। তোমাকেই তো ভালবেসেছি গো! তোমার দাদাকে পাঠালাম, ওকে ভাগাবার জন্যে।'

—'না, তা হয় না। ওকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছ! আমার কাছে তুমি বোনের সমান।'

মেয়ে তো রেগে ভয়ঙ্করী! বড়ভাই জল নিয়ে আসছে দেখে সে রোলারুলি করে কাঁদছে। বলছে, 'তোমার ভাই একটা শয়তান! আমাকে বলছে, তোমাকে ফেলে রেখে ওর সঙ্গে পালাতে।'

ছোটভাইকে একটি কথাও বলার সময় দিল না দাদা। তরোয়াল বের করল। দুজনে সারাদিন লড়ল। সন্ধ্যে নাগাদ দুজনেই মরে গেল।

এখন মেয়ে উধাও। আবার চলছে সাপ। আর বুড়ো চলেছে পিছনে। নির্বাক. যেন ছায়া!

অবশেষে সাপ ধরল এক বুড়োর চেহারা। ধপধপে সাদা দাড়ি এক বুড়ো। যে বুড়ো চলছিল ওর পিছনে। এই বুড়োকে দেখে সাহস পেয়ে সে বলছে, 'তুমি কি? তুমি কে?'

সহাস্যে বৃদ্ধ বলল. 'কেউ কেউ বলে মৃত্যুর দেবতা। আমিই মৃত্যু ঘটাই তো!'

—'তাহলে আমার মৃত্যু ঘটাও। কতদিন তোমার পিছনে হাঁটছি, দেখেছি কি করো! আমার বাঁচার ইচ্ছেও নেই গো!'

মৃত্যুর দেবতা মাথা নাড়ল। —'না, এখনো নয়। যাদের সময় ঘনায়, আমি তাদেরই মারি। তোমাকে আরো ষাট বছর বাঁচতে হবে।'

বলেই সে মিলিয়ে গেল।

সে কি মৃত্যুর দেবতা, না কোন পিশাচ?

কেউ জানে না।

মেষপালকের ভূত

তেলুগু

এক মেষপালক আর তার বউ থাকে এক গ্রামে। নিত্য লোকটা ভেড়া চরাতে যায়। একদিন সে এক গাছে চেপেছে। ডালে বসে কোপাচ্ছে, গাছ থেকে যেখানে ডাল বেরিয়েছে, সেখানে।

এক বামুন যাচ্ছিল। কাণ্ড দেখে সে বলছে, 'ওহে! তুমি তো পড়ে যাবে। যে ডালে বসেছ, সেটাই কাটছ?'

—'প্রভু! জানলেন কি করে, যে আমি পড়ে যাব?'

—'দেখিয়ে দিচ্ছি। গায়ের কাপড়টা এই ডালে রাখো। পাশের ডালে বসে যেমন কাটছিলে, তেমনি কাটো। দেখতে পাবে স্বচক্ষে।'

মেষপালক ওঁর কথামতই কাজ করল। ডালটা কাটা হতেই কাপড় আর ডাল, দুটোই ধপাস্!

মেষপালক তো অভিভূত। —'ও বাবা! এ বামুন তো অনেক জানে। কোন কেউকেটা মানুষ হবেন।'

গাছ থেকে নেমে বামুনের পায়ে পড়ে সে বলছে, 'প্রভু! দয়া করে বলুন, আমি মরব কখন? এ আপনাকে বলতেই হবে।'

—'ওহে মূর্খ! তোমার জন্ম মৃত্যুর কথা আমি জানব কি করে? যাও যাও, জ্বালিও না।'

মেষপালক কি ছাড়ে?

—'আমি জানি আপনি সর্বজ্ঞ। জানেন আপনি, বলতেই হবে। আমি আপনাকে বরং একটা ভেড়া দেব।' বামুনের পা আঁকড়ে পড়ে রইল তো রইলই সে।

বামুন পড়ল মহাফাঁফরে। শেষে ছাড়া পাবার জন্যে ও বলল, 'দেখ হে! মরার আগে নাকটা ছোট হয়ে যাবে, চোখ গর্তে ঢুকে যাবে। তখন তুমি মরবে, বুঝেছ?'

বামুন ছাড়া পেয়ে বাঁচল।

মেষপালক ভেড়া চরায় আর চিন্তা করে, বামুন কি বলে গেল। ক্রমে এল গ্রীষ্মকাল। একদিন তার বউ খাবার আনতে দেরি করেছে। বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে ওর। দারুণ তেষ্টা। আঙুল দিয়ে নাকটা মেপে ওর মনে হল, নাকটা তো ছোট হয়েছে, চোখে আঙুল বোলাল। হ্যাঁ, চোখও গর্তে ঢুকে গেছে। ভাবল, 'বাঃ! আমি তাহলে মরব এখন?' মাঠে ভেড়া ছেড়ে রেখে ও ঘরে ফিরল।

বউ খাবার নিয়ে বেরোচ্ছিল। সে বলছে, 'ভেড়াগুলো রেখে এলে কোথায়?'

কোন জবাব নেই। মেষপালক ভাবছে, 'মরেই তো যাব। কথা কয়ে লাভ?' বোবাকালার মত সে নিশ্চল বসে রইল।

—'কথা কও না কেন? কি হ'ল তোমার?' ঘরে ঢুকে দম আটকে ও দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রইল। উবু হয়ে বসে আছে, নিশ্বাস নিচ্ছে না। বউ তাকে কত নাড়াল, কত ঝাঁকাল, সে কথাও কয় না, নিশ্বাসও নেয় না। শেষে চোখ বুজল, আর সে নড়ে না।

বউ চেঁচাল, 'ওগো! আমার স্বামী মরে গেল গো!'

ওর জাত বিরাদরীর সবাই এল। ওকে নাড়াল, ঝাঁকাল, চড়চাপড়টা মারল। মেষপালক কথাও বলে না, নড়েও না।

—'হ্যাঁ, মারাই গেছে।'—বলল সবাই। একখানা নতুন কাপড়ে বেঁধেছেঁদে ওরা ওকে গোরস্থানে নিয়ে গেল। ইয়া লম্বা গোর খুঁড়ে ওকে শোয়াল। মেষপালক তো নিশ্বাস ছাড়ছেনা। কবরে মাটি চাপা দিয়ে সবাই নদীতে গিয়ে হাত পা ধোবার জোগাড় করছে। মাটি চাপা পড়ে মেষপালক আর নিশ্বাস ছাড়তে পারে না। তখন সে আলগা মাটি সরাতে সরাতে উঠে দাঁড়াল। মাথা, গোঁফ, শরীর, সব কাদায় মাখামাখি, সে চেঁচাতে থাকল, 'ওহে! আমাকে এখানে ফেলে রেখে যাচ্ছ কোথায়?'

সবাই ঘুরে দাঁড়াল। দেখ কাণ্ড! যে লোককে এখনি কবর দিয়ে এল, সে উঠে দাঁড়াচ্ছে! সর্বাঙ্গ কাদামাটি মাখা! আতঙ্কে ওরা দৌড়চ্ছে আর চেঁচাচ্ছে, 'বাবা গো! মা গো! গাড়াড়িয়ার (মেষপালকের) ভূত আমাদের ধরতে আসছে গো!'

অন্য গ্রামবাসীরা শুধোচ্ছে তো ওরা এক কথাই বলে যাচ্ছে। সবাই যে-যার ঘরে ঢুকে দোরে খিল দিয়েছে। মেষপালক নিজের বাড়ি গিয়ে চেঁচাচ্ছে, 'অ বউ! আমি মরিনি গো! দোর খোল, ঢুকতে দাও।'

বউ বলছে, 'ওগো! পায়ে ধরি, চলে যাও। তোমার নামে নতুন কাপড় দেব। তোমার গোরে নারকেল ভেঙে জল দেব। আমাকে রেহাই দাও গো! এসো না আর।'

বেজায় খিদে পেয়েছে ওর। কে খেতে দেবে? গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে ও পৌঁছেছে হনুমান মন্দিরে। ভাবছে, 'পুরুত তো দেবতাকে ভোগ দেবে। খানিক নয় চেয়ে নেব!' সারা রাত বসে রইল সেখানে। কেউ এল না। সারা রাত গাঁয়ে কেউ দোরটি

খুলল না। পরদিন সূর্য ওঠার অনেক পরে গাঁয়ের মানুষ উঠেছে, দোর খুলছে, ঝাঁটপাট দিচ্ছে, যে যার কাজে যাচ্ছে। পুরুত খানিক ভাত ডাল রেঁধে তার ওপর ঘি ঢেলেছে, সেই সঙ্গে ফুল বেলপাতা নিয়ে মন্দিরে এসেছে। গঙ্গাজলে মূর্তিকে স্নান করিয়ে ফুল চড়াতে যাবে, এমন সময়ে মূর্তির পিছন থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে মেষপালক। সে বলছে, 'প্রভু! অনেক দেরি করে ফেললেন আজ! আমি ব'লে আপনার জন্যে বসেই আছি।'

—'ও বাবা গো! গাড়াড়িয়ার ভূত রে, গাড়াড়িয়ার ভূত!' চীৎকার করে পুরুত সব ফেলে দিয়ে পলায়ন! গ্রামের লোকজন বাইরের উঠোন ঝেঁটোতে ঝেঁটোতে ওই চেঁচানি শুনে ঝাঁটা ঝুড়ি ফেলে পালাল। যারা গোহালে বলদের দড়ি খুলতে গিয়েছিল, তারাও পালাল। সবাই যে-যার ঘরে ঢুকে দোর এঁটে দিল।

মেষপালক আবার গেছে নিজের বাড়ি। বউকে বলছে দোর খুলতে। বউ তো দরজা খুলছে না। তখন ও মন্দিরেই ফিরল। ওই খাবারই খেল ক'দিন। কিন্তু পরে কি! গোর দেবার সময়ে ওরা তো সব খুলে নিয়েছিল।

তখন মনে ভাবছে, 'ধোপাঘাটে গিয়ে কিছু জামাকাপড় আনতে হবে। ধোপা এলে একটা কাপড় চাইব, যাতে লজ্জা ঢাকা যায়। সেটা কোমরে জড়িয়ে ঘরে আসব।' ধোপাঘাটে গিয়ে যে ভিটিতে ধোপা নোংরাকাপড় রাখে, তার মধ্যেই লুকিয়েছে।

এক দারোগা রোজকার মতো গ্রামে রোঁদ দিতে এসেছে। দেখে গ্রামের সবাই দোরবন্ধ করে বসে আছে। সে ভাবছে, 'ভর দুপুরে দোর বন্ধ? কেন, ব্যাপারখানা কি?' দোরে দোরে ঘা মেরে ও কারণ শুধোচ্ছে।

ওরা বলল, 'এক গাড়াড়িয়ার ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও না চলে গেলে আমরা বেরোব না।'
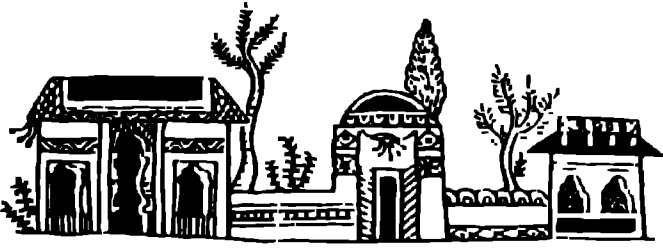
—'আরে! আমি তো কোন ভূত দেখলাম না? যতসব রাবিশ!'

গ্রামের মোড়ল রেড্ডির কাছে গেল, সে এক কথাই বলল। দারোগা বলল, 'আমি তোমাকে রক্ষা করব। দোর খোল।'

রেড্ডির খানিক ভরসা হ'ল। ও দোর খুলল। ক্রমে ক্রমে অন্যরাও দোর খুলে বেরোল, যে-যার কাজে গেল।

দারোগা ধোপাকে বলছে, 'আমার পোশাক বড় নোংরা হয়েছে হে! কেচে আনো দেখি।'

—'আমি পারব না। তখন গেলাম, গাড়ড়িয়ার ভূতকে দেখলাম। ও আমায় ভর করবে।'

—'ভারি ডরপোক তো! চলো, আমি সঙ্গে যাচ্ছি।'

ঘোড়ায় চেপে দারোগা ধোপাকে নিয়ে নদীর ঘাটে গেল। ঘোড়ার লাগাম ধরে ধোপাকে বলল, ভিটিতে দেখতে। ধোপা তো নোংরা পোশাকটা ভিটিতে রাখতে গেছে। দেখে, মেষপালক ভিতরে বসে আছে। সারা অঙ্গে, এমন কি দাড়িতেও ছাই মাটি মাখামাখি। ধোপা কাছে আসতে ও বলছে, 'অ সুব্বান্না! আজ সকালে এত দেরি কেন? কখন থেকে তোমার জন্যে বসে আছি!'

এ কথা শুনেই দারোগা ঘোড়ায় চেপে ভেগেছে। ধোপা চেঁচাতে চেঁচাতে পালাচ্ছে, আর গ্রামের সবাই আবার পালিয়ে গিয়ে দোর বন্ধ করেছে।

মেষপালকের আর সহ্য হ'ল না। —'গর্দভের থেকেও নির্বোধ তোরা!'—এই ব'লে ও একটা কাপড় কোমরে জড়াল, আরেকটা কাপড় গায়ে জড়াল, বাড়ি গেল। বউকে যতই বলে, বউ ওর কথা শোনেই না। অবশেষে ও হতাশ আর্তনাদে বলল, 'মরিনি আমি, মরিনি! এক বামুন বলেছিল, আমি মরব! আমি ওর কথা বিশ্বাসও করি। সেই থেকেই আমার এত দুঃখভোগ! দোর খুলে স্বচক্ষে দেখই না।'

দোর ফাঁক করে বউ তাকাচ্ছে। না, মানুষ-মানুষ লাগছে যেন? কাপড়ও পরেছে! বউ ওকে ঘরে ঢুকিয়ে নিল। সর্বাঙ্গে কাদামাটি শুকিয়ে উঠেছিল। জল ঢেলে ঢেলে ঘসে ঘসে সব পরিষ্কার করল। ঠিকমতো জামাকাপড়ও পরতে দিল।

সে সব প'রে ট'রে মেষপালক পরদিন থেকে ভেড়া চরাতে গেল।

যা তার নিত্যদিনের কাজ।

এ জীবন, অন্য জীবন

বাংলা

দুই বন্ধুর পথে দেখা। দু'জন যাচ্ছে দু'দিকে। একজন যাচ্ছে এক মহিলার কাছে। আরেকজন যাচ্ছে এক ধর্ম সভায়। সেখানে এক বিখ্যাত প্রচারক ও কথক আসবেন।
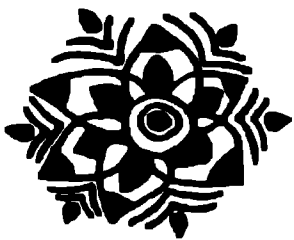
যে ধর্মসভায় যাচ্ছিল, সে বন্ধুকে বলল, 'ওই মেয়েটার কাছে যাচ্ছ কেন? ধর্মসভায় চলো না! এ প্রচারক যখন বলেন, মনে প্রেরণা জাগে। ইনি নাচেন, গান করেন। সাধুসন্ত ও ঠাকুরদেবতাদের নিয়ে চমৎকার সব গল্প বলেন। চলো আমার সঙ্গে।'

এ বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে চলো না কেন? তোমাকেও একটি রূপসী, চনমনে মেয়ে দেখে দেব, আমারটি যেমন! ও রকম জোলো ধর্মীয় ব্যাপারে সময় নষ্ট করো কেন?'

কেউ কাউকে দলে টানতে পারল না। যে যার পথে গেল।

যে ধর্মসভায় গেল, সে ধর্মীয় কোন ব্যাপারে মনই বসাতে পারল না। ওর কেবল মনে হতে থাকল, আহা! বন্ধু এক সুন্দরী মেয়ের বাহুবন্ধনে কি সুখে সময়টা কাটাচ্ছে। আর ও নিজে এক প্রচারকের বক্তৃতা শুনে সময় অপচয় করছে!

সে মেয়ের আলিঙ্গনে থেকেও তো বন্ধুটি আনন্দ পাচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে, ওর বন্ধু সাধুসন্ত ও দেবদেবীর গল্প, স্তোত্রপাঠ, এ সব শুনে পুণ্য অর্জন করছে, স্বর্গে জায়গা কিনে নিচ্ছে। আর সে? কি বোকা, প্রগল্‌ভ মেয়ের সাহচর্যে জীবনটা অপচয় করছে।

তাই তো লোকে বলে, মানুষ অন্য জীবনের মোহে এ জীবন ছেড়ে দেয় না। আর এ জীবনের মোহ ছেড়ে অন্য জীবনও বেছে নেয় না।

ঈশ্বর যখন সর্বব্যাপী

বাংলা
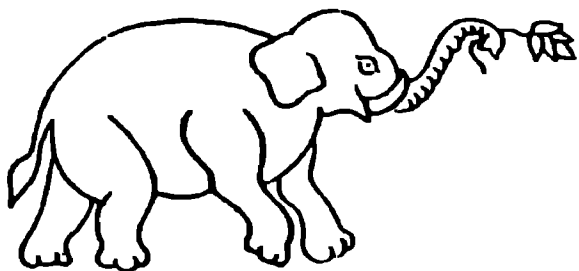
এক গুরুর অনেক শিষ্য। যা তিনি প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেন, সে কথাই ওদের বলতেন, 'ঈশ্বর সর্বব্যাপী। তাঁর বাস সব কিছুতেই। তাই সব কিছুকে ঈশ্বর জেনে দেখবে, প্রণামও করবে।'

একদিন এক শিষ্য কোন কাজে বেরিয়েছে। একটা হাতি ক্ষেপে গিয়ে বাজার দিয়ে দৌড়চ্ছে। মাহুত চীৎকার করছে, 'সরে যাও! সরে যাও! হাতি ক্ষেপেছে!'

শিষ্যের তো গুরুর শিক্ষা মনে আছে। সে তো পালাবে না।

—'আমার মধ্যেও ভগবান, হাতির মধ্যেও ভগবান! ভগবান কখনো ভগবানকে আঘাত করতে পারে?'

মনে প্রচুর প্রেম ও ভক্তি নিয়ে সে হাতির সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। মাহুতের মাথা খারাপ হবার জোগাড়! সে শুধু বলছে, 'পালা রে বাবা! তোকে মেরে দেবে!' শিষ্য এক চুলও নড়ল না।

পাগলা হাতি ওকে শুঁড়ে জড়িয়ে শূন্যে তুলে, শুঁড় বেশ ক'পাক ঘুরিয়ে ওকে নর্দমায় ফেলে দিল। সে বেচারি ক্ষতবিক্ষত, দেহে রক্ত ঝরছে, কিন্তু সবচেয়ে বড় দাগা পেয়েছে মনে। সমানে ভাবছে, ঈশ্বর আমাকে এই করলেন? এই?

গুরু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে এলেন। ওকে বাড়ি নিয়ে যাবেন! শিষ্য বলল,

"আপনি বলেছিলেন ঈশ্বর সর্বত্র আছেন। দেখুন হাতি আমার কি করল!"

গুরু বললেন, 'ঈশ্বর সর্বব্যাপী, এ কথা সত্যি। হাতিটাও ঈশ্বর। কিন্তু মাহুতও তো ঈশ্বর। সে তোমাকে পালাতে বলছিল। ওর কথা শুনলে না কেন?'

বাঘ জানত না, সে বাঘ

বাংলা

এক বাঘিনীর পূর্ণগর্ভ। সে ঝাঁপ মারল এক ভেড়ার পালে। তখনি তার প্রসব বেদনা হ'ল। একটি ছানার জন্ম দিয়ে সে মরেই গেল।

ভেড়ারা দয়ার সাগর বললে হয়। তারা বাঘের বাচ্চাকে যত্নআত্তি করল, বুকের দুধ খাওয়াল, ভেড়ার পালের মধ্যেই তাকে বড় করতে থাকল। তারা ঘাস খায় তো বাঘের ছানাও ঘাস খায়। তারা ভ্যা-ভ্যা ডাকে, তো সেও ভ্যা-ভ্যা ডাকে। অবশ্যই ওর ভ্যা-ভ্যা-টা কিছু বেয়াড়া ছাঁদের। যখন বড় হ'ল, চেহারায় সে বাঘ। স্বভাবে-আচরণে সে ভেড়া।

একদিন এক জাঁদরেল বলিষ্ঠ বাঘ এই ঘাসখেকো বাঘের বাচ্চাকে দেখে তাজ্জব। সে এগোতেই ভেড়ার পাল ছিটকে-মিটকে পালাচ্ছে। বাঘের বাচ্চাই পড়ে থাকল। সে ভয়ে ভ্যা-ভ্যা করে ডাকছে। বড় বাঘটা কাছে এল, কথা কয়ে ওকে শান্ত করল, তারপর ওকে নিয়ে গেল এক ঝিলের ধারে।

বলল, 'জলে নিজের ছায়া দেখ। ওটা তুমি। তারপর আমায় দেখ। তোমাকে তো একেবারে আমার মতো দেখতে। তুমি ভেড়া নও হে, তুমি বাঘ! তোমার খাদ্য ঘাস নয় হে, মাংস!'

ঘাসখেকো বাঘের একথা বিশ্বাস হতে চায় না। বড় বাঘ অনেকক্ষণ ধরে কথা কয়ে ওকে বুঝিয়ে ছাড়ল, যে ও বাঘই বটে। প্রথমটা ও মাংস খেত না, ঘাস চিবোত, আর ভ্যা-ভ্যা করত। অবশেষে একদিন বড় বাঘ ওকে এক খণ্ড মাংস খাইয়ে ছাড়ল।

রক্তের স্বাদ ভীষণ ভালো লাগল ওর। ভ্যা-ভ্যা ডাকা আর ঘাস খাওয়া ও ছেড়ে দিল। এতদিনে বুঝল, ও ভেড়া নয়, বাঘ।

চলে গেল বড় বাঘের সঙ্গে। ওর মতো বাঘা হয়ে গেল।

গন্ধর্বসেন মারা গেছেন!

বাংলা

বাদশা একদিন দরবারে বসেছেন, মন্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বিলাপ করতে করতে দৌড়ে এলেন। বাদশা বলছেন, এত হাহাকারের কি হ'ল?

মন্ত্রী তখ্‌তের পায়া চুম্বন করে আভূমি নত হয়ে বললেন, 'হায় হায় বাদশা! গন্ধর্বসেন মারা গেলেন!'

দরবার বন্ধ হয়ে গেল। হুকুমজারি হ'ল, প্রত্যেকে যেন একচল্লিশ দিন শোকপালন করে মৃতের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানাতে।

যখন হারেমে গেলেন, তখনো বাদশা কাঁদছেন। বাদশাকে শোকাকুল দেখে বেগমরা শুধোচ্ছেন, হ'লটা কি! —বাদশা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, গন্ধর্বসেন মারা গেছেন। শুনে বেগমরা বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁদতে থাকলেন। অন্দরমহলে সে কি শোক! সে কি হুলুস্থুলু ব্যাপার!

বড় বেগমের এক দাসী তো এমন কাণ্ডকারখানার কারণ বোঝে নি। সে বলছে, 'বেগমসাহেবা! সবাই এত কাঁদছে কেন গো?'

বড়বেগম লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আহা হা! বেচারা গন্ধর্বসেন মারা গেল!'

—'তিনি বেগমসাহেবার কে?'

—'তা তো জানি না বাছা!' বড়বেগম তড়িঘড়ি ছুটলেন বাদশার কাছে। জানতে চাইলেন, যার জন্যে সবাই বিলাপ করছেন, সেই গন্ধর্বসেন লোকটা কে?

সে তো বাদশারও জানা নেই। বোকা ব'নে গিয়ে তিনি দরবারে ফিরে গেলেন, মন্ত্রীকে তলব করলেন, বললেন, 'মন্ত্রী! যার জন্যে সবাই বিলাপ করছি, সে গন্ধর্বসেন লোকটা কে?'

—'মাপ করবেন হুজুর মালিক! এ বান্দাও জানে না গন্ধর্বসেন কে! তবে কি! দেখলাম, কোতোয়ালির বড় দারোগা কাঁদছে আর বলছে, গন্ধর্বসেন মরে গেল! গন্ধর্বসেন মরে গেল! সে চাইছিল তার সঙ্গে অন্যরাও কাঁদুক, তাই!'

বাদশাহ গর্জে উঠলেন, 'তুমি একটি উজবক! যাও, এখনি খোঁজ করো, গন্ধর্বসেন কে!'

মন্ত্রী বাদশাহকে কুর্নিশ করেই পড়িমরি ক'রে দৌড় লাগালেন। কোতোয়ালির বড় দারোগা প্রাসাদের ফটকে দাঁড়িয়ে, তাঁকে শুধোলেন, গন্ধর্বসেন কে!

দারোগা ফ্যালফ্যাল করে তাকাল মন্ত্রীর দিকে। বলল, পরলোকগত গন্ধর্বসেন যে কে, সেটা সেও সঠিক জানে না। তবে জমাদার কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল।

বলছিল, গন্ধর্বসেন মরে গেছে। তখন দারোগাও তার সঙ্গে কেঁদেছিল, মন্ত্রীকে সে কথা বলেওছিল।

এখন মন্ত্রী আর দারোগা জমাদারকে খুঁজে বের করল। শুধোল, গন্ধর্বসেন কে, যার জন্যে জমাদার কাঁদছিল?

জমাদার বলল, 'না হুজুর! সে কে, সে কি, তা তো আমার জানা নেই। দেখলাম, গন্ধর্বসেন মরেছে ব'লে আমার বউ বেজায় কাঁদছে। ভারি দুঃখ হ'ল আমার, কাঁদতে কাঁদতে এসে আপনাকে খবরটা দিলাম। হুজুর! কেউ কাঁদলে বা হাসলে মনে একটা কি যেন ঘটে যায়। তখন আমরাও কাঁদি, কিংবা হাসি। আমার বউ কাঁদছিল। আমিও কাঁদলাম!'

ওরা তিনজনেই গেল জমাদারের বউয়ের কাছে। সেও বলল, পরলোকগত গন্ধর্বসেন বিষয়ে সে নিজে তো জানে না কিছু। সে পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিল। দেখে গ্রামের ধোপানী আছড়েপিছড়ে কাঁদছে আর বলছে, ওর গন্ধর্বসেন মরে গেল!

তখন ওরা চারজনেই দৌড়ল ধোপানীর বাড়ি। শুধোল, গন্ধর্বসেন তার কে! সে মরতে ধোপানী সকালে অত আছড়েপিছড়ে কাঁদছিল কেন?

ধোপানী হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠল, 'আমি বড় অভাগী গো! আমার বুক এখনো যেন ভেঙে যাচ্ছে! সে তো আমার পেয়ারের গাধা! ছেলের মতো তাকে ভালবাসতাম গো!'

মুখের বাক্যি ফুরোয় না, আবার সে কেঁদে আকুল হয়। এরা বেজায় অপদস্থ হ'য়ে চলে এল।

মন্ত্রী প্রাসাদে ফিরে বাদশাহের পায়ে আছড়ে পড়লেন। সত্যি কথাটাই বললেন, যে গন্ধর্বসেনের জন্যে সবাই শোক করছিলেন, সে ধোপানীর পেয়ারের গাধা! বাদশাহ তাঁকে ধমকধামক দিলেন, আবার মাপও করে দিলেন।

এ খবর যখন অন্দরমহলে, হারেমে পৌঁছল, বাদশাহ্ আর তাঁর সভাষদদের নিয়ে বেগমরা হেসে হেসে বাঁচেন না। হাসতে হাসতে, হাসতে হাসতে, তাঁদের পেটে খিল ধরে যাবার জোগাড়, যাকে বলে!

তেনালি রামের স্বপ্ন

তেলুগু

একদিন রাজা ঘোষণা করলেন, তিনি এক স্বপ্ন দেখেছেন। —'বুঝলে হে তেনালি রাম! তুমি আর আমি, শুধু আমরা দুটিতে একটা নতুন জায়গায় যাচ্ছি। একটা পথে পৌঁছলাম, তার দু'পাশে দুটো গভীর গর্ত। একটা মধুতে বোঝাই, আরেকটা গু'য়ের গর্ত। পথটা বেজায় সরু, আবার আমাদের পেরোতেও হবে। পা টিপে টিপে যাচ্ছি দু'জনে, দুজনেরই পা পিছলে গেল। আমি পড়লাম মধুর গর্তে, তুমি পড়লে গুয়ের গর্তে।'

সভাসদরা যত হাসে, তত হাততালি দেয়। হতভাগা তেনালি রাম অন্তত স্বপ্নে যেমনটি শাস্তি পাওয়া উচিত, তা পেল তো! তারা বেজায় খুশি।

রাজা আরো বললেন, 'আশ মিটিয়ে মধু খেলাম। কোনমতে হাঁচড়পাঁচড় করে উঠেও এলাম। আর তুমি? হায় হায়, ওই পচা গুয়ের মধ্যে কি নাকানিচোবানি খাচ্ছিলে! কোনমতে ওপরে উঠে পড়েছিলে প্রায়! কিন্তু পা পিছলে আবার পড়লে, মাথা নিচে, ঠ্যাং ওপরে। তখন আমার ঘুমটা ভেঙে গেল।'

সভাসদরা হেসে খুন! তেনালি রামের মুখে হাসি নেই।

কিন্তু সকালে সে রাজসভায় হাজির। একটা স্বপ্নও দেখে এসেছে।

—'গতকাল রাজামশাই একটা স্বপ্নের কথা বললেন। গত রাতে আমি আবার একটা স্বপ্ন দেখলাম। যেখানে আপনার স্বপ্নের শেষ, সেখান থেকে আমার স্বপ্নের শুরু। আপনি তো মধুর গর্ত থেকে উঠে পড়লেন। আমিও বহুবারের চেষ্টার পর উঠে পড়লাম রাস্তায়। তবে আমি আপনি তো ও অবস্থায় বাড়ি ফিরতে পারি না, পারি কি? তাই জিভে চেটে আপনার গায়ের মধু আমি সাফ করলাম। আর জিভে চেটে আপনিও আমার গা সাফ করলেন!'

স্বপ্নে ভোজ খাওয়া

রাজস্থানী

ছিল তিন ভাই, তাদের পদবী খান। আর ছিল এক মিও। মিওদের জাতে হিন্দুদের প্রথাও মানে, মুসলিমদের প্রথাও মানে। ওরা বেরোল রুজিরোজগারের ধান্ধায়। চলতে চলতে এক জায়গায় পৌঁছল, খানিক জিরোবে। ভাইরা বলাবলি করছে, 'আমরা তিন জন, মিওটা একা। ওকে ঠিক বাগে রাখা যাবে।'

সকলের ক্ষিদে পেয়েছে, ওরা মিওকে টাকা দিয়ে বলছে, 'এমন কিছু আনো, যা সবাই খেতে পারি।'

মিও গিয়ে এক ঠোঙা লাড্ডু কিনেছে। ভাবছে, 'এ খান ভাইয়েরা তো আমাকে কিছু খেতে দেবে না। নিজের ভাগটা খেয়ে নেওয়াই ঠিক।' তো নিজের ভাগের লাড্ডু খেয়ে বাকিটা নিয়ে গেছে ওদের জন্যে।

এরা দেখে বলছে, 'মিও, তুমি একটি পেঁচার বাচ্চা। আমরা চারটে লোক, আনলে কত ক'টা? অতগুলো খেলে কি করে?' মিও পকেট থেকে আর কয়েকটা লাড্ডু বের করে গবগবিয়ে খেয়ে নিল। বলল, 'দাদারা! এমনি করে!'

ওরা ভাবল, 'আরো প্রশ্ন শুধোলে ও সবগুলোই খেয়ে নেবে।' খানদের কপালে কম-কম জুটল। তবু ওরা লাড্ডু সমান চার ভাগ করল। যে-যার কপালে যেমন জুটল, খেয়ে নিল। কেউ খুশি হ'ল, কেউ হ'ল না, ওই যা জুটল, খেল। জল খেয়ে তেষ্টা মিটিয়ে সবাই গেল কাজের খোঁজে।

এমন কাণ্ড! যেমনটি ভেবেছিল, তার চেয়ে ভালো কাজই পেল ওরা। হাতে পয়সা হয়েছে, এখন ওরা বাড়ি ফিরতে চায়। তা ভাইয়েরা এ-ওকে বলছে, 'বাড়ি যাবার আগে আরেকটা কাজ তো আছে। মিও আমাদের লাড্ডু বেশির ভাগ খেয়ে নিয়েছিল। আমরাও ওর সর্বস্ব নিয়ে ওকে ভিখিরি করে ছাড়ব।

মিওকে ডেকে ওরা বলছে, 'বাড়ি যাবার আগে ভাই! এই কাজটা করে ফেল। আমাদের জন্যে পায়েস রাঁধো।'

ভাইয়েরা দুধ, চিনি, চাল, সুগন্ধি মশলা সব আনল। মিও অতি উৎকৃষ্ট পায়েস রাঁধল। পায়েস রইল ডেকচিতে। তখন রাত হয়েছে, তো ভাইয়েরা বলছে, 'যে সবচেয়ে ভালো স্বপ্ন দেখবে। সে এই পায়েস খাবে। রাজী তো?'

—'হ্যাঁ ভাই, উত্তম প্রস্তাব। যে সবচেয়ে ভালো স্বপ্ন দেখবে, সেই খাবে পায়েস।'

—'সকালে উঠে আমরা যে-যা স্বপ্ন দেখেছি, তা বলব। যে সবচেয়ে ভালো স্বপ্ন দেখবে, সে পায়েস খাবে। যে যাচ্ছেতাই স্বপ্ন দেখবে, সে খাবে না।'

'হ্যাঁ ভাইরা! খুব ভালো কথা।'

ভাইয়েরা ডেকচির মুখটা কাপড়ে ঢেকে এঁটেসেঁটে বেঁধেছে। ডেকচিটা মাথার কাছে রেখে ঘুমের জোগাড় করছে। মিও ভাবছে, 'এই তিন বেটাই হারামজাদা। সবাই সমান খরচ দিলাম বটে! কিন্তু ওরা তো আমাকে ভাগ দেবে না, ঠকাবে।'

খান ভাইরা চায় মিও ঘুমোক, আর মিও চায় ওরা ঘুমোক। শেষে মিও ঘুমের ভাণ করল। নাকও ডাকতে থাকল। খানরা ওর দিকে নজর রাখল। যখন বিশ্বাস হ'ল যে ও সত্যিই ঘুমোচ্ছে, ওরা যে-যার বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়ল।

যেই না ঘুমিয়েছে, মিও অমনি উঠেছে। পা টিপে টিপে গিয়ে সবটা পায়েস চেঁছে মুছে খেয়েছে। এক কণাও লেগে নেই ডেকচিতে। তারপর বিছানায় শুয়ে গরম চাদর মুড়ি দিয়ে টেনে ঘুম লাগিয়েছে। অত পায়েস খেয়ে নিজেকে বেশ রঙিন মনে হচ্ছে।

সকালে উঠে তিন ভাই কথা কইছে। মিও ঘুমোচ্ছে। কি জন্যেই বা উঠবে, পায়েস তো খতম। ভাইয়েরা এ-ওকে শুধোচ্ছে, 'কি স্বপ্ন দেখলে হে? স্বপ্নটা কি দেখলে?'

একজন বলছে, 'ভাই রে! স্বপ্ন দেখলাম আমি আজমীরের রাজদরবারে পৌঁছেছি। সে যে কি চমৎকার, সে কি বলি!' সে আরেক ভাইকে খোঁচাচ্ছে, সেও বলুক এবার।

এই ভাই বলছে, 'স্বপ্নে চলে গেলাম জয়পুর! রাজার সঙ্গেও দেখা হ'ল।'

মিওর ঘুম ভেঙেছে, সে কান পেতে শুনছে। তৃতীয় ভাই বলছে, 'ভাই! কি বলব! মক্কা চলে গিয়েছিলাম। স্বয়ং হজরত মহম্মদকে দেখে এলাম।'

তিন জনের স্বপ্নই জানা গেল। মিও এখন যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে, আর উঃ আঃ করছে, আর বড় বড় হাই তুলছে। এ পাশ ওপাশ করছে, আর যেন ঘুমের মধ্যেই কাৎরাচ্ছে।

—'ওরে মিও! পেঁচার বাচ্চা! উঠবি কি না?'

—'জ্বালিও না তো!' —কাৎরাতে কাৎরাতে ও পাশ ফিরল।

—'বল্ কি স্বপ্ন দেখলি? স্বপ্নে কি হ'ল?'

—'ভাই! যা হ'ল, ঘটনা তো এই! এক বিশাল জোয়ান এসে আমায় দমাদম পেটাল। এখনো গা টনটন করছে উঃ! সে বলল, পায়েস খা! সবটা পায়েস খা! খেলাম, সবটাই খেলাম। তখন ও আমাকে আরো খানিক মেরে ধরে চলে গেল। সর্বাঙ্গ টনটন করছে গো!'

—'ওরে মূর্খ! ওরে পেঁচার বাচ্চা! আমরা তো কাছেই শুয়েছিলাম। আমাদের ডাকলি না কেন? আমরাই নয় তোকে রক্ষা করতাম!'

—'ভাই! কেমন করে ডাকতাম? জাগাতাম বা কি করে? একজন ছিলে

আজমীরে, আরেকজন ছিলে জয়পুরে। আরেকজন সেই কোথায় মক্কা গিয়েছিল হজরত মহম্মদকে দেখতে। তোমাদের নাম ধরে কি কম চেঁচিয়েছি? তবে শুনতে কেমন করে?'

স্বপ্নের খোঁজে

সাঁওতালী

এক যে ছিলেন রাজা। তাঁর বড়রানীর কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি। আবার বিয়ে করলেন। এ রানীর দুটি ছেলেও হ'ল। সবাই খুশি, রাজার গদীতে বসার মানুষরা এল এতদিনে। তারপর, যেমনটি প্রায়ই হয়, বড়রানীরও একটি ছেলে হ'ল। এরপরে বেধে গেল লাগাতার ধুন্ধুমার ঝগড়া। ছোটরানী ভেবেছিল, তার ছেলেরাই রাজা হবে। এখন তার ভয়, বড়রানীর ছেলেকেই যদি সিংহাসনে বসান রাজা? অনেক ফন্দিফিকির করল সে, রাজা যাতে বড় রানী আর তাঁর ছেলেকে তাড়িয়ে দেন। রাজা সে কথা শুনলেন। আলাদা এক তালুক, আর বাড়ি দিয়ে বড়রানীকে ছেলেসুদ্ধ সেখানেই পাঠালেন।

এক রাতে রাজা এক স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নের মানে তো বুঝলেন না। দেখলেন সোনার চিতাবাঘ, সোনার সাপ আর সোনার বাঁদর একসঙ্গে নাচছে। স্বপ্নের মানে বোঝা যাচ্ছে না, বেজায় চিন্তা রাজার।

ডাকলেন ছোট রানী, আর তার দুই ছেলেকে। তারা তো কিছুই বলতে পারল না। তবে ছোট ছেলে বলল, তার মনে হচ্ছে, ওদের সৎভাই এর মানে বলতে পারে।

তাকেও ডাকা হ'ল, বলা হ'ল স্বপ্নের কথা। সে শুনেমেলে বলল, 'স্বপ্নটা যা বলছে, তা এই রকম! তিনটে সোনার প্রাণি হ'চ্ছি আমরা তিন ভাই। আমরা তো আপনার কাছে সোনার সমান। ভগবান এ স্বপ্ন এইজন্যে দেখালেন, যেন এরপর আমরা পরস্পর লড়াই না করি। তিনজনে তো রাজ্য পাব না। একজনই পারে, তখন আমরা লড়াইও করব। স্বপ্ন বলছে, ভাইদের মধ্যে যে সোনার চিতাবাঘ, সোনার সাপ আর সোনার বাঁদর এনে সর্বসমক্ষে নাচাতে পারবে, সেই আপনার ছেলেদের মধ্যে প্রধান, রাজ্যও সেই পাবে।'

রাজা এ ব্যাখ্যা শুনে সন্তুষ্ট হলেন। ছেলেদের বললেন, পরের বছর ঠিক আজকের তারিখের মধ্যে যে এ কাজ করতে পারবে, সেই পাবে রাজ্য।

ছোটরানীর ছেলেরা অনেক ভেবে ঠিক করল, স্বপ্নের এ সব প্রাণিদের খুঁজতে

চেষ্টা করাও পণ্ডশ্রম হবে। কোন স্যাকরাকে ধরে এগুলো যদি গড়িয়েও নেওয়া যায়, ওদের নাচানো তো যাবে না।

বড়রানীর ছেলে গেছে মায়ের কাছে। সব কথাই খুলেমেলে বলছে। মা বলছে, ছেলে যেন সাহসে বুক বাঁধে, তাহ'লে স—ব পেয়ে যাবে। জঙ্গলে এক বৈষ্ণব সাধু আছেন। সেই গোঁসাই জানবেন কি করতে হবে। তো রাজপুত্তুর বেরিয়ে পড়েছে। কয়েক দিন পথ চলার পর, অন্ধকার ঘনালে পৌঁছিয়েছে এক ঘন জঙ্গলে। ঘুরতে ঘুরতে দেখে, দূরে কোথাও আগুন জ্বলছে। সেখানে গিয়ে আগুনের পাশে বসে ও তামাক টানতে লেগেছে। গোঁসাই কাছেই ঘুমোচ্ছিলেন। তামাকের গন্ধে তাঁর ঘুম ভেঙেছে। উঠে বসে শুধোচ্ছেন, কে ওখানে বটে!

—'মামা! আমি তোমার ভাগনে।'

—'সত্যি? আমার ভাগনে তুই? এত রাতে এলি কোথা থেকে?'

—'বাড়ি থেকে গো মামা!'

—'হঠাৎ আমার কথা মনে পড়ল কেন? আগে তো আসিস নি কখনো? আশঙ্কা করি, কিছু একটা ঘটেছে!'

—'না, তেমন কিছু নয় গো! তোমার কাছেই এলাম। মা বলল, সোনার চিতাবাঘ, সোনার সাপ আর সোনার বাঁদরের খোঁজ পাব কি করে, তা তুমি জানবে।'

গোঁসাই কথা দিলেন, এ কাজে রাজপুত্তুরকে সাহায্য করবেন। তারপর উনোনে হাঁড়িতে জল চাপালেন। ঠিক তিন দানা চাল ফেললেন, কিন্তু ভাত হ'ল দুজনের দু'বেলা খাওয়ার মতো। খাওয়াদাওয়া হ'লে গোঁসাই বললেন, 'ভাগনে রে! কি যে করতে হবে তোকে, সে তো আমি বলতে পারি না। জঙ্গলে আরো ঢুকে যা। আমার ছোট ভাইকে পাবি। সে তোকে বলে দেবে খ'ন!'

পরদিন সকালেই রাজপুত্তুর বেরিয়ে পড়ল। আরেক গোঁসাইয়ের কাছে পৌঁছেও গেল। সব শুনেমেলে ইনিও হাঁড়ি চাপালেন, জলে ফেললেন দুই দানা চাল। এত ভাত হ'ল, যে দু'জনে হেকুরঢেকুর খেতে পারেন। খাওয়া হ'লে ইনি বললেন, স্বপ্নে দেখা চিতা-সাপ-বাঁদর যে কোথায় মিলবে, সে তো তিনি জানেন না। তবে জঙ্গলের গভীর গহীনে তাঁর ছোট ভাই থাকেন, তিনি জানবেন।

পরদিন সকালে রাজপুত্তুরের যাত্রা হ'ল শুরু। দু'দিন পথ চলে পৌঁছল ও তিন নম্বর গোঁসাইয়ের কাছে। কি করতে হবে তা জেনেও নিল। অবশ্যই ইনিও হাঁড়িতে জল চাপালেন, ফেললেন এক দানা চাল। ভাত ফুটল যখন, তখন দুজনে ফেলাছড়া করে খাওয়ার মতো অনেক ভাত!

সকালে গোঁসাই রাজপুত্তুরকে বলছেন কি করতে হবে। যেতে হবে এক কামারের কাছে। সে বারো মণ লোহা দিয়ে বানাবে ঢাল! তার ধারটা এমন ধারালো হবে, যে
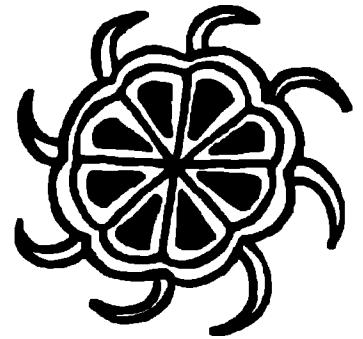
পাতা পড়লে দু' টুকরো হয়ে যায়।

রাজপুত্তুর কামারশাল থেকে ঠিক তেমনি এক ঢাল গড়িয়ে গোঁসাইয়ের কাছে আনল। গোঁসাই বলছেন, এটাকে তো পরখ করে দেখতে হয়! ঢালটাকে একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে উনি রাজপুত্তুরকে বলছেন গাছে উঠে গাছ ঝাঁকিয়ে পাতা ফেলতে। রাজপুত্তুর গাছে উঠল, ডাল ঝাঁকাল, পাতা তো পড়ে না। গোঁসাই গাছে চেপে আলতো দোলা দিতেই বৃষ্টিধারার মতো ঝরঝরিয়ে পাতা ঝরল। ঢালের ধারে যেটাই পড়ে, সেটাই টুকরো হয়ে যায়। গোঁসাই এখন সন্তুষ্ট। না, যেমনটি চেয়েছিলেন, ঢাল তেমনটিই হয়েছে।

তারপর গোঁসাই রাজপুত্তুরকে বলছেন, জঙ্গলে আরো গভীরে যাও। একটা বাঁশের ঘরে থাকে সাপ আর সাপিনী। ওদের মেয়ে আছে একটি, তাকে ঘরের বাইরে আসতে দেয় না। রাজপুত্তুর যেন ঢালটা রাখে দরজায়, নিজে লুকিয়ে থাকে গাছে। সাপরা যেই বেরোবে, কেটে দু' টুকরো হয়ে যাবে। তখন যেন ও মেয়ের কাছে যায়।

মেয়েই দেখিয়ে দেবে কোথায় আছে সোনার জন্তু আর সাপ। তো রাজপুত্তুর তখনি রওনা দিল। দুপুর নাগাদ সাপের বাড়িও পৌঁছল। গোঁসাইয়ের কথামতো দোরের মুখ ঢাকল ঢাল দিয়ে। সন্ধেবেলা সাপ আর সাপিনী ঘর ছেড়ে বেরোতে যাবে, ব্যস! দু' টুকরো হয়ে কাটাও পড়ল, মরেও গেল।

কিছুক্ষণ বাদে, বাপ-মা'র কি হ'ল দেখতে মেয়ে উঁকি মেরেছে। রাজপুত্তুর দেখল তাকে। সাপ কোথায়, এ যে পরমাসুন্দরী এক কন্যে। তখনি দৌড়ে কাছে গিয়ে রাজপুত্তুর কথা কইতে থাকল। আর কি! খুব অল্পসময়ের মধ্যেই দুটি এ-ওকে ভালবেসে ফেলল। রাজপুত্তুর সান্ত্বনা দিল অনেক। ক্রমে ক্রমে নাগকন্যা বাপ-মা'র শোক ভুলল। বাঁশের বাড়িতে ওরা অনেকদিন থেকে গেল।

নাগকন্যা কড়া নিষেধ জারি করেছিল, রাজপুত্তুর যেন দক্ষিণ, বা পশ্চিম দিকে না যায়। একদিন রাজপুত্তুর নিষেধ না মেনে পশ্চিম দিকে গেছে। কিছুদূর যেতেই দেখে এক দল সোনার চিতাবাঘ, খাসা নাচ নাচছে। দেখতে দেখতে সেও হয়ে গেল সোনার চিতাবাঘ। সেও নাচতে থাকল। নাগকন্যা সবই জেনেছে। রাজপুত্তুরকে সে ফিরিয়ে আনল, আবার মানুষ করেও দিল।

ক'দিন বাদে রাজপুত্তুর গেছে দক্ষিণে। দেখে এক পুকুর পাড়ে সোনার সাপেরা নাচছে। দেখতে দেখতে সে নিজেও এক সোনার সাপ। বেজায় নাচ জুড়েছে। আবার নাগকন্যা তাকে ফিরিয়ে আনল, করে দিল রাজপুত্তুর।
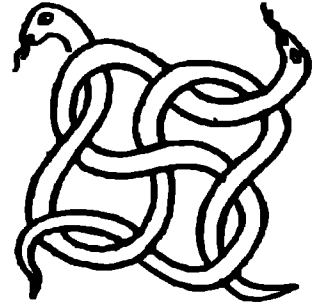
এবার রাজপুত্তুর গেল দক্ষিণ-পশ্চিমে। সেখানে এক মস্ত বটগাছের নিচে সোনার বাঁদরদের নাচ চলছিল। নিজে একটি সোনার বাঁদর হয়ে রাজপুত্তুরও মেতে গেল নাচে। আর নাগকন্যা তাকে ফিরিয়েও আনল।

এবার রাজপুত্তুর বলছে, তার ঘরে ফেরার সময় হয়েছে। নাগকন্যা বলছে, প্রথম কথা হ'ল সে এসেছিল কেন! রাজপুত্তুর তার বাপের স্বপ্নের কথা বলল। সোনার চিতা-সাপ-বাঁদর, সবই তো মিলেছে। এখন তো সে যেতেই পারে।

—'আমার কি হবে? আমাকে মেরে রেখে যাও। আমার মা-বাপকে তো মেরেছ! আমি একলা থাকতে পারব না।'

—'তোমাকে মারব না গো, বাড়ি নিয়ে যাব।'

নাগকন্যা শান্ত হ'ল। রাজপুত্তুর শুধোচ্ছে, সোনার প্রাণি তো দেখেছে মাত্র, নিয়ে যাবে কি উপায়ে?

নাগকন্যা বলছে, রাজপুত্তুর যদি শপথ করে যে তাকে ছাড়বে না, আরেকটা বিয়েও করবে না, সময় হ'লে নাগকন্যা সোনার বাঘটাগ দেখিয়ে দেবে। রাজপুত্তুর শপথও করল, দু'জনে বাড়ি চলল।

তিন নম্বর গোঁসাইয়ের থাকার জায়গায় এসে রাজপুত্তুর বলছে, সে কথা দিয়েছিল, গোঁসাইকে সোনার প্রাণি দেখিয়ে নিয়ে যাবে। এখন তো সে বিশ বাঁও জলের নিচে। সঙ্গে তো সোনার পশু নেই।

নাগকন্যা ওর গায়ের চাদরে তিনটে গিঁট বাঁধল। বলল, গোঁসাই চিতা-সাপ-বাঁদর দেখতে চাইলে রাজপুত্তুর যেন গিঁট খুলে দেয়।

রাজপুত্তুর গোঁসাইয়ের কাছে গেছে। গোঁসাইও জানতে চেয়েছেন।

রাজপুত্তুর বলছে, 'ঠিক জানি না, তবে চাদরে কিছু একটা বেঁধে এনেছি।'

গিঁট খুলতে বেরোল এক ঢেলা মাটি। একটা খোলামকুচি, এক টুকরো কাঠকয়লা। সেগুলো ফেলে দিয়ে ফিরে গিয়ে নাগকন্যাকে বলছে, চাদরের গিঁটে রাবিশ বেঁধে দেবার অর্থ কি!

—'তোমার মধ্যে বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস থাকলে জীবন্ত প্রাণিগুলি মাটি-খোলামকুচি কাঠকয়লা হয়ে যেত না!'

চলতে চলতে ওরা পৌঁছল দ্বিতীয় গোঁসাইয়ের ডেরায়। এবার রাজপুত্তুরের কঠিন সংকল্প, বিশ্বাস তার দৃঢ়ই থাকবে। এবারে গিঁট খুলতে বেরিয়ে এল সোনার চিতা-সাপ-বাঁদর। ওরা চলা থামাল না। প্রথম গোঁসাইকেও দেখাল, তারপর পৌঁছল বড়রাণীর বাড়ি।

নির্ধারিত দিনটি এগিয়ে এল। রাজপুত্তুর বাবাকে জানাল, একটা খোলা ময়দানে যেন অনেক চালাঘর, দোকান থাকে। আর, ওর মায়ের বাড়ি থেকে ময়দান অবধি পথ থাকবে ঢাকা। তাহ'লেই ও দেখাবে অরণ্যের প্রাণিদের নাচ। রাজা সে রকমই হুকুম দিলেন। নির্ধারিত দিনে মানুষ জমল এ চমৎকার ঘটনা দেখবে বলে। রাজপুত্তুর আনল সোনার চিতা-সাপ-বাঁদর। আর সেই ছাউনি দিয়ে ঢাকা পথ থেকে নাগকন্যা নির্দেশ দিয়ে ওদের নাচ করাল। সারাদিনমাস ধরে দেখল মানুষ। সন্ধ্যা হয়ে গেল,

বাড়ি ফেরার মনই নেই কারো।

রাতারাতি যত দোকান আর ছাউনি হয়ে গেলা সোনার। এ দেখে রাজা ছোটরানী আর তাঁর ছেলেদের ছেড়ে চলে গেলেন বড়রানীর কাছে।

রাজপুত্তুর নাগকন্যাকে বিয়ে করল, সিংহাসনে বসল, মনের সুখে ধর্মপথে থেকে রাজত্ব করতে থাকল।

যে রাজকন্যেকে তার বাবা বিয়ে করতে চেয়েছিল

তুলু

এক রাজার এক কন্যে। একদিন, রাজ্যের জমি সেচের জল পাচ্ছে কি না, সে তদারকি সেরে ঘরে ফিরছেন, দেখেন প্রাসাদের ছাতে দাঁড়িয়ে আছে তাঁরই মেয়ে। মেয়ে জামার বোতাম আঁটছে। তার বুকের এক ঝলক দেখলেন, আর তখনি ওকে বিয়ে করার বাসনা জাগল। সিধা গেলেন রানীর কাছে। বললেন, 'যা বুনেছি সে ফসল খাওয়া কি ঠিক হয়?'—'অবশ্যই।' মন্ত্রীদের এক প্রশ্নই করলেন। তাঁরাও বললেন, যে ফসল বপন করেছেন, তা রাজা নিশ্চয় খেতে পারেন। রাজা এক বিয়ের জোগাড় শুরু করলেন। রাজ্যে রাজ্যে গেল নিমন্ত্রণ। নকীবরা ঘোষণা করে এ খবর জানাল রাজ্যের প্রজাদের। প্রতিবেশীদের সপরিবারে নেমন্তন্ন। বিয়ের দিন এসে গেল। দূরের মানুষ, কাছের মানুষ, শহর ভরে গেল মানুষে। বর তো রেশমে অলঙ্কারে সুসজ্জিত। শুধু কেউ জানে না, কে হবে বধূ।

রাজকন্যের মনে সন্দেহ আগেই জেগেছিল। বাবার বাসনার তাপ তিনি টের পেয়েছিলেন। ছুতোরদের বলেছিলেন এক বিশাল বাক্স বানাতে। সেটি নিজের শোবার ঘরের কোণে রেখেছিলেন। বিয়ের দিনে তাতে লুকোলেন রাজকন্যে, ঢাকনা টেনে নামালেন, ভিতর থেকে ছিটকিনি বন্ধও করলেন।

রাজা সেজেগুজে দাসীদের পাঠালেন তাঁর মেয়েকে কনের সাজে সাজাতে। দোতলায় উঠে দাসীরা তো তাঁকে খুঁজে পেল না। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ! রাজকন্যে কোথাও নেই। রাজা বেজায় ভেঙে পড়লেন। বিশাল ভোজসভায় অদ্ভুত এক ভোজ খেলেন অতিথিরা। বিস্ময়ে মাথা নাড়লেন বারবার, যে বিয়ে হ'ল না তারই ভোজ যাকে বলে।

চার পাঁচ দিন বাদে মেয়ের ঘরের দিকে চাওয়াও অসহ হ'ল রানীর কাছে। ঘর দেখলেই হারানো মেয়ের কথা মনে হয়।

—'ও নেই, ওর বাক্স দিয়ে কি হবে?' ব'লে দাসদের বললেন বাক্সটা নদীতে ভাসিয়ে দিতে। নদীর স্রোত সে বাক্সকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল অন্য রাজ্যে।

এখন সে রাজ্যের রাজা আর মন্ত্রী, বালি নিয়ে বসে নদীতীরে খেলছিলেন। বাক্স ভেসে চলেছে দেখে মন্ত্রী জলে নেমে সেটা ধরতে গেলেন। বাক্স দূরে সরে গেল। রাজা যখন নামলেন, বাক্স কাছে চলে এল। রাজা লোকজন ডেকে বাক্সটা রাখালেন তাঁর শোবার ঘরে।

রোজ রাতে রানীমা ছেলের জন্যে এক ঘটি দুধ আর এক ছড়া কলা রেখে যান। শোবার আগে রাজা সেই দুধ আর কলা খান। যেদিন থেকে ঘরে বাক্সটা রেখেছেন, রাজা পান আধঘটি দুধ, আধছড়া কলা। তা দেখে মাকে বলছেন, 'আধঘটি দুধ, আধছড়া কলা দিয়ে যাও কেন গো?'

—'না বাছা! বরাবর যেমন আনি, তেমনি তো আনি? একঘটি দুধ, এক ছড়া কলা!' এক রাতে রাজা শোবার ঘরেই লুকিয়ে আছেন। মা এলেন, দুধ আর কলা রেখে বেরিয়ে গেলেন। তখন এক পরমাসুন্দরী কন্যে বাক্স থেকে বেরিয়ে আধঘটি দুধ, আধছড়া কলা খাচ্ছে। যেমন সে বাক্সে ঢুকতে যাবে, রাজা তার হাত চেপে ধরেছেন।

—'কে গো তুমি? তোমার ব্যাপারটা কি?'

রাজকন্যে সব কথাই বলল। আর সেই থেকে রাজা বেশি সময়টা কাটান শোবার ঘরে। অন্য যত মেয়ে, তাদের দিকে ফিরেও চান না।

কিন্তু লেগে গেল এক যুদ্ধ। রাজাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেই হ'ল। যাবার আগে রাজা রানীমাকে ব'লে যাচ্ছেন, 'মা গো! রোজ রাতে আমার শোবার ঘরে এক ছড়া কলা, এক ঘটি দুধ রেখে যেও। কখনো ভুলে যেও না।'

এদিকে এক দাসী তো দরজা একচুল ফাঁক করে দেখেছে সব। নিত্যি রাতে রাজা ওই বাক্স খোলেন, বেরিয়ে আসে এক সুন্দরী কন্যে। আগে রাজার খুব প্রিয় ছিল একটি রক্ষিতা। দাসী আতিপিতি তার কাছে গিয়েই গোপন কথা ফাঁস করেছে। সে মেয়ে তো হিংসুটি। তখনি সে ঠিক করেছে, রাজকন্যেকে নিকেশ করবে।

রানীমার কাছে গিয়ে, রাজার শোবার ঘরে যে বাক্স আছে, সেটা চাইছে। রানীমা মোটেই রাজী নন। কিন্তু হিংসুটি তাঁকে রাজী করাবার কৌশল জানে। বাক্সটা সে আদায় করল, নিজের বাড়ি নিয়েও গেল। বাক্স খুলেই দেখে রূপসী এক কন্যে। তখনি সে তাঁকে বিকলাঙ্গ করতে শুরু করল। আগে কাটল হাত, নিজের রাঙাআলুর ক্ষেতে পুঁতল। পা দুটো কেটে নিয়ে ফেলল সারের গর্তে। বুক কেটে নিয়ে ঢোকাল ধানের তুষের ডোলে। চোখ খুবলে নিয়ে রাখল আচারের বয়ামে। তারপর ঘরের

পিছনে এক গর্তে ফেলে দিল বাকি দেহটা। না-বাঁচা, না-মরা অবস্থায় হাত-পা-চোখহীন রাজকন্যে পড়ে পড়ে আর্তনাদ করতে থাকলেন।

সেইদিনই, সেই পথ ধরেই যাচ্ছিল এক বুড়ি। সে তো সে গোঙানি শুনেছে। গর্তে নেমে রাজকন্যের দেহটা বয়ে নিয়ে গেছে নিজের বাড়ি।

পরদিন সকালে রাজকন্যে বুড়িকে ডেকে বলছে, 'হিংসুটির বাড়িতে আচারের বয়ামে আমার চোখ আছে, নিয়ে এসো গো!'

বুড়ি তো হিংসুটিকে চেনে জানে। ও গিয়ে একটু আচার চেয়েছে। হিংসুটি বলছে, 'ভাঁড়ার ঘরে যাও, বয়াম থেকে আচার নাও।' বুড়ি সযত্নে রাজকন্যার চোখ দুটি তুলে নিয়ে বাড়ি নিয়ে এল। রাজকন্যের চোখের গর্তে চোখ বসিয়ে দিতেই রাজকন্যে দৃষ্টি ফিরে পেলেন। পরদিন রাজকন্যে বলছে, 'দিদিমা গো দিদিমা! আমার হাত দুটো ওর রাঙাআলুর বাগানে পোঁতা আছে, নিয়ে এসোনা গো!' বুড়ি হিংসুটির কাছে একটা রাঙাআলু চাইতে গেছে। হিংসুটি বলছে, "একটা রাঙাআলু চাই? যাও না বাগানে, একটা খুঁড়ে তুলে নাও গে!' বুড়ি রাঙাআলুর বাগানে মাটিতে হাত চালিয়ে খুঁজে খুঁজে হাত দুটো পেল। ঘরে নিয়ে জুড়ে দিল রাজকন্যের কাঁধে। এখন রাজকন্যে হাতও পেলেন ফিরে। পরদিন রাজকন্যে বলছে, 'দিদিমা গো দিদিমা! পা দুটো যে রইল সারের গর্তে, নিয়ে এসো না?' তো বুড়ি গিয়ে হিংসুটিকে বলছে, 'ক'টা শসার দানা পুঁতেছিলাম। দিব্যি কল বেরিয়েছে। কিছু সার দিতে পারলে গাছের তেজ বাড়বে। তোমার গর্ত থেকে নিই?' —'ওঃ! সারের গাদা আমার গর্তে। যত চাও, নিয়ে যাও।' বুড়ি সারের গর্ত থেকে রাজকন্যের পা দুটো নিয়ে গিয়ে জুড়ে দিল। রাজকন্যের পা হ'ল।

পরদিন রাজকন্যে বলছে, 'দিদিমা গো! হিংসুটির বাড়ি তুষ রাখার ডোলে আমার বুক দুটো আছে। এনে দাও গো! বুড়ি গিয়ে হিংসুটিকে বলছে, 'বাছা! মাটির নতুন হাঁড়ি কলসি কিনলাম ক'টা। চারটি তুষ পেলে ছাই আর তুষ মাখাতাম। বেশ কালো হ'ত হাঁড়ির গা। দেবে চারটি তুষ?' —'আমাদের অঢেল তুষ আছে। যত চাও, নিয়ে যাও না কেন?' বুড়ি তুষ হাঁটকে রাজকন্যের বুক জোড়া পেল, ঘরে এল জুড়েও দিল। এখন রাজকন্যে আগের মতো সর্বাঙ্গ সুন্দরী।

ওদিকে যুদ্ধ শেষ। রাজা ফিরে এলো। এসেই গেলেন শোবার ঘরে। বাক্সও নেই, রাজকন্যেও নেই। মা'কে ডাকলেন রাজা।

—'ঘরের বাক্সটা কি করলে মা?'

রাজা গেলেন হিংসুটির বাড়ি।

—'আমার বাক্স কোথা গেল?'

—'সে তো নদীতে ফেলে দিলাম।'

রাজা বুঝলেন আর ফিরে পাবেন না সেটা। নদীতে তো খরস্রোত। কোথায়

ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেছে, হয়তো বা সমুদ্রেই। ভাঙা বুকে ফিরলেন বাড়ি। দু'হাতের চেটোয় মাথা রেখে বসে রইলেন।

কদিন বাদে রাজকন্যে শুনল যে রাজা যুদ্ধ থেকে ফিরেছেন। বুড়িকে বললেন, একটা বিশাল জলসার আয়োজন হোক। খবর পেয়ে সবাই অবাক। কি করে এক গরিব বুড়ি এমন আয়োজন করে? আবার কৌতূহলও হচ্ছে। রাজারও দেখতে সাধ গেল, কেমন করে বুড়ি এ আয়োজন করে। বুড়ির ছোট কুঁড়েঘরেই বসল সবাই। হঠাৎ, আচমকা রাজকন্যে হাতে তম্বুরা নিয়ে ঢুকলেন। তার বেঁধে নিয়ে গান গেয়ে উঠলেন। গানের মধ্যে দিয়েই তাঁর কাহিনী বলে গেলেন। রাজা তো বুঝেছেন, এ তো তাঁরই রাজকন্যে! অমনি উঠে গিয়ে তার হাত ধরেছেন। রাজা আর রাজকন্যের ধুমধামে বিয়ে হ'ল। আর হিংসুটিকে নগরের বাইরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দেওয়া হ'ল।

মা-ছেলের বিয়ে

মারাঠী

সতোয়াই দেবীকে সবাই জানে। জন্মের পাঁচদিনের দিন, প্রতি শিশুর কপালে ভাগ্য লিখে দেওয়া তাঁরই কাজ। তিনি যা লেখেন, তা হতেই হয়।

সতোয়াই দেবীর একটি মেয়ে। মা যান কোন না কোন শিশুর ললাটলিপি লিখতে, মেয়ে একলা রাত কাটায়।

একদিন মেয়ে বলছে, 'রোজ রাতে আমাকে একলাটি ফেলে রেখে কেন যাও মা?'

—'বাছা! ঈশ্বর যে কাজের ভার দিয়েছেন, তাই করতে হবে তো! তাই যেতে হয়। নতুন শিশুদের ভাগ্যলিপি লিখতে হয়।'

—'কি লেখো, কেউ পড়তে পারে?'

—'না, দেবতারাও জানেন না আমি কি লিখি।'

—'যখন জন্মালাম, আমার ভাগ্যলিপি লিখেছ?'

—'অবশ্যই।'

—'বলো না মা, কি লিখেছ?'

কিছুতে মুখ খুললেন না সতোয়াই। রোজকার মতোই বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু মেয়ে নাছোড়বান্দা। রাতদিন মা'র পেছনে লেগে থাকে, হাড়মাস ভাজাভাজা করে। সেষে শাসাল, কি লিখেছে তার কপালে, তা যদি মা না বলে, তবে মেয়ে বাড়ি ছেড়ে

চলে যাবে। অবশেষে সতোয়াই বললেন, 'বাছা! নিজের ছেলেকে বিয়ে করবে, এই তোমার ভাগ্যলিপি!'

এ কথা জেনে বজ্রাহত মেয়ে বলল, 'নিজের মেয়ের ললাটলিখন তুমি বদলাতে পারো না?'

—'না। বলেছি তো যা লিখি, তা ফিরে লেখা যায় না। যেমনটি বললাম, তেমনটি হতেই হবে।'

ক্রোধে উন্মত্ত মেয়ে হাহাকার করল, 'নিজের পেটের মেয়েকে এই করলে?'

তখনি সে ঠিক করল, ভাগ্যকে সে পরাজিত করবে। প্রতিজ্ঞা করল, কখনো বিয়ে করবে না, মুখ দেখবে না কোন পুরুষের। চলে গেল গহন বনে। একটি কুটীর বানিয়ে একলা থেকে গেল সেখানে। ক্রমে এল যৌবন।

একদিন এক রাজা মৃগয়ায় বেরিয়ে ওই বন দিয়ে চলেছেন। পৌঁছলেন এক হ্রদে। অপরূপ সে হ্রদের জল যেমন স্বচ্ছ, তেমন মিষ্টি। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ, —তিনি দু'হাতের আঁজলায় সে জল খেলেন। খানিক জলে কুলকুচো করে এঁটো জল ফেললেন হ্রদে, ঘোড়া ছুটিয়ে চলেও গেলেন।

একটু পরেই সেখানে এসেছে দেবীকন্যা। সারা সকাল গেছে ফলমূল আহরণে, বড় ব্যস্ত সে, বড় পিপাসিত। হ্রদের জল আঁজলা আঁজলা পান করল ও। রাজা যে জলটা কুলকুচো করে ফেলেছিলেন, ঠিক সে জলটাই খেল ও। সে জল যেমন ওর পেটে পৌঁছল, ওর গর্ভসঞ্চার হ'ল। কিছু ঘটে গেছে বলে প্রথমে ও বোঝেনি। তবে শীঘ্রই তো বুঝল যে পেটে শিশু বড় হচ্ছে। বড় ভয় পেল ও। ভেবে পায় না কি করবে। ক'মাস বাদে তার এক চমৎকার ছেলে জন্মাল। ভাগ্যলিপি তো ও জানে। তাই ছেলেকে মেরে ফেলবে বলে স্থির করল। নিজের শাড়ির খানিক ছিঁড়ে, তা দিয়ে ছেলে জড়িয়ে পাহাড় চূড়া থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল নিচে।

পাহার চূড়ার নিচেই থাকে মালী আর মালী বউ। ঘন ঘন সারে কলাগাছ লাগিয়ে চমৎকার বাগান করেছে ওরা। ছেলে জড়ানো পোঁটলা পড়বি তো পড়, পড়ল পুরু, তেজালো কলাপাতার ঝাড়ে। পড়ল তো পড়েই আছে, তো মালীর চোখ পড়ল সেদিকে। সন্তর্পণে নামিয়ে নিয়ে ও বউকে দিল সেটা। ওদের ছেলেমেয়ে ছিল না। বড় খুশি হ'ল ওরা, এ যেন দেবতাদের উপহার। ওদের আদরে যত্নে শিশু দিনে দিনে বাড়তে লাগল। বড় হয়ে ভারি সুদর্শন এক যুবক হ'ল সে।

দেবীকন্যা অনেক বছর কাটাল জঙ্গলে। শেষে এ নিঃসঙ্গ জীবন হ'ল অসহ্য। মনে হ'ল এখন সে ফিরতেই পারে মানুষের দুনিয়ায়। ভাগ্যলিপি তো ফলল না। ছেলেকে ও মেরেই ফেলেছে। বনের সীমানা পেরিয়ে গেল ও, পাহাড় চূড়া পাক দিয়ে নেমে চলল। পৌঁছল উপত্যকায়, শেষ অবধি সেই মালী বুড়ো বুড়ির ঘরে। ওরা খুব অতিথি বৎসল। যখন জানল ওর যাবার জায়গা নেই কোথাও, ওদের কাছেই

থাকতে বলল। ও থাকে, বাড়ির কাজও করে। এরা ওকে পছন্দই করে। দেখতে ফুটফুটে, পরিশ্রমও করে খুব।

ক'মাস বাদে বুড়ো বুড়ি ভাবল, ঈশ্বর ওদের দিয়েছেন ছেলে। তিনি নিশ্চয় এখন এ মেয়েকে ছেলের বউ হবার জন্যে পাঠিয়েছেন। ছেলের সঙ্গে এর বিয়ে দিল ওরা। এখন তো বউই গিন্নি। বাড়ির কাজে গোটা বাড়ির সবকিছুই ওকে দেখতে হয়।

একদিন ঘরের মাচানে ও পুরনো বাসন ঘাঁটছে, হঠাৎ দেখল শাড়ির ছেঁড়া টুকরো। এ যে ওরই কাপড়, তা বুঝতে দেরি হল না। তবু নিশ্চিত হবার জন্যে মাচান থেকে নামল তাড়াতাড়ি, শাশুড়িকে শুধোল কাপড়ের টুকরোটার কথা। শাশুড়ি স—ব বলল ওকে। ওর স্বামী যখন ছোট্ট শিশু, ওই কাপড়ে জড়ানো অবস্থাতেই তাকে পেয়েছিল কলাগাছের মাথায়। দেবীকন্যা তখনি জানল, সতোয়াই যা লিখেছিলেন, সে কপালের লেখা ফ'লে গেছে। সে যা জানে, তা কাউকে বলল না। স্বামীর সঙ্গে সুখেই থাকল। বুড়ো শ্বশুর আর শাশুড়ির আশীর্বাদ তো ছিলই। ও নিজেও ওঁদের যত্ন করত, কর্তব্য করতে ভুলত না।

দাওয়াই

বাংলা

এক রাজা জোয়ান বয়সেই আটকুঁড়ো হয়ে গেলেন। বড় দুঃখ, বড় বিস্বাদ হ'ল জীবন, কেন না ছেলেও হবে না, সিংহাসনের উত্তরাধিকারীও থাকবে না। তাঁর হারেমে তো কত রূপসী মেয়ে। দেখেন আর দুঃখ বেড়ে চলে। কোন চিকিৎসক, কোন প্রথার চিকিৎসা কাজে দিল না। আয়ুর্বেদীয়, বা হাকিমী, বা বিদেশী, সবই হ'ল ব্যর্থ। তাঁর রাজ্যে সবচেয়ে গরিব মানুষটিও সমর্থ পুরুষ। তিনি সে সুখে বঞ্চিত।

একদিন শুনলেন, রাজ্যে সবে এসেছেন এক দরবেশ। যত রকম অসুখের কথা জানা আছে, এমন কি যে রোগ সারবার নয় সে রোগেরও দাওয়াই জানেন তিনি। আশা নিরাশায় দোলা খেতে খেতে গোপনে রাজা গেলেন দরবেশের কাছে। রাজার রোগ কি, তা জেনে নিয়ে দরবেশ বের করলেন এক ছোট্ট শিশি। তাতে যে দাওয়াই, তা সব রোগ সারায়। টলটলে দাওয়াই থেকে যেন আলো ঠিকরোচ্ছে। দরবেশ নিজে তিনভাগ দাওয়াই খেয়ে নিলেন। বাকিটা রাজাকে দিয়ে বললেন, রোজ সকালে মাত্র এক ফোঁটা খেতে হবে তিনদিন। দেখতে হবে দাওয়াই কাজ দিচ্ছে কি না। রাজা

বড়ই কৃতজ্ঞ। দাওয়াই নিয়ে বাড়ি গেলেন। প্রথম ফোঁটা খেয়েই মনে হ'ল ভাল লাগছে। দ্বিতীয় ফোঁটা খেতে রাজা সাধারণ মানুষের মতো হলেন। হারানো পৌরুষ ফিরে পেলেন। তৃতীয় ফোঁটা খাবার পর শরীরে জেগে উঠল ঘুমন্ত আবেগ। সম্ভোগের ইচ্ছা জ্বলে উঠল। এখন তিনি পুরুষ সিংহ। আনন্দে রাজা দিশাহারা। পৌরুষ ফিরে পেতে মনে ফিরল শান্তি। এখন অন্যান্য বিষয়, অন্য মানুষ এ সব নিয়ে ভাববার সময় পেলেন। দরবেশ, আর তাঁর অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার কথাই ভাবলেন। এক চুমুকে তিনি তিনভাগ দাওয়াই খেলেন তো! তিনদিনে তিন ফোঁটা খেয়েই রাজা তো কামনায় উন্মাদ বললে হয়। এর রহস্য জানার জন্যে মন ভারি ব্যস্ত হ'ল। দরবেশের কাছে গেলেন তিনি। সসম্ভ্রম অভিবাদনের পর বললেন, 'হে প্রভূ! আমার পৌরুষ ফিরিয়ে দিয়েছেন, এ জন্য ধন্যবাদ জানাব কি করে, তা জানি না। আপনার দাওয়াই জাদু জানে। শুধু ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাতে আসি নি। মনে একটা সন্দেহ জেগেছে, সে বিষয়ে জানতে এসেছি। আমি জানি দাওয়াই কি কাজে দিয়েছে আমার। অবাক আমি এই ভেবে, যে আপনি এক সাধু পুরুষ, ব্রহ্মচারী, —অতটা দাওয়াই খেয়েও স্থির ও শান্ত থাকছেন কি করে? এর গোপন রহস্য কি?' কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে দরবেশ গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন। —'মহারাজ! কাল অবধি যদি বাঁচেন, কাল এ কথার জবাব দেব। এ মুহূর্তে আমার কর্তব্য, আপনার প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করা। আপনার মরণ কাল ঘনিয়েছে। আমি লোকের মুখ দেখে সব বলে দিতে পারি। আমি জানি আপনি কে, কতদিন বাঁচবেন। আপনার নিয়তি, কাল সূর্যোদয়ের আগেই মৃত্যু। চেষ্টা করি, দেখি আপনাকে বাঁচাতে পারি কি না!'

এই বলে তিনি আরেক শিশি অত্যাশ্চর্য দাওয়াই বের করলেন। রাজার গলায় সেটা ঢেলে দিলেন নিঃশেষে। রাজা পুতুলের মত সেটা খেলেন। এখন মৃত্যুভয় চেপে বসল মনে, থরথর কাঁপতে থাকলেন তিনি। নিশ্বাসের জন্যে খাবি খেতে খেতে আরো প্রশ্ন করতে গেলেন, পারলেন না।

দরবেশ রাজাকে ফিরে যেতে বললেন, নিজে কুটীরে ঢুকে গেলেন।

তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে পালকি আছে, কিন্তু সে পর্যন্ত হেঁটে যেতে কি কষ্ট! পা যেন চলতেই চায় না। বাড়ি পৌঁছে হারেমে গেলেন। সুন্দরী মেয়েরা হেসে হেসে এগিয়ে আসছে তাঁকে আলিঙ্গন করতে। হাত নেড়ে তাদের চলে যেতে বললেন। ওদের রূপলাবণ্য যেন তাঁর হৃদয়ের ব্যথাকে দুঃসহ করে তুলল। মনে একটি চিন্তা, আসন্ন মৃত্যুর ভাবনা। কোন কথা না ব'লে গেলেন শোবার ঘরে। হুকুম দিলেন, তিনি না ডাকলে কেউ যেন ঘরে না ঢোকে। দোর বন্ধ করে ঘুমোতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সারা রাত বিছানায় অস্থির এ পাশ ও পাশ করলেন। রেশম ও সাটিনের বিছানা যেন কণ্টক শয্যা! মৃত্যুচিন্তা অন্তর কুরে কুরে খাচ্ছে। রাতকে করছে আতঙ্ক পূর্ণ।

প্রাসাদ মিনারের ঘড়ি প্রহরে প্রহরে বাজছে, যেন নিজের মৃত্যুর ঘণ্টা শুনছেন। সকাল নাগাদ তিনি বিধ্বস্ত, পরাজিত, আচ্ছন্ন। জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে রোদ এসে মুখে পড়তে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। সূর্য উঠেছে! তা দেখার জন্যে তিনি বেঁচেও আছেন! যেন নতুন জীবন ফিরে পেলেন। দৌড়লেন দরবেশের কাছে। নিশ্চয় তিনিই রাজার জীবনরক্ষা করেছেন।

কুটীরের বাইরে বসে তামাক খাচ্ছিলেন দরবেশ। রাজাকে দেখে সহাস্যে বললেন, 'মহারাজ! গত রাতটা বেগমদের সঙ্গে কাটল কেমন?' —'বেগমদের সঙ্গে কাটল?' —'রাজাকে যেন চাবুক মারল প্রশ্নটা। —'আজ সকালে না আমার মৃত্যু হবার কথা?' দরবেশ শান্ত গাম্ভীর্যে বললেন, 'মহারাজ! আমি জানতাম, আপনি অত তাড়াতাড়ি মরবেন না। তবে ভয় দেখিয়েছিলাম, আপনাকে হাতে কলমে শিক্ষা দেব ব'লে। প্রায় সবটা জাদু দাওয়াই খাবার পরেও কেন বিচলিত হইনি। এ প্রশ্নের জবাব দিতে চেয়েছিলাম। কয়েক ফোঁটা খেয়ে আপনি তো পাগলা হয়ে গিয়েছিলেন! 'এখন বুঝলেন, যে মনে যখন আসন্ন মৃত্যুর ভয়, —তখন স—ব পার্থিব বাসনা কামনার মুখের ওপর মন তার দরজা বন্ধ করে দেয়। একই দাওয়াই একটি পুরো শিশি খাওয়ালাম আপনাকে, যাতে কামনা আরো জাগে। কিন্তু মৃত্যু ভয় আপনার মনকে দখল করে। ফলে এ দাওয়াই আপনার মনে রেখাপাত করতে পারল না। মৃত্যুর প্রেতছায়া আপনি একটি রাত দেখেছেন। কিন্তু আমি প্রতি মুহূর্তে যে ছায়াকে নাচতে দেখি চোখের সামনে। কেমন করে মনে অন্য চিন্তা আসবে বলুন? আমার জীবনের লক্ষ্য, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া। তাই মৃত্যুকে নিয়ত ডাকি, অন্তরে লালন করি তার চিন্তা। এখন বাড়ি যান। দীর্ঘজীবী হোন আপনি, তবে এ শিক্ষা ভুলবেন না যেন।' এ কথা বলে দরবেশ কুর্নিশ করলেন, মিলিয়ে গেলেন!

উর্দুতে এক গাঁজাখুরি গল্প

উর্দু
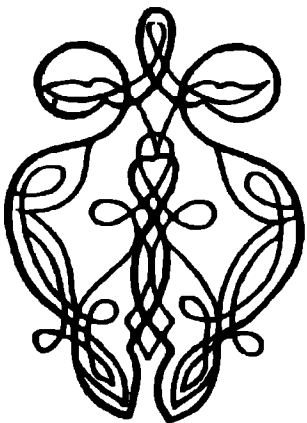
একটা কাঁটার সূচলো ডগায় ছিল তিনটে পুকুর। তার দুটো শুকনো, আর একটায় মোটে জল নেই। যেটাতে জল নেই, সেটাতে তিন কুমোর আস্তানা গাড়ল। তিন কুমোরের দুজনের হাত নেই, আর তৃতীয় জন হস্তহীন। তৃতীয়জন বানাল তিনটে হাঁড়ি। তার দুটো ডাঙা আর একটার তলার দিকটা মোটে নেই। এই হাঁড়িটাতেই ওরা তিন দানা চাল রাঁধল। দুটো থেকে গেল

কাঁচা, আর শেষেরটা রান্নাই হয়নি। যে চালটা রান্নাই হয়নি, তা খেতে নেমন্তন্ন করল ওরা তিন অতিথিকে। এদের দু'জন সদাই রেগে টং, আর তৃতীয়জনকে তো শান্ত করা অসম্ভব। তিন নম্বর অতিথিকে তিন ঘা জুতো পেটা করা হ'ল। দু'বারই জুতো ফসকে গেল, তিনবারের বার ওর গায়েই লাগল না। জুতো খাবার ভয়ে দৌড় মারল নিমন্ত্রিত। নিমন্ত্রণকর্তা তাকে তাড়া করল।

সে তাড়া করছে তো এক বুনো হাতি তার ওপরেই চড়াও হয়েছে। সে ঘুষি বাগিয়ে বুনো হাতিটার দুটো পাঁজরা আর হাতিটার আধখানা ভেঙে ফেলল। মার খেয়ে আধখানা হাতি দৌড়ল, নিমন্ত্রণকর্তা তাকে তেড়ে চলল। হাতিটা উঠে পড়ল গাছে, আর ডাল থেকে ডালে, পাতা থেকে পাতায় দৌড়তে থাকল। শেষমেশ হাতিটা গাছ্ থেকে লাফ মেরেছে। দেখে একটা নল লাগানো বাটি। বাটির মুখ দিয়ে ঢুকে হাতি নল দিয়ে বেরিয়ে এল। দেহটা বেরোল, লেজটা আর বেরোয় না। নিমন্ত্রণ কর্তা ভাবল অসহায় একটা জন্তুকে নাই মারলাম। সে চলল নিজের পথে।

তারপর দেখে, একটা ছোট্ট মেয়ে একটা খড়ের ডগায় মরা হাতিটাকে তুলেছে। মাকে বলছে, সেটা ফেলবে কোথায়। বলছে, 'এ তো একটা নেংটি ইঁদুর গো!'

লোকটা ভাবছে, 'বাপ রে! এমন ক্ষমতাধর মেয়ের বাপ না জানি কত শক্তি ধরে!' শুধোয় মেয়ের বাবা কোথায়!

মেয়ে বলে, 'সত্তর হাজার দৌলত বোঝাই ষাঁড়ে টানা গাড়ি। বাবা জঙ্গলে সত্তর হাজার ষাঁড় চরাচ্ছে। সবগুলো গাড়ি একটা দড়িতে বাঁধা, দড়িটা বাবার কোমরে বাঁধা।'

জঙ্গলে গিয়ে লোকটা মেয়েটার বাপকে দেখেছে। দৌলত বোঝাই সত্তর হাজার ষাঁড়ের দড়ি ওর কোমরে বাঁধা। লোকটা গিয়ে বলে, তোমার সঙ্গে লড়তে চাই।'

মেয়ের বাপ বলল, 'লড়তে চাও তো লড়বে' কিন্তু এখানে তো আমরা দু'জনে শুধু। কে যে জিতল, সে বিষয়ে আমরা একমত হব না কখনো। একটা তৃতীয় ব্যক্তি দরকার, যে হার-জিত ফয়সলা করবে।'

আর তখনি দেখে একটা বুড়ি যাচ্ছে হেঁটে। পিঠ তার ধনুকের মতো বাঁকা, এক হাতে খাবারের পোঁটলা, আরেক হাতে কলসি। এরা তাকেই বলল হার-জিত ফয়সালা করতে। বুড়ি বলে, 'বাছারা! আমার মতো বুড়িকে দিয়ে কি এ কাজ সম্ভব? তবে কাছেই আমার এক ছেলে থাকে। সে তো কোমরে সত্তর হাজার উট বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। সে হ'লেই ভালো হয়।

এরা দু'জন রাজী। বুড়ি খাবারের পোঁটলা কলসির মুখে চাপাল, সেটা রাখল মাথায়। এদের দুজনকে বসাল নিজের দুই হাতে। সত্তর হাজার ষাঁড়ের দড়ি কোমরে বেঁধে একজন বসল বুড়ির এক হাতের চেটোয়, অন্যজন বসল আরেক হাতে। বুড়ি যখন ক্ষেপে যায়, ছেলেকে শাসায়, তোকে কাজীর দারোগা ডেকে ধরিয়ে দেব।

ছেলে দেখে দূর থেকে মা আসছে। দু'হাতের চেটোয় দুটো লোক। ভেবেছে এরা কাজীর লোকই হবে। ভয়ের চোটে নিজের চাদর বিছিয়ে তাতে নিজের সত্তর হাজার উট পোঁটলা করে বেঁধে তুলে নিয়ে দৌড় দিল। কয়েকটা উটের মাথা পোঁটলা থেকে বেরিয়ে আছে। একটার জিভ ঝুলছে একটা চিল ভেবেছে ওটা মাছ। সোঁ করে নেমে এসে পোঁটলাটা ছোঁ দিয়ে ধরে সে আকাশে উঠল। পোঁটলা যেন বড়ই ভারি। চিল ওটা ফেলেই দিল।

এক রানী তখন প্রাসাদের ছাতে হাঁটছিল, আর মুখ তুলে আকাশ দেখছিল। পোঁটলা পড়ল তাঁর চোখে। চোখ ব্যথা করছে। তাই ধাইকে ডাকলেন। ধাই রানীর চোখ পরীক্ষা করে দেখে তাজ্জব! চোখের মধ্যে সত্তর হাজার উট চরে বেড়াচ্ছে। ধাই একটা একটা করে উট বেছে বের করছে, কোনটা রাখে পকেটে. কোনটা রাখে আঁচলে।

রানীর চোখে আর অসোয়াস্তি নেই। ধাই মহানন্দে উট নিয়ে বাড়ি এল। গুনে গেঁথে দেখে, ও মা! উনসত্তর হাজার, নয়শো নিরানব্বইটা উট? একটা কি রানীর চোখে রয়ে গেল?

ছোট্, ছোট্, ছোট্ প্রাসাদে। কিন্তু রানীর চোখে তো উট নেই। ছোলা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে এসেছিল, অনেক খুঁজল। উট কিন্তু মিলল না।

ক'দিন বাদে ও ছোলার ছাতুর ছোট ছোট ফুলকি পিঠে বানিয়েছে। প্রথমটি যেই ছিঁড়েছে, দেখে তার মধ্যে সেই উট! তবে তার ঘাড় বা মাথা নেই।

—'এতদিন ছিলে কোথায়?'

—'আমি তো এখানেই। তবে আমার ঘাড় আর মাথা আছে আগ্রায়। সময় হলেই ওরা তোমার কাছে এসে যাবে।'

এখন, আগ্রার রাজা এক চমৎকার বাগান করেছেন। কিছুদিন ধরে কোন জন্তু তার গাছপালা খেয়ে নিচ্ছে। তল্লাসী করার হুকুম হয়েছে, লাভ হয়নি কোন। শেষে রাজাদেশে উজীর গেছেন পাহারা দিতে। উজীর পাহারায় জেগে। কড়ে আঙুল একটু কেটে গেছে। সেখানে নুন-মরিচ দিয়ে রেখেছেন, যাতে জ্বলুনির চোটে ঘুম না হয়।

মাঝরাতে দেখেন, একটা উটের কেবল ঘাড় আর মাথা ঢুকে গাছপালা খাচ্ছে। উজীর সে ঘাড়-আর-মাথাকে পাকড়ে ধরে শুধোন, সে কে!

উটের ঘাড় আর মাথা বলে, 'আমি কে, তাতে কি হবে? এই বীজটা ধরো, যেমনটি বলি। তেমনটি করো। এটা রাজার কাছে নিয়ে যাও, ঘড়িতে ভোরের ঘন্টা, মানে প্রথম ঘন্টা বাজার আগেই ওঁর সামনে পুঁতে ফেলো। দ্বিতীয় ঘন্টা বাজলে অঙ্কুর বেরোবে, তৃতীয় ঘন্টা বাজলে গাছ বড় হবে, চতুর্থ ঘন্টা বাজলে ফুল ধরবে গাছে, পঞ্চম ঘন্টা বাজলে ফুল থেকে ফল ধরবে, ষষ্ঠ ঘন্টা বাজলে ফল পাকবে,

সপ্তম ঘণ্টা বাজলে রাজা ওটি খাবেন।'

উটের মাথা যেমনটি বলল, উজীর তেমনটি করলেন। সপ্তম ঘণ্টা বাজাল ঘড়ি, আর রাজার সামনে পাকা টুসটুসে একটি তরমুজ রাখা হল।

সেই সময়েই কিছু জ্যোতিষি ঢুকে পড়লেন। বললেন, এক প্রলয় ঝড় ও বৃষ্টি আসছে। রাজা যদি তাঁর পরিবার, প্রজা, সবাইকে নিয়ে এক নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় না নেন, সবাই মরবেন।

সবাই বিপদের আশঙ্কায় হতবুদ্ধি।

আর তরমুজটি দেখে জ্যোতিষীরা সমস্বরে চেঁচালেন, —'এ-ই তো।'

তখনি তরমুজ দু'খণ্ড করে ভেতরের শাঁস কুরে ফেলা হ'ল। রাজা প্রজা টাকাকড়ি গম চাল-গরু ঘোড়া উট সব ঢুকে গেল তরমুজের খোলে। তরমুজটা জোড়া লেগে গেল।

আর নামল মুষলধারে বৃষ্টি। বহুদিন চলল বর্ষণ, দেশ গেল ভেসে, তরমুজটাও ভেসে গেল।

ঝড়বৃষ্টি থেমেছে, তো এক বিশাল মাছ দেখেছে তরমুজটা। যেমন দেখেছে, তেমন গিলেছে। সে তরমুজ এতই বড়, যে মাছের গলায় আটকে গেছে। মাছ লাফিয়ে ডাঙায় পড়ে খাবি খাচ্ছে।
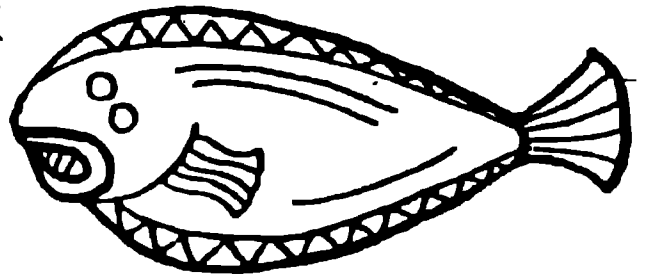
এক সারস অনেকদিন উপোসী, সে ওই মাছটা গিলেছে। মাছ তো গলা দিয়ে নামে না। সেও হাঁপিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে হাপসাচ্ছে। তখন এক বেড়াল গিলল সারসটা। গিলেই সে নট্‌ লড়ন চড়ন, নট্‌ কিছু। বেড়ালটাকে খেল এক কুকুর। তার অবস্থাও একই হ'ল। এক কঞ্জর, বা যাযাবর বেদের বউ স্বামীকে সর্বদা খোঁচায়, কিছু খাবার আনতে। লোকটা বলে, 'ভ্যানভ্যান কোরনা তো! একদিন এত খাবার আনব, যে চারদিন ধরে খাবি।' কঞ্জর শিকারে বেরিয়ে আধমরা কুকুরটা দেখে সেটা মেরেছে। মহানন্দে সেটা নিয়ে গেছে বাড়ি। বেদেনী সেটাকে কেটেই চেঁচাচ্ছে, 'দেখ গো! কুকুরের পেটে একটা বেড়াল!'

—'বলিনি তোকে, যে চারদিনের খাবার আনব? বেড়ালটা কালকের জন্যে রেখে দে!'

পরদিন বেড়াল কাটতে বেরোল সারস। বেদে বলল, —'সারসটা কালকের জন্যে থাক।'

পরদিন সারস কাটতে বেরোল মাছ। তারপর দিন মাছ কাটতে বেরোল তরমুজ। পরদিন তরমুজ কাটতে পিলপিল করে বেরোলেন রাজা, তাঁর প্রজারা। জিনিসপত্র, গরু, ভেড়া, উট, সে কি কাণ্ড!

রাজা বেদেকে খানিক জমি দিলেন, সে জমির খাজনা লাগবে না। আর দিলেন রাশি রাশি টাকা, আর নিজে?

সবাইকে নিয়ে রাজ্যে ফিরে গেলেন।

সবচেয়ে

আংগামী নাগা (অসম)
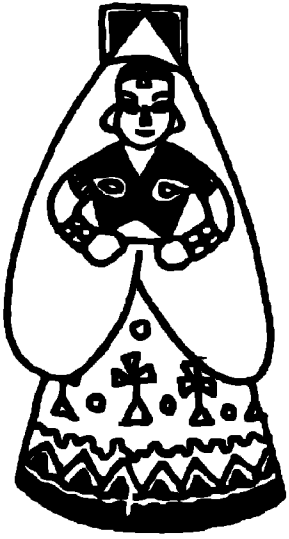
একদিন একজন তার ক্ষেতে যাওয়ার পথে ধরল একটা ইঁদুর। বাড়ি এসে একটা বাক্সে রেখেছে সেটাকে। পরে যখন বের করেছে, কি আশ্চর্য! ইঁদুর কোথায়? এ তো রূপের ডালি এক মেয়ে! দেখেই ও ভাবল, 'মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যারা, তাদের কারো সঙ্গে এর বিয়ে দিলে খুব লাভ হবে আমার।' ও বেরিয়ে পড়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের খোঁজে। পৌঁছেছে ওদের গোষ্ঠীর সর্দারের বাড়ি। তাকে বলল, 'তুমি তো পৃথিবীর সেরা মানুষ। আমার ইচ্ছে, তুমি আমার পুষ্যি মেয়েকে বিয়ে করো।' সর্দার বলল, 'বিয়ে করতে পারলে তো ভালই হ'ত, কিন্তু তুমি বলছ সবার সেরা যে, তাকেই ওর বিয়ে করা ঠিক হবে। তা দেখ, জল আমার চেয়ে অনেক ক্ষমতা ধরে। বানভাসি নদীতে যদি নাইতে নামি, আমি তো ভেসে যাই।' লোকটি গেল জলের কাছে। সর্দারকে যা যা বলেছে, তার সবই বলল। জল বলল, 'আমি সবার সেরাও নই, সবচেয় বেশি শক্তিও ধরি না। যখন স্থির ও শান্ত থাকি। বাতাস এসে আমার বুকে ঢেউ তোলে। সে আমার চেয়ে বড়।'

লোকটি গেল বাতাসের কাছে। বাতাস বলল, 'পাহাড় তো আমার চেয়ে অনেক শক্তিধর। যত জোরেই বই না কেন, পাহাড়কে এক চুল নড়াতে পারি না।' লোকটি গেল পাহাড়ের কাছে। পাহাড় বলল, 'আমি অধিকাংশ জিনিসের চেয়েই শক্তিধর। বাতাসও আমাকে টলাতে পারে না। কিন্তু ইঁদুর! ইঁদুর যখন ইচ্ছে, আমাকে ফুটো করে ঢুকে যায়। ইঁদুরের কাছে আমি কিচ্ছু নই। আর কোথায় যেতে পারত সে? অবশেষে সে বাড়ি ফিরল। ফিরে, কি দেখল? দেখল, মেয়েটা আবার ইঁদুর হয়ে গেছে।

ইঁদুরটাকে ও ছেড়ে দিল।

রবিবারের গল্প

মারাঠী

আটপাট নগরে থাকে এক বুড়ো বামুন। রোজ যায় জঙ্গলে কাঠকুটো আর ঘাস আনতে। একদিন সে দেখল এক আশ্চর্য দৃশ্য! বনদেবীরা সূর্যকে পূজা করছে, অদ্ভুত সব আচার নিয়ম সে পূজায়।

বামুন সসম্ভ্রমে বলছে, 'আপনারা কি করছেন?'

--'সূর্য দেবতাকে পূজা করার রীতি এ সব।'

... 'কেমন করে করতে হয়, বলুন আমাকে।'

--'এ সব ধর্মাচার খুব শক্তিশালী। তোমাকে শেখালে তুমি হয়তো অহংকারী হয়ে যাবে। ঠিক নিয়মমতো পূজা করতে পারবে না।'

---'না, আমি বিনয়ে নম্র ও দীন থাকব। যেমনটি শেখাবেন, ঠিক তাই করব।'

তখন ওরা বলল সব। শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবারে চন্দনবাটা দিয়ে সূর্যদেবের মূর্তি গড়তে হবে। নিবেদন করতে হবে ফুল ও ফলের অর্ঘ্য। ছয়মাস এটি করে চলতে হবে। বাকি ছয় মাস গরিবকে ভিক্ষা দিতে হবে।'

বামুন বাড়ি গেল। শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবারের জন্যে অপেক্ষা করল। তারপর যা যা বলা হয়েছে, ঠিক সেইমতো সব করল।

সূর্যদেব তার পূজায় ও অর্ঘ্যে প্রসন্ন হলেন। বহু ধনদৌলত ঝরে পড়ল তার কোলে। এখন সে এক বিখ্যাত মানুষ।

একদিন রানী ডেকে পাঠালেন তাকে। রাজসভায় পৌঁছে সে ভয়ে কম্পমান! রানী খুব আপ্যায়ন করলেন। সদয় কণ্ঠে বললেন, 'ভয়ের কিচ্ছু নেই। আমরা আপনাকে ডেকেছি প্রার্থনা জানাতে। আমাদের পরিবারে আপনার মেয়ে দুটির বিয়ে দিন।'

ইতস্তত করে বামুন বলছে, 'আমার মেয়েরা গরিব ঘরের। রাজবাড়িতে ওরা দাসীর ব্যবহার পাবে।'

-- 'না না। রাজকীয় অভ্যর্থনাই পাবে। একজনের স্বামী হবে এক রাজা। অন্যটির স্বামী হবে মন্ত্রী।'

সানন্দে সম্মত বামুন। সে বিয়ে হ'ল। বামুনের মেয়েরা গেল স্বামীর ঘরে। বারো বছর ওদের সঙ্গে বামুনের দেখা নেই। নিজের কর্তব্য, প্রথা মেনে সূর্য পূজা। এতেই সে ব্যস্ত।

অবশেষে গেল রাজার রানী বড় মেয়ের কাছে। মেয়ে বাপকে বসাল রত্নখচিত আসনে, সুগন্ধি জলে ধোয়াল তার হাত পা, নিয়ে এল পায়সান্ন।

বামুন বলল, 'এখানে কিছু খাবার আগে তোমাকে সূর্য কথা বলতে চাই।'

—'বাবা! তোমার কথা শুনি এমন সময় তো নেই। রাজা শিকারে বেরোবেন, এখনি তাঁর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।'

কথা তো সে শুনল না। বামুনের কাছে মেয়ের আচরণ খুব অপমানজনক মনে হ'ল। ক্রুদ্ধ হয়ে সে বেরিয়ে এল।

এবার বামুন গেল মেজ মেয়ে, মন্ত্রীর বউয়ের বাড়ি। সেও বাবাকে আদরে সম্মানে ঘরে নিয়ে গেল। কারুকাজ খচিত কাঠের আসনে বসাল। সুগন্ধি জলে হাত পা ধুইয়ে নিয়ে এল পায়সান্ন। বামুন বলল, ' বাছা! কিছু খাবার আগে আমি আমার সূর্য কথা বলতে চাই।'

—'হ্যাঁ বাবা! বলো সূর্য কথা। সানন্দে শুনব আমি!'

মেয়ে শোবার ঘর থেকে ছয়টি মুক্তো আনল। বাবাকে দিল তিনটে, নিজে রাখল তিনটে। বামুন কাউকে যা বলেনি। সেই সূর্য কথা বলল মেয়েকে। বনে বনদেবীদের দেখতে পেল, তারা সূর্যদেবকে পূজো করার নিয়ম শেখাল। সে শিখল পূজো করতে, —সব কথা! মেয়ে ভক্তি ভরে সবই শুনল। তারপর মেয়ের বাড়িতে খেয়েদেয়ে বামুন বাড়ি ফিরল।

বউ যখন শুধোল, মেয়েরা কেমন আছে, বামুন সবই ব'লে বলল, 'বড় মেয়ে আমার কথা শুনলই না। ওর কপালে অনেক দুঃখ আছে।'

ঠিক তাই হ'ল। রাজা তাঁর বাহিনী নিয়ে অন্য রাজ্যে সেই যে গেলেন, আর ফিরলেন না। মেজমেয়ে সূর্য কথা শুনেছিল, সে রইল সুখে সমৃদ্ধিতে।

বড় মেয়েকে শনি ধরল। বড়ই গরিব হয়ে গেল সে। একদিন বড় ছেলেকে বলল, 'ঘরে তো ভাঁড়ার শূন্য। আমার বোনের কাছে যা, কিছু চেয়ে নে। যা দেয়, তাই আনিস।'

পরের রবিবার বড় ছেলে গেছে মাসির গ্রামে। গ্রামের পুকুরপাড়ে মেয়েরা এসেছে নাইতে, কাপড় কাচতে। ও বলছে, 'তোমরা কার দাসী গো?'

—'আমরা মন্ত্রীর বউয়ের দাসী।'

—'তাই যদি হও, তাঁকে বলো, তাঁর বোনপো এসেছে। বলো, তার পরণে জীর্ণ কাপড়, যেন খিড়কির দোর দিয়ে ভেতরে আসতে দেয়।'

দাসীরা ওকে পাছ দুয়োর দিয়ে নিয়ে গেল। মাসির ব্যবস্থায় ও সুগন্ধি জলে স্নান করল, নতুন কাপড় পরল, বিশাল ভোজ খেল। তারপর মাসি তাকে একটা কুমড়ো দিল। কুমড়োর ভেতরটা ফাঁপা, সোনার মোহরে বোঝাই। যাবার কালে মাসি বলল, 'ফেলে দিসনি কোথাও। আগলে আগলে সযত্নে বাড়ি নিয়ে যা।'

বাড়ি যাবার পথে সূর্যদেব এক মালীর রূপ ধরে এসে কুমড়োটি চুরি করলেন। বাড়ি ফিরতে মা শুধোয়, মাসি কি দিল! ছেলে শূন্য হাত দেখাচ্ছে আর বলছে, ' ভাগ।

দিয়েছিল, কর্ম নিয়ে গেল। মাসি যা দিয়েছিল, সব হারিয়ে ফিরলাম।'

পরের রবিবার গেল দ্বিতীয় ছেলে। সেও দাঁড়াল পুকুরপাড়ে সেও মেয়েদের শুধোল, 'তোমরা কার দাসী গো?' আর দাসীরাও বলল, 'আমরা মন্ত্রীর বউয়ের দাসী।' সেও বলল, 'তাঁকে বলো, তাঁর বোনপো দেখা করতে এসেছে।'

পাছদুয়োর দিয়েই সে ঢুকল। মাসি তাকে সুগন্ধ জলে নাইয়ে, নতুন কাপড় পরিয়ে, চর্ব্যচোষ্য খাইয়ে একটা মোহর বোঝাই ফাঁপা লাঠি দিল। বলল, 'ফেলে দিসনি বাছা। সযত্নে সন্তর্পণে সামলেসুমলে নিয়ে যা।' ফেরার পথে সূর্যদেব এল এক রাখালের বেশে, আর লাঠিটি নিয়ে পালালেন। ঘরে ফিরতে মা শুধোচ্ছে, মাসি কি দিল? ছেলে শুধু বলল,

'ভাগ্য দিয়েছিল
কর্ম নিয়ে গেল।'

পরের রবিবার গেল তৃতীয় ছেলে। দাঁড়াল পুকুরের পাড়ে। মাসি তাকে বাড়িতে ডেকে নিল। সুগন্ধি জলে স্নান, রাজভোগ্য আহার, নতুন কাপড়, সবই হ'ল। মোহর, বোঝাই ফাঁপা নারকেল দিয়ে বলল, 'সাবধানে পথে কোথাও যেন নামাস নি।' বাড়ি ফেরার পথে ছেলে কুয়োর বাঁধানো পাড়ে জিরোচ্ছে। নারকেলটি গড়িয়ে ধপাস জলে। ছেলে বাড়ি ফিরতে মা যখন শুধোয়, ছেলে বলল,

'দিয়ে গেল ভাগ্য
নিয়ে গেল কর্ম।'

চতুর্থ রবিবারে গেছে ছোট ছেলে। সে পেল এক মাটির হাঁড়ি বোঝাই মোহর। সূর্যদেব চিল হয়ে নামলেন, ছোঁ দিয়ে সেটা নিয়ে আকাশে উঠে গেলেন।

তারপরের রবিবারে বড় মেয়ে নিজেই গেল। পুকুরপাড়ে সে দাঁড়িয়ে আছে, বোন এসে হাত ধরে তাকে নিয়ে গেল। নাওয়াল, নতুন কাপড় পরাল, খাওয়াল। তারপর দিদিকে বলল, এত যে কষ্ট পেল দিদি, তার কারণ তো একটাই। বাবার সূর্যকথা শোনোনি। ছোটবোন নিজেই দিদিকে সে কথা বলল।

খুব মন দিয়ে শুনল দিদি। থেকে গেল বোনের কাছে। যখন শ্রাবণ মাস এল, দু'বোনে সূর্য পূজা করল।

পূজো করতে না করতে বড়মেয়ের রাহু কেটে গেল। শুনল, কয়েক বছর যুদ্ধ করে শত্রুদের হারিয়ে দিয়ে তার স্বামী গাড়ি গাড়ি ধনদৌলত নিয়ে ফিরছেন। ফেরার পথে মন্ত্রীর শহরে পৌছল। যখন জানল, রানী এখানে বোনের বাড়িতেই আছেন, তখনি আনতে লোকজন পাঠালেন। রানীর ছোট্ট ছোট্ট বোনপোরা এসে বলছে, 'মাসি! মাসি! ছাতা নিয়ে কত লোক আসছে তোমাকে নিতে, হাতি, ঘোড়া, সৈন্যসামন্ত, কত কি!' সবাই বেরিয়ে এল দেখতে, বহু বছর দুঃখভোগ, ও দূরে থাকার পর রাজাও রানী মিলিত হলেন। বোনেরা এ ওকে দামী কাপড়চোপড় উপহার দিলেন, রাজদম্পতি

চললেন ঘরের পথে।

পথে যেখানে বিশ্রাম নেবেন, ভৃত্যরা রাঁধল। রানী নিজের আর রাজার থালায় খাবার নিচ্ছেন, বোনের বলা সূর্যকথা মনে পড়ল। চাকরদের বললেন কাছাকাছি গ্রামে যেতে, কোন গরিব, বা অন্নহীন, বা ক্ষুধার্তকে ডেকে আনতে।

গ্রামে তো কাউকে তেমন মিলল না, তবে এক গরিব কাঠুরেকে পাওয়া গেল। রানী ছয়টি মুক্তো নিলেন, তিনটি ওকে ধরে থাকতে বললেন। তারপর তাকে বললেন সূর্য কথা। কাঠুরে যেন দেহমন দিয়ে সে গল্প শুষে নিচ্ছে আগ্রহে। যখন সে কথা শুনছে, তার বোঝার কাঠ হয়ে গেল সোনা। সে যেমন অবাক, তেমনি আনন্দিত। সে তখনি শপথ করল, বনদেবীরা বামুনকে যেমনটি শিখিয়েছে, ঠিক তেমনি করেই ও সূর্য পূজা করবে।

পরদিন ওঁরা আরেক জায়গায় থেমেছেন। রান্না হতে রানী নিজের ও রাজার থালায় খাবার নিয়ে আবার চাকরদের বললেন, কাছাকাছি গ্রাম থেকে গরিব, নিরন্ন, ক্ষুধার্ত, উপবাসী কাউকে ডাকতে। ওরা নিয়ে এল এক গরিব চাষীকে। তার ফসল গেছে শুকিয়ে, কুয়োর জলও শুষে নিয়েছে মাটি। তখন রানী ছয়টি মুক্তো আনলেন তিনটি দিলেন তাকে, তিনটি রাখলেন হাতে। তারপর বলতে থাকলেন সূর্য কথা। কথা শেষ হবার আগেই কুয়ো ভরে উঠল জলে, মরা ফসল সবুজ ও সতেজ হয়ে হেসে উঠল। বড় আনন্দে ফিরে গেল চাষী। শপথ করে গেল, যে বামুন বনদেবীদের কাছে যেমনটি শিখেছে, ঠিক তেমন নিয়মে সে সূর্য পূজা করবে।

এর পরে রানী এক গরিব বুড়িকে বললেন সূর্য কথা। তার বড়ছেলে হারিয়ে গেছে বনে, মেজছেলে ডুবে গেছে পুকুরে, ছোটছেলে মরেছে সাপের কামড়ে। রানী সূর্য কথা বলে চলেছেন, তারমধ্যেই কবে-হারিয়ে যাওয়া বড় ছেলে, জলে ডুবে মৃত মেজছেলে, সাপের কামড়ে মৃত ছোট ছেলে, সবাই চলে এল সেখানে। আনন্দে চোখে নামল জল বুড়ির গালে। সে শপথ করে গেল। বামুনকে বনদেবীদের শেখানো রীতিতেই সূর্য পূজা করবে।

এরপরে রানীর ভৃত্যরা নিয়ে এল একটি লোককে, যার নাম অবধি নেই। মানুষ তাকে মাংসপিণ্ড ব'লে জানে। তার দু'চোখই টেরা, হাত-পা নেই। তাকে বয়ে আনতে হল। রানী তাকে নাইয়ে ধুইয়ে গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিলেন। তারপর ওর নাভিতে তিনটি মুক্তো, হাতে তিনটি মুক্তো, সূর্য কথা বলতে থাকলেন। কথা শুনতে শুনতেই স্বাভাবিক মানুষের মতো হাত-পা হল তার। টেরা চোখও সেরে গেল। গভীর কৃতজ্ঞতায় ও আনন্দে ভেসে গেল সে। শপথ করে গেল, বনদেবীরা বামুনকে যেমন প্রথা শেখান, সেই নিয়মেই সূর্যপূজা করবে সে।

পরদিন রাজারানী পৌঁছলেন রাজধানী। রান্না হল. ওঁরা খেতে বসবেন, তো স্বয়ং সূর্যদেব চলে এলেন খেতে। রাজা তখনি প্রাসাদের সব দরজা খুলে দিলেন, অনেক

ভালো, বিচিত্র নানা রান্না নতুন করে রাঁধতে বললেন। প্রতিটি পদের যেন ছয় রকম স্বাদ হয়, আদেশ দিলেন।

সূর্যদেব ও রাজা বসেছেন খেতে। প্রথম গ্রাসেই সূর্যদেব পেয়েছেন এক গাছা লম্বা চুল। রাগে আগুন হয়ে বলছেন, 'এ চুল কোন পাপিষ্ঠার?' তখন হতভাগিনী রানীর মনে পড়ছে, বারো বছর যখন দারিদ্রে কেটেছে, ঘরের ছাউনির নিচে বসে চুল আঁচড়াতেন। সেই চুলের একগাছাই বাতাসে ভেসে এসে থাকবে। সূর্যদেবের পায়ে পড়লেন তিনি। ক্ষমা কি সহজে পেলেন? এক ভূষো কালো কম্বলে গা জড়িয়ে ছাউনি থেকে একটা বাঁশের বাতা টেনে নিয়ে নগরের বাইরে যেতে হবে। বাতা আর চুলগাছা, বাঁ কাঁধ টপকে ফেলে দিতে হবে। রানী তাই করলেন। তখন সূর্যদেব প্রসন্ন হয়ে আহার সমাপন করলেন। বামুন, রাজা ও রানী, মন্ত্রীর বউ ও তাঁর পরিবার, কাঠুরে, গরিব চাষী, গরিব বুড়ি, মাংসপিণ্ড, সবাই সূর্যদেবের আশীর্বাদে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে থাকল।

তেনালী রাম আর বামুনেরা

কন্নড়, তামিল, তেলুগু
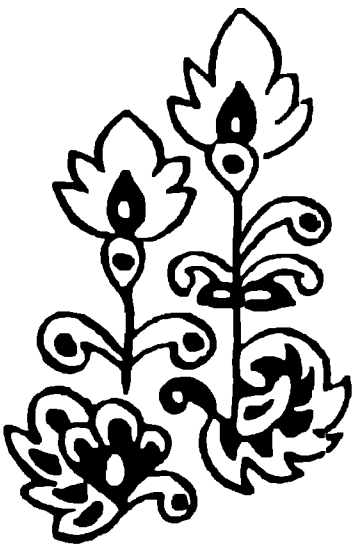
রানীমা মরতে বসেছেন তো বলছেন, 'একটা শেষ সাধ ছিল। একটা মিষ্টি আম যদি মরার আগে খেতে পেতাম!'

সে তো আমের সময় নয়। রাজা দিগবিদিকে লোক পাঠালেন। কয়েক সপ্তাহ বাদে তারা একটা সুঁটকো এত্তটুকুন আম আনলও বটে, কিন্তু বড় দেরিতে। রানীমা ততদিনে মারা গেছেন।

মায়ের ছোট্ট সাধটিও পূরণ করতে পারলেন না, এতে রাজার বুক ভেঙে গেল।

আবার ভয়ও হ'ল রানীর অতৃপ্ত আত্মা প্রেত হয়ে প্রাসাদে হানা দেবে। রাজসভায় বামুনদের ডেকে শুধোলেন, মায়ের আত্মার শান্তির জন্য কি করা যায়। বামুনরা সমাধান বের করে ফেলল। রাজা একশো বামুনকে একটি করে সোনার আম দিলেই রানীমার আত্মা শান্তি পাবে। রাজা রাজ-স্যাকরাদের বললেন একশোটা সোনার আম বানাতে, উপহার-দান-উৎসবের একটি শুভদিন দেখলেন, সেদিন এক রাজকীয় ভোজের ব্যবস্থাও হ'ল।

ভোজ খেতে যাচ্ছে বামুনরা তেনালীরামের বাড়ির সামনে দিয়ে। সে দোরে

দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা লোহার শিক, আর গনগনে কাঠকয়লা নিয়ে। বামুনদের বলছে, 'গতকাল রাজামশাই বললেন, যে বামুন গায়ে গরম শিকের দাগ নেবে, সে একটা নয়, দুটো আম পাবে।'

লোভী বামুনরা সবাই পিঠ পেতে দিল। কেউ বা দু'বারও দাগাতে দিল।

তারপর যন্ত্রণায় কঁকাতে কঁকাতে গেল রাজবাড়ি। কিন্তু সবাই তো একটি করেই আম পেল। তারা পিঠের দাগ দেখাল। আরো আম চাইল।

রাজা ক্ষেপে লাল!

ওরা বলল, রাজার প্রিয় বিদূষক, তেনালীরাম কি বলেছে।

আরো রেগে রাজা তেনালীরামকে ডাকলেন। সে বলল, 'মহারাজ! আমার মা যখন মারা যান, গেঁটে বাতে ভীষণ যন্ত্রণা পান। চিকিৎসকরা বললেন, লোহা তাতিয়ে ওঁর গাঁটে গাঁটে দাগ দিলে কাজ হবে। সে কাজ করার আগেই মা বেচারি মারা গেলেন!

'যখন শুনলাম, বামুনদের আপনি সোনার আম দিচ্ছেন আপনার মায়ের আত্মাকে শান্তি দেবার জন্যে, ভাবলাম এ কাজটাও সেরে ফেলি। আহা ভাগ্যে এই পুণ্যবান বামুনরা ছিলেন! আমাদের দু'জনের মায়েদের আত্মারই শান্তি হ'ল।'

মরতে মরতে বাঁচা

তামিল

এক বেজায় ধনী জমিদার, বেজায় চিপ্পুসও বটে। যেমন কিপটে, তেমন খিটখিটে, কেউ তার কাজই করতে রাজী নয়। ক্ষেতে লাঙল পড়ে না, খাল আর পুকুর শুকোয়। ফলে সে গরিব হতে থাকল। তবু হাতখোলা হতে শিখল না। কিষাণদের মজুরি দিতেও নারাজই রইল।

একদিন এক সাধু এলেন। চিপ্পুসের নাকাল অবস্থার কথা শুনে বললেন, 'একটা মন্ত্র বলতে পারি হে! তিনটি মাস রাতদিন জপ করো, এক বেম্ভদত্যি দেখা দেবে। সে তোমার গোলাম হবে, সব হুকুম মানবে। একশোটা মুনিষের কাজ ও একা করবে।'

চিপ্পুস ওঁর পা ধরে মিনতি করছে মন্ত্রের জন্যে। সাধু ওকে পশ্চিমমুখো করে বসালেন, মন্ত্র শেখালেন। চিপ্পুস ওঁকে অনেক কিছু দিল। সাধুটি চলে গেলেন।

চিপ্পুস এ মন্ত্র তিনমাস অহোরাত্র জপ করল। চতুর্থ মাসের পয়লা তারিখেই এক

পেল্লায় বেম্ভদত্যি এসে দাঁড়াল সামনে। তার চেহারা ও আকার ভয়ে হাড় কাঁপায়। দতিা কিন্তু চিপ্পুসের পায়ে পড়ে বলল, 'কি চান আমার কাছে, প্রভু?'

চিপ্পুস ঘাবড়ে গেছে। বিশাল দত্যির বাজখাঁই গলা শুনে ভয় পেয়েছে। তবু ও বলল, 'আমি চাই, তুমি আমার গোলাম আমি তোমার মনিব হই।'

—'সে জন্যেই তো এইছি। বলুন, কি করতে হবে, তবে কি, আমাকে পরপর কাজ দিয়ে যেতে হবে। একটা ফুরোবে, আরেকটা দেবেন। এক লহমা বসে থাকতে পারিনা আমি। কাজ দিতে না পারলে আপনাকে মারতে হবে, খেয়ে ফেলতে হবে, আমি এরকমই।'

চিপ্পুস হাসল। ভাবল, তার এত কাজ আছে, যে অমন অনেক বেম্ভদত্যি লাগবে। তখনি ও ওকে নিয়ে গেল ওর মস্ত পুকুরের দিকে। কত বছর ধরে এটা শুকিয়ে খাক্ হয়ে যে আছে!

বলল, 'এটা সংস্কার করো। এত গভীর করবে, যাতে মাথায় মাথায় একটার ওপর আরেকটা রাখলে তালগাছ ডুবে যায়।' —'জো হুকুম মালিক!'

বেম্ভদত্যি কাজে লেগে গেল।

চিপ্পুস তো ভাবছে, এটা দু'মাসের কাজ। দু'মাইল লম্বা আর দু'মাইল চওড়া না পুকুরটা?

খোশমেজাজে বাড়ি গেল ও, ভরপেট খেল, বউয়ের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করল। বউ তো কয়েক বছর স্বামীর এত ফুর্তি দেখেনি।

কিন্তু সন্ধেবেলা হঠাৎ হাজির দত্যি মশাই। বলে কি, পুকুরের কাজ হয়ে গেছে।

চিপ্পুস বলল, 'অ্যাঁ! অত কাজ দু'ঘণ্টায় শেষ? বেশ! এখন যাও, আমার পুরো জমির আগাছা আর পাথর বেছে ফেল। বিশটা গ্রাম জুড়ে আমার জমি আছে। চাষের জন্যে জমি তৈরি করে ফেল। কাজ শেষ না হলে এসো না কিন্তু।'

—'জো হুকুম মালিক!'

কয়েক হাজার বিঘা ওর জমি, চারদিকে ছড়ানো। অনেক বছর হাত দেয়নি কেউ। আগাছায় আর জঞ্জালে বোঝাই হয়ে আছে। চিপ্পুস ভাবল, কয়েক বছর না হোক, কয়েক মাস লেগে যাবে দত্যিটার।

রাতে ঘুমোতে যাবে বলে তোড়জোড় করছে, দত্যি হাজির। বলে কি, 'কাজ খতম মালিক। আপনার জমি তৈরি।' কাজের বিদ্যুৎগতি দেখে চিপ্পুস অবাকও হয়েছে, ভয়ও পেয়েছে খানিক। সে তড়বড়িয়ে বলল, 'তাহ'লে লাঙল দাও, ধান বোনো। পুকুর থেকে জল নিয়ে ঠিকমত সেচ দাও। যতটা দরকারী, তার চেয়ে বেশি দিও না যেন!'

—'জো হুকুম মালিক!'

বেম্ভদত্যি তো উধাও।

এবার ওর এক সপ্তাহ তো লেগে যাবে, ভেবে চিপ্লুস ঘুমোতে গেল। কিন্তু ঘুম ভাঙাল বেম্ভদত্যি। আরো কাজ চাইল। চিপ্লুস জমিদারের অবস্থা বেগতিক! সারারাত ভেবে ভেবে নতুন নতুন কাজ দেয়। তার বাড়ি চুণকাম হ'ল; গাইগরুকে নাইয়ে ধুইয়ে দুধ দোহানো হ'ল। নতুন নতুন বাড়ি তৈরি হ'ল। পৃথিবীর চারদিক থেকে অপূর্ব সব ফুল ও ফলের গাছ এনে বাগানে লাগানো হ'ল।

দত্যি মালিকের মনের ইচ্ছেগতি আঁচ করে আরো দ্রুত কাজ করছে, সময়ও কম লাগছে। তার তো ক্লান্তি নেই।

চিপ্লুস জমিদার, রাত না ফুরাতে হতক্লান্ত, ভয়ে দিশাহারা। ভাবছে, 'আর তো কোন কাজ ভেবে পাচ্ছি না? কি করি এখন? কাজ না দিলেই ও আমাকে মারবে। কি করি?'

চেঁচিয়ে উঠে ও মাথার চুল ছিঁড়তে থাকল।

বউ ওর অবস্থা দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'সাহস হারিও না। যত কিছু কাজ করাতে চেয়েছিলে, ভেবে নাও। স—ব করাও দত্যিকে দিয়ে। আর কাজ ভেবে না পাও, ওকে আমার কাছে পাঠিও।'

চিপ্লুস দত্যিকে বলল, তাকে পিঠে চাপিয়ে সব কাজ ঘুরিয়ে দেখাতে। যোজন যোজন জুড়ে তার দত্যি গোলামের কাজের কি নিখুঁত পরিচয় ছড়িয়ে আছে!

পুকুরটা গভীর, পরিষ্কার, জলে বোঝাই, মাইল মাইল ব্যাপী। বিশটা গ্রামে তার যত জমি, সব আগাছা পরিষ্কার, লাঙল দেওয়া, ধান লাগানো তাতে। তার বাগান ঝকঝকে যেন। খুব পরিষ্কার, আর মনোহরণ ফুলে ফলে সাজানো। নতুন নতুন বাড়িতে আসবাব, সাজানো গোজানো। গাইগরু নাওয়ানো ধোওয়ানো, তাদের দুধ দোহানো হয়েছে।

সব কাজই কয়েক ঘণ্টায় হয়ে গেছে।

মালিক মাথা ঘামাচ্ছে নতুন কাজের চিন্তায়, ভয়েও সে কম্পমান।

দত্যি বলছে, 'আর কি করব? বলুন, বলুন, কাজ না পেলে আমি অস্থির হয়ে পড়ি।'

এখন বউয়ের কথা মনে হয়েছে চিপ্লুসের। সে বলছে, 'তোমার মতো কর্মিষ্ঠি লোক পাইনি কখনো। একটু আমার বউয়ের কাছে যাবে? সামান্য কি কাজ যেন করাবে বলছিল!'

এ ভাবে একটু সময় পেয়ে চিপ্লুস প্রার্থনা করছে আর ভাবছে, কাজ পাগলা দত্যির হাতে মরণ তো নিশ্চিত!

তখনি ওর বউ এল, হাতে একগাছা লম্বা কোঁকড়া নিজের মাথার চুল নিয়ে। দত্যিকে বলল, 'অ বেম্ভদত্যি! এই চুলটা সোজা করে নিয়ে এসো তো!'

দত্যি সেটা নিয়ে এক অশ্বত্থ গাছে চড়েছে। তার বিশাল উরুতে চুলটা পাকায়

আর তুলে দেখে সোজা হ'ল কি না! না, সোজা তো হয় না। কোঁকড়াই থাকে। তামিল মেয়েটির কোঁকড়া চুলটা সোজা করবার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

তখন ওর মনে হয়েছে, স্যাকরারা তো সোনার তার আগুনে তাতিয়ে সোজা করে? ও গেছে এক স্যাকরার দোকানে। স্যাকরা ঘুমোচ্ছে, দত্যি চুলটা দিয়েছে আগুনে। যেমন দেওয়া, চুলটা ফস্ করে পুড়ে গেল। একটু ধোঁয়া উঠল। একটা বিশ্রি গন্ধ নাকে এল।

দত্যি ভয়ে কাঁটা।

—'এখন কি করি? এখন কি করি? মালকিনকে চুলটা ফেরত না দিলে তিনি কি বলবেন?'

মালকিন কি বলবে সেই ভয়ে, কি করবে ভেবে না পেয়ে মরিয়া হয়ে, দত্যি দৌড় লাগাল।

আর কোনদিন তাকে দেখেনি কেউ।

দুই বউ, এক বর

তামিল

এক প্রৌঢ়। একটা বউয়ে মন ভরেনি তার। তরুণী একটি বউ আনল। দুই সতীনে মোটে বনে না, রাতদিন চুলোচুলি।

স্বামী শহরের দুই প্রান্তে দুটো সংসার পাতল। অনেক কথা কাটাকাটি, পীড়াপীড়ি, ঝগড়াঝাঁটির পর স্বামী দুই বউকে মানিয়ে ছাড়ল।

আজ এর কাছে থাকবে, কাল ওর কাছে।

এখন, ছোট বউয়ের কাছে থাকে যখন, উকুন বাছার অছিলায় বউ পটাপট পাকা চুলগুলো তোলে। ওর ইচ্ছে বরকে কমবয়সী দেখাক, মাথায় যার কালো চুল।

যখনি বড় বউয়ের কাছে যায়, সে কালো চুল তোলে পটাপট। নিজের বয়স বেশি বলে তার দুঃখ তো আছেই। এখন ইচ্ছে, বরকে ওর চেয়ে বেশি বয়সী দেখাক, কমবয়সী নয়।

ফলে, ক্রমে ক্রমে, লোকটার মাথার একটা চুলও রইল না।

মৃত রাজপুত্র আর কথাকওয়া পুতুল

কন্নড়

রাজার এক মেয়ে, ছেলে নেই। মাঝে মাঝে এক ভিখিরি আসে। রাজকন্যে ভিক্ষে দিলেই এই আজব লোকটি বলে, 'স্বামী হবে একটা মরা মানুষ! ভিক্ষে দাও।'

রাজকন্যে ভাবে, 'এমন অদ্ভুত কথা আমায় বলে কেন?'

কথাটি না ক'য়ে ও ভিক্ষে দিয়ে চলে যায়। এই বাবা, বা সাধুটি, বারো বছর ধরে রোজ আসে। রোজই বলে, 'এক মরা মানুষ হবে তোমার বর!'

একদিন রাজা বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো শুনলেন। তিনি নেমে এসে মেয়েকে শুধোচ্ছেন, 'এ সব কথার মানে কি, বাছা?'

মেয়ে বলল, 'সাধুবাবা রোজ আসে আর বলে, একটা মরা মানুষ তোমার বর হবে। ভিক্ষে দাও! আমি ভিক্ষে দিই। যখন আমি ছোট্টটি, তখন থেকে বারো বছর ধরেই এ কথা বলছে, বাবা!'

শুনে রাজা বিচলিত হলেন। ভয় হ'ল, ভবিষ্যদবানী যদি ফলে যায়? একমাত্র সন্তানের স্বামী হবে এক মরা মানুষ, সে তো তিনি চান না। বিষণ্ণ মনে বললেন, 'এ রাজ্যে বসে থেকে লাভ নেই, চলো দেশ-দেশ ঘুরে দিন কাটানো যাক।'

দাসদাসী গুছিয়ে দিল সব, সপরিবারে বেরিয়ে পড়লেন রাজা।

সেই সময়, পাশের রাজ্যের রাজপুত্তুরের এক অদ্ভুত অসুখ হয়, তিনি মারাও যান। মারা গেলে কি হয়, দেখে মনে হয়, ঘুমিয়ে পড়েছেন বুঝি বা! জ্যোতিষীরা বললেন, বারো বছর বাদে উনি বেঁচে উঠবেন।

রাজা ছেলেকে সমাধি দিলেন না। শহরের বাইরে একটি বাড়ি তৈরি করে ছেলের দেহ সেখানে রাখলেন। পোশাকআশাক, অলঙ্কারে সাজানো শরীর। দিব্যি চুনসুরকি ইটের বাড়ি, চুনকাম করা। ঢোকার বড় দরজা তালাবন্ধ করে একটি কাগজ লটকে দিলেন। কাগজে লেখা ছিল, 'যে সতী মেয়ে দেবতাদের অর্ঘ্য দিয়েছে স্বামীর জন্যে, সে এখানে আসবে। শুধু সে ঢুকতে পারবে। সে ছুঁলেই দরজা খুলে যাবে। আর কারো স্পর্শে এটা খুলবে না।'

এর পরেপরেই রাজকন্যের বাবা, পরিবার, দাসদাসী, লোকজন নিয়ে হাজির এ রাজ্যে। সবাইয়ের ক্ষিদে পেয়েছে। রান্নাবান্না শুরু হল। রাজকন্যে হাঁটতে হাঁটতে দেখছেন সব। তালাবন্ধ দরজাটি চোখে পড়ল। খুব চোখে লাগার মতো তালা। চমৎকার কারুকাজ করা, দূর থেকে দেখলেও বোঝা যায়, ঝলমল করছে।

কাছে গিয়ে রাজকন্যে তালায় হাত রেখেছেন। নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল, তিনি

ঢুকলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল, তালা বন্ধ হয়ে গেল। রাজকন্যের সামনে বারোটি দরজা। তিনি ছুঁলেই খুলে যাচ্ছে, তিনি ঢুকলেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

বাড়ির অন্দরকোঠায় দেখেন এক পালঙ্কে এক মৃতদেহ। দেখে মনে হয় যেন ঘুমোচ্ছে। কি যে ঘটে যাচ্ছে, কেন তাঁর সামনে দরজা খুলে যাচ্ছে, ঢুকলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তা বোঝার আগেই সামনে দেখেন এক মরা মানুষ। রাজকন্যে চেয়ে দেখছেন, লোকটির পরিবার যেন বারো বছরের মতো খাবারদাবার, বাসনপত্তর, থালাবাটি, জামাকাপড়, খাদ্যশস্য, মশলাপাতি, সব রেখে গেছে।

মনে পড়ল সাধুবাবার কথা।

মনে হ'ল, 'পালাতে তো পারলাম না। তাঁর কথাই সত্যি হচ্ছে।'

মৃতের মুখের কাপড় সরালেন। মৃত সে নিশ্চয়ই, কিন্তু মুখ দেখলে মনে হয় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। —'কি করা যাবে? মনে হচ্ছে, এই মৃত মানুষটির সঙ্গে আমিও বন্দী থাকলাম। যা হয় কিছু করা যাক।'—তিনি লোকটির পা মালিশ করতে লাগলেন।

প্রায় বারো বছর রাজকন্যে মৃতদেহটির যত্ন করতেন, মালিশ করতেন দেহ। সকালে ঘুম ভাঙত ওই ইন্দিহিন্দি আঁটা বাড়িতে যার বারোটা দরজা।

কোথায় যেতে পারতেন? নাইতেন, রাঁধতেন, বাড়ির কাজ করতেন, মৃতদেহের যত্ন করতেন, আর ভাবতেন, এ কি হ'ল!

ওদিকে জঙ্গলে, মা বলছেন, 'খাবার তো তৈরি। আমাদের মেয়ে গেল কোথা?' বাবা বেরিয়ে মেয়েকে ডাকাডাকি করছেন। দেখতে পেলেন না, তবে বাড়ির ভেতর থেকে তার ডাক শুনলেন।

মা আর বাবা চেঁচালেন, 'বাছা! ওখানে গেছ কেন? বেরিয়ে এসো!'

রাজকন্যে বাবাকে সবই বলল চেঁচিয়ে।

—'আমি ছুঁতেই তালা খুলে গেল। আমি ঢুকতেই আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল। এখানে আমি একা!'

—'ওখানে কি আছে?'

— 'একটা মৃতদেহ। আর কিছু নেই।'

—'বাছা, এ তোমার কপালে ছিল। সাধুবাবা যা বলেছিল, তা ফলে যাচ্ছে। ও তালা খোলা যাবে না।'

বাড়ির চারদিক দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করলেন ওঁরা, পারলেন না। অনেক চেষ্টা করে শেষমেশ বললেন, 'আমরা আর কি করতে পারি? আমরা যাই। তোমার কপাল তোমাকে কোথায় নিয়ে যায়, তুমিই দেখ!'

ভাঙা বুক নিয়ে দুঃখদীর্ণ দম্পতি ফিরে গেলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বৃদ্ধও হলেন।

সেই বন্ধবাড়িতে বন্দিনী রাজকন্যে রাতদিন মৃতের পা মালিশ করেন, প্রথা-আচার মেনে স্নান করেন, সময়মতো দেবতাদের পূজো করেন, স্বামীর নামে অর্ঘ্য দেন। দশম বছরে, পথে যারা দড়াবাজি আর নানারকম খেল দেখায়, তাদের একটি মেয়ে এল ওখানে। দোর তো খুলতে পারল না, ও ছাতে উঠল।

রাজকন্যে বড় নিঃসঙ্গ। মানুষের মুখ দেখার জন্যে মরে যান যেন!

ভাবেন, 'বাড়িতে একটু ফাঁকফোকর থাকলে একটা বাচ্চাকে নয় ঢুকিয়ে নিতাম? কোন মেয়েকে যদি বন্ধু পেতাম!'

হঠাৎ দেখেন, জানলা দিয়ে এক তরুণী উঁকি মারছে।

—'অ মেয়ে! ভেতরে আসবে?'

—'আসব।'

—'তোমার মা-বাবা আছেন? থাকলে ঢোকার চেষ্টাও কোর না। বেরোতে তো পারবে না। মা-বাবা না থাকলে ভেতরে এসো।'

—'না না, আমার কেউ নেই!'

রাজকন্যে ওকে ভেতরে টানছেন। ও তো খেলওয়ালী! শরীরটা দুমড়ে-মুচড়ে-বেঁকিয়ে ও ভেতরে চলে এল।

রাজকন্যে মহাখুশি! একজন সঙ্গী পেয়ে সময় কেটে গেল তাড়াতাড়ি। আরো দু'বছর গেল।

রাজপুত্তুরের বারো বছরও কাটল। তাঁর বেঁচে ওঠার সময় এগিয়ে আসছে।

একদিন রাজকন্যে স্নান করছেন। জানলায় একটা গাছের ডাল, সেখানে বসে এক ব্যাঙ্গমা পাখি বলছে, 'বারো বছর তো হয়ে এল। যদি কেউ এই গাছের পাতা ছেঁড়ে, তা ছেঁচে রস বের করে রাখে রুপোর বাটিতে, সে রস ঢেলে দেয় মৃতের মুখে, সে এখনি আবার বেঁচে ওঠে!'

রাজকন্যে তা শুনলেন। তখনি ছিঁড়লেন পাতা, ছেঁচলেন, রস ধরলেন রুপোর বাটিতে। সেটা মৃতের মুখে দেবার জন্যে নিয়ে যাবেন, থমকে গেলেন। স্নান করে তো শুদ্ধশুচি হতে হবে, শিবপূজা করতে হবে, তারপর না রাজপুত্তুরের মুখে রসটি দেওয়া যাবে!

বাটি নামিয়ে রেখে তিনি স্নান ও পূজা করতে গেলেন।

খেলওয়ালী বেদেনী শুধোচ্ছে, 'বাটিতে এটা কি? এখানেই বা কেন?'

রাজকন্যে সবই খুলে মেলে বললেন।

এ কথা শুনেই বেদেনী ভেবেছে, এই তো সুযোগ! রাজকন্যে যখন পূজোয় মগ্ন, সে আতিপিতি গিয়ে রাজপুত্তুরের মুখ হাঁ করিয়ে রসটা ঢেলে দিয়েছে। সে রস ভেতরে যেতেই রাজপুত্তুর উঠে বসেছেন, যেন ঘুম থেকে উঠলেন।

'শিব! শিব!' বলে জেগে উঠে মেয়েটিকে বলছেন, 'তুমি কে?'

—'আমি তোমার স্ত্রী!'

রাজপুত্তুর তো ভারি কৃতজ্ঞ। ওঁরা স্বামী স্ত্রীর মতোই থাকলেন। যিনি বারো বছর রাজপুত্তুরের সেবা করেছেন, কেই রাজকন্যে তখনো তদ্‌গত মনে শিবের পূজো করছেন।

পূজোর শেষে উঠে এসেই শোনেন, ফিসির ফিসির গোপন কথা এ-ওকে বলছে। ভাবলেন, 'শিব! বারো বছর তপস্যা করে এই ফল মিলল? না, সুখ আমার কপালে নেই?'

এখন তিনি হলেন দাসী। রাজপুত্তুর আর খেলওয়ালী সুখের সাগরে ভাসতে থাকলেন।

কিন্তু রাজকন্যে তো রাজকন্যেই, তাঁর মা রানী! খেলওয়ালী এক খেলওয়ালার মেয়ে! চলাফেরায়, আচরণে, কথা বলায়, দুজনের তফাৎটা রাজপুত্তুর দেখছেন। তাঁর সন্দেহ হ'ল, কোথাও কোন গণ্ডগোল আছে। সেদিনই বেলার দিকে তিনি বলছেন, 'একটু শিকারেও বেরোব, একবার শহরেও যাব। তোমাদের কার কি চাই, তা বলো।'

বেদে ঘরের খাওয়াদাওয়ার জন্যে খেলওয়ালী হাঁপিয়ে উঠেছে। সে ফরমাশ দিচ্ছে শাকসবজি আর শুকনো, কড়াপাকের রুটির। রাজকন্যে ভারি বিরক্ত হলেন। তুই মেয়েমানুষ! শাড়ি চা, রেশমের জামা চা!

রাজপুত্তুর খেলওয়ালীকে বলছেন, দাসী কি চায় শুধোতে। রাজকন্যে বললেন, 'তেমন কিছু নয়। মনিবকে বলো, আমি একটা কথাকওয়া পুতুল চাই।'

রাজপুত্তুর ভাবলেন, 'এও অবাক-মেয়ে বটে! শুধু একটা কথাকওয়া পুতুল চায়?' দিব্যি শিকার খেলে রাজপুত্তুর শাকসবজি, বেদেদের কাছে চেয়ে আনা শুকনো রুটি, আর কথাকওয়া পুতুল এনে ওদের দিলেন। খেলওয়ালী খুব খুশি। এই তো মনের মতো খাবার! এখন ওর শরীরও ফিরবে, গালে গোলাপী আভাও দেখা দেবে।

রাতে সবাই খেয়েদেয়ে শুতে গেছে, তো কথাকওয়া পুতুল বলছে, 'একটা গল্প বলো!'

—'কি গল্প বলি বলো তো? আমার অভিশপ্ত জীবনই তো গল্প কথা হয়ে দাঁড়াল।'

—'সে গল্পই বলো।'

রাজকন্যে পুতুলকে তাঁর জীবনকথা বলেই যাচ্ছেন। সে গল্প তো তোমরাও শুনলে। পুতুল বেশ 'হুঁ! তাই তো? তাই বুঝি?' এ সব বলছে শুনতে শুনতে।

পাশের ঘরে নিদ্রাহীন রাজপুত্র সবই শুনছেন, জানছেন। শেষে রাজকন্যে বললেন, 'ওখানে রুপোর বাটিটা রেখে গেলাম, আর আমি পূজো সেরে আসার আগেই ও রাজপুত্তুরকে রসটা মুখে ঢেলে দিল। তাই তো আজ ও বউ, আমি শুধুই দাসী! এই তো হ'ল!'

যত শুনছেন, তত রাগ বাড়ছে রাজপুত্তুরের। গল্প শেষ হতে একটা ছাপটি নিলেন। খেলওয়ালী পাশে ঘুমোচ্ছিল, তাকে ছাপটি মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন।

বললেন, 'তুমি আমার বউ নও! তুমি এক খেলদেখানী বেদেনী! বেরোও।'

তারপর রাজপুত্তুর গিয়ে রাজকন্যেকে কত না সান্ত্বনা করলেন। রাজকন্যেই তো বারোটি বছর তাঁকে ঠাকুরসেবা করেছেন। বাকি রাত্তির দুজনে মনের সুখে গল্প করলেন।

ওদিকে তো রাজপুত্তুরের মা-বাবাও দিনের-মাসের-বছরের হিসেব রাখছেন। তাঁরা জানেন, বারো বছর হয়ে গেছে। ছেলের যে কি হ'ল, তা জানতে বড় অধীর তাঁরা।

তাঁরা এলেন। সঙ্গে শহর ভেঙে লোক এল। দেখেন, সব দরজা খোলা। ভেতরের ঘরে রাজপুত্তুর আর রাজকন্যে।

কৃতজ্ঞতায় ভেসে গিয়ে রাজা ও রানী রাজকন্যের পায়ে পড়লেন। বললেন, 'তোমার শত শত পূর্বজন্মের, আর এ জন্মের তপস্যার পূণ্যফলেই আমাদের ছেলে বেঁচে উঠেছে। কি সজীব সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে, যেন সদ্য ঘুম ভেঙে উঠল। সবই তুমি করেছ, মা!'

ওঁরা ওদের নিয়ে গেলেন প্রাসাদে। মহা ধুমধামে বিয়ে হ'ল। কত শোভাযাত্রা না বেরোল। রাজকন্যের মা-বাবাকে ডাকা হ'ল। তাঁরা বুড়ো, ক্ষীণশক্তি এখন। তাঁদের চোখের দৃষ্টিও আবছা হয়ে গেছে। যেন মাটিতে সমাধিতে যেতে পারলে বেঁচে যান।

কিন্তু এমন আনন্দের খবরে ওঁদের মন চাঙ্গা হয়ে উঠল। মেয়ের বিয়েতে রওনা হলেন ওঁরা, মেয়েকে আবার ফিরে পেলেন, এই কি কম কথা?

সাপিনী মা

গুজরাতি
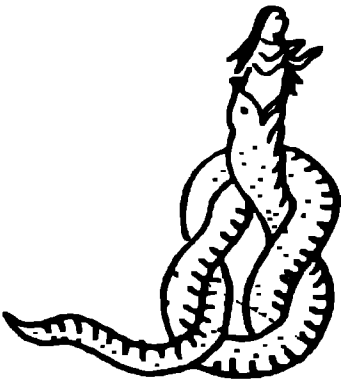
এক বৃদ্ধ দম্পতির সাত সাতটি বিবাহিত ছেলে। বেটা বউরা এদের কাছেই থাকে। ছয় বউয়ের আদর খুব। কেননা তাদের আত্মীয় কুটুম বড়লোক। ছোট বউটার বেলা পাতঠোক্‌না ব্যবহার। তার সাতকুলে কেউ নেই। তায় সে অনাথ। শ্বশুর বাড়িতে সবাই ওর কথা বলতে হলে বলে। 'ওই যে যেটার বাপের বাড়িতে কেউ নেই।'

রোজ গোটা পরিবারটা মহানন্দে খেতে বসে। সবার খাওয়া শেষ হওয়া অবধি

ছোট বউ দাঁড়িয়ে থাকে। সবার খাওয়া হলে হাঁড়ি পাতিল চেঁছে যা জোটে, তা খায়। তারপর সবগুলো বাসন মাজে।

এমনিই চলছিল। তা পূর্বপুরুষের খাবার উৎসর্গ করার দিন এল। এরা মোষের দুধে পায়েস, ক্ষীর কত কি বানাচ্ছে। ছোট বউয়ের পেটে ছেলে। তার বড় সাধ যে একটু ক্ষীর খায়। কিন্তু তাকে দেবে কে? অন্যেরা চেটে পুটে ক্ষীর খেয়ে চলে যায়। ওর জন্যে থাকে রাত্রের বাসনের নিচে লেগে থাকা আধপোড়া চাঁছি। ও বলে, 'আধপোড়া চাঁছি? তাই সই।'

নেকড়ায় সে চাঁছি বেঁধে নিয়ে ও একটা একান্ত জায়গা খোঁজে, যেখানে ওকে দেখতে পাবে না কেউ। তখন কুয়ো থেকে জল আনার সময়। কুয়োতলায় মেয়েদের জটলা। ছোটবউ ভাবল, সবাই চলে যাক, তারপরে খাব। জল আনতে গিয়ে ও পোঁটলা রেখেছে এক সাপের গর্তের কাছে। কুয়ো থেকে জল তুলে ভাবছে, স্নান সেরে ক্ষীরটা খাব।

বউ নাইছে, গর্ত থেকে বেরিয়েছে এক সাপিনী। তারও পেটে ডিম। ক্ষীরের গন্ধে সেও উতলা। সবটুকু ক্ষীর খেয়ে ও গর্তে; ঢুকে গেছে। ভাবছে, যার ক্ষীর, সে যদি ক্ষীরচোরকে গালমন্দ করে, তাকে কামড়াব। ছোটবউ স্নান সেরে এসে দেখে এক কণাও ক্ষীর নেই।

সে বলে, 'একটুখানি ক্ষীর, না পেলাম ঘরে, এখানে রেখেও পেলাম না! আহা! আমার মতোই কোনো দুঃখিনী আছে হয়তো! সেই খেয়ে থাকবে! আমি যেমন তৃপ্তি পেতাম, সে যেন তাই পায় গো!'

এ কথা শুনে সাপিনী বেরিয়ে এসে বলে, 'কে গো তুমি, ছোট্ট বউটি?'

—'মা গো! আমি বড় দুঃখিনী। পেটে সন্তান, ক্ষীর খেতে বড় সাধ! খানিক চাঁছি রেখে গেলাম, কে যেন খেয়ে নিয়েছে। থাক্! সেও হয়তো আমার মতোই দুঃখিনী, তেমনিই ক্ষুধায় কাতর। আমার ক্ষীরটুকু খেয়ে কেউ তো সুখ পেল? আমি তাতেই খুশি।'

—'আমিই খেয়েছি গো! গালমন্দ দিলে তোমাকে কাটতাম। তবে আশীর্বাদ করলে মা! বলো তো কিসের এত দুঃখ তোমার?'

—'মা! বাপের বাড়ির কেউ নেই। শীগগিরি সাধভক্ষণের সময় হবে। বাপের বাড়ির লোকজনেরই এটা করার কথা,—কিন্তু কেউ নেই!'—বলতে বলতে ও কেঁদেই ফেলল।

—'মেয়ে! আর চিন্তা কোর না। জেনো আজ থেকে আমি, আর আমার গুষ্টিবর্গকে তোমার বাপের বাড়ির লোকজন ব'লে জেনো। আমরা এ গর্তেই থাকি। সাধের সময় হলে গর্তের মুখে নেমন্তন্ন চিঠি রেখে যেও। এ বড় মঙ্গল অনুষ্ঠান। সে ভাবে পালনও করতে হয়।' এমনি করে সাপিনী হ'ল ছোট বউয়ের মায়ের সমান।

ছোটবউ তো মুগ্ধ।

প্রথমবার পোয়াতি ছোট বউ। সাধভক্ষণের দিনও এল। তো শাশুড়ি বলে, 'এর তো সাতকুলে কেউ নেই। কে সব করবে?'

ছোট বউ বলে, 'শাশুড়ি ঠাকরুণ! আমাকে একটা নেমন্তন্ন চিঠি দেবে?'

—'তোর কি ভাই আছে? কে আছে বাপ-মায়ের বংশে? কেউ নেই। কাকে দিবি চিঠি?'

—'এক দূরের জ্ঞাতি আছেন। মাসির জন্যে একটা চিঠি দিস না।'

—'শোন সবাই! এনার না ভাই, না কেউ, ইনি পাগলই হয়েছেন। হঠাৎ কোথাথেকে জ্ঞাতি জুটিয়েছেন!'

এক পড়শী বউ বলল, 'হচ্ছেটা কি? বেচারিকে একটা কাগজই তো দেবে। তাতে তোমার এত কি ক্ষতি হবে?'

ছোট বউ গ্রামের সীমানায় সাপের গর্তের কাছে চিঠিটা রেখে চলে এল।

দিন তো এসে গেল। শাশুড়ি আর ছয় বউ জোট বেঁধে ছোট বউকে ব্যঙ্গবিদ্রূপে বিঁধতে থাকল।

—'দেখো না! এনার আত্মীয়কুটুমরা বাপের বাড়ি, মামাবাড়ি থেকে এসে পড়ল ব'লে। কত কি আনবে তারা, পেটরা পেটরা কাপড়! উনোনে হাঁড়ি চাপাও গো! গম সিজিয়ে লাপাসি বানাও। ওরা এসে পড়ল ব'লে।'

এ নিষ্ঠুর তামাশা চলতে চলতেই লাল পাগড়ী বেঁধে অতিথিরা হাজির! দেখতে যেন মোগল আমীর ওমরা! রাজপুতানীর মতো দেখতে এক অভিজাত মহিলাও এসেছেন। ছোটবউ তো চিনেছে, এই সাপিনী মা! শাশুড়ি আর জায়েরা তো থ'!—'কোথাথেকে এল ওরা? ওর তো মা-বাপ-ভাই কেউ নেই? এল কোথা থেকে? কি বড়লোক!'

তারপর শুরু হ'ল অভ্যর্থনা।—'আসুন আসুন! এ আপনাদের ঘর বলেই মনে করবেন! আমরা পথ চেয়েই আছি কখন ছোট বউয়ের আপনজনেরা আসে!'

উনোনে চেপেছে লাপাসির হাঁড়ি। উৎসবের তোড়জোড়ও চলছে।

সাপিনী মা মেয়েকে ডেকে বলে, 'বাছা! ওঁদের কিছু রাঁধতে নিষেধ করো। সুগন্ধি মশলায় ফোটানো দুধ রাখো এ ঘরে। দোর বন্ধ করে খেয়ে নেব। আমরা নাগবংশী, যেমনতেমন খাই না।'

ছোটবউ শাশুড়িকে বলে, এঁরা নাগবংশী, সবরকম খাবার খেতে জাতের নিষেধ আছে। মশালাদার ফোটানো দুধই এঁদের আহার।'

খাবার সময় হ'ল। দুধের পাত্র এ ঘরে রাখা হ'ল। দোর বন্ধ করে অতিথিরা সাপের চেহারা ধরে দুধ খেয়ে নিলেন।

প্রথম সাধভক্ষণ হয়ে গেল ধুমধামে। নতুন কুটুমরা এ বাড়ির মেয়ে পুরুষ

সকলকে সোনা-রুপো-রেশমী দিল। সবাই বিস্ময়ে হতবাক।—'দেখ দেখ, কত কি এনেছে। কত যৌতুক না দিচ্ছে ছোটবউকে!'

শেষে অতিথিরা বলে, 'এখন বিদায় দিন। অনুমতি করুন, বোনটিকে সন্তান প্রসবের জন্যে নিয়ে যাই।'

—'নিশ্চয় নিশ্চয়! আপনাদের বাড়ির মেয়ে আপনারা নিয়ে যাবেন, 'না' বলতে কি পারি?' শাশুড়ি বলে।

—'ওকে আনতে লোক পাঠাবেন না। আমরাই বোনকে পৌঁছে দিয়ে যাব।'

শ্বশুরবাড়ির সবাই বিদায় দিতে এসেছে। অতিথিরা খুব বিনয় নম্র ভাবে বলল, 'আপনারা চলে যান। আমরা ঠিক চলে যেতে পারব।'

সবাই চলে গেলে ওরা গেল সেই সাপের গর্তের কাছে। ওরা বলল, 'বোনটি! ভয় পেও না। এখন আমরা সাপ হয়ে যাব, তোমাকে ভেতরে নিয়ে যাব।'

—'আমি ভয়ই পাইনি।'

সবাই ওকে নিয়ে গর্তে ঢুকল।

ছোট বউ দেখে কি বড় বড় সব ঘর! মল্লিকা ফুলের মতো সুন্দর! চমৎকার খাটপালঙ্ক, ঘরে ঘরে দোলনা। সাপিনী মা গৃহকর্ত্রী। সে বসল দোলনা খাটে। দোলনা দুলছে—কিকাদুকা! কিকাদুকা! শব্দে। নাগদেবতার মাথায় মণিরত্ন, ইয়া বড় জোড়া গোঁফ! তিনি বসে আছেন নরম সাটিনের গদীর আসনে।

নাগদেবতা ছোট বউকে 'মেয়ে' বললেন। পাতালপুরীতে তার কি দরকার, সব নজরে রাখলেন। সোনা রুপোর দোলনা খাটে সে বড় আরাম পেল। নতুন বাবা-মা, বাড়ির সবাই তাকে ভালবাসে, যত্নআত্তি করে।

সাপিনী মায়েরও প্রসব কাল এসেছে। সে ছোটবউকে বলে, 'দেখ বাছা! একটা কথা বলব, শিউরে উঠনা। আমরা তো সাপের জাত। আমরা জানি, যদি আমাদের প্রতিটি শিশু বাঁচে, তাহলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হবে। অন্য কোন প্রানী ঠাঁই পাবে না, মানুষ পাবে না হাঁটাচলার পথ। তাই, যেমন যেমন জন্মায়, আমরা ওদের খেয়ে ফেলি। যেগুলো নালায়, সেগুলো বাঁচে। আমি যখন এ কাজ করব। বিচলিত হোয়ো না যেন!'

সাপিনী মায়ের ডিম ফোটার সময় হল। ছোট বউ হাতে মাটির পিদিম নিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সাপিনী তো ডিম গিলে ফেলছে। দেখে ছোটবউয়ের গা কেমন করছে। হাত কেঁপে পিদিমটা পড়ে গেল। আঁধারে দুটো সাপের ক্যারা ডিম ভেঙে বেরিয়ে পালাচ্ছে সাপিনী মা ওদের লোজের ডগাটা কেটে নিল। এরা হল লেজকাটা সাপ।

ভরাভর্তি ন'মাসে ছোট বউয়ের ব্যথা উঠল। এক ছেলে হ'ল তার, রূপ কি! যেন দেবতার হাতের আংটিটি। ছেলে দিনে দিনে বাড়ে। যখন সে ছেলে হামা টানতে শিখল, ছোট বউ বলল, 'মা গো! আমার জন্যে কি না করলে! এখন আমাকে ঘরে

পৌঁছে দাও!'

সাপিনী মা নাতির জন্যে বিছানা, দোলনা, গলার হার, পায়ের নূপুর, আরো কত গয়না দিল। ছোটবউকেও দিল নানানিধি জিনিস। তারপর বলল, 'বাছা! যা বলি তা করো তো! তোমার দাদুর মুখে হাতটা ঢুকিয়ে দাও। এতটুকু ভয় কোর না। সে তোমায় কামড়াবে না।'

ভয়ে কেঁপেকেঁপেই ছোটবউ বৃদ্ধ সাপের মুখে হাতটা ঢোকাল। বগল অবধি সেঁধিয়ে গেল পেটে। যখন হাত বের করে আনল, হাতে বালা-চুড়ি-কঙ্কণ-অনন্ত, সোনায় ঝলমল করছে হাত।

সাপিনী মা বলল, 'অমনি করেই অন্য হাতটাও সেঁধিয়ে দাও!'

এ হাতও নিচ থেকে ওপর, সোনায় ঝলমলে।

এখন দুই সাপ ভাই মানুষের বেশে ছোটবউকে গ্রামের সীমান্তে পৌঁছে দিল। যখন ও শ্বশুরবাড়ি পৌঁছল ছেলে নিয়ে, সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'ছোটবউ এসেছে গো! ছোটবউ এসেছে! কত কি এনেছে, কত যৌতুক! তবে ওর আত্মীয়দের গ্রাম কোথায় কেউ জানে না।'

ছোটবউ চুপ করে রইল।

ওর ছেলে বড় হচ্ছে। একদিন বড় বউ কুলো দিয়ে গম ঝাড়ছে, এবার পিষবে। ছোট্ট ছেলে মুঠো মুঠো গম ছেটাচ্ছে।

জ্যেঠি চেঁচাচ্ছে, 'অমন কোর না বাছা! গম ছেটাচ্ছ কেন? আমরা গরিব, ও কাজ আমাদের সাজে না।'

এটা ছোটবউকে ঠেস দিয়ে বলা হ'ল। ও তো অনেক যৌতুক পেয়েছে।

ছোটবউয়ের মনে কথাটা বাজল। ও গ্রামের সীমানায় সেই সাপের গর্তের কাছে গিয়ে কাঁদছে।

যখন ঘরে ফিরল, পেছনে সারসার বলদ আসছে, তাদের পিঠে গমের বস্তা। শ্বশুরবাড়ির সবাই মহা অপদস্থ হ'ল।

একবার ওর ছেলে খানিক দুধ ফেলে দেয়। অমনি বড়জ্যেঠি ওকে কথা শোনাচ্ছে।

—'ও কাজ কোর না বাছা! তোমার মায়ের কুটুমরা বড়লোক। তোমাকে হয় তো এক পাল মোষই পাঠিয়ে দেবে। আমরা তো গরিব! আমাদের দুধ ফেলো না।'

আবার ছোট বউ কাঁদতে কাঁদতে গেল সাপের গর্তের ধারে। সাপিনী মা বেরিয়ে এসে বলছে, 'আমরা দেখব খ'ন! যাও, বাড়ি যাও। তবে যাবার কালে মোটে পিছনে চেও না। পথের বাজীকরকে ঘোল খেতে দিওনা কখনো। 'আয়, আয়' বলতে বলতে চলে যাও। এক পাল মোষ তোমার বাড়ি পৌঁছে যাবে।'

ছোট বউ বাড়ি ফিরছে 'আয়! আয়!' বলতে বলতে, আর এক পাল মোষ যাচ্ছে পিছনে। বাড়ি পৌঁছে ও সকলকে ডেকে বলল, 'মোষের গোহালটা তো পরিষ্কার

করতে হয়!'

সবাই বেরিয়ে এসে হাঁ হয়ে গেল। এ যে এক পাল কেন, অগণন মোষ! আবার কপালচাঁদা, কপালে সাদা দাগ!

ওদিকে সাপের গর্তে কি হচ্ছিল? লেজকাটা দুই সাপ ভাইয়ের মন সদাই অখুশি। কেউ খেলতে চায় না তাদের সঙ্গে। বলে,

চলে যা রে লেজকাটা!
তোকে খেলতে দেবো না!
চলে যা রে কাটা লেজ!
তোকে খেলতে দেবো না!

দু'ভাই সাপিনী মা'কে শুধোচ্ছে, 'মা! মা! মা! কে আমাদের লেজ কেটেছে, সেটাই বলো না!'

—'বাছারা! তোমাদের এক দিদি আছে, সে মানুষ। যখন তোমরা জন্মাও, ওর হাত থেকে মাটির পিদিমটা আচমকা পড়ে যায় তো! সে জন্যে লেজ খোয়া গেছে তোমাদের।'

—'বটে! তাহ'লে আমরা দু'জনেই যাচ্ছি। এমন কাজ করার জন্যে ওকে কামড়ে দেব।'

—'না রে না। দিদিকে কামড়াতে আছে? সে যে বড্ড ভালো মেয়ে! তোদের কত আশীর্বাদ করবে।'

—'আশীর্বাদ করলে ওকে শাড়ি আর জামাও দেব। চলেও আসব। গালমন্দ করলে কামড়ে দেব।'

মা কিছু বলার আগেই দু'ভাই এঁকেবেঁকে ছুটেছে দিদির বাড়ি। একজন লুকিয়েছে চৌকাঠের কাছে, আরেকজন গেছে নদীর ধারে। ভাবছে, 'আসুক একবার! কামড়ে দেবো।'

দিদি চৌকাঠে এসেই হোঁচট খেল। পায়ে যেন কি ঠেকল। ও বলছে, 'আমি তো অনাথ! আমি যদি কাউকে ব্যথা দিয়ে থাকি, আমার বাপের বাড়ির লোকজন যেন আমাকে মাপ করে। নাগদেবতা আমার বাবা, সাপিনী মা আমার মা! তারা আমাকে রেশমী শাড়ি, গয়নাগাঁটি, কত কি দিয়েছে!'

এ কথা শুনে লেজকাটা ভাবছে, 'দিদি তো আমার বড় ভালো। একে কামড়াই কি করে?'

দিদি গেছে জল আনতে। আবার সে হোঁচট খেল, পায়ে কি যেন ঠেকল।

আবার ও বলল, 'আমি এক অনাথ মেয়ে! যদি কাউকে ব্যথা দিয়ে থাকি, বাপের বাড়ির সবাই যেন আমাকে মাপ করে। নাগদেবতা আমার বাবা, সাপিনী মা আমার মা! কত যৌতুক দিয়েছে তারা! রেশমী কাপড়! কত অলঙ্কার!'

কাটা লেজ ভাবছে, 'এ তো আশীর্বাদই করল। একে কি কামড়ানো যায়?'

দু'ভাই মানুষ সেজে দিদির কাছে এল। তাকে দিল শাড়ি আর জামা। বোনপোকে দিল সোনার নূপুর! ফিরে গেল নিজেদের গর্তে।

সাপিনী মা ছোটবউয়ের যত ভালো করেছিল, আমাদেরও যেন তেমনি করে!

তেজা আর তেজি

অসমীয়া
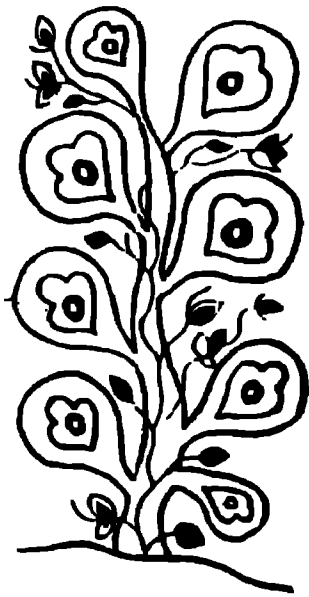
এক ধনী চাষীর দুই বউ। বড় বউয়ের একটি মেয়ে। ছোটবউয়ের এক ছেলে আর এক মেয়ে। তেজা আর তেজি। বড় বউ তাদের তো নয়ই, তাদের মা'কেও ভালবাসে না। ছোট বউ আবার স্বামীর আদরিণী।

একদিন দুই বউ পুকুরে নাইতে গেছে। ছোট বউ, বড় বউকে বলেছে তার পিঠটা ঘষে দিতে। ঘষতে ঘষতে বড় বউ, এক ঠেলা মেরে ছোট বউকে জলে ফেলে দিয়ে বলল, 'কচ্ছপ হয়ে যা! ওখানেই থাকবি।' ছোট বউ হয়ে গেল এক বড়সড় কচ্ছপ। সৎমা বাড়ি ফিরতে তেজা আর তেজি তাদের মায়ের কথা শুধোচ্ছে। তো সৎমা ধমক মেরে বলছে, 'সে কোথায় গেছে, আমি জানব কি করে?'

পরদিন সকালে তেজা আর তেজি গেছে পুকুর পাড়ে গরু চরাতে। অবাক কাণ্ড! একটা কচ্ছপ ভেসে উঠল আর বলল, 'বাছারা! আমি তোমাদের মা। তোমাদের সৎমা আমাকে জলে ফেলে দিয়ে কচ্ছপ বানিয়ে দিয়েছে। তোমাদের জন্যে বড় চিন্তা বাছা! ভেবে মরি। তোমরা ভরপেট খেতে পাচ্ছ তো?'

এবার ও একটি পাতায় একটু বমি করে ওদের সেটা খেতে বলল। কি আশ্চর্য! যেমন সেটা খাওয়া, তেমন ক্ষিদেতেষ্টা কোথায় চলে গেল।

সেদিন থেকে ওরা রোজ যায় কচ্ছপ মায়ের কাছে। মা পেট থেকে উগরে আনে খাবার, ওদের খেতে দেয়।

বড় বউ দেখল, সতীনের ছেলেমেয়ে ক্ষিদের কথা বলে না। ওরা দেখতে সুন্দর হচ্ছে, বেশ রিষ্টপুষ্ট চেহারাও হচ্ছে। নিজের মেয়েকে কত ভালোমন্দ খাওয়ায়। সে

মেয়ে যেমন সুঁটকো, তেমন পাকানো চেহারা তার। মনে সন্দেহ, কিছু একটা ঘটছে কোথাও। তো নিজের মেয়েকে একদিন তেজা আর তেজির সঙ্গে পাঠাল। দেখুক, বাড়ির বাইরে কিছু খায় কি না!

মা'কে দেখতে যাবার সময়ে, সৎদিদি সঙ্গে থাকুক, এ তো তেজা তেজি চায় না। তাই একটা দলছুট্ গরু ধরতে ওকে পাঠিয়ে দিল। নিজেরা হাঁসফাঁস করে দৌড়ল মায়ের কাছে। তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে ওরা যখন খাচ্ছে, সৎদিদি তো এসে পড়েছে। খাবারের ভাগ সেও চাইল, তাকে দিতেও হল, খেয়ে সে তৃপ্তিও পেল। তেজা তেজি মিনতি করল, এ কথা যেন ওর মাকে না বলে।

সন্ধ্যায় ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফিরলে বড় বউ দেখে তার নিজের মেয়ের চেহারাও যেন খেয়েদেয়ে ভারি তুষ্ট। তখনি ও তীরের মত ধারালো সব প্রশ্ন ছুঁড়ে মেয়েকে নাজেহাল করতে লেগে গেল।

—'তোরা সারাদিন কিছু খাস নি?'

—'না না, কিচ্ছু না। দাঁতে কুটোটি ভাঙিনি।'

মা তো নাছোড়বান্দা। শেষমেষ মা যখন বলল, এবার পিট্টি দেবে, মেয়ে স—ব. বলে দিল। পুকুরে কচ্ছপ...তিন জনে তার বমি খেয়েছে...কি স্বাদ তার, যেন অমৃত...সবই বলল।

সেই রাতে বড় বউ খানিক খোলামকুচি মেঝেতে ছড়িয়ে তার ওপরে নিজের মাদুর পেতেছে। সে যেমন এপাশ ওপাশ করে, খোলামকুচি মট মট করে ভাঙে। স্বামী শুধোচ্ছে,—'কি হ'ল? ব্যাপারখানা কি?'

—'সর্ব অঙ্গে ব্যথা গো! গাঁটে গাঁটে ব্যথা! এত কষ্ট হচ্ছে!'

—'কি করলে আরাম হবে?'

—'জানি, কিসে ব্যথা সারবে।'

—'কিসে?'

বড় বউ বলে, 'পুকুরের বড় কচ্ছপটার মাংস যদি পাই, তো এখনি ভালো হই।'

চাষী চাকরবাকরকে বলছে কচ্ছপটা ধরতে। তেজা আর তেজি সে কথা শুনে ছুট্রে গেছে পুকুরপাড়ে। মা'কে জানাতে হবে তো!

মা বলে, 'বৃথা কান্না কেঁদে আমাদের লাভ নেই। মন দিয়ে শোনো যা বলি! জাল ফেলে ওরা আমাকে ধরতে পারবে না। তোমরা যদি আসো, তবেই আমি ধরা দেব। ওরা আমাকে কেটেকুটে বেন্নন রাঁধবে। তোমাদের যখন খেতে ডাকবে, মাংসটা খেও না। পাতচাপা দিয়ে রেখো। তারপর এঁটো পাতা, মাংস, সব এই পুকুর পাড়ে পুঁতে দিও।. দেখো, সোনারুপোর একটা গাছ হবে সেখানে। তা থেকে তোমাদের উপকার হবে।'

পরদিন লোকজন কত চেষ্টা না করল, কচ্ছপ তো জালে ধরা দেয় না। সবাই যখন হাল ছেড়ে দিল, তেজা আর তেজি সহজেই ধরে ফেলল তাকে।

তারপর ওরা মায়ের কথামতো সবই করল। সে মাংস না খেয়ে পাতে মুড়িয়ে পুকুরপাড়ে পুঁতে ফেলল।

পরদিন ভোরেই পুকুরপাড় ঝলমলিয়ে একটি সোনা আর রুপোর গাছ দেখা দিল। সে অপরূপ গাছ দেখতে মানুষ ভিড় করে আসছে তো আসছেই। শেষে রাজার কানেও কথা গেল। তাঁর বড় সাধ, এ গাছ প্রাসাদে নিয়ে যান। কিন্তু কেউ তো পারে না গাছ উপড়াতে। তেজা গাছের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। মা তাকে যেমনটি বলেছে, ও সেই কথাই বলল।

—'মহারাজ! এ গাছ আমিই তুলে দিতে পারি। তবে কথা দিতে হবে যে আপনি আমার বোনকে বিয়ে করবেন।'

রাজা রাজী হলেন। তেজা গাছটি তুলে ওঁকে দিল। রাজা খুবই অবাক। তেজাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, 'আমার বউ হবার পক্ষে তোমার বোন খুবই ছোট। ও বড় হোক। তখন আমি ওকে বিয়ে করব।'

যাবার কালে তেজা, একটি ডালিমচারা আর একটি পাখি দিল রাজাকে। বলল, 'মহারাজ, এ প্রতিশ্রুতি, আমার বোন, এ সবই আপনি ভুলে যাবেন হয়তো। যেদিন পাখি কথা কইবে, ডালিম ধরবে গাছে, এসে তেজিকে নিয়ে যাবেন।'

রাজা কথা দিলেন।

সময় কেটে গেল। পাখিও কথা কয়, গাছেও ডালিম ধরে, কিন্তু রাজা তো প্রতিজ্ঞা ভুলে বসে আছেন। এক সন্ধ্যায় উনি জিরোচ্ছেন, তো পাখি গাইছে

হায়! হায়! হায়!
ডালিমে পাক ধরেছে
খসে পড়বে কখন
বোন তেজি যে বড় হয়েছে
রাজা কেমন করে ভুলে আছেন?

গান শুনে রাজা এদিকে চা'ন, ওদিকে চা'ন। পাখি আবারও গাইল,

হায়! হায়! হায়!
ডালিমে পাক ধরেছে
খসেই পড়ে বুঝি!
রাজা কেমন করে ভুলে আছেন?
তেজি তো বড় হয়েছে।
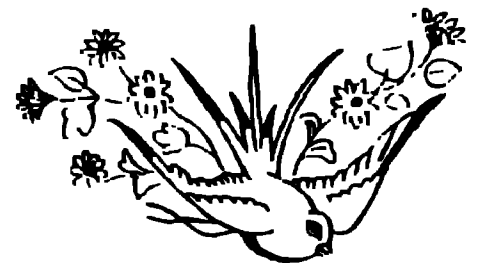
এখন রাজার মনে পড়েছে সেই অপরূপ গাছ! তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি, যে মেয়েটিকে বিয়ে করবেন। তাই আর দেরি না করে তিনি তেজির গ্রামে গেলেন, ওকে বিয়ে করলেন, বউ নিয়ে ঘরের পথে চললেন।

রাজার তো আরো সাতটি রানী আছেন। তাঁরা কেন চাইবেন, আরেকজন

আসুক? তিনি তেজিকে নিয়ে নৌকোয় ফিরেছেন. মাঝি ঘাটে বাঁধবে নাও, বড় রানী গেয়ে উঠলেন,

এখানে নয় তেজি!
এখানে নেমো না
ও শয়তান তেজি!
এ ঘাট আমার।

মাঝি আরেক ঘাটে নাও বাঁধতে যায়, তো আরেক রানী গেয়ে ওঠেন,

এ ঘাটে নয় তেজি!
এখানে নেমো না
ও পাপীনি তেজি!
এ ঘাট আমার।

সাত রানী ওদের সাত ঘাটে নামতে দিলেন না। মাঝি আরেক ঘাটে নাও বাঁধল।

তেজি তো সুখী। কিন্তু তার সৌভাগ্য দেখে সৎমা তো খুশি নয়। সে শুধু মৎলব পাকাচ্ছে, ভাবছে কখন তারও সময় আসবে। এক বছ্র বাদে তেজির এক ছেলে হ'ল, তো সৎমা সুযোগ পেল।

প্রথামতো তেজিকে একবার বাপের বাড়ি যেতে হয়। রাজা বিদায় দিলেন ওকে। বাপের বাড়ি এসেছে তো সৎমা'র ভালবাসা উছলে পড়ে। সর্বদা যত্নআত্তি করে তেজি আর ছেলের।

একদিন সকালে সৎমা বলে, 'আয়, তোর চুল বেঁধে দিই।' চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে তেজির মাথায় বিঁধিয়ে দিয়েছে একটা কাঁটা। বলছে, 'যা! ময়না পাখি হয়ে উড়ে যা!' তেজি ময়না হয়ে উড়ে গেল।

ক'দিন বাদে রাজা চিঠি দিয়ে লোক পাঠালেন তেজিকে আনতে। সৎমা নিজের মেয়েকে তেজির কাপড় গয়নায় সাজিয়ে তেজির ছেলেকে কোলে দিয়ে পাঠাল। ময়নাটি পালকির সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলল।

তেজির পোশাকে সৎদিদিকে তেজির মতই দেখাচ্ছে। রাজা খুব একটা তফাৎ ধরতে পারেন নি। তবে ছেলে তো মা'কে পাচ্ছে না। সে ভারি কান্না জুড়ল। সৎদিদি ছেলেকে দোলাচ্ছে, দুধ খাওয়াতে চেষ্টা করছে, তো ময়না গেয়ে উঠল,

কার ছেলে গো? কে দোল দেয় গো?
ও যে বাচ্চাটাকে আরোই কাঁদায়, আরো!
রাজা গানটা শুনলেন, ভাবতে থাকলেন।

বাপের বাড়ি যাবার আগে তেজি তাঁতে একটা জাল বুনতে নেয়, আর বুনতে বুনতেই ওটা ফেলে রেখে চলে যায়। সৎদিদি তাঁতে বসে ওটা বোনার ভান করছে, তো ময়না গেয়ে উঠেছে,

কার জাল এটা? কে বুনছে এখন?
সুতো ছিঁড়ছে সমানে, সুতো পাকিয়ে যাচ্ছে?

রাজার সন্দেহ এখন পূর্ণ জাগ্রত। তিনি তো দেখেছেন তেজি ছেলেকে কেমন যত্ন করে, কত সুন্দর তাঁত বোনে। তিনি হাতে দুটো মিষ্টি নাড়ু নিয়ে বলছেন, 'অ ময়না! আমার হাতে দুটো নাড়ু। একটা ক্ষিদের নাড়ু, আরেকটা তেষ্টার নাড়ু। যদি সত্যিই আমার আপনজন হও, তবে ক্ষিদের নাড়ুটা খাও। যদি আর কেউ হও? তেষ্টার নাড়ুটা খেও।'

ময়না ওঁর হাতে বসল উড়ে এসে। ক্ষিদের নাড়ুটাই ঠোকরাল। রাজা ওর গায়ে মাথায় হাত বোলাচ্ছেন, মাথায় কি একটা ধারালো কি হাতে লাগল। সেটা টেনে ফেলে দিলেন যেমন! সামনে এ তো তেজি!

তেজির কাছে সাতকাণ্ড রামায়ণ সব শুনলেন। সৎমা আর সৎদিদির বেইমানির কথা শুনে রাগে জ্বলে উঠলেন। জল্লাদদের বললেন সৎদিদিকে কেটে একটা বাসনে তার মাংস আর চর্বি রাখতে, মাথা-হাত-পা আরেকটা বাসনে রাখতে, আরেকটিতে রক্ত রাখতে।

তাঁর হুকুম মতোই কাজ হ'ল। দু'জন লোককে বললেন ওগুলো তেজির সৎমা'র কাছে নিয়ে যেতে। বললেন, 'প্রথম পাত্রটা আগে দেবে। বলবে এটা হরিণের মাংস। যখন চলে আসবে সকালে, অন্য পাত্র দুটো রেখে এসো।'

ওরা তো সেগুলো নিয়ে গেল সেই নিদয়ার কাছে। প্রথম পাত্রটি পেয়ে ও বলে, 'চমৎকার! সেদিনই গেল মেয়েটা, উপহার পাঠিয়েছে? আরেকজনের এ সব বোধসোধও ছিল না, কিছু পাঠায়ও নি।' মাংস রেঁধে ও সবাইকে দিল, নিজেও খেল। চর্বি দিয়ে বাতি জ্বালল। রাজার লোকরা কিছু খেল না, বলল, ওদের শরীর ভাল নেই। খাওয়াদাওয়া শেষ। বাতি জ্বলছে। রাজার লোকরা গান ধরল,

এক আপনজন রাঁধে
এক আপনজন বাড়ে
সবাই একসঙ্গেই খেল
এক আপনজনের চর্বি দিয়ে বাতি জ্বালাল
ঘর ভেসে গেল আলোয়।

সৎমা গান শুনে বলে, 'কি গাইছ তোমরা?'—'আমাদের বড় জ্বর গো! কে জানে কি গাইছি।'

পরদিন সকালে সৎমা দেখে, ওরা ভোর ভোর চলে গেছে।

আতিপিতি ঢাকনা খুলে যখন দেখল, তার আদরের মেয়ের মাথা-হাত পা-রক্ত, তখন তো বুঝল গত রাতে কি খেয়েছে! শোক যত, জ্বালা তত। তীব্র আর্তনাদে ও বাতাস ফালাফালা করে চিরে দিল।

ঘুঘুর ডিম! সে এক গল্প বটে!

মলয়ালম

কামারের বাড়ির সামনে এক বড় গাছের কোটরে এক ঘুঘু একটি ডিম পেড়েছে। খাবারের খোঁজে ও যখন উড়ে গেছে, কামারনী ডিমটি চুরি করল।

বাসায় ফিরেই ঘুঘু দেখে ডিম নেই। ও বুঝল এ কাজ কামারনীর। ও গিয়ে মিনতি করল, 'আমার ডিমটা দয়া করে দিয়ে দাও না গো!'

কামারনী যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, 'ডিম? কোন ডিমের কথা বলছিস? আমি তো কোনো ডিম দেখি নি!'

ঘুঘুর বুক ভেঙে গেল। সাহায্যের আশায় ও উড়তে থাকল। এক শুওরের সঙ্গে দেখা।

—'ছোট্ট পাখি, ছোট্ট পাখি, কাঁদছ কেন?'

—'অ শুওর! একটা উপকার করবে? কামারনীর রাঙাআলুর ক্ষেত খুঁড়ে তছনছ করবে? ও আমার ডিমটা চুরি করেছে গো!'

—'সে আমি পারব না।'

এক শিকারী তাকে দেখে বলছে, 'ছোট্ট পাখি কাঁদছ কেন?'

—'শুওরটাকে একটা তীর মারবে? কামারনী আমার ডিম চুরি করেছে, শুওর কামারনীর রাঙাআলু খুঁড়ছে না।'

—'আমি কেন সে কাজ করতে যাব? রাখ তো!'

কাঁদছে আর উড়ছে ঘুঘু, এক ইঁদুরের সঙ্গে দেখা। ইঁদুরও শুধোয় ঘুঘু কাঁদে কেন? ঘুঘু বলছে, 'শিকারীর ধনুকের ছিলাটা চিবিয়ে কেটে দাও না। ও শুওরকে মারবে না, শুওর কামারনীর রাঙাআলু উপড়াবে না, কামারনী আমার ডিম চুরি করেছে।'

—'আমি পারব না।'

এবার দেখা বেড়ালের সঙ্গে।

—'কি হ'ল গো ছোট্ট পাখি?'

—'ইঁদুরটাকে ধরবে? সে তো শিকারীর ধনুকের ছিলা কাটবে না। শিকারী মারবে না শুওরকে। কামারনী আমার ডিম চুরি করেছে, কিন্তু শুওর তার রাঙাআলু উপড়াবে না।'

—'আমি পারব না।'

ঘুঘু কাঁদছে দুঃখে আর রাগে। একটা কুকুর শুধোল ওর কি হয়েছে?

—'বেড়ালটাকে কামড়াবে? সে তো ধরবে না ইঁদুরকে। ইঁদুর তো কেটে দেবে না শিকারীর ধনুকের ছিলা। শিকারী তীর মারবে না শুওরকে। শুওর খুঁড়বে না

কামারনীর রাঙাআলু, যে আমার ডিম চুরি করেছে।'

—'আমি পারছি না বাপু!'

এবার দেখা এক পাকা দাড়ি বুড়োর সঙ্গে। ঘুঘু বলছে, 'দাদু গো! কুকুরটাকে মারো না! ও কামড়াবে না বেড়ালকে, বেড়াল ধরবে না ইঁদুর,—ইঁদুর কাটবে না শিকারীর ধনুকের ছিলা,—শিকারী মারবে না শুওরকে,—কামারনী তো আমার ডিম চুরি করেছে, শুওর ওর রাঙাআলুর ক্ষেত খুঁড়বে না।'

বুড়ো মাথা নেড়ে 'না' জানিয়ে চলে গেল।

ঘুঘু গেল আগুনের কাছে। আগুন বুড়োর দাড়ি পোড়াক। আগুন তো রাজী নয়। গেল জলের কাছে। জল আগুনকে নেভাক। আগুন বুড়োর দাড়ি পোড়ায়নি, যে কুকুরকে লাঠি মারেনি, সে বেড়ালকে কামড়ায়নি, যে ইঁদুর ধরেনি,—সে শিকারীর ধনুকের ছিলা কাটেনি, যে শুওরকে তীর মারেনি, সে কামারনীর রাঙাআলুর ক্ষেত তছনছ করেনি, যে ঘুঘুর ডিম চুরি করেছে। জল 'না' বলে দিল।

এরপরে ঘুঘু দেখল এক হাতিকে। হাতিকে সকল বিত্তান্ত বলে বলছে জলে নেমে তাণ্ডব করো। হাতিও মাথা নেড়ে দিল।

এখন ঘুঘু দেখেছে এক কালো ডেও পিঁপড়েকে। পিঁপড়ে ওর কান্নার কারণ শুধোতেই ঘুঘু তার নালিশের ঝুলি খুলে বসল। শেষে বলল, 'পিঁপড়ে ভাই! তুমি কিন্তু আমাকে সাহায্য করতে পারো। হাতির শুঁড়ের মধ্যে ঢুকে ওকে কামড়াও। তাহ'লেই ও জলে নেমে...'—'নিশ্চয়। কেন যাব না? এই চললাম!'

পিঁপড়ে হাতির শুঁড়ে ঢুকে গেল। অনেকটা ঢুকে যেখানে কামড়ালে যমযন্ত্রণা হবে, সেই নরম জায়গায় জুৎ করে কামড়ে দিল।

হাতি ছুটল জলে ঝাঁপাঝাঁপি করতে। জল উছলে পড়ছে আর আগুন নেভাচ্ছে। আগুন ক্ষেপে গিয়ে বুড়োর দাড়িতে পড়ল। বুড়ো লাঠি তুলে কুকুরকে তেড়ে গেল। পিট্টি খেয়ে কুকুর ছুটে গিয়ে বেড়ালকে দিল এক কামড়। বেড়াল ধরল ইঁদুরকে, আর ইঁদুর শিকারীর ধনুকের ছিলায় দাঁত বসাল। শিকারী নতুন ছিলা পরিয়ে শুওরকে মারল একটা তীর। আর শুয়োর যন্ত্রণার চোটে কামারনীর সাধের ক্ষেতের সব রাঙাআলু উপড়ে ফেলল।

কামারনী তখনি বুঝেছে কিংকর্তব্যম্। ও আতিপিতি গিয়ে ঘুঘুর ডিমটা সযত্নে রেখে দিল গাছের কোটরে। এত কাণ্ড করে তবে ঘুঘু তার ডিম ফেরত পেল।

একটা ঢোল

হিন্দী

একটি গরিব মেয়ে, তার একটি মাত্র ছেলে। শহরের বড়লোকদের বাড়িতে মা খুব খাটে। বাড়ি পরিষ্কার করে। আটা পেষে। তার বদলে কি পায়? চারটি ছোলা পায়। ওইটুকুই তার সম্বল। ছেলেকে নতুন জামা, খেলনা, কিচ্ছু কিনে দিতে পারে না। একদিন ও ছোলা, গম বেচতে যাচ্ছে বাজারে। ছেলেকে বলল, 'বাজার থেকে কি এনে দিই তোকে, বল্ তো?' ছেলে তখনি বলল, 'একটা ঢোল মা, একটা ঢোল।'

মা তো জানে, একটা ঢোল কিনে দেবার পয়সা কোনদিন হবে না তার। বাজারে গিয়ে গমটম বেচল। কিনল খানিক ছোলার ছাতু আর একটু লবণ। খালি হাতে ছেলের কাছে ঘরে ফিরছে, মনটা ভাল নেই। দেখে পথে এক টুকরো কাঠ পড়ে আছে। দিব্যি শুকনো কাঠ। ওটা কুড়িয়ে এনে ছেলেকে দিল।

ছেলে ভেবে পেল না ওটা নিয়ে সে কি করবে। তবু, যখন খেলতে বেরোল। লাকড়িটা ও নিয়েই গেল। এক বুড়ি ঘুঁটের জ্বালে কাঠ জ্বালাতে চেষ্টা করছে চুলো ধরাতে। আগুন জ্বলছে না, ধোঁয়া বেরোচ্ছে শুধু, বুড়ির চোখে ধোঁয়া লেগে জল পড়ছে। ছেলে থেমে পড়ল। শুধোল, বুড়ি কাঁদে কেন?

আর কেন! চুলো ধরাতে পারছে না, রাঁধতেও পারছে না।

ছেলে বলল, 'আমার কাছে একটা ভালো লাকড়ি আছে। এটা দিয়ে চুলো ধরাও।'

বুড়ি খুব খুশি। ও চুলো ধরাল, রুটি সেঁকল, ছেলেকে একখানা রুটিও দিল।

যেতে যেতে ছেলে দেখে এক কুমোর বউ। তার ছেলে হাহাকার করে কাঁদছে আর হাত পা ছুঁড়ছে। ছেলে শুধোল, বাচ্চা কাঁদে কেন?

আর কেন! বাচ্চার পেয়েছে ক্ষিদে, মায়ের কাছে কোন খাবারই নেই। ছেলে তখনি রুটিটা দিল বাচ্চাটাকে। গবগবিয়ে খেয়ে নিল রুটিটা আর বাচ্চাটা কান্নাও থামাল। কুমোরের বউ ছেলেকে কি আর দেবে, একটা বড়সড় মাটির ভাটি দিল।

সেটা নিয়েই ও চলছে। পৌঁছে গেল নদীর ধারে। সেখানে ধোপা আর ধোপানী,—কি তাদের চ্যাচানি,—ধুন্ধুমার ঝগড়া বেধে গেছে। ধোপা তার বউকে মারছে যত, বকছে তত।

ছেলে শুধোল, কেন?

—'আমাদের একটাই ভাটি, সেটা ইনি ভেঙে ফেলেছেন। কাচার আগে যে কাপড় সিদ্ধ করবে, কিচ্ছু তো নেই।'

ছেলে বলল, 'যাক গে, যাক গে। ঝগড়া কোর না বাপু। এই ভাটিটা নাও।'

ধোপা সেটা পেয়ে বেজায় নিশ্চিন্ত। ও ছেলেটাকে একটা কোট দিল।

ছেলে হাঁটতে হাঁটতে এল এক সেতুর কাছে। দেখে, একটা লোক, গায়ে জামা নেই, শীতে ঠকঠকিয়ে কাঁপছে। গায়ের জামা কোথায় গেল শুধোতে লোকটা বলছে, 'এই ঘোড়া চেপে শহরে আসছিলাম। ডাকাতের হাতে পড়লাম। সব কেড়েকুড়ে নিয়ে গেল গো, গায়ের জামাটা অব্দি নিল?'

—'না, ভেবোনা তো। এই কোটটা নাও।'

কোটটা নিয়ে লোকটি বলছে, 'তোমার মনটা তো খুব ভালো। নাও, এই ঘোড়াটা নাও, আমি দিচ্ছি।'

ঘোড়া নিয়ে চলতে চলতে ছেলে পেয়ে গেল এক বিয়ের শোভাযাত্রীদের। গায়ক আছে, বাদক আছে, বর আর বর যাত্রীরা আছে। সবাই মুখ ঝুলিয়ে একটা গাছের নিচে বসে আছে।

কি হ'ল? কি হ'ল? এমন আনন্দে নিরানন্দ কেন? তো বরের বাপ বলছে, 'বিয়ে দিতে যাচ্ছি বরাত নিয়ে। বরের জন্যে তো একটা ঘোড়া চাই। যার ঘোড়া আনার কথা, সে এসে পৌঁছয়নি। বর তো পায়ে হেঁটে যেতে পারে না। দেরি হয়ে যাচ্ছে। বিয়ের লগন বয়ে যাবে।' ছেলেটা বলল, তার ঘোড়া নিক ওরা।

এরা বেজায় খুশি। বর বলছে, এর বদলে কি দেওয়া যাবে ছেলেকে।

—'একটা জিনিস দিতেই পারো। ওই যে ঢুলী যে ঢোলটা নিয়ে বসে আছে?'

ঢুলীকে বিশেষ বলতে হ'ল না। সহজেই বর, ঢোলটা দিয়ে দিল ছেলেকে। ঢুলী জানে, সে যা টাকা পাবে, তা থেকে আরেকটা ঢোল স্বচ্ছন্দে কিনতে পারবে।

নতুন পাওয়া ঢোল বাজাতে বাজাতে ছেলে মায়ের কাছে ছুটল। স—ব বলল মা'কে। পথে পাওয়া একটা লাকড়ি কেমন করে ঢোল হয়ে গেল, সেই কথা!

বোকাদের রাজ্যে

কন্নড়

বোকাদের রাজ্যে রাজা ও মন্ত্রী চূড়ান্ত গবেট। অন্য রাজাদের নিয়মে তো এ রাজ্য চলতে পারে না। তাই ওরা ঠিক করল, দিন হবে রাত, রাত হবে দিন। হুকুম দিল। সূর্য ডোবার পর সবাই চাষবাস করবে, যে-যার কাজে যাবে, আর সূর্য উঠলেই ঘুমোতে যাবে। যে এ আদেশ অমান্য করবে, তার শাস্তি মৃত্যু। মৃত্যুভয়ে প্রজারা আদেশ মানতে থাকল। গবেট রাজা আর গবেট মন্ত্রী খুব খুশি।

এ রাজ্যেই একদিন এল এক গুরু আর তার শিষ্য। চমৎকার শহর, জনমানবশূন্য, অথচ এখন দিন। সবাই ঘুমোচ্ছে, একটা ইঁদুরও নড়ে না। গরুবাছুরও শিখে ফেলেছে যে দিনে ঘুমোতে হয়। গুরুশিষ্য দেখে শুনে অবাক। ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখছে, হঠাৎ সন্ধ্যা হয়ে গেল। নিমেষে শহর জেগে উঠল, যে-যার কাজে দৌড়ল।

দুজনেরই ক্ষিদে পেয়েছে। দোকানপাট খুলেছে তো ওরা গেছে সওদা করতে। আবার অবাক হতে হ'ল। সব জিনিসের দামই এক পাই। সে একসের চাল কেনো, বা একছড়া কলা! গুরুশিষ্য খুব খুশি। এমন কাণ্ড যে হতে পারে, তা ওরা শোনেনি জীবনে। এক টাকায় ওরা অসাগর খাবার কিনতে পারবে।

রেঁধেবেড়ে খেয়ে নিল ওরা। গুরু বুঝেছে, এ হ'ল নিরেট বোকাদের রাজ্য। এখানে থেকে যাওয়াটা সুবুদ্ধির কাজ হবে না।

শিষ্যকে বলল, 'এ রাজ্য আমাদের মতো লোকের জন্যে নয়। চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

শিষ্য তো নারাজ। সব কিছু কত সস্তা এখানে। সে তো শুধু চায় ভালো খাবার, সস্তার খাবার।

গুরু বলল, 'এরা সবাই গবেট। এ রাজ্য বেশিদিন টিকবে না। তোমাকে কি ক'রে বসবে, তাও বলা যায় না।'

শিষ্যর তো এ সুবুদ্ধি পছন্দ নয়। সে থাকবেই এখানে। গুরু হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'যা ইচ্ছে করো গে। আমি বাপু চললাম।'

গুরু চলে গেল। শিষ্য রয়ে গেল। ভাত, রুটি, ঘি, কলা, নিত্যি ভুঁরিভোজন করতে করতে মোটা যা হ'ল! যেন ধর্মের নামে উচ্ছুগ্‌গু করা ষাঁড় একটি।

এক দিনের বেলা, এক চোর ঢুকেছে এক ধনী বণিকের বাড়ি। সিঁদ কেটে ঘরে ঢুকে চোরাই মাল নিয়ে বেরোবে, তো পুরনো বাড়ির দেওয়াল ধ্বসে পড়েছে মাথায়। চোরও মরে গেছে। চোরের ভাই রাজাকে নালিশ জানাচ্ছে, 'মহারাজ! আমার দাদা যখন বংশগত পেশার কাজে নিযুক্ত ছিল, বণিকের বাড়ির দেওয়াল ভেঙে পড়ে সে মারা গেল। এই বণিকই অপরাধী। একটা শক্তপোক্ত দেওয়াল বানানো উচিত ছিল ওর। আপনি অপরাধীকে শাস্তি দিন আর পরিবারকে অবিচারের জন্য ক্ষতিপূরণ দিন।'

রাজা বললেন, 'ন্যায়ের জয় হবে, চিন্তা কোর না।' তখনি ডেকে পাঠালেন বাড়ির মালিককে। সে হাজির হতেই রাজা জেরা শুরু করলেন।

—'তোমার নাম কি?'

—'অমুক চন্দ্র অমুক মহারাজ!'

—'মৃত ব্যক্তি যখন সিঁধ কেটে ঢোকে, বাড়িতে ছিলে?'

—'হ্যাঁ মহারাজ! সিঁধ কেটে ঢুকল, দেয়ালটা পুরনো হয়ে গেছে, ওর ওপর ভেঙে পড়ল।'

—'অপরাধী দোষ স্বীকার করেছে। তোমার দেওয়াল এর ভাইকে মেরেছে। মানুষ খুন করেছ তুমি। শাস্তি দিতে হবে তোমাকে।'

বেচারি বণিক বলল, 'মহারাজ! আমি তো দেওয়াল বানাই নি। যে বানিয়েছিল, দোষটা সে করেছে। ঠিক মতো বানায়নি আর কি। তাকেই শাস্তি দেওয়া ঠিক হয়।'

—'সে ব্যক্তি কে?

—'মহারাজ! বাড়ি তো বাবার সময়ের। লোকটাকে জানি। বুড়ো হয়ে গেছে এখন, কাছেই থাকে।'

রাজা পেয়াদা পাঠালেন। রাজমিস্ত্রিকে হাত-পা বেঁধে নিয়ে আসা হ'ল।

—'ওহে! ওর বাবার আমলে ওর বাড়ির দেয়াল তুলেছিলে তুমিই?'

—'তুলেছিলাম মহারাজ!'

—'কি দেয়াল তুলেছিলে হে? একটা গরিবের মাথায় ভেঙে পড়েছে সেটা, লোকটাও মরেছে? তুমি ওকে খুন করেছ। তোমার প্রাণদণ্ড হবে।'

কোতলের হুকুম দেবার আগেই বেচারি রাজমিস্ত্রি বলল, 'হুকুম দেবার আগে দয়া করে আমার কথাটা শুনুন। আমি দেয়ালটা তুলি, সেটা তেমন পোক্ত হয়নি, এ কথা সত্যি। কিন্তু কাজে তো মন দিতে পারিনি আমি। খুব মনে আছে, সারাদিন পায়ের মল ঝমঝমিয়ে এক বেশ্যা রাস্তার এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করত। দেয়াল বানাবার সময়ে কাজের দিকে চোখও থাকত না, মনও থাকত না। বেশ্যাটাকে ধরুন মহারাজ! আমি জানি ও কোথায় থাকে!'

—'ঠিক বলেছ। মামলা জটিল হচ্ছে। ভালো করে দেখা দরকার। এমন জটিল মামলার বিচার করা সহজ নয়। বেশ্যাটাকে ধরা যাক।'

বেশ্যা তো এখন বুড়ি। সে কাঁপতে কাঁপতে এল।

—'অনেক বছর আগে, যখন এই হতভাগ্য দেওয়াল তুলছিল। তুমি রাস্তার এ মোড়-ও মোড় পায়চারি করতে? ওকে দেখেছ তখন?'

—'হ্যাঁ মহারাজ! দিব্যি মনে আছে।'

—'মল ঝমঝমিয়ে হাঁটতে, কেমন? বয়স কম ছিল, ওকে প্রলোভিত করেছিলে, তাই ও একটা রদ্দি দেওয়াল বানায়। এক হতভাগ্য সিঁদেল চোরের মাথায় দেওয়াল ভেঙে পড়ে। লোকটা মরে যায়। তুমি একটা নির্দোষ মানুষকে মেরেছ। শাস্তি হবে তোমার।'

বুড়ি বলল, 'সবুর, মহারাজ, সবুর! ও রাস্তায় প্যারেড করতাম কেন, এখন মনে পড়েছে। স্যাকরাকে সোনা দিয়েছিলাম গয়না গড়াতে। আলসে! কুঁড়ে! বজ্জাত! একশো অজুহাত দেখাচ্ছে, বলছে আজ দেবো, এখনি দেবো, কাল দেবো, তখুনি দেবো! রাতদিন ঘোরাত আমাকে। ওর বাড়ির রাস্তায় কত যে হাঁটিয়ে মেরেছে! তখনি তো মিস্তিরিটা দেখত আমায়। আমার কোন দোষ নেই মহারাজ! সব দোষ

ওই স্যাকরা বেটার।'

—'বেচা—রি! ঠিক বলেছে ও, ঠিক! এতক্ষণে আসল অপরাধীর হদিশ পেলাম। স্যাকরা কোথায় লুকিয়েছে! ধরে আনো তাকে।'

স্যাকরা দোকানের কোণেই লুকিয়ে বসেছিল। পেয়াদা তাকে ধরে এনেছে। অভিযোগ শুনে ও বলছে, 'মহারাজ! আমি এক গরিব স্যাকরা। হ্যাঁ, এই বুড়িকে তখন খুব হাঁটাহাঁটি করিয়েছি। অনেক ছুতো দেখিয়েছি। কেন? ধনী বণিকের বরাত দেওয়া কাজ না করে তো ওর গয়নায় হাত দেওয়া যাচ্ছিল না। ওদের বাড়ি বিয়ে লেগেছিল। ওদের সবুর সইছিল না। আপনি তো জানেন, বড়লোকরা কেমন অধৈর্য হয়!'

—'কে, কে এই ধনী বণিক, যে এই হতভাগিনীর গয়না করতে দিচ্ছিল না তোমাকে,—বেচারিকে হাঁটাচ্ছিল তোমার বাড়ির সামনে! যে জন্যে রাজমিস্ত্রির মন বিচলিত হচ্ছিল,—যে জন্যে দেওয়াল তৈরীতে এত গণ্ডগোল,—যে দেয়াল ভেঙে পড়েছে এক নির্দোষীর ওপর,—মেরেই ফেলেছে তাকে। কে সে? নাম বলতে পারো তার?'

স্যাকরা সেই বণিকের নামই বলল, যে সেই বাড়ির মালিক, যে বাড়ির দেয়াল ভেঙে পড়েছে। রাজা ডাকলেন, এর নাম ন্যায় বিচার! পথ ঘুরে ঘুরে সেই বণিকের কাছেই এল।

আবার যখন তাকে আনা হ'ল, সে চেঁচাতে থাকল, 'আমি তো নয়! আমার বাবা গয়নার বরাত দিয়েছিলেন! তিনি তো মারা গেছেন! আমি নিরপরাধ!'

গবেট রাজা গবেট মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে কঠোর আদেশ জানালেন।

—'এ কথা সত্য, যে তোমার বাবাই প্রকৃত হত্যাকারী! তিনি মৃত। কিন্তু তাঁর জায়গায় অন্য কাউকে শাস্তি দিতেই হয়। সেই অপরাধী পিতার যাবৎ সম্পত্তি, সব তুমিই পেয়েছ। টাকাকড়ি যেমন, অপরাধও তেমন, সব তোমাতেই বর্তেছে। যখনি তোমাকে প্রথম দেখেছি, তখনি জানি, এই পৈশাচিক অপরাধের নাটের গুরু তুমি! তোমার প্রাণদণ্ড হ'ল।'

প্রাণদণ্ডের জন্যে একটা নতুন শূলের ফরমাশ গেল। শূলের মাথা খুব ছুঁচলো করা হ'ল। অপরাধীকে চড়াতে হবে তো! হঠাৎ মন্ত্রীর মনে হ'ল, শূলের মাপের তুলনায় বণিক বড়ই সুঁটকো। তিনি রাজাকে সে কথা বললেন। রাজাও উদ্বিগ্ন হ'লেন।

—'কি করা যায়?'

হঠাৎ মনে হ'ল, বেজায় মোটা কাউকে এনে চড়ালেই তো হয়। ইয়া মোটা লম্বা শূল! মানানসই ভুঁড়িদার মানুষ চাই। রাজার লোকরা খুঁজতে খুঁজতে শিষ্যকে পেয়ে গেল। চাল-আটা-ঘি-কলা, খেয়ে খেয়ে সে পাহাড় প্রমাণ হয়েছে।

তাকে ধরতে সে চেঁচাচ্ছে, 'কি দোষ করেছি আমি? আমি নির্দোষ! আমি সন্নেসী মানুষ!'

—'হ'তে পারে, তা হ'তেই পারে। কিন্তু রাজাদেশ হ'ল শূলের সঙ্গে মানানসই একটি ভুঁড়িদার মানুষ চাই।'

—লোকজন ওকে মশানে নিয়ে গেল।

এখন শিষ্যের মনে পড়ছে বিচক্ষণ গুরুর কথা! এ হ'ল বোকার রাজা। তোমাকে কি ক'রে ব'সবে, কে জানে!'

মনে মনে ও আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছে গুরুকে, বলছে, আমার আকুতি শোনো। মন্ত্রবলে গুরু সব জেনেছে। সে তো অতীত থেকে ভবিষ্যৎ, সব দেখতে পায়। তৎক্ষণাৎ সে শিষ্যকে বাঁচাতে চলে এল। খাওয়ার লোভে শিষ্যের এই বিপত্তি।

এসেই ও শিষ্যকে ধমকাল, কানে কানে কি বলল। তারপর গেল রাজার কাছে।

—'হে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী! হে রাজা! বড় কে? গুরু, না শিষ্য?'

—'অবশ্যই গুরু শ্রেষ্ঠ!'

—'তবে আগে আমাকে শূলে চড়ান, তারপর শিষ্যকে চড়াবেন।'

শুনে শিষ্য চেঁচাতে থাকল, 'আমাকে আগে গো, আমাকে আগে! আমাকে আগে আনা হয়েছে, হ্যাঁ! আগে আমার প্রাণ নাও, তারপর ওঁর!'

কে আগে শূলে চড়বে, তাই নিয়ে গুরুশিষ্যের সে কি ধুন্ধুমার ঝগড়া! রাজা ঘোল খেয়ে গেলেন। গুরুকে শুধোলেন, 'আপনি মরতে চাইছেন কেন? আমরা শিষ্যকে ঠিক করেছি, কেননা শূলে চড়াবার জন্যে একটা মোটাসোটা লোক দরকার।'

—'আমাকে এ প্রশ্ন করা উচিত নয়। আমাকে আগে শূলে চড়ান।'

—'কি জন্যে? না, এর মধ্যে কোন রহস্য আছে। আপনি জ্ঞানীপুরুষ, আমাকে বোঝান।'

—'বললে পরে শূলে চড়াবেন তো?'

রাজা কথা দিলেন। গুরু রাজাকে নিয়ে গেল দূরে, কানে কানে বলল, 'জানেন? আমরা দু'জন কেন এখনি মরতে ব্যস্ত? সা—রা পৃথিবী ঘুরে এলাম। এমন শহরও দেখলাম না, আপনার মতো রাজাও পেলাম না। এই শূলদণ্ড একে ন্যায়দণ্ড বললেই হয়! এটা নতুন, কোন পাপী এতে চড়েনি। যে প্রথম মরবে এ শূলে, সে এ দেশের রাজা হয়ে জন্মাবে পরজন্মে। তার পরে যে চড়বে, পরজন্মে সে এ রাজ্যের মন্ত্রী হবে। সন্নেসীর জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে আমাদের। কিছুকাল রাজা আর মন্ত্রী হয়ে মজা লোটা যাবে। কথা রাখুন মহারাজ, আমাদের চড়ান শূলে। অবশ্য; মনে রাখবেন! আমি আগে!'

রাজা গভীর চিন্তায় তলিয়ে গেলেন। পরজন্মে কেউ এ রাজ্যের রাজা হোক, তা তিনি মোটেই চান না। ভেবে দেখতে সময় চাই।

একদিনের জন্য প্রাণদণ্ড স্থগিত রেখে তিনি গোপনে মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। বললেন, 'পরজন্মে অন্যকে রাজ্য দিয়ে দেওয়াটা গোক্ষুরি কাজ হবে।

চলো, দু'জনা গিয়ে শূলে চড়ি। আমরাই রাজা আর মন্ত্রী হয়ে জন্মাব। সাধুসন্নেসী তো মিছে কথা বলে না!'

মন্ত্রী রাজী।

মন্ত্রী জল্লাদদের ডেকে বললেন, 'আজ রাতে দণ্ডের আসামীদের পাঠাব। প্রথম জন এলে তাকে প্রথমে শূলে চড়াবে। দ্বিতীয়জনকে তারপর। এ হ'ল রাজাদেশ। কোন ভুলচুক হয় না যেন!'

রাতে রাজা আর মন্ত্রী গোপনে গেলেন কারাগারে। গুরু শিষ্যকে ছেড়ে দিলেন। নিজেরা গুরু শিষ্য সেজে থেকে গেলেন। ব্যবস্থামতো বিশ্বাসী রাজভক্ত কর্মীরা ভোরবেলা দু'জনকেই শূলে চড়াল।

কাকশকুনের সামনে ফেলে দেবার জন্যে যখন লাশ নামানো হ'ল, প্রজারা ঘাবড়ে গেল। এ তো রাজা আর মন্ত্রীর লাশ! রাজ্যে বেজায় গোলমাল লেগে গেল।

সারারাত প্রজারা শোক করল, আর রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনাকল্পনা করল। কয়েকজনের হঠাৎ মনে হ'ল গুরু শিষ্যের কথা। তারা তো তখন চলে যাবার জন্যে তৈরি।

প্রজারা বলল, 'আমাদের তো একটা রাজা আর একটা মন্ত্রী চাই।'

সবাই একমত। তারা গুরুশিষ্যকে রাজা ও মন্ত্রী হবার জন্যে চেপে ধরল। শিষ্যকে রাজী করাতে দেরি হয়নি, গুরু কিছু সময় নিল।

গবেট রাজা আর গবেট মন্ত্রীর রাজ্য চালাতে রাজী হ'ল ওরা,—তবে এক শর্তে।

পুরনো আইনকানুন সব পালটানো হবে।

সেই থেকে সে রাজ্যে দিনে দিন হয়, রাতে রাত। আর এক পাই দিয়ে কিছু কেনা যায় না। রাজ্যটা আর সব জায়গার মত হয়ে গেল আর কি!

অহিংসা

বাংলা

এক ভয়ংকর বিষাক্ত সাপ একটা রাস্তার দখল নিয়েছে। যে যায়, তাকেই কামড়ায়। এক সাধু যাচ্ছেন, তো সাপ তেড়ে এসেছে। সাধু নির্ভয় শান্ত চোখে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'আমাকে কামড়াতে চাও তো? এসো, কামড়াও।'

এমন অভূতপূর্ব আপ্যায়নে সাপটা দমে গেল। এই

সাধুর কোমলতার কাছে হেরে গেল ও। সাধু বললেন, 'অ বন্ধু! শোনো না! এখন থেকে কাউকে কামড়াবে না, এমন কথা দিলে কেমন হয়? রাজী?'

সাপ ফণা নামিয়ে সম্মতি জানাল। সাধু গেলেন নিজের পথে, সাপ শুরু করল নিষ্পাপ, অহিংস জীবন।

শীগগিরি সবাই জেনে গেল যে সাপটা কারো ক্ষতি করে না। ছেলেরা ওর পেছনে লেগে গেল নিষ্ঠুর ভাবে। পাথর ছোঁড়ে, লেজ ধরে টেনে নিয়ে যায়। সাপ তার কথা রেখেছে। মুখ বুজে সব সয়ে যায়।

সৌভাগ্যের কথা, সাধু তাঁর নবতম শিষ্যকে দেখতে এলেন। সাপটির ক্ষতবিক্ষত চেহারা থেকে ভারি কষ্ট হ'ল ওঁর।

যখন শুধোলেন, ব্যাপারখানা কি?

সাপ ক্ষীণ স্বরে বলল, 'হে পুণ্যবান! আপনি বললেন, কাউকে কামড়ানো ঠিক নয়। কিন্তু মানুষ এত নির্দয়, এত নির্দয়...!'

সাধু বললেন, তোমাকে কামড়াতে নিষেধ করেছি। ফোঁস করতে তো নিষেধ করিনি বাছা!'

নাপিতের গোপন কথা

তামিল
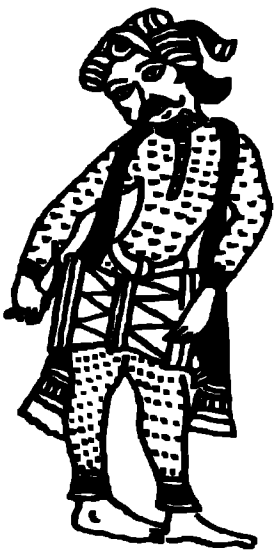
কোঙ্কনের রাজা ছিলেন বেজায় ভালো। মনে হ'ত, স—ব আছে তাঁর। কামদেবতার মতো সুশ্রী, মিষ্টভাষী, ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু। সোজা হিসেবে তিনি খুবই বড়, অপরাজেয় একেবারে। শত্রুদের পরাজিত করার পর স্বেচ্ছায় তিনি স্বরাজ্যের অনেক অংশ শত্রুদেরই দিয়ে দিয়েছেন।

এ সব দিব্যগুণের পরেও তাঁর ছিল এক বিশেষ ক্ষমতা। সভায় লোকজন সশ্রস্ত থাকত, কেন না কেউ ফিসফিস করে কথা বললেও তিনি শুনতে পেতেন। মশা উড়ল, একটা কাঁটা পড়ে গেল, তিনি শুনতে পেতেন। এই অত্যাশ্চর্য শ্রবণশক্তি কোথা থেকে এবং কেমন করে পেলেন? চারপাশে যা হয়, সব শুনে ফেলেন কি করে? এ রহস্য জানার কৌতূহল ছিল সকলেরই।

একদিন রাজার নিজস্ব নাপিত, রাজার লম্বা লম্বা চুলের নিচে কি যেন একটা দেখল। রাজার দাড়ি কামাতে কামাতে তাঁর কান জোড়া দেখে ফেলল। মনে হল,

এমন কান সে অন্য কোথাও দেখেছে, কোথায়,—তা মনে আনতে পারল না।

ভাবছেই সে, ভাবছেই। দাড়ি কামানো যে আধপথে থেমে আছে, সে খেয়ালও নেই। ক্ষুর ভাঁজ করে রেখে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবনায় ডুবে গেল।

রাজা গজগজ করলেন। শুধোলেন, ও ভাবে দাঁড়িয়ে ও করছেটা কি! শেষে রাগে ফেটে পড়লেন। নাপিত আপনভাবে বিভোর। কিছুই তার কানে ঢুকছে না। শেষে রাজা উঠে দাঁড়ালেন। রাগে আগুন হয়ে বললেন, 'করছটা কি? তোমার মাথা কেটে ফেলব এবার।'

নাপিত তার মোহাবেশ থেকে একটু জেগে উঠল। কিন্তু 'অ্যাঁ?' ব'লে আবার চিন্তায় ডুবে গেল। মানুষের চিন্তার ওপর তো হাত নেই। কোন রাজা সে চিন্তা থামাতে চেষ্টা করলেও সফল হবেন না। নাপিতের চিন্তা নিজের পথে ছুটছে। আধা-কামানো রাজা ভীষণ চেঁচালেন। নাপিত হঠাৎ চোখ খুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখেছি! দেখেছি! গাধার মাথায় দেখেছি!'

—'কি? কি বললে তুমি?'

রাজা এখন নাপিতের ওপর বেজায় খাপ্পা। তাঁর গলা পর্দায় পর্দায় চড়ছে। তো নাপিত কাঁপতে কাঁপতে বলে ফেলল, 'ও হো হো হো...আপনার কান!'

বেচারা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। রাজা বললেন, 'আমার কানের জন্যে তুমি কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?'

—'প্রভু! আপনার মতো কান দেখেছি গাধার। গাধার কান আরেকটু বড়, এই যা!'

রাজা সত্যিই ক্ষেপেছেন। তবে স্বভাবটা তো ভালো, সে রাগ সামলেও নিলেন। বললেন, নাপিত যেন তাঁর কানের কথা কাউকে না বলে।

বড় দুঃখে বললেন, 'কিছুদিন হ'ল ও দুটো বড়ই হচ্ছে। তবে এ কথা কারুকে বলেছ কি মাথাটি কেটে নেব।'

নাপিত প্রতিজ্ঞা করল, কাকপক্ষীকে বলবে না। ক্ষুর বের করে কোন মতে ক্ষৌরকার্য সারল। নাপিতের মুখ বন্ধ রাখতে রাজা এক থলে মোহর দিলেন। একদিকে খুশি, ওদিকে মনে রাজার কান-রহস্যের বোঝা, নাপিত ছুটে ছুটে বাড়ি গেল এলতলা-বেলতালা ঘুরে। যাতে চেনা মানুষ নজরে না পড়ে। কিন্তু হাসি চাপতে গিয়ে কাঁপছে সে। হাহা-হিহি-ক্যাঁক ক্যাঁক-চিহি চিহি, কত রকম স্বরে যে হাসি বেরিয়ে আসছে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে। দেখে মানুষজন ভাবল, ও ক্ষেপে গেছে নিশ্চয়। ভাবল লেবুর শরবৎ খেলে ওর মাথা ঠাণ্ডা হবে, ক্ষ্যাপামিও সেরে যাবে।

বাড়ি পৌঁছতে দোরের সামনে মা দাঁড়িয়ে। মাকে দেখেই নাপিত গমকে গমকে হাসছে। মা ভাবছে, আমাকে দেখে এত হাসি কিসের! বউকে দেখে তো আরোই হাসি। বউ যত যা শুধোয়, জবাবে মেলে শুধু হাসি। হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে জল

গড়াচ্ছে। বউ ভাবল, স্বামী পাগল হয়েছে বুঝি বা। নিজের কপালকে দোষ দিতে থাকল। মানুষজন সরে যেতে হাসি একটু কমল।

স্নান করতে গিয়েই মনে পড়ল গাধার কান। আবার পেট থেকে ভসভসিয়ে উঠে এল হাসির ফোয়ারা। মাথায় জল পড়তে একটু ঠাণ্ডা হল। হেসে হেসে সর্বাঙ্গে খিল ধরে গেছে যেন।

স্নানের ঘর থেকে বেরোতে দেরি হচ্ছে দেখে মা ডাকতে গেল। মাকে দেখেই আবার হাসি। নিজেকে থামাতে পারছে না ও। নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। মা আস্তে ওকে নিয়ে গেল রান্নাঘরে, খেতে দিল। এক গ্রাস খায়, আবার মনে পড়ে যায়, হাসতে থাকে। বুক ব্যথা করছে, পেট কনকন করছে, থামতে তো পারছে না। খাবার গলায় আটকে গেল। হেঁচে ফেলল, দম আটকে ও অজ্ঞানই হয়ে যায় বুঝি। একটু সামলাতেই আবার সেই প্রাণান্তকারী হাসি শুরু হ'ল।

এক সময়ে চিন্তায় ব্যাকুল মা শুধোল, 'কি হয়েছে? ব্যাপারটা কি?'

রাজাদেশ অমান্য করে কি করে? মাথা কাটা যাবার ভয় নেই? অনেক জেরার পর ও বলল, 'তোমাকে বলি কেমন করে?'

মা বলল, 'এত হাসছিস কেন? কি দেখেছিস? তোর মুখ ফুলে গেছে, চোখ টকটকে লাল। বলতে পারছিস না কেন? আমাদের আর জ্বালাস না।'

—'কেমন করে বলব? রাজাদেশ অমান্য করব? কি করি আমি?'

—'তোর মা, যে তোকে জন্ম দিল, তোর গু-মুত কাড়ল, তাকেও বলতে পারিস না, এ এমনই গোপন কথা?'

—'রাজার অবাধ্য হই কি করে?' আবার সেই হাসি।

—'বুঝলাম! শোন্ বাছা! আমাকে নয় বলতে পারবি না। একটা গাছকে গিয়ে বল্না কেন? গাছ তো কথা কয় না। কাউকে বলবেও না।'

নাপিতের মনে ধরল কথাটা। সবাই বলে, দুঃখের কথা বলে ফেললে মন হালকা হয়। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ও জঙ্গলে চলে গেল গাছেদের কাছে কথাটা বলতে। ও গাছদের বলল,

ও গাছ! ওগো গাছ! কাউকে বোল না
আমি যা বলব!
ও পুংগা গাছ! কাউকে বোল না
আমি যা বলব!
ও পাড়িরি গাছ, কাউকে বোল না
কি দেখেছি সকালে!
ও ইলুপ্পাই গাছ! কাউকে বোল না
আমার গোপন কথা!

অরণ্য বৃক্ষ রাজি! মন দিয়ে শোনো
যে মহান নৃপতি এ রাজ্যের রাজা
তাঁর কান, গাধার কান!
গাছ! গাছ! কেউ যেন না জানে
আমি বলেছি এ কথা
হাসতে হাসতে মরে যাচ্ছিলাম,
তাই বলেছি!
রাজাদেশ পালন করেছি
মায়ের উপদেশ মেনেছি
হাসি আমাকে মারছিল,
আমি টুঁটি চেপে দিলাম হাসির
আর হাসব না গো!
রাতদিন হাসব না আর!

এ গান সে গেয়েই চলল। যে গোপন কথা ওকে ছিঁড়ে ফেলে ফেটে বেরোচ্ছিল, তার হাত থেকে মুক্তি পেল, গান থামাল।

ও বাড়ি ফিরে গেল।

কিছুদিন বাদে ডোমরা রাগ ও ছন্দে পারদর্শী এক ডোমরা বাদকের একটি নতুন ডোমরা দরকার। সে বনে গিয়ে জুৎসই গাছ খুঁজছে একটা। যে সব গাছকে নাপিত গোপন কথা বলে গেছে, তারই একটি কাটল ও। ডোমরার আড়াটা বানাল তাই দিয়ে, চামড়ায় মুড়ল। তারপর গেল রাজসভায়। রাগসংগীতের তালে তালে ডোমরা বাজিয়েই ও খ্যাতি পেয়েছে তো!

রাজসভায় গায়ক একটি রাগসংগীতের প্রথমাংশ গাইলেন চমৎকার। বাদককে বললেন ডোমরা বাজাতে। ডোমরাবাদক আলতো হাতে বাজাচ্ছে, যেন ডোমরা কথা কয়ে উঠবে ছন্দে ছন্দে।

শুনে সবাই তাজ্জব। ডোমরার তালে তালে বাজল,

ত্রাং তাক্ তাকা তাকা ত্রাং
তাক ত্রাং তাকা ত্রাং তাকা তাকা
রাজার কান, গাধার কান!
তাক ত্রাং তাকা তাকা তাকা ত্রাং
রাজার কান, গাধার কান!

সভায় সবাই স্পষ্ট শুনল এ কথা। সবাই চাইল রাজার দিকে। এখন সবাই বুঝল, রাজা কেমন করে ফিশফিশে কথাও শুনতে পান!

গোপাল ভাঁড়ের গল্প

বাংলা

এক গরিব স্বামী-স্ত্রী সবসময়ে কল্পনার জগতে থাকে, দিবাস্বপ্ন দেখে। গোপাল ভাঁড় তাদের বাড়ির পাশেই থাকে। একদিন দুজনে দিবাস্বপ্ন নিয়ে দারুণ মেতে গেল। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। বাতাসে প্রাসাদ গড়ে তোলা। গোপাল সব শুনতে পেল।

স্বামী বলছে, 'যেই টাকা পাব, গরু আমি কিনবই।'

বউ বলল, 'গাই দোয়াব আমি। দুধ রাখতে অনেকগুলো ভাঁড় লাগবে। যাই, কিনে আনি।'

পরদিনই বউ গিয়ে ভাঁড় কিনেছে। স্বামী বলছে, 'কি কিনলে গো?'

—'কেন, ভাঁড়? একটা দুধের, একটা ঘোলের, একটা মাখনের, একটাতে থাকবে ঘি।'

—'চমৎকার! কিন্তু পাঁচ নম্বর ভাঁড়টা?'

—'যে দুধটুকু বাঁচবে, সেটা তো আমার বোনকে দিয়ে আসব, তাই!'

—'অ্যাঁ? বোনকে দুধ দিয়ে আসবে, কেমন? বলি, কতদিন ধরে চলছে এ সব, অ্যাঁ? একবারটি আমাকে জিজ্ঞেস করা নয়, আমার অনুমতি নেওয়া নয়, দেখাচ্ছি!'

রাগের চোটে স্বামী হাঁড়িগুলো ভেঙেই ফেলল।

বউ বলল, 'আমি গরুর যত্ন করছি, দুধ দোয়াচ্ছি,—বাড়তি দুধ নিয়ে যা খুশি করব, হ্যাঁ!'

—'বজ্জাত মেয়েমানুষ বটে! আমি খেটেখুটে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গরু কিনব, আর উনি দুধ বিলোবেন বোনকে। তার আগে তোকে মেরেই ফেলব।'

স্বামী হুঙ্কার করে আরো থালাবাসন ছুঁড়ে বউকে মারল।

গোপালের মনে হল, ব্যাপারটা আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। ও এ বাড়ি এসে হাজির হ'ল। পড়শীকে শুধোল, 'ব্যাপার কি হে? জিনিসপত্র ছুঁড়ছ কেন?'

—'এই, এই মেয়েছেলেটা আমাদের গরুর দুধ ওর বোনকে দিয়ে আসছে।'

—'তোমার...গরু?'

—'নিশ্চয়। হাতে টাকা এলেই আমি গরু কিনব তো!'

—'ও! সেই গরু! এখন তো তোমার গরু নেই, তাই না?'

—'রোসো খানিক। গরু আমি কিনবই।'

—'তাই বুঝি? এখন বুঝলাম আমার সবজি বাগানে কি হচ্ছে!'

লাঠি দিয়ে পড়শীকে মারছে গোপাল।

—'আরে, কি করো? থামো, থামো! আমাকে হঠাৎ পেটাচ্ছ কেন?'

—'তোমার গরু! আমার বাগানে ঢুকে যত সিম আর শসা খাচ্ছে। তুমিও দিব্যি ছেড়ে রেখেছ।'

—'সিম? শসা? তোমার সবজি বাগান কোথায়?'

—'বাগানটা তো বানাব এবার। কয়েকমাস ধরেই ভাবছি বানাব, আর তোমার গরু বাগান তছনছ করছে তো করছেই!'

এতক্ষণে পড়শীর মাথায় ঢুকল ব্যাপারটা। তখন হাসাহাসির ধুম পড়ে গেল।

মেথরের স্বপ্ন

ওড়িয়া

রাজবাড়ির মেথরানীর একদিন শরীরটা খারাপ করেছে। ওর স্বামীও মেথর, তাকে বলল রাজবাড়ি যেতে। মেথরকে ঢোকানো হ'ল খিড়কি দরজা দিয়ে, যাতে ও রানীর খাটা-পায়খানার নিচ থেকে গুয়ের চাড়ি সরিয়ে নিতে পারে। যখন ও খাটা-পায়খানার তল থেকে চাড়ি সরাতে গেছে, রানী তখন পায়খানায় বসেছেন মুখ তুলে মেথর এক ঝলক দেখেছে ওঁর উরুর ভেতর দিকটা। আহা, রেশমের মত মসৃণ, জুঁইফুলের পাপড়ির মতো শুভ্র আর কোমল গো! এক ঝলকে ওটুকু দেখেই মেথর রানীর জন্যে কামনায় পাগল হ'ল। আহা, দেহের বাকিটা তাহ'লে কত না সুন্দর গো! ঘরে ফেরার কালেও রানীর উরুর ওই একটুখানি ওর মন জুড়ে রইল। এমনই বশ করল ওকে, যে মেথর না পারে খেতে, না পারে ঘুমোতে। বউ যখন শুধোল, ব্যাপারটা কি! কেন মেথর এমন ভাবে-বিভোর? মেথর সত্যিকথাটা বলেই ফেলল। রানীকে চাই।

—'হা ঈশ্বর! তুমি চাও রানীকে পেতে? তুমি? একটা সামান্য মেথর? অন্য কোন মেয়েকে চাইলে, সে নয় ভাবা যেত। চেষ্টা করতাম আমরা। কিন্তু রানী! ও সব ভুলে যাও, বুঝলে? সাধারণ লোক ওঁকে চোখের দেখাও দেখতে পায় না।' বউ কত বোঝাল। স্বামীর মন জুড়ে আছে রানীর উরু। সে পাগলামি সারাতে চেষ্টা করল। লাভ হ'ল না কিছু। মেথরের মন একই চিন্তার বেড়াজালে বাঁধা পড়েছে। মন যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

ক্ষ্যাপাক্ষ্যাপ্ত হয়ে উঠল মেথর। কাপড় ছাড়ে না, খায় না, ঘুমোয় না, শেষে একদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়েই গেল। এখন ও পথের মানুষ। একদিন এক বটগাছের নিচে বসে রানীর উরুর কথা ভাবছে, কিছু গ্রামবাসী জড়ো হ'ল।

ওরা ক'দিন ধরেই দেখছে, যেন ধ্যানমগ্ন ও। খায় না, ঘুমোয় না, কথা বলে না, দেহও যেন স্থির পাষাণ। এখন মুনিঋষি সম্পর্কে তাদের যেমন ধারণা, তার সঙ্গে এ মানুষ তো খাপ খেয়ে যায়।

ওরাই ওর পরিচর্যা শুরু করল। কত অর্ঘ্য, খাবার, বস্ত্র, আনতে থাকল। ও ফিরে চেয়েও দেখল না। এমন নিঃশেষ ঔদাসীন্য দেখে ওর পবিত্রতা সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হ'ল। ওকে ঘিরে যে ভক্তজনের ভিড়, ও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।

এক মাসেই ও এক বিখ্যাত ব্যক্তি। সারা দেশে ওর খ্যাতি ছড়িয়ে গেল। মেথর সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। রানীও ওর নাম শুনলেন। এই পুণ্যাত্মাকে দর্শন করতে চাইলেন।

রানী দাসদাসী নিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়ালেন। মাটিতে লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন ওর পা ছুঁয়ে। সামনে রাখলেন নানা নৈবেদ্য। মেথর ওঁর দিকে তাকালই না। উনি কে, তাও জানে না, জানতে চায়ওনি। ওকে এ সব স্পর্শই করল না।

ওর কামনা ছিল উদগ্র। তা ওকে নিয়ে যায় সেই অবস্থায়, যেখানে ও হয়ে গেল সম্পূর্ণ নিষ্কাম।

ছেলেটা জ্ঞান বেচত

গুজরাতি

এক গরিব ব্রাহ্মণ বালক বাপ-মা হারিয়ে অনাথ হ'ল। কোন কাজকর্মও পায়নি। তবে ছেলে খুব চালাক। বাপকে দেখে দেখে অনেক কিছু শিখেও ফেলেছে। একদিন তার মাথায় বিদ্যুৎঝলকে খেলে গেল বুদ্ধি।

শহরে গিয়ে ও সবচেয়ে সস্তা আর ছোট্ট একটা ঘর নিয়ে দোকান খুলে বসল। যে সামান্য পয়সা বাঁচল, তা দিয়ে কিনল কাগজ-কালি-কলম। একটা বড় কাগজে 'জ্ঞান বেচা হয়' লিখে দোকানের সামনে টাঙিয়ে দিল। ওর চারপাশে বড় বড় শেঠ, তাদের বড় বড় দোকান। মানুষ যা নিত্য কেনে, তাই বেচে ওরা। কাপড়-সোনাদানা-ফল-তরকারি, এ সব। বামুন ছেলে সারা দিন গলা চড়িয়ে খদ্দের ডাকতে থাকল, 'জ্ঞান বেচা হয়, জ্ঞান! সঠিক দামে জ্ঞান বেচা হয়!' যারা বাজার করতে এসেছে তারা তাই কিনতে চায়, যা দেখা যায়, শোঁকা যায়, খাওয়া যায়, শোনা যায়। তারা ওকে পাগলই ভাবল। ভিড় করে ওকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করল।

কেউ এক ফোঁটা জ্ঞানও কিনল না। ছেলে কিন্তু আশা ছাড়েনি।

এক বণিকের ছেলে ধনী, কিন্তু মাথামোটা। সে একদিন ও পথে যাচ্ছে, তো শুনছে বামুন ছেলে জ্ঞান ফেরি করছে। কি যে বেচা হচ্ছে তা ও বোঝেনি। ভেবেছে, কোন সবজি হবে, অথবা এমন জিনিস যা হাতে ধরা যায়। তাই বামুন ছেলেকে শুধোচ্ছে, সের কত করে?

বামুন ছেলে বলছে, 'আমি ওজন দরে জ্ঞান বেচি না। আমার জিনিস ভারে কাটে না, ধারে কাটে।'

বণিকপুত্র একটি পয়সা দিয়ে এক পয়সার জ্ঞান চাইল। বামুন ছেলে এক টুকরো কাগজে লিখল, 'দু'জন যখন ঝগড়া করে, দাঁড়িয়ে তা দেখা সমীচীন নয়।' বণিকপুত্রকে বলল, কাগজটা পাগড়িতে বেঁধে রাখতে।

বণিকপুত্র বাড়ি গিয়ে বাপকে দেখাচ্ছে কি কিনেছে।—'এক পয়সার জ্ঞান কিনেছি বাবা, পাগড়িতে বেঁধে নিয়েও এসেছি।'

বাবা গিঁঠ খুলল, কাগজে কি লেখা আছে তা পড়ল, 'দু'জন যখন ঝগড়া করে, দাঁড়িয়ে তা দেখা সমীচীন নয়।'

বাবা তো খেপে লাল। সে ছেলের ওপর চিল্লাচ্ছে, 'গাধা! এক পয়সা দিয়ে এই ছাইপাঁশ কেউ কেনে? সবাই জানে, দু'জন ঝগড়া-মারামারি করলে তা দাঁড়িয়ে দেখা ঠিক নয়!'

তখনি বাজারে, বামুন ছেলের দোকানে গিয়ে ও চেঁচাচ্ছে, 'বজ্জাত! আমার ছেলেকে ঠকিয়েছ তুমি। সে এক গাধা, তুমি এক জোচ্চোর। পয়সা ফেরত দাও, নইলে পুলিশ ডাকব!'

'আপনি যদি আমার মাল না চান, ফেরত দিতেই পারেন। ফেরত দিন আমার জ্ঞান, নিয়ে যান পয়সা।'

বণিক কাগজের টুকরোটা ছুঁড়ে দিয়ে বলছে, 'নাও! আমার পয়সা ফেরত দাও।'

'না, জ্ঞান তো ফেরত দেন নি, কাগজ ফেরত দিয়েছেন। পয়সা যদি ফেরত চান, দলিলে সই করতে হবে। লিখতে হবে, আপনার ছেলে কখনো আমার উপদেশমতো কাজ করবে না। সর্বদা সে দাঁড়িয়ে দেখবে ঝগড়া মারামারি।'

যে লোকজন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তারাও বামুন ছেলেকেই সমর্থন করল। বণিক তখন দলিলে সই করে পয়সা ফেরত নিল। ছেলে বোকার মতো যে কাজ করেছে, সেটা সহজে ভেস্তে দেওয়া গেল বলে সে বেশ সন্তুষ্ট।

সে দেশের রাজার দুই রানী। এ-ওর শত্রু। দু'রানীর দাসীরাও এরা-ওদের শত্রু। তাদের মালকিনদের মতো তারাও সর্বদা ঝগড়া করে। একদিন দুই রানীই যার-যার দাসীকে বাজারে পাঠিয়েছেন। একই দোকানে গেছে দু'জনে, একটাই কুমড়ো, তা দু'জনেই কিনতে চায়।

কাক-চিলের ঝগড়া বেধে গেল। তাদের গালিগালাজ আর অঙ্গভঙ্গি এত ভয়ানক, যে দোকানী দোকান ছেড়ে পালাল। বণিকপুত্র ওখানেই ছিল। বাবা আর বামুন ছেলের দলিলের কথাও ও জানত। কিন্তু ও গেল সেই ঝগড়া দেখতে।

দুই দাসী গালাগালির পর চুলোচুলি শুরু করল, তারপর চালাল ঘুসোঘুসি। এক দাসী বণিকপুত্রকে দেখে বলল, 'তুমি আমার সাক্ষী। ও আমাকে মেরেছে।'

অপর দাসী বলল, 'তুমি স্বচক্ষে দেখলে কে কাকে মারল। কতবার মারল, বলতো? তুমি আমার সাক্ষী।'

বেলা বাড়ছে, আরো কাজ আছে, দাসীরা চলে গেল।

যে-যার মালকিনের কাছে গিয়ে রং চড়িয়ে, ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে ঝগড়ার কথা নালিশ করল। রানীরাও রণচণ্ডী হয়ে রাজাকে নালিশ জানালেন। দুই রানীই বণিকপুত্রকে জানালেন, যে সে হচ্ছে তাঁর সাক্ষী। যদি তাঁর দাসীর সমর্থনে সাক্ষী না দেয়, মুণ্ডুটি নির্ঘাৎ কাটা হবে।

বণিক পুত্র বেজায় ঘাবড়ে গেল। বণিক নিজে আরও ঘাবড়ে গেল।

শেষে ছেলে বলল, 'সেই বামুনের কাছেই চলো। সে তো জ্ঞান বিক্রি করে। এ বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাবার কোন বুদ্ধি বাৎলাতে পারে কি না, দেখাই যাক না।'

বাপ বেটা গেল বামুন ছেলের কাছে। সে সাহায্য করতে রাজী, তবে এবার উপদেশ কিনতে হবে পাঁচশো টাকা দিয়ে। বণিক তখনি টাকা দিল। বামুন ছেলে বলল, 'যখন ওরা তোমাকে দরবারে ডাকবে, পাগলের অভিনয় কোর। ভাণ করবে, ওরা কি বলছে, তার কিচ্ছু বুঝতে পারছ না।'

পরদিন রাজা সাক্ষী ডেকেছেন। তিনি আর মন্ত্রী বণিকপুত্রকে নানাভাবে জেরা করে চললেন। সে ছেলে একটা কথারও জবাব ঠিকমতো দেয় না। ব্যা ব্যা করে, প্রলাপ বকে, এমন উলটোপালটা কথা কয়ে চলল, যে রাজা ক্ষেপে গিয়ে ওকে বের করে দিলেন। কৌশলটা কাজে লাগল। এতে বণিকপুত্র মহাখুশি। সকলকে বলে বেড়াল বামুনের ছেলের জ্ঞানের কথা। বাজার গরম হয়ে গেল বামুন ছেলের সুযশে।
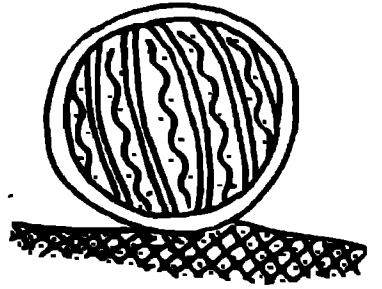
বণিক তেমন নিশ্চিন্ত নয়, তার ছেলেকে বাকি জীবন পাগলামির ভাণ করেই চলতে হবে, নইলে রাজা ধরে ফেলবেন যে তাঁকে ঠকানো হয়েছে। তখন নির্ঘাৎ ছেলের মুণ্ডুটি কেটে নেবেন।

আবার দুজনে বামুনের ছেলের কাছেই গেল। এবারও দিতে হ'ল পাঁচশো টাকা। বামুন ছেলে বলল, 'খবর রাখো, কখন রাজা খোশমেজাজে আছেন। তখন গিয়ে সত্যি কথাটা বলে ফেল। উনি মজা পাবেন, তোমাদের ক্ষমাও করে দেবেন। যখন হাসিখুশির মেজাজে আছেন, তখনি যেও।'

বণিকপুত্র ঠিক এ উপদেশ মেনেই কাজ করল। রাজা দেদার হেসে ওকে মাপ করে দিলেন।

বাজারের এই বামুন ছেলের কথা জেনে রাজার খুব আগ্রহ জাগল। তাকে ডেকে পাঠিয়ে শুধোলেন, বেচার মতো জ্ঞান কি আরো আছে?

ছেলে বলল, 'অঢেল। বিশেষ করে রাজারাজড়ার জন্যে। তবে আমাকে দিতে হবে লাখ টাকা!'

রাজা লাখ টাকা দিলেন। বামুন ছেলে কাগজে লিখল, 'কোন কাজ করার আগে গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখবেন।'

রাজা এতই খুশি, যে এ বানী তিনি তার বালিশের ওয়াড়ে সেলাই করলেন। নিজের বাসনকোসনে খোদাই করালেন। সর্বদাই চোখে পড়বে, বানীটিও ভুলবেন না।

কিছুকাল বাদে রাজার হ'ল অসুখ। মন্ত্রী আর দুই রানীর একজন, রাজাকে নিকেশ করার ষড়যন্ত্র করছিলেন। চিকিৎসককে ঘুস দিলেন। চিকিৎসক রাজার ওষুধে বিষ মেলাতে রাজী হলেন।

ওষুধ এল, রাজা সোনার পেয়ালাটি তুলেছেন। দেখেন গায়ে লেখা আছে, 'কোন কাজ করার আগে গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখবেন।' কোন সন্দেহ করেননি। ওষুধের পেয়ালাটা নামিয়ে ওষুধটা দেখছেন।

দেখছে তো চিকিৎসকও। তার মনে পাপ। সে ভেবেছে, রাজা বুঝি ধরে ফেলেছেন, ওষুধে বিষ আছে। সে রাজার পায়ে পড়ে সব ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়ে কাঁদছে আর ক্ষমা চাইছে।

রাজা প্রথমটা হতচকিত। তারপর সেপাই শাস্ত্রী ডেকে চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করালেন। তারপর মন্ত্রীও অপরাধী রানীকে ডেকে বললেন ওষুধটা খেতে।

তাঁরাও তাঁর পায়ে পড়ে মাপ চাইলেন। রাজা ওদের দিলেন ফাঁসি। চিকিৎসককে রাজ্য থেকে নির্বাসনে দিলেন।

বামুন ছেলেকে করলেন মন্ত্রী। ঐশ্বর্যে সম্মানে তাকে বিভূষিত করলেন।

দুই বয়াম ফার্সী ভাষা

পাঞ্জাবী
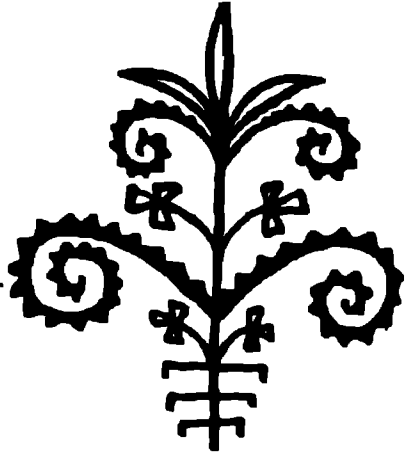
বহুকাল আগে দুরানীরা পাঞ্জাব জয় করেন। ছিল একটি ছোট তাঁতিদের গ্রাম। দুরানীরা বলত ফার্সী, তাঁতিরা বলত পাঞ্জাবী। গ্রামবাসীদের মহামুশকিল। তশীলদার যখন খাজনা নিতে আসে, ওরা না পারে হিসেব দিতে, না পারে অভাব অভিযোগ জানাতে। শাসক যা বলে সব সয়ে যেতে হয়, যা চায় তাই দিতে হয়।

তাই তাঁতিরা এক জমায়েৎ ডাকল। সবাই মিলে ঠিক করল, মাথা পিছু দশ টাকা চাঁদা তুলে এক ফাণ্ড হবে। ওদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী দুজনকে কাবুলে বা আরো দূরে পাঠানো হবে। তারা বেশ খানিকটা ফার্সী ভাষা নিয়ে আসবে।

যেমন কথা, তেমন কাজ! তাঁতিদের মধ্যে যারা জ্ঞানী বলে এক জীবন্ত কিংবদন্তী, সেই দুই বুড়ো বেরিয়ে পড়ল। দামী জিনিস আনতে হবে, ওরা পেশোয়ার পেরোল, পার হ'ল দুর্গম খাইবার পাস।

প্রতি গ্রামে ওরা গভীর উদ্বেগে শুধোয়, 'হ্যাঁ গো! বেচবার মতো খানিক ফার্সী ভাষা মিলবে? আছে?'

গ্রামবাসীরা হাসে, নয় কান দেয় না, নয় পেছনে লেগে তাড়িয়ে দেয়। অবশেষে পৌঁছল জালালাবাদ শহরে। ঢোকার ফটকে যার সঙ্গে দেখা হল, সে ধূর্ত আর নিষ্ঠুর। তাঁতি বুড়োরা বলল, 'আমাদের গাঁয়ের জন্যে কিছু ফার্সী ভাষা কিনতে চাই।'

লোকটা বুঝেছে, এরা বেজায় বোকা। এদের ধোঁকা দিয়ে টাকা বাগানো যাবে।

সে বলল, 'নিশ্চয়। সঙ্গে এসো আমার। যদি দাম দিতে রাজী থাকো, আমি তোমাদের দু' বয়াম খাসা ফার্সী ভাষা দেব।'

নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে ওদের খাওয়াল দাওয়াল, শোবার ব্যবস্থা করে দিল। এ হচ্ছে বছরের সেই সময়, যখন ঘরের কড়িকাঠে চাক বাঁধে। লোকটা দুটো বয়ামে গুড় ঢেলেছে। তাতে ঢুকিয়েছে বেশ কয়েকটা ভিমরুল। বয়ামের মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধেছে। বয়াম দুটো বেচেছে ওদের।

লোকটা বলল, 'সাবধান! পথে বয়ামের মুখ খুলো না। তাহ'লে ফার্সী ভাষা পালিয়ে যাবে। যত্নে বয়ামের মুখ এঁটে রেখো। বয়ামের গলায় গলায় ফার্সী ভাষা! বাড়ি পৌঁছে বিষ্যুৎবার দেখে সকলকে ঢোকাবে এক অন্ধকার ঘরে। দরজা জানলা বন্ধ করে জামাকাপড় খুলে ফেলবে। তখন বয়ামের মুখ খুলো। সবাই যে-যার ভাগ পাবে, খুশিও হবে।'

সাতরাজার ধন এক মাণিক সে বয়াম নিয়ে তাঁতিরা ভারতে ফিরে চলল। গ্রামে ফিরেই পাড়াপড়শী ডেকে সুসংবাদ দিল। ফার্সী বোঝাই আশ্চর্য বয়ামও দেখাল। অন্ধকার ঘরে গিয়ে দোর জানলা আটকে, জামাকাপড় খুলে তড়িঘড়ি বয়ামের মুখ খুলল।

যেই ছাড়া পেয়েছে, অমনি ডিমরুলগুলো বেরিয়ে সকলকে কামড়াতে লেগেছে। তাঁতিরা দেয়াল হাতড়াচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে, 'দরজা কোথা গেল, দরজা?'

অবশেষে দরজা খোলা গেল। সবাই ছুটে বেরোল। ভিমরুলের কামড়ে মুখ যা ফুলেছে, এ-ওকে চিনতে পারে না। একজন মা'কে খুঁজছে, তো অন্যেরা বলছে, 'তোমার মা ওদিকে দৌড়ল। একগাদা ফার্সী লেগে আছে তার গায়ে।

মাকে খুঁজে পাওয়া গেল। বেচারি এমন কামড় খেয়েছে যে ব্যথার চোটে তাকে বিছানা নিতে হ'ল।

এরপর ও গ্রামের তাঁতিরা আর ফার্সী ভাষা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে সাহস পায়নি। যারা নতুন ভাষা শিখতে দড় আর চালাক, তারাই ফার্সী ভাষা শিখুক গে!

যে দেশে যেমন

পাঞ্জাবী

বিয়ে করল, আর বাপ মরে গেল ছেলেটার। ছেলের শ্বশুর শাশুড়ি বড় কাতর হলেন। মা বললেন, 'বেচারা ছেলেটা একা পড়ল। ও এসে বউ নিয়ে যাক। ওকে খবর পাঠাই। ভালো বউয়ের মতো মনের মিতা কি হয়?'

খবর পেতেই ছেলেটা সেজেগুজে ঘোড়ায় চেপে রওনা হ'ল। পথে এক জঙ্গলে দেখে অতিকায় অজগরে আর বেজিতে লড়াই লেগেছে। ঘোড়া থামিয়ে ও সাপে নেউলে লড়াই দেখছে। বেজি তো সাপকে হারিয়ে দিচ্ছে। সাপের দেহও ক্ষতবিক্ষত। সাপটা হয়তো মরেই যাবে।

ছেলেটা ভাবছে, 'বেজির সঙ্গে সাপ পেরে উঠবে না। এখন ওদের ছাড়িয়ে দিলেই ভালো।'

ছাড়িয়ে দিতেই গেল ও। কিন্তু বেজি তো দ্বিগুন বিক্রমে তেড়ে তেড়ে আসছে। ছেলেটা তরোয়াল বের করে বেজিকে কেটে ফেলল।

ঘোড়ার কাছে গিয়ে চড়তে যাবে, সাপ তো তেড়ে এসে ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে

জড়াল। ছেলেটা বলল, 'তোমার প্রাণ বাঁচালাম, উপকারই তো করলাম। তুমি কি করছ?'

সাপ বলল, 'হক কথা। শত্তুরের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছ। কিন্তু আমি তো ছাড়ছি না, তোমায় আমি খাব।'

ছেলেটা বোকা বনেছে, ভয় পেয়েছে, রেগেও গেছে।—'কেন? একটা উপকারের বদলে আরেকটা উপকার করতে কি নেই? প্রাণ বাঁচালাম বলেই কি আমাকে মারবে? আমাদের দেশে আমরা এমন করি না।'

—'এ সব অঞ্চলে পৃথক নীতি হে! এ দেশে কেউ ভালো করলে তার ক্ষতি করাটাই নিয়ম।'

ছেলেটা সাপটাকে যুক্তি দিয়ে কতই বোঝাল। সাপ কোন কথা মানতে রাজী নয়। সে জাতে অজগর, তায় ক্ষুধার্ত, ছেলেটাকে সে খাবেই।

শেষে ছেলেটা বলল, 'বেশ, নাগমশাই, তাই খেও। তবে আট দিন সময় দাও, কাজকর্ম গুছিয়ে রেখে আমি আসব। তখন খেও।'

—'তাই হোক। চেহারা তো ভালো মানুষের মতই, আট দিনে ফিরো কিন্তু।'

সাপটা ছেলেটাকে ছেড়ে দিল। ঘোড়ায় চেপে ও শ্বশুর বাড়ি গেল।

আত্মীয়-কুটুম-বন্ধু-বিশেষত তরুনী বউ ওকে পেয়ে সবাই খুশি। থাকলও ওখানে ক'দিন। কিন্তু সর্বদাই মনমরা, যেন বিষণ্ণ। এখানে সবাই ভাবিত হ'ল।

—'কি হয়েছে বলো? এখনো কি বাপের জন্য শোকাকুল? আমরা কিছু করতে পারি?'

ও জবাবই দিল না। সাতদিনের দিন বাপ-মা বউকে শুধোল, 'ওর কি রাগ হয়েছে? কি হয়েছে ওর?'

বউ, চেষ্টা করেও কিছু জানতে পারল না।

আট দিনের দিন ও বলল, 'রওনা হওয়া যাক।'

শ্বশুর শাশুড়ি মেয়েকে দানযৌতুক দিল, ওদের চাপাল গরুর গাড়িতে, বিদায় দিল।

গ্রাম ছেড়ে খানিক দূর গিয়ে ছেলে বলল, 'তোমরা সবাই ফিরে যাও। আমি জেনেছি, পথেই আমার মৃত্যু হবে। তোমরা ফিরে যাও।'

দাসদাসী ভয় পেয়ে চলে গেল সবাই। বউ বলছে, 'যেখানে তোমার মৃত্যু, সেখানে আমারও মৃত্যু। ঘরে ফিরে আমি কি করব?'

কঠোর জেদে ও সঙ্গে চলল।

ঠিক জায়গায় পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে ছেলে সাপকে ডাকল।

—'কথা দিয়েছিলাম, এসেছি। খেতে চাও তো এসো, খাও আমাকে।'

ওর বউ এ-হেন সর্বনাশা কথা শুনে ওর সঙ্গে চলেছে। শোনা গেল এক দারুণ

ফোঁসফোঁসানি। এক পেল্লায় সাপ হাঁ করে বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে, ছেলেটাকে খাবে।

বউ বলল, 'থামো! কেন তুমি ওকে খেতে যাচ্ছ, শুনি?

সাপ ওকে আদ্যোপান্ত কাহিনী বলে শেষে বলল, 'যে দেশের যা নিয়ম! এ দেশে আমরা উপকারীর ক্ষতি করি।'

সাপটার মন নরম করার জন্যে বউটি অনেক নীতিকথা, অনেক যুক্তি শোনাল। সাপ তো শোনে না। শেষে বউ বলল, 'তুমি বলছ, এ দেশে উপকারীর ক্ষতি করে মানুষ! এ তো এক বিচিত্র প্রথা। কোন যুক্তিই নেই এর সপক্ষে। আমি এমন প্রথা 'কেন', তা জানতে চাই। কোথা থেকে এল এ প্রথা?'

—'ওই পাঁচটা তাল গাছ দেখছ? ওদের কাছে যাও। খুব চেঁচিয়ে শুধোও, এ দেশে মানুষ উপকারীর ক্ষতি করে কেন?—শোন, ওরা কি বলে!'

বউ গিয়ে মাঝের তালগাছটিকে শুধোল। গাছ বলল, 'শুনে দেখ, আমরা পাঁচটা গাছ। তিন জোড়া ছিলাম। ছয় নম্বর গাছটা ছিল ফোঁপরা, তার গুঁড়িতে কোটর।' সে সেই গাছটির কথা বলল।
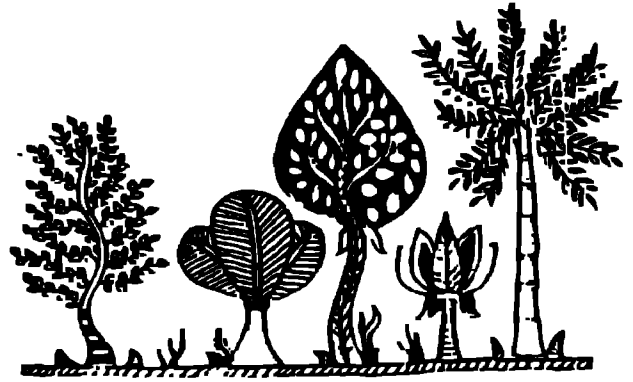
'বহুকাল আগে এক চোর চুরি করে পালাচ্ছিল, লোকজন তাকে তাড়া করে। পালাতে পালাতে সে এখানে আসে। তখন রাত, তবে জ্যোৎস্না রাত। সেই তালগাছের কোটর দেখে ও তার মধ্যে লুকোয়। লোকজন হইহই করে তেড়ে আসছে। চোরটি মিনতি করে বলে, হে তাল বৃক্ষ! বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!'

'তালগাছ ওর করুণ মিনতি শুনে, কোটরের চারদিক ঢেকে নিল, ওকে লুকিয়ে রাখল। লোকজন এখানেও গাছ ঘিরে ঘিরে খুঁজল। কোথাও ওকে পেল না, ওরা চলে গেল। তালগাছও ওর আচ্ছাদন খুলে চোরকে যেতে দিল।

'তালগাছ যখন অতি বৃদ্ধ হয়, তখন সুগন্ধ ছড়ায়। অনেকে ভাবে, তালের মধ্যে চন্দন কাঠ জন্মেছে। এই চোর যখন চলে যায়, ওর গা থেকে চন্দনের গন্ধ ছড়াচ্ছিল। ও যেখানেই যায়, এ গন্ধ ওর দেহের যেন সঙ্গী। ও গেছে এক রাজার দেশে। এক পথচারী সে সুগন্ধ পেয়ে বলছে, 'এমন সুগন্ধি পেলে কোথায়?'

—'খোয়াব দেখছ নাকি? আমি সুগন্ধি মাখি না।'

—'চমৎকার সুগন্ধ! যদি এটা দাও, আমি দাম দেব।'

—'যাও তো হে, কেটে পড়ো। গন্ধ টন্ধ মাখি না আমি। গন্ধ তোমার নাক দিয়ে বেরোচ্ছে।' লোকটা ধূর্ত ছিল। সে রাজাকে গিয়ে বলল, 'শহরে এক ভিনদেশী এসেছে। চমৎকার সুগন্ধি আছে ওর কাছে। আপনাকে হয়তো দিয়ে দেবে চেপে ধরলে।'

রাজা লোকজন পাঠালেন। চোরকে ধরে আনা হ'ল। রাজা বললেন, 'কোথায় পেয়েছ্ সুগন্ধি? আমাকে ওটা দেখাও তো?

—আমার কাছে কিচ্ছু নেই!

—কথা না বাড়িয়ে দিয়ে দাও তো বখশিস পাবে। অন্যথায় তোমায় মেরে ওটা নেব।

ভয়ের চোটে চোর বলল, 'মারবেন না। খুলে বলছি সব কথা। ও বলল তালগাছের কোটরে লুকোবার ইতিহাস, বলল, সেই থেকে চন্দনগন্ধ ওর সঙ্গের সাথী। শুনে রাজা বললেন, 'চঁলো, সে আশ্চর্য গাছ্ কোথায়, তা দেখাবে চলো।

'ওরা চলে এল এখানে। রাজা বললেন, গাছটি কেটে ওঁর প্রাসাদে নিয়ে যেতে। সেই প্রাচীন, দীর্ঘ তরু যখন এ কথা শুনল, এর কারণটা বুঝল, সে চীৎকার করে বলল, 'একটা লোকের প্রাণ বাঁচাই, সে জন্যে আমাকে আজ মরতে হচ্ছে। এখন থেকে আইন হোল, এ জঙ্গলে যদি কেউ উপকার করে, তার ক্ষতি কোর।'

বউ এ করুণ কাহিনী শুনে স্বামীর কাছে ফিরে এল। সাপ বলল, 'তালগাছরা বলল কিছু? এখন বিশ্বাস হ'ল তো, আমি যা বলেছি, এ দেশের প্রথাই তাই?'

বউটিকে তা মানতেই হ'ল। তবু সাপ যখন এগোচ্ছে, ও কাঁদতে লাগল। বলল, 'আমার কি হবে? স্বামীকে খাচ্ছ যখন, আমাকেও খাও।'

সাপের মনে হ'ল এটা তো ন্যায্য কাজ হয় না। সে বলল, 'তোমাকে? কেন? তুমি আমার উপকার করোনি, এমন কি কোন ক্ষতিও করোনি। আমি তোমাকে খাব কোন্ যুক্তিতে?'

—'আমার স্বামীকে খাও যদি, আমার জীবনে থাকলটা কি? তুমি বলছ, আমি তোমার উপকার করিনি। তবু আমার ক্ষতি করবে, সর্বনাশ করবে? কেন?'

এ কথা শুনে সাপের ভারি অণুশোচনা হ'ল। বউটা কাঁদছেও হাপুসহপুস। সাপ জানে, যে নিয়মমতো বরকে খেতে হবে। কিন্তু বউকে সান্ত্বনা দেবে কি করে? ওর ক্ষতি করাটা তো ন্যায্য হয় না! মেয়েটাকে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। সাপ নিজের গর্তে ঢুকল, দুটো জাদু-বড়ি নিয়ে বেরিয়ে এল।

—'হাঁদা মেয়ে। বড়ি দুটো নিয়ে খেয়ে ফেল। সোনার চাঁদের মতো দুটো ছেলে হবে। তাদের নিয়ে দিন কেটে যাবে, পরে তারাও তোমাকে দেখবে শুনবে। এখন যাও!'

বউ যেমন হাতে বড়ি পেয়েছে, মগজে বুদ্ধি ঝিলিক দিয়েছে। সে বলছে, 'হ্যাঁ, বড়ি খেলাম, ছেলেও হ'ল। আমার সুনাম থাকবে তাতে? স্বামী নেই, ছেলে হয়েছে, ছেলেদের সবাই বেজন্মা বলবে না?'

এত ঝামেলার কথা তো সাপ ভাবেনি। রণে ভঙ্গ দিয়ে ও বলছে, 'মেয়েরা কি প্যাঁচালো, কি প্যাঁচালো!'

.আবার ও গর্তে ঢুকল, আবার আনল দুটো জাদু-বড়ি। বউকে দিয়ে বলল, 'শোধ নিতে পারলে খানিক শান্তি পাবে। যদি কেউ তোমার দুর্নাম রটায়, তোমার ছেলেদের কুৎসা করে, এই বড়ি ধরবে তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে। লোকটার মাথার ওপর ধরে আঙুলে ঘোরাবে বড়িটা। গুঁড়োগুলো যেমন ঝরে পড়বে, লোকটা পুড়ে ছাই হয়ে ধোঁয়া উঠবে, দেখো?'

প্রথম বড়ি দুটো সযত্নে আঁচলের খুঁটে বাঁধল বউটি। অন্য বড়ি দুটো বুড়ো আঙুল আর তর্জনীতে চেপে সাপের ওপর আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'অ সাপ! বল না গো! এমনি করে ঘোরাব?'

এক কণা গুঁড়ো গায়ে পড়তেই সাপটা হয়ে গেল জ্বলন্ত আগুনের সাপ। পরে দেখা গেল এঁকে বেঁকে লম্বা কি যেন পড়ে আছে, তা সাপ নয়, সাপ-পোড়া ছাই।

তারপর হাসিমুখে বউ বরকে বলল, 'যেই কারো ভালকরে, শেষ অবধি তার ভালোই হয় গো! ক্ষতির বদলে ক্ষতি মেলে। ভালো করেছিলে, দেখ তার প্রতিদানও পেলে। সাপটা মন্দ করেছিল, শেষ হয়ে গেল। ঈশ্বর শেষ অবধি ন্যায়বিচারই করেন।

ওরা বাড়ি চলে গেল। আর অনে—ক দিন বেঁচে রইল সুখে শান্তিতে।

একজনের খুশি

উর্দু
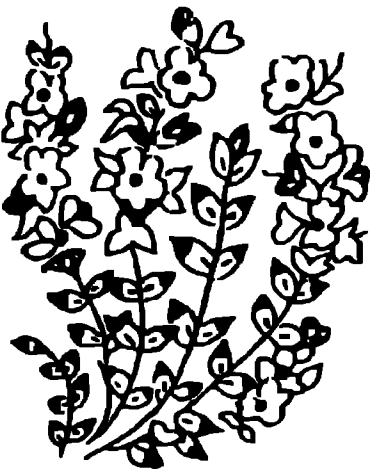
আফগানিস্থানের কাবুল শহর থেকে একটি লোক ভারতে বেড়াতে এল। এক শহরের পথে হাঁটতে হাঁটতে ও পৌঁছেছে এক মিঠাইওয়ালার দোকানে। সেখানে নানারকম মিষ্টি সাজানো আছে।

ও তো হিন্দুস্তানী ভাষার দু'একটা শব্দ মাত্র জানে। মিঠাইওয়ালার সামনে গিয়ে ও চমৎকার দেখতে একটা খাবার আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে।

মিঠাইওয়ালা ভাবল, ও মিষ্টান্নের নাম শুধোচ্ছে। তাই বলল, 'খাজা।'

এখন 'খাজা' হ'ল খাবার, আর প্রায় এক উচ্চারণে 'খা জা' হ'ল 'খেয়ে যা'। কাবুলের লোকটি দ্বিতীয় শব্দার্থটাই জানে। তাই ও হপহপ করে খাজা তুলছে, আর গপগপ করে খাচ্ছে।

মিঠাইওয়ালা দাম চাইছে। ও তো তা বোঝেনি। খেয়েদেয়ে মনের সুখে হাঁটা দিয়েছে।

মিঠাইওয়ালা ক্ষেপে গিয়ে পুলিসকে নালিশ করেছে। পুলিশ তো কাবুলের লোকটিকে ধরেছে। দারোগা বললেন যা, সেই শাস্তি দেওয়া হল। ওর মাথা ন্যাড়া করে আলকাতরা লাগাও। গাধার পিঠে চড়াও। ঢাকঢোল বাজিয়ে মিছিল করে ওকে শহর থেকে বের করে দাও।

এমন শাস্তির মানে হ'ল, দেখলে সবাই বুঝে যাবে, এ দেশে আইন ভাঙলে অপরাধী এই শাস্তি পায়। ভারতবর্ষে এ এক নিষ্ঠুর শাস্তি। কিন্তু কাবুলের লোকটি খুব মজা পেল। এমন ব্যবহার পেয়ে সে সম্মানিত, মুগ্ধ! আর রাস্তার মানুষজন ওকে কি আগ্রহে না দেখছিল!

দেশে ফেরার পর সবাই শুধোচ্ছে, 'ভারত দেশটা কেমন?'

—'দুর্দান্ত! চমৎকার দেশ, ধনী দেশ! স—ব কিছু বিনে পয়সায় মেলে! দোকানে গিয়ে মনপসন্দ্ মিষ্টির পাঁজা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দাও না। ওরা বলবে যত খুশি নাও আর খাও। পুলিস আসবে ঢাকঢোল আর শিঙা বাঁজিয়ে। তোমাকে কামিয়ে দেবে। মাথায় কলপ লাগিয়ে দেবে। চমৎকার একটা গাধায় চাপিয়ে ভারতীয় বাজনা বাজিয়ে তোমাকে শহর ঘোরাবে! আর, স—ব বিনে পয়সায়। চমৎকার দেশ! খুব অতিথিবৎসল সবাই! মানুষজন কি ভালো!

রাজা বিক্রম আর চীনের রাজকন্যে

হিন্দী

উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য ক্ষমতাশালী ও ন্যায়নিষ্ঠ সম্রাট। ন্যায় বিচারের জন্যে তিনি প্রায়ই ছদ্মবেশে প্রজাদের মধ্যে ঘোরেন। স্বচক্ষে দেখেন, রাজ্যে কি হচ্ছে। এ ভাবে তিনি অনেক নতুন, চমকপ্রদ কথা জানতে পারেন, অনেক রহস্যের জাল উন্মোচন করেন।

এক যোগী এলেন তাঁর রাজ্যে, নগর প্রান্তে নদীর ওপারে বসবাস করতে থাকলেন। ছোট্ট এক পাতার কুটীর, সেখানে জ্বলছে পবিত্র আগুনের ধুনি। আগুনের মধ্যেই তিনি বসে থাকেন।

শীঘ্রই তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা ছড়িয়ে পড়ল। লোকজন আসতে থাকল। কয়েকজন শিষ্য জুটে গেল। ক্রমেই শিষ্য সংখ্যা বেড়ে চলল। প্রাসাদেও তার নাম শোনা যেতে থাকল। বিক্রমাদিত্যের সন্দেহ হ'ল এ যোগী কোন শয়তান। তাঁর প্রাণহানির ষড়যন্ত্র চলছে নদী তীরে ওই

কুটীরে। এক রাতে ছদ্মবেশে বেরিয়ে নদী সাঁতরে তিনি যোগীর কুটীরের কোণে লুকিয়ে থাকলেন।

যা দেখলেন, তাতে ভয়ে রক্ত হিম হয়ে গেল। যোগী ধুনির মধ্যে বসে। সামনে চিত হয়ে আছে এক শব। একটা লোক শবের বুকে বসে আছে। বিক্রম চিনলেন এ এক বিক্ষুব্ধ প্রাক্তন মন্ত্রী। একে তিনি কর্মচ্যুত করেন। লোকটা মন্ত্র বলছে আর রক্তচন্দনে ডোবানো ফুল গুঁজে দিচ্ছে মড়ার মুখে। চারদিকে ধুপধুনোর ধোঁয়া। মড়া জাগিয়ে পিশাচি তৈরি করার প্রক্রিয়া চলছে।

ঘন্টা খানেক বাদে মন্ত্রী বলছে, 'বলো পুত্র কথা বলো।'

মড়ার ঠোঁট নড়ে, কথা সরে না।

—'বলো পুত্র, কথা বলো। মা কালীর কাছে তোমায় বলি দিয়েছি অকৃতজ্ঞ রাজার ওপর শোধ নিতে। কথা বলো!'

পুত্রহন্তা মন্ত্রী মড়ার মুখে ফুল-চন্দন-বেলপাতা গুঁজে চলেছে, মড়ার ঠোঁট নড়ে, কথা সরে না। বারবার তিনবারই চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল।

যোগী বলল, 'ধৈর্য ধরো। কুটীরে কোন বাইরের লোক এসেছে, তাই দেবী নীরব।'—গলা তুলে ও বলল, 'তুমি কে, এ পবিত্র ও গোপন তন্ত্রাচার দেখছ? যেই হও, এখনি কুকুর হয়ে যাও।'

তিনবার সে এ কথা বলল। বিক্রম কুকুর হয়ে গেলেন।

সকালে প্রাসাদে রাজা নেই। মন্ত্রী ও আমলারা ভীত, রাজার কোনো বিপদ হল? মানুষকে আতঙ্কিত করা চলে না। তাঁরা ঘোষণা করলেন, রাজা অসুস্থ। কিছুকাল রাজসভায় বসবেন না। এদিকে দিকে দিকে গেছে গুপ্তচর রাজাকে খুঁজতে। শেষে মন্ত্রীরা গেলেন জ্যোতিষাচার্য বরাহমিহিরের কাছে। বরাহমিহির গণনা করে জানলেন, যোগী রাজাকে কুকুর বানিয়ে রেখেছে।

বললেন, 'এই যোগী এক ভয়ংকর মায়াবী। রাজার শত্রু। মেরেই ফেলত রাজাকে, কিন্তু রাজাকেও রক্ষা করে চলে চার বীর, যারা দৈবী শক্তি ধরে। সামনের শুক্লা প্রতিপদে যোগীর গোপন তন্ত্রাচার সমাপ্ত হবে। তখন কালীশক্তির কাছে চার বীরও হীনবল হবে। রাজাকে রক্ষা করতে যা হয়, কিছু করতে হবে।' নীরব হলেন তিনি, দুশ্চিন্তায় মুখ মলিন।

সহসা ওঁর মুখ উদ্বেল হ'ল। যমজ ছেলেদের ডাকলেন। রাজার বিপদের কথা ব'লে বললেন, 'পুত্র! আমরা রাজার অন্নে পালিত। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় এখন। প্রাণ চলে গেলেও সে কাজ করতে হবে। তোমরা তৈরি তো?'

দু'জনে সমস্বরে বলল, 'আপনার বা রাজার কথা কবে অমান্য করেছি? বলুন, কি করতে হবে?

বাবা ওদের নদীতীরে নিয়ে গেলেন, ওপারে দেখিয়ে বললেন, 'ওটা যোগীর

কুটীর। দরজায় একটি কালো কুকুর দেখবে, তিনিই রাজা বিক্রম। আমি তোমাদের করে দিচ্ছি হরিণ। গিয়ে, ছলিয়ে ছলিয়ে কুকুরকে আনবে এ পারে। নদী গভীর নয়। যোগীর ক্ষমতা মাঝ নদী অবধি মাত্র। যত জোরে পার দৌড়ে যাও কুকুরকে নিয়ে এসো। মাঝ নদী না পেরোনো অবধি তোমরা বিপন্ন, বুঝেছ?'

দুই ছেলেকে তিনি হরিণ বানিয়ে দিলেন। ওরা সাঁতরে চলল যোগীর কুটীরের দিকে।

জল পেরিয়ে হরিণরা দোরের দিকে যেই গেছে, গর্জে উঠে কুকুরও ওদের তাড়া করেছে। হরিণ জলে ঝাঁপ দিল তো কুকুরও ঝাঁপ দিল। কুকুরের ডাকে ধ্যান ভেঙে যোগী দেখল ওদের। প্রথমে সন্দেহ হয় নি। কিন্তু তারপরেই ও বুঝেছে, হরিণের রূপে এরা মানুষ। তখনি চিল হয়ে ও উড়েছে হরিণের চোখ খুবলে নেবে ব'লে। রাজার রক্ষয়িত্রী চার বীর তা দেখে ধুলোর ঝড় তুলেছে। রাজা আর যমজ ভাই মাঝ নদী এখনি পেরোবেন, পেরোবেন, চিল ধুলো কেটে নেমে এসে একটি হরিণের একটা চোখ তুলে নিল। পর মুহূর্তেই রাজারা সংকটরেখা পেরোলেন। যোগীর মন্ত্র সীমার বাইরে চলে এলেন। চিলটা আকাশে পাক খেল. নামতে সাহস পেল না।
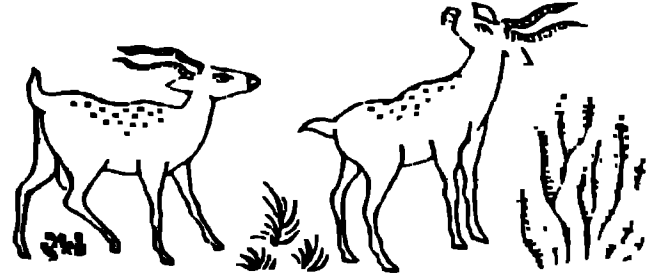
বরাহমিহির ওপারে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তিনজনকেই মানুষের রূপ ফিরিয়ে দিলেন। রাজা কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞতায় ভাসাভাসি রাজসভার সবাই। তবে দুঃখ একটাই ওই তরুণ কিশোরের একটা চোখ গেল।

ঘোষণা করা হ'ল জ্যোতিষাচার্য বরাহমিহিরের চেষ্টায় রাজা সেরে উঠেছেন। যোগী বনাম রাজা, এ বিষয়ে সবাই নীরব থাকলেন।

যোগীর শিষ্যরা ওদিকে সংখ্যায় যত বাড়ছে, শক্তিতেও তত। রাজার অলক্ষ্য প্রহরী চার বীর বলল, যোগীর অশুভশক্তি বাড়ছে, তাদের ক্ষমতা দিয়ে এঁটে ওঠা যাবে না। রাজা জ্যোতিষাচার্যকে বললেন, এ সংকট কাটাবার উপায় বলুন।

তিনি বললেন, 'রাজা! যোগীর সঙ্গে তো আমি পেরে উঠব না। আমি জানি তিনটি বিদ্যা, ও জানে তেরটা। ধ্যানবস্থায় জগৎ ঘুরলাম চীনের রাজকন্যে ছাড়া যোগীকে হারাতে পারবেনা কেউ। তিনি চৌদ্দটি বিদ্যা জানেন। তাঁকে বিয়ে করলে আপনার প্রাণ বাঁচবে।'

রাজা মন্ত্রীদের ডেকে রাজকার্য বুঝিয়ে দিলেন। তারপর তাঁর সেই ঘোড়ায় চেপে একলা রওনা হলেন, যা জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সমানে চলে। এ বিপদ যাত্রা থেকে কেউ তাঁকে নিরস্ত করতে পারল না।

বহুদিন চলার পর এক পথিককে শুধোলেন, 'ভাই! এ রাজ্য কার?'

'জানো না? এ তো মহান রাজা বিক্রমের।' বিক্রম যাচ্ছেন, যাচ্ছেন, যেখানেই শুধোন, উত্তর পান এ তাঁরই সাম্রাজ্য। কোনদিন বোঝেন নি তা কত বড়, কত সমৃদ্ধ। নিজ বংশধরদের জন্য এ সাম্রাজ্য রেখে যাবার সংকল্প আরো দৃঢ় হ'ল।

কয়েক মাস বাদে স্বরাজ্য পেরিয়ে ঢুকলেন চীন দেশে। কোন একদিন পৌঁছলেন রাজধানীতে। রাত হয়েছে। নগরের বাইরে এক বাগানে শুয়ে পড়লেন, গাছে ঘোড়া বেঁধে রেখে।

এখন হবি তো হ'! ওই পথেই যাচ্ছিল একদল চোর। ঘোড়াটা দেখে ওদের মনে হ'ল এ বড় সুলক্ষণ। চোরের সর্দার বলল, 'যাই পাই ভাই, ভাগাভাগি হবে আমাদের, আর এই পয়া ঘোড়ার মধ্যে।'

মারি তো হাতি, লুটি তো ভাণ্ডার! ওরা চুরি করেছে রাজকোষে। এত এত মণিমুক্তো, গয়নাগাঁটি, সব নিয়ে আবার এই বাগানে। ঘোড়ার গলায় দুর্মূল্য নওলক্ষা হীরের হার পরিয়ে দিয়ে ওরা যে যার পথে চলে গেল।

চুরি তো ধরা পড়ল। পুলিশ চোর খুঁজতে হন্তদন্ত হয়ে বাগানে পেল ঘুমন্ত বিক্রমকে, ঘোড়ার গলায় ঝুলছে নওলক্ষা হার। ওরা বিক্রমকে বেঁধে ছেঁদে ঘোড়াসুদ্ধ নিয়ে গেল চীন সম্রাটের সামনে। রাজা তো পরিচয় দেবেন না, তিনি নিশ্চুপ। সম্রাট তাঁকে চোর ঠাওরালেন। তাঁর হুকুমে জল্লাদ বিক্রমের হাত পা কেটে মাঠে ফেলে রাখল।

বিক্রম যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছেন, মানুষজন তাঁকে খোঁচাচ্ছে, দেখিয়ে হাসছে। রক্তপাতে দুর্বল, দিনটা ওখানেই পড়ে রইলেন। রাতে এক গরিব কলু যাচ্ছিল। এই তরুণ, সুন্দর অথচ হাত পা হীন যুবককে দেখে তার খুব কষ্ট হ'ল। ওর ঘা-গুলো বেঁধে কলু ওঁকে সযত্নে নিয়ে গেল কুটীরে। কলুর বউ তো জাঁহাবাজ কুচক্করে। ও দেখেই চিল্লাতে লাগল, 'অ উজবক! কি করেছ? এই নুলোখোঁড়াটাকে এনেছ কোন আক্কেলে? জান না ও চোর? সম্রাট ওর হাত-পা কেটে শাস্তি দিয়েছেন? তিনি খবর পেলে আমাদের ঘাণিতেই আমাদের পিষবেন!'

—'দেখ! আমি জেনেশুনে একে এনেছি। ও অসহায়। আমি ওকে 'ছেলে' বলেছি। তুমি ওর সঙ্গে তেমন ব্যবহারই করবে। একটা সৎকাজকে বাক্যবাণে নষ্ট করে দিও না। যাও, একটু মলম বানাও। আমি লাগিয়ে পট্টি বেঁধে দেব।' মোটে ইচ্ছে নেই, তবু বউ স্বামীর কথা মানল। ধীরে ধীরে ক্ষত সারল। রাজা শক্তি ফিরে পেলেন। কলু এখন ওঁকে ঘানির ওপরে বসায়। ষাঁড় ঘানিগাছ ঘোরায়। কলু ওঁকে খাবার, জল, সব এনে দেয়।

একদিন কলুর মনে হ'ল, তার পুষ্যি ছেলে বেজায় নোংরা, তেলকালিতে চিটাচীটে। বউকে বলল, 'ছেলেকে স্নান করানো দরকার। আজই করব।'

রাজা বললেন, 'বাবা! রাজকন্যের বাগানের পুকুরে স্নান না করালে আমি নাইতে চাই না।'

কলু বউ রণচণ্ডীর মূর্তি ধরল।—'দেখ! নুলোখোঁড়াকে দেখ! রাজকন্যের পুকুরে নাইবেন! জানিস না? ও বাগানের সোনায় বাঁধানো পথে কোন বেটাছেলে পা দেয় না? দেখ! ছেলের বাপ! এই যমের অরুচিটার সাধ মেটাতে অমন কাজ করতেও যেও না।'

—'ও কাজ আমি করবই। ও আমার ছেলে! ওর ছোট্ট একটা সাধ মেটাব। তাতে যা হয়, হোক!'

রাত ঘনালে রাজাকে কাঁধে বয়ে ও নিয়ে গেল রাজকন্যের বাগানে। রাতে কোন রক্ষীশাস্ত্রী নেই। রাজাকে নিয়ে গেল ঘাটে। রাজা বললেন তাঁকে ওখানে রেখে যেতে, মাঝরাতে নিয়ে যেতে। কলুর মন তো মানে না। বিক্রমের জেদে ও রাজী হ'ল।

রাজা কোনমতে জলে নেমে স্নান করলেন, কাপড় বদলালেন। পূজায় বসলেন। তিন ঘণ্টা পূজার পর আকাশে তারার গতি দেখে বুঝলেন, মধ্যরাত ঘনাচ্ছে। তখন তিনি গম্ভীর, ভরাট গলায় দীপক রাগ গাইতে শুরু করলেন। দীপক রাগ তো অন্তরাত্মাতেও ঝড় তোলে। রাগটি তাঁর রচনা, গাইতে পারেন একা তিনি। এ রাগের জন্যই বাতাস ও অগ্নির অদৃশ্য শক্তিগুলি তাঁর হাতের পুতুল। বিক্রম ও দীপক, যেন একই শব্দ। এমন অঙ্গাঙ্গী।

যেই গান ধরলেন, নগরের নিভানো আলো সব জ্বলে উঠল। নগরের লোকরা এ দৃশ্য দেখে ঘরে ঘরে অবাক। দীপক তো আলো জ্বালে!

গান উঁচুতে উঠছে, আলোর মালা উজ্জ্বল হচ্ছে। গান থেমে যাচ্ছে, আলো নিভে আসছে। গান শেষ তো আলোও নিভে গেল।

রাজকন্যে আলোর খেলা দেখেছেন। তিনি তখনি জানেন, এ আর কেউ নয়, রাজা বিক্রম। তাঁর হৃদয়ে যেন ঢেউ উঠল। তাঁর কতদিনের স্বপ্ন, যে ভারত সম্রাট বিক্রম, যাঁর জগৎজোড়া যশ, তাঁকে বিয়ে করেন। গুপ্তবিদ্যা প্রয়োগ করে জানলেন. তিনি এ নগরেই ছদ্মবেশে আছেন কোনো কলুর ঘরে।

মধ্যরাত্রি কাটতে না কাটতে কলু ওঁকে নিয়ে এল, বিছানায় শুইয়ে দিল। সূর্য তখনো ভাল করে ওঠেনি, রাতের পরিশ্রমে কলু তখনো বিছানায়, রাজদূতরা এসে বলল, রাজকন্যে ডেকেছেন ওকে। আগেই মনে হ'ল, বাগানে ঢোকার কথা জেনে গিয়েছেন। কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দেখে, শহরের সব কলুই করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তখন ও স্বস্তি পেল।

রাজকন্যে আমলাদের শুধোলেন, 'শহরের সব কলুই হাজির? কেউ বাদ পড়েনি?'

আমলারা নত মস্তকে মাথা নাড়ল।

তখন রাজকন্যে কলুদের বললেন, 'কাল ভোর ছ'টার মধ্যে তোমাদের প্রত্যেকে আমাকে একশো মণ তেল এনে দেবে। না দিলে তোমাদের সপরিবারে ঘানিতে পিষব। যাও!'

কাঁদতে কাঁদতে, রাজকন্যের আকাশ লাথথানো আবদারকে গাল দিতে দিতে কলুরা বাড়ি ফিরল।

আমাদের কলু যখন ঘরে ফিরল তখন তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। যেমনটি আশা করা যায়, তেমনটি ঘটল। কলু তার বউয়ের সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া করল। সেও তো ধানী লঙ্কা। চেঁচাতে থাকল, 'অ গাধা! বুঝেছ, কি করেছ? বলি নি, নুলোখোঁড়াকে ঢুকিও না? বলিনি, যমের অরুচিটা অপয়া? যেদিন থেকে ঢুকেছে, সব মন্দাদিকেই যাচ্ছে। কোথায় পাবে, একশো মণ তেল? তোমার বোকামির জন্যে কাল সব ঘানিতে পেষাই হব।' রোলারুলি করে ও মড়াকান্না কাঁদল। কলুর মাথা খারাপ হবার জোগাড়। সেদিন বাড়িতে উনোন জ্বলল না, খাওয়াদাওয়া হ'ল না।

অসহায় রাজা সারাদিন ঘানিতে বসে। খুব ক্ষিদের কষ্ট। সন্ধ্যায় কলুকে ডেকে কারণ শুধোলেন। কলু যখন সব বলল রাজা বললেন, 'বাবা! মরব তো সবাই একদিন! এখনি যদি মরি, মানুষের মতই মরব। উপোসে শুকিয়ে মরি কেন? যাও, খাবার জোগাড় করো।'

এরপর ওরা উঠল। রেঁধে বেড়ে যখন খাচ্ছে, ওরা তো জানে এটা শেষ খাওয়া। ঘুম কি সহজে আসে? ক্লান্তির ভারেই ওরা ঘুমিয়ে গেল।

ওরা ঘুমোলে রাজা নিচু গলায় ভৈরবী রাগিনী গাইতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর রক্ষাকর্তা চার বীর হাজির। তারা বলল, 'অগ্নিবংশে জাত হে সম্রাট! এ কাজ করছেন কেন? কতদিন এই পঙ্গু শরীরে বাস করবেন? কি আদেশ বলুন! আমরা হাজির!'

—'তোমরা আমার বিশ্বাসী বন্ধু। শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করব। কিন্তু এখন সাহায্য চাই। একশো মণ উৎকৃষ্ট তেল আনো।' ওরা উপে গেল। নিমেষে কলুর ঘরের সামনের পথ হাজার হাজার কালো মাটির জালায় ভরে গেল।

কলুর ঘুমের মধ্যে নানা দুঃস্বপ্ন আসছে। একটা এমন ভীষণ, যে ও চেঁচিয়ে মেচিয়ে পাড়ার ঘুম ভাঙাল। চোখ খুলে তেলের জালা দেখে ও ভাবল, সৈন্যরা ওকে কাটতে এসেছে। ওর কি আর্ত চীৎকার!—'বাঁচাও! বাঁচাও! মেরে ফেলল!'

ওই সব সৈন্যরা যে নড়ছেনা, সেটা যখন বুঝল, সাহস করে কাছে গিয়ে দেখে, ওগুলো সব তেল বোঝাই জালা! দুঃখে যেমন, আনন্দেও ও পাগল পাগল! তখনি ছুটল প্রাসাদে, রাজকন্যেকে বলল, তেল মজুদ!

রাজকন্যে একথা শুনতেই চাইছিলেন। তখনি বুঝলেন, বিক্রমের বীররা ছাড়া এ কাজ অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়। অতএব বিক্রম ওই কলুর বাড়িতেই আছেন। অন্য

কলুরা বলতে এসেছিল, তেল তারা জোগাড় করতে পারেনি। ওদেরকে পাঠিয়ে দিলেন বাড়ি। আর এই কলুকে শুধোলেন, 'খুলে বল তো সব! বাড়িতে কাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছ?'

—'আ-আর কেউ নয় রাজকন্যে। আমি, আমার বউ, আর এক বেচারা নুলোখোঁড়া,—তাকে ছেলে করেছি! মাঠ থেকে তুলে এনেছিলাম...'

তিনি বিক্রম! রাজকন্যে বললেন, 'দু'মাস বাদে পূর্ণিমার দিন বাবা আমার স্বয়ংবর সভা ডাকবেন। আমি স্বামী নির্বাচন করব। পৃথিবীর রাজকুল নিমন্ত্রণ পাবেন। সারা নগরও আসবে। তুমি সেদিন তোমার ওই ছেলেকে নিয়ে আসবে। এটা নিমন্ত্রণ, এবং আদেশও বটে।'

দু'মাস ধরে নগর বড় ব্যস্ত। চীনের রাজধানী উৎসবসজ্জায় সাজছে। স্বয়ংবরের দিন এসে গেল। পৃথিবীর রাজন্যবর্গ রাজধানী ঘিরে শিবির স্থাপনা করেছে। চমৎকার বর্ণাঢ্য মণ্ডপে দেখা হচ্ছে তাদের। সকলের আশা, রাজকন্যার মালাটি তাঁর গলাতেই দুলবে। স্বয়ংবর সভায় রেশম ও মণিরত্নের জাঁকজমক। একপাশে দাঁড়িয়ে কলু, তার কাঁধে তার ছেলে। দুজনেই ভালো জামাকাপড় পরেছে। কিন্তু সে তো রাজাদের চাকরদের পোশাকের চেয়েও নীরেস।

হঠাৎ দুই সহচরী নিয়ে রাজকন্যে ঢুকলেন। তাঁর রূপের আলো সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। মালা তাঁর হাতে, চোখ দুটি কাকে যেন খুঁজছে। অবশেষে দেখলেন কলুকে। অটল পায়ে এগিয়ে গেলেন, ওই নুলোখোঁড়ার গলায় পরালেন মালা। চীনের সম্রাটের মাথা হেঁট অবমাননায়, রাজাগজারা এ দেখে শিউরে উঠলেন।

কিন্তু স্বয়ংবর প্রথায় তো একবার বর নির্বাচন করলে তা বদলানো যায় না। সম্রাট বললেন, কলু ও তার বিকলাঙ্গ ছেলেকে ধুমধাম করে প্রাসাদে আনা হোক। কলু তো নিঃসম্বল, তাই কোষাধ্যক্ষকে কলুর বাড়ি পাঠানো হ'ল, বিয়ের আয়োজন করতে। বিক্রম কাউকে কিছু করতে দিলেন না। কোষাধ্যক্ষকে একরকম বের করেই দিলেন। রাতে কলুকে বললেন, তাঁকে রাজকন্যের বাগানের পুকুরঘাটে নিয়ে যেতে। সেখানে যাবার পর বললেন, 'বাবা! বাড়ি চলে যাও। ভোর হবার আগে আমাকে নিয়ে যেও।'

যখন তিনি একা, বিক্রম সুরু করলেন দীপক গাইতে। এই অপরূপ মায়াবী সংগীত বাতাসে যতই ছড়ায়, ততই দীপমালা জ্বলে ওঠে নগরে। রাজকন্যে জেগে উঠে সব দেখলেন।

জাদুবলে অপ্সরার রূপ ধরে তিনি বাগানে গেলেন। বিক্রম ওঁকে চিনতে পারেননি।

অপ্সরা বলল, 'হে মহান রাজা! যে কোন বর প্রার্থণা করুন। আপনার গানে আমি প্রসন্ন হয়েছি।'

—'হে ইন্দ্রলোকের সুন্দরী অপ্সরা! আমাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ করে দিন! আমি বিকলাঙ্গ!'

শুনেই অপ্সরা অদৃশ্য হলেন। ফিরে এলেন বিক্রমের কাটা হাত পা নিয়ে। জোড়া দিতেই রাজা সম্পূর্ণ মানুষ। অপ্সরা অদৃশ্য হ'ল, রাজকন্যে ফিরে গেলেন প্রাসাদে। রাজা স্মরণ করলেন চার রক্ষয়িতাকে। তারা এসেই বলল, 'আমরা প্রস্তুত। আদেশ করুন।'

'বন্ধুগণ! বহু বছর তপস্যা করে তোমাদের পাই, তোমরাও আমার যথেষ্ট সেবা করেছ। আমার সেবকজীবন থেকে মুক্তি পাবার সময় এসেছে। একদিন তোমরা বাতাসের সঙ্গে ভেসে বেড়াতে। আমি তোমাদের মধ্যে চেতনা জাগাই।

এখন দেশে যাও, আমার সেনাবাহিনী নিয়ে এসো। এ নগর ঘিরে যোজনব্যাপী শিবির স্থাপিত হোক। সোনারূপোর সাজে সজ্জিত আমার হাতি ও ঘোড়া সব যেন হাজির থাকে। কলুর কুটীরকে করে দাও রাজপ্রাসাদ, মণিরত্নে পরিপূর্ণ, সুসজ্জিত দাসদাসী যেন থাকে। ভারত সম্রাট বিক্রমের উপযুক্ত যেন হয় সব, ভোরের, আগেই।'

বীরেরা তাঁকে প্রণতি জানিয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

বেচারা কলু তো লুকিয়ে থেকে সবই দেখেছে। কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এসে ও রাজার পায়ে পড়ল।

'ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন হে ভারত সম্রাট!'

বিক্রম তার হাত ধরে ওঠালেন। আন্তরিক গলায় বললেন, 'বাবা! সর্বদা আমাকে পুত্র বলে জেনো। আমার দুঃসময়ে তোমার করুণা, সে তো শোধ হবার নয়। চলো, বাড়ি যাই। পুবের আকাশ ফর্সা হচ্ছে।'

ঘরে ফিরে কলু চমৎকৃত। কোথায় তার ছোট্ট কুটীর, এ তো রাজপ্রাসাদ। তার খাণ্ডারটি বউ বেরিয়ে এল রানীর সাজে। আনন্দ তার ধরে না। তার শাপশাপান্ত আর গালাগালির বদলে সে শুধু মথা নোয়াচ্ছে আর হাসছে।

বীবরা ভোরের আগেই কাজ সম্পূর্ণ করেছে। চীন সম্রাট শুনলেন রাতারাতি বহস্যজনক ভাবে এক বিশাল সেনাবাহিনী রাজধানী ঘিরে ফেলেছে। তখনি তিনি খালি মাথায়, খালি পায়ে দাঁতে কুটো নিয়ে বেরোলেন। এটি হল হার স্বীকার ও শান্তি স্থাপনার নিয়ম।

কিন্তু বিক্রম বেরোলেন শিবির থেকে। শ্বশুরকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানালেন। সম্রাট যখন জানলো কন্যা যে বিকলাঙ্গকে নির্বাচন করেছে, তিনি মহান রাজা বিক্রমাদিত্য, তখন তাঁর আনন্দ যে কত হ'ল। বলা যায় না। এ খবর নগরে পৌঁছল। যে রাজারা স্বয়ংবর দেখে ক্ষেপে যান, ওই বিকলাঙ্গকে খুন করার যুক্তি আঁটেন। তাঁরাই এখন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মহামহিম বিক্রমকে প্রণতি জানালেন।

বিয়ে হ'ল বিশাল ধুমধামে। বীরদের তৈরি বিশাল সুসজ্জিত চাঁদোয়ার নিয়ে বর ও বধূ এক মঞ্চে বসলেন সন্ধ্যায়। তখন এক চমৎকার যৌথনৃত্যের দল নাচ দেখাচ্ছে।

নাচ চলছে, তো খবর এল, একদল ভোজবাজিকর এসেছে। এমন সেরা সেরা দর্শকদের ভোজবাজি দেখাতে চায়। রাজা ওদের আনতে বললেন।

যখনি ওরা ঢুকেছে, রাজা তো চিনেছেন, তাঁর দুশমন সেই যোগী আর সেই মন্ত্রীও আছে দলে। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। রাজকন্যে ফিশফিশ করে বললেন, 'ভয় পাবেন না! দেখুন, নিজের তৈরি ফাঁসে ওরা নিজেরা কেমন ঝোলে!'

মৃতকে জীবনদানের খেলা দিয়ে শুরু হল। মন্ত্রী একটা লম্বা বাক্স থেকে বের করল তার ছেলের শবদেহ। মাটিতে নামিয়ে তার বুকে চেপে বসল। যোগী চারপাশে ধুনি জ্বেলে মাঝে বসল।

অন্য বাজিকররা ঢোল, তম্বুরা, বাজনা বাজাচ্ছে। ধীরে শবদেহ আর তাতে সওয়ার মানুষ শূন্যে উঠে গেল। আকাশে শোনা গেল অস্ত্রের ঝনঝনা আর যুদ্ধের কোলাহল। তারপর মাটিতে পড়তে থাকল শবদেহটির টুকরো।

লোকটি নেমে এসে বলল, 'রাজা! খণ্ডবিখণ্ড শবদেহ তো দেখলেন। এখন আমি এটাকে জোড়া লাগাব, জীবনদান করব।' ও খণ্ডগুলোকে সাজাল। যোগী ধুনি থেকে ছাই দিল। ছাই ছড়িয়ে দিতেই মৃত হ'ল জীবিত, সে উঠেও দাঁড়াল। চীৎকার করে বলল, 'বাবা! আমার ক্ষিদে পেয়েছে। খেতে দাও।' আর প্রাক্তন মন্ত্রী বিক্রমকে দেখিয়ে বলল, 'বাঘ হয়ে যা! খা! তোর শত্রুকে।'

বাঘ হয়ে সে রাজার দিকে ঝাঁপ মরল। রাজকন্যে হাত নাড়ালেন। যেন বাজ পড়েছে মাথায়, এমন ভীষণ গর্জনে বাঘ ঘুরে গেল। তারপর, যোগী বাধা দেবার আগেই ক্রুদ্ধ বাঘ মন্ত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে তাকে টুকরো টুকরো করে লাফ মেরে চলে গেল। যোগী ধুনিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে পালাতে নিয়েছে, রাজকন্যে হাত দোলালেন। যোগী মাটিতে স্থানু, অনড়।

বজ্রকণ্ঠে রাজকন্যে বললেন, 'নীচ ভোজবাজিকর! তুই দৈবীশক্তিকে অসৎ কাজে ব্যবহার করেছিস। ওই শক্তি তোকে শাস্তি দিচ্ছে। আমার করার নেই কিছু। বোধ-চেতনা-আত্মাহীন হয়ে বনের পশুর মতো চিরকাল ঘুরে বেড়াগে যা!'

তিনি হাত নাড়লেন। টলতে টলতে যোগী বেরিয়ে গেল। বোধশক্তিহীন, মানুষের কোন লক্ষণই নেই, যেন জাদুবলে কে ওর ক্ষমতার আগুন নিভিয়ে দিয়েছে।

বিক্রম রানী নিয়ে দেশে ফিরলেন। প্রজারা আনন্দে অধীর হ'ল। সুখে শান্তিতে অনে—ক দিন রাজত্ব করলেন বিক্রম।

জলের উপর হাঁটা

বাংলা
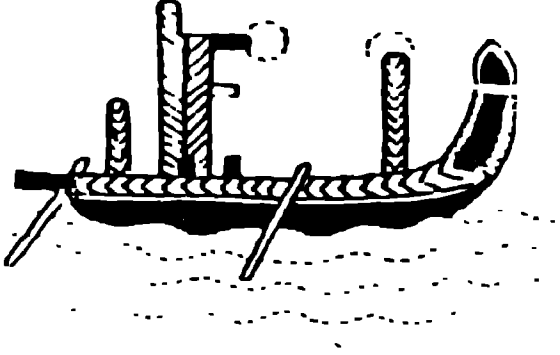
এক সাধু নদীতীরে ধ্যান করছিলেন। জপতপ করে কি অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা হয়েছে, তা দেখিয়ে এঁকে বোমকে দেবার জন্যে আরেক সাধু জলের উপর দিয়ে হেঁটে এঁর কাছে এলেন।

প্রথমজন চুপচাপ বসে আছেন। ইনি এসে বললেন, 'দেখলে! কি কাণ্ডটা করে দেখালাম!'

- 'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখলাম জল দিয়ে হেঁটে নদী পেরোলে। কোথায় শিখলে গো?'

- 'হিমালয়ের পাদদেশে বারো বছর যোগাভ্যাস ও তপস্যা করেছি এক পায়ে দাঁড়িয়ে! সপ্তাহে একদিন খেতাম। এত করে এ ক্ষমতা আয়ত্ত করেছি।'

- 'সত্যি? এ জন্যে এত কষ্ট করতে গেলে কেন? আমাদের খেয়াঘাটের মাঝি, দু'পয়সা দিলে যে কোন দিন তোমাকে নদী পার করে দেবে।'

গুরু আর নির্বোধ

তেলুগু

এক ধনী গুরুর দেশজোড়া শিষ্য। থাকেন রাজার মতো, পালকি চেপে শহরে শহরে শিষ্যবাড়ি যান, প্রণামী ও উপঢৌকন নেন। সব দেশে সব শিষ্যদের কাছে একবার যেতেও তাঁর বারো বছর সময় লাগে।

একবার ঘুরতে বেরিয়েছেন, এক শহরের বাইরে এক রাস্তায় একটি লোকের জন্যে থামতে হ'ল। তার চেহারা ও ধরণ-ধারণ নির্বোধের মতো। পথের মাঝে দাঁড়িয়ে সে, পালকি যেতে দেবে না, যতক্ষণ না গুরু ওর সঙ্গে কথা বলেন। গুরু বিরক্ত হলেন, তবে এক মিনিট কথা কইতে রাজী হলেন।

খেঁকিয়ে বললেন, 'চাইছটা কি?'

—'আমি স্বর্গে যেতে চাই। লোকে বলে, তুমি গুরু, তুমি সে পথ জানো।'

গুরু হো হো করে হেসে বললেন, 'স্বর্গে যাবে, কেমন? সে তো সোজা হে!

আকাশপানে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকো। ঠিক চলে যাবে স্বর্গে।'

—'ব্যস? আর কিছু নয়?

ও আর প্রশ্ন করার আগেই গুরুর আদেশে পালকি নিয়ে চলে গেল বাহকরা।

বারো বছর বাদে গুরু ও পথেই ফিরলেন। শহরের সীমান্তে এসে দেখেন। একটি লোক আকাশপানে মুখ আর দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। চুল দাড়ি পেকে সাদা, নখ লম্বা আর নোংরা, পোশাক শতচ্ছিন্ন, ওর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। আকাশ পানে চেয়ে আছে।

গুরু তার কাছে এগোচ্ছেন, দেখলেন এক অত্যাশ্চর্য কাণ্ড। এই নির্বোধ লোকটা ধীরে ধীরে ওপরপানে উঠে যাচ্ছে। গুরু নিমেষে বুঝলেন, কি করা উচিত হবে। পালকি থেকে নেমে ওই নির্বোধের পা জড়িয়ে ধরে স্বর্গে উঠে গেলেন।

ওঁর স্বর্গে যাবার নানা পন্থা, তা তিনি এখন উপলব্ধি করলেন। ওর পা ধরেই যেতে হ'ত।

ইমানদার প্রাণিজগৎ, বেইমান মানুষ

কুমাওনী, হিন্দীর এক হিমালয়-আঞ্চলিক ভাষা।
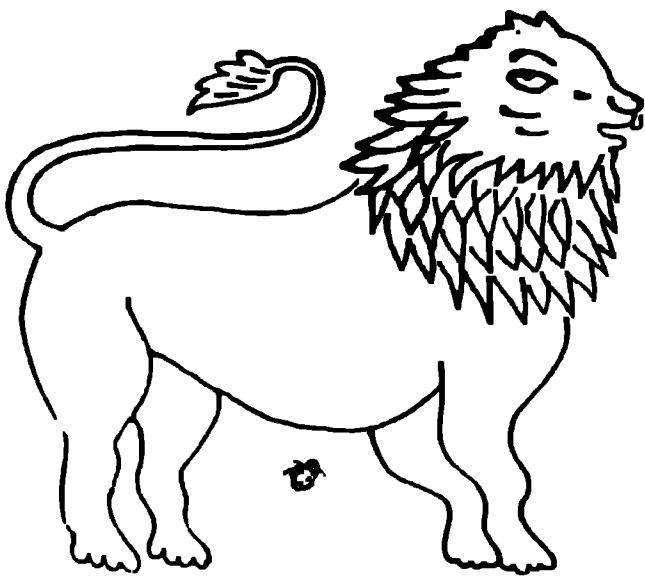
এক সময়ে এক সজ্জন বনের পথে যাচ্ছেন। জল চাই, তো এক পতিত কুয়ো দেখলেন। মুখ ঝোঁকাতে শুনলেন, কুয়োর তল থেকে কারা তাঁকে ডাকছে। একটা সিংহ, একটা সাপ, এক স্যাকরা, আর এক নাপিত কুয়োয় পড়ে গেছে। আর উঠে আসতে পারছে না। সিংহ বলল, 'আমাকে উঠে আসতে সাহায্য করো গো, তোমার ঋণ ভুলব না।'

—'সিংহ ভাবলেই আমি ভয়ে কাঁপি। তোমাকে বাঁচাই, আর তুমি আমাকে খাও, কেমন? তোমার তো পেট জ্বলছে!'

—'না, না। কথা দিচ্ছি, তোমার কোন ক্ষতি করব না। দয়া করে সাহায্য করো!'

খুব শক্তপোক্ত বুনো লতা ছিঁড়ে তা ঝুলিয়ে দিয়ে লোকটি সিংহকে টেনে তুলল। সিংহ বলল, 'বনেই তো থাকি। আমার সঙ্গে দেখা করে যেও। তোমায় সামান্য যা হয় দেব। যাবার আগে একটা সদুপদেশ দিয়ে যাই। ওই লোক দুটোকে সাহায্য কোর

না। এরা লোক ভালো নয়।'

এখন সাপ মিনতি জানাল তাকে তুলতে। লোকটি যখন বলল, সে সাপকে ভয় পায়, সাপও বলল যে, সে লোকটির কোন ক্ষতি করবে না। সাপকেও সে ওপরে তুলে নিল। যাবার আগে সাপ বলে গেল, দরকার পড়লে লোকটি যেন সাপকে স্মরণ করে। এটাও বলল, নাপিত আর স্যাকরা দুষ্ট প্রকৃতির। ওদের সাহায্য না করলেই ভালো।

নাপিত আর স্যাকরা যখন মিনতি করতে থাকল, লোকটি ভাবল, 'আমার মতোই মানুষ তো বটে!' লতা নামিয়ে ওদেরকেও টেনে তুলল ও। ওরা ওকে বারবার ধন্যবাদ দিল। শহরে ওদের সঙ্গে দেখা করতে বলল। প্রাণ বাঁচিয়েছে ওদের, ওরা তো কৃতজ্ঞতা জানাবে!

ঘোরাঘুরি সেরে লোকটি আবার সেই বনের পথেই ফিরছে। সিংহের সঙ্গে দেখা। সিংহ ওকে দেখে মহাখুশি। ওকে পিঠে চাপিয়ে ঘোরাল, আর বিদায় কালে একটি হীরের আংটি উপহার দিল।

তারপর ও গেল শহরে। সেই নাপিত আর স্যাকরার সঙ্গেও দেখা করল। তারা খুব ভদ্রতা দেখাল। তবে লোকটি যেই হীরের আংটিটা ওদের দেখিয়েছে, ওরা গোপনে রাজাকে খবর পাঠিয়েছে।

জঙ্গলের পথে যাত্রা করার কালে রাজার এক মেয়েকে সিংহ মেরে ফেলে। রাজা নকীব দিয়ে রাজ্যে ঢেড়া দেন, যে রাজকন্যার মৃত্যু বিষয়ে কোন খবর দিতে পারবে, তাঁর কোন অলঙ্কার দেখাতে পারবে, সে পুরস্কার পাবে। এই হীরের আংটি তো রাজকন্যার।

নাপিত এখন রাজার কোটাল। সে এই সজ্জনকে বন্দী করে কারাগারে নিয়ে খুব নির্যাতন চালাল। লোকটি একই কথা বলে চলল। সে নিরপরাধ। সিংহ তাকে এই আংটি দিয়েছে।

কে তার কথা বিশ্বাস করবে? রাজা ধরে নিয়েছেন, এই লোক তাঁর মেয়েকেও মেরেছে,—আংটিও চুরি করেছে। আদেশ দিলেন, ওর মাথা কাটা যাবে।

কারাগারে বসে ও শেষমেশ সাপকে ডাকল মনে মনে। সাপ তো তখনি হাজির।

—'বলো, কি করতে পারি?'

লোকটি তার দুঃখের কথা বলল।

সাপ বলল, 'পইপই করে বললাম, ও দুটোকে বাঁচিও না। তবে একবার তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ, আমিও তোমাকে এ বিপদে উদ্ধার পেতে সাহায্য করব। আমি গিয়ে রানীকে কামড়াচ্ছি। তুমি রাজাকে জানাবে, যে বিষ টেনে তুলে তুমি ওঁকে বাঁচাতে পারো। বাকিটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

সে রাতেই বিষাক্ত সাপের কামড়ে রানী অচৈতন্য। রাজা তো ওঝা-গুনীন-বৈদ্য খুঁজে আনতে লোক পাঠাচ্ছেন। রানী বিষে নীল। সবাই ভাবছে, তাঁর মরণকাল ঘনিয়েছে।

পরদিন, মাথা কাটার আগে, লোকটি একটি অন্তিম মিনতি জানাল রাজাকে। সে রানীকে বাঁচাবে, বিষ নামিয়ে দেবে। তখনি তাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেও রানীর ঘরে ঢুকেছে, আর তার বন্ধু, সেই সাপও হাজির। দংশন স্থানে মুখ লাগিয়ে সাপ বিষটা টেনে নিল।

রানী সুস্থ হয়ে উঠলেন।

রাজা সন্তুষ্ট, রাজা কৃতজ্ঞ। কিন্তু রাগ তো তাঁর যায় নি। তিনি জানেন, এই লোকই তাঁর মেয়েকে মেরেছে।

লোকটি তার বক্তব্য বলেই যাচ্ছে। সাক্ষী হিসেবে সে স্যাকরা আর নাপিতকেও ডাকল। বলল, তারা রাজাকে বলুক, সে ওই সাপ আর সিংহের সঙ্গে তাদেরও কেমন কুয়ো থেকে তুলেছিল! নাপিত আর স্যাকরা মাথা নাড়ল। তারা তো একে জীবনে দেখেনি আগে!

মরিয়া হয়ে লোকটি ভাবল, সিংহ একবার এলে প্রমাণ হ'ত যে সে সত্যি কথাই বলছে।

ভাবার সঙ্গে সঙ্গে পালে পালে সিংহ নিয়ে আমাদের সিংহ ঢুকেছে নগরে। তাদের ভয়াল, গম্ভীর গর্জনে, নগর কাঁপছে। রাজা ও প্রজারা আশ্চর্য অবাক,—ভয়ে তাঁরা জড়ভরত। এখন রাজার বিশ্বাস হ'ল লোকটি সত্যি কথাই বলেছে। সিংহরাও চলে গেল।

নাপিত আর স্যাকরা সব অস্বীকার করল বটে, কিন্তু রাজা হুকুম দিলেন, ভালো লোকটির বদলে ওদের মাথা কাটা হোক।

সইয়ে সইয়ে বলবে

উর্দু

এক জমিদার, প্রচুর জমিজমা তাঁর, সামান্য কারণেই প্রচণ্ড রেগে যান। এ বিষয়ে তাঁর খ্যাতি আছে। আবার তাঁর কলিজার দোষ আছে, তা বড় দুর্বল। তাই বাড়ির লোকজন, দাসদাসী, সকলের ওপর হুকুম আছে, যে ওঁকে কি বলছ, সে বিষয়ে সাবধান থেকো। কেমন করে বলবে, সে বিষয়েও সাবধান! যা বলবে, সইয়ে সইয়ে বলবে।

একবার তিনি শহরে থাকতে গেছেন। হঠাৎ, কিছু সংবাদ নিয়ে এক ভৃত্য হাজির হ'ল।

মনিব কিছু অবাক।

—'আমার বাড়ি থেকে আসছ? কেমন আছে সব, ভালো তো?!

—'খুব ভালো হুজুর! শুধু কালো কুকুরটা না? মরে গেছে।'

—'আহা হা! বেচারা! তা মরল কিসে? আসার সময়ে তো ভালই দেখে এলাম!'

—'বদহজম হয়ে গেল হুজুর! অত ঘোড়ার মাংস খেলে, না মরে যেত কোথায়?'

—'ঘোড়ার মাংস? পেল কোথায়?'

—'আমাদের আস্তাবলেই। আর কোথায় পাবে হুজুর?'

—'কি বললে? আমার ঘোড়াগুলো মরে গেছে?'

—'যখন ওদের খেতে দিতে সহিসই নেই, ঘোড়া বেঁচে থাকতে পারে হুজুর?'

—'সহিসদের কি হ'ল?'

—'যখন মাইনে দিতে কেউ থাকে না, আর উপোস করে চলতে হয়, তখন মানুষের যা হয় হুজুর, তাই হয়েছে।'

—'কি বলছ কি, অ্যাঁ? কেন, কেন মাইনে পায় নি ওরা? আমার নায়েব গোমস্তার কি হয়েছিল? আমার গিন্নির বা কি হ'ল?'

—'রান্নার লোক যখন থাকে না, খেতে দেবারও কেউ থাকে না, তখন তাঁরা বেঁচে থাকতেন কি ক'রে? বলুন হুজুর, বলুন!'

—'রাঁধুনীর...কি...হয়েছিল?'

—'কি করে বাঁচত হুজুর? যখন রান্নাঘরই জ্বলে গেল, আর আগুন ছড়িয়ে গেল গোটা বাড়িতে, মেরেই ফেলল সক্ক—লকে, তখন রাঁধুনী কি ক'রে বাঁচে হুজুর? বলুন?'

গেঁয়ো বজ্জাত, শহুরে বজ্জাত, আর বজ্জাতদের রাজা

ওড়িয়া

এক আঁধার রাতে এক গাছের নিচে গেঁয়ো বজ্জাত আর শহুরে বজ্জাতের দেখা। দু'জনে হাঁটছিল উলটোদিকে, তবু দেখা হয়েই গেল। গেঁয়ো বজ্জাতের মাথায় এক বস্তা চুনাপাথর, শহুরে বজ্জাতের মাথায় এক বস্তা ছাই। গেঁয়ো বজ্জাত বলল, 'কি নিয়ে যাচ্ছ ভাই?'

—'এই, এক বস্তা কর্পূর আর কি! তুমি?'

—'আমি? এক বস্তা কড়ি গো! চাই না কি?'

—'তা...এক বস্তা কর্পূরের বদলে এক বস্তা কড়ি দিতে রাজী আছ?'

গেঁয়ো বজ্জাত খুব রাজী। দু'জনে বস্তা বদলাবদলি করল।

গেঁয়ো বজ্জাত বাড়ি গিয়ে বউকে বলছে, 'ওঃ! কি বুদ্ধির খেলাটা না দেখিয়ে এলাম! এক বস্তা রাবিশ চুনাপাথরের বদলে একবস্তা কর্পূর আনলাম।'

শহুরে বজ্জাত তার বউকে বলছে, 'এ দুনিয়াতে সত্যিকারের চালাক লোক কমই মেলে! আমি তাদের একজন, বুঝলে? একটা বোকাকে ঠকিয়ে তার এক বস্তা কড়ি নিয়ে এলাম। কিসের বদলে? না একবস্তা ছাইয়ের বদলে। লোকটা যখন বস্তা খুলবে, আর ছাই উড়ে পড়বে ওর মুখে চোখে, ঘাবড়ে গিয়ে মরেই যাবে। মরুক গে! একটা বোকা, সে বাঁচলেই কি, আর মরলেই কি!'

দু'বাড়িতে ছেলেপিলে ভীষণ ব্যস্ত। বস্তা কখন খোলা হবে? তারপর? বাচ্চারা স্তম্ভিত। বাপ-মা-র মুখ ফ্যাকাসে। একবস্তায় চুনাপাথর, এক বস্তায় ছাই! বজ্জাতদের অবস্থাও ভ্যাবাচ্যাকা। দু'বাড়িতেই বউরা যা মুখ করল না স্বামীদের!

—'বচনবাগীশ অপদার্থ? কিছুই কি পার না? ঘটে কি ছিটেফোঁটা বুদ্ধি নেই?

ওরা আর কি বলবে? কামড়াতে গিয়ে নিজেই কামড় খেয়েছে। ঠকাতে গিয়ে ঠকেছে নিজে!

যাই হোক, বাজারে দেখা হ'তে এ-ওকে দেখে হেসেই খুন! ওরা দোস্তি পাতাল, এ কারবারে সমান ভাগীদারও হ'ল। এ-ওর মুখে মন্দিরের মহাপ্রসাদও গুঁজে দিল, যাতে বন্ধুত্বের বন্ধন চিরদিন থাকে। শহুরে বজ্জাত আনন্দ করে বলছে, 'দু'জন গুনী লোক যখন হাতে হাত মেলায়, তাদের ঠকাবে কে? আমরা এখন সকলকে ঠকাতে পারি। মেলা, বাজার, শহরের পথঘাট, পবিত্র স্নানঘাট, এমন কি এই পবিত্র মন্দিরেও হানা দেব আমরা।'—'আমরা শুধু সোনাদানা চুরি করব না। সে তো সহজ কাজ। বামুনের কপাল থেকে চন্দনের তিলক, আর সুন্দরী মেয়েদের চোখ থেকে কাজল, তা চুরি করতেও জানি আমরা।'

দুজনে বেরিয়ে পড়ল। প্রথমে হানা দিল এক বুড়ির বাড়ি। বুড়ির পয়সা অনেক, কিন্তু বয়সের ভারে তার পিঠ ভেঙে গেছে। লাঠি নিয়ে নুয়ে নুয়ে সে চলে। ওর বাড়ি যাবার আগে ওরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বুড়ির বিষয়ে আদ্যোপান্ত জেনে নিয়েছিল।

দেখা হতেই ওরা বুড়ির পায়ে পড়ে গেল। বলল, 'পিসি গো! কতকাল আগে বে' হয়েছে। কোনদিন যাওনি বাপের বাড়ির আত্মীয়স্বজনের কাছে। আমরা তো তোমাকে ভুলিনি। যখন ছোট ছিলাম, আমাদের খেলা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে। এখন আমার ছেলের বে' ঠিক হয়েছে। বাড়িতে তুমি সবার বড়। চলো একবার, সব দেখাশোনা করো। নাও, কাপড় বদলে নাও।

এও সত্যি যে বহু বছর বুড়ি বাপের বাড়ি যায় না। একে তো তা অনেক দূরে। আর নিজের সংসার সামলাতেই তার জীবন কেটে গেছে। শৈশব আর বালিকা বয়সের কথা মনে করে সে কতই কাঁদল। এরা এসেছে ব'লে ও ভারি খুশি। ভাবল,

তেল মেখে ভাল করে স্নান করুক ওরা। সোনার বাটিতে তেল দিয়ে বুড়ি নিজের ছেলের সঙ্গে ওদের পুকুর ঘাটে পাঠাল।

বজ্জাতরা তেল মাখল, স্নান করল, বাটিটা ফেলে রাখল পুকুরপাড়ে শর ঘাসের বনে। একজন আবার চেঁচাল, কাকে বাটি নিয়ে গেল গো! বাড়িতে বুড়ি খেতে দিয়েছে তো ওরা বলছে, 'কাক ভারি বজ্জাত বটে! এমন সব কাণ্ডও করে! তেল মেখে বাটিটা পাড়ে রেখেছি। ছুটলাম কাকের পিছু পিছু, তা সে তো উড়ে গেল। কি করব?'

বুড়ির ছেলে সবই দেখেছে, কিন্তু সে কথাটি বলল না। এরা ভেবেছে, ছেলেটা হাবাগোবা।

সোনার বাটি হারিয়ে বুড়ির মনে দুঃখ হয়েছে। ভাবছে তামা, বা সীসে, বা রুপোর বাটিতে তেল দিলাম না কেন! ওর মনে হ'ল এটা কুলক্ষণ। বিয়েতে যাওয়া ঠিক নয়। ওর বদলে ও ছেলেকে পাঠাল বিয়েতে। ছেলে ঘোড়া চেপে রওনা হ'ল।

পথে বজ্জাতরা বলছে, 'ও ভাই! আমাদের ক্ষিদে লেগেছে খুব। তোমার অঙ্গে তো অনেক সোনাদানা! একটা ছোট্ট কিছুও বন্ধক রাখো যদি, সবাই পেট পুরে খাই!'

বুড়ির ছেলে বলছে, 'দামী জিনিস বেচে কেউ? ও সব করে হা-ঘরেরা। আরে, বাজারে আমার সুনাম আছে! যা চাও, তাই খাওয়াব। তবে আমার মুখ হাসিও না বাপু! যখন এদের সঙ্গে কথা কইব, তখন আমি যেমনটি বলি, তেমনটি করবে। যদি কেউ শুধোয়, 'একটা, না দুটো?' তখনি বলবে, 'দুটো'। বুঝলে তো?'

বজ্জাতরা খুব রাজী। জিনিসটা যাই হোক না কেন, একটা কেন, দুটোই নেব?

বুড়ির ছেলে গাঁয়ে এক ব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে কানে কানে বলছে, 'তোমার জন্যে দুটো ভাড়াটে মজুর এনেছি। ওদের কিনে নিতেও পারো। সারাটা জীবন থেকে যাবে। দিব্যি জোয়ান, চাষের কাজে ভারি দড়! আমাকে মোটামুটি ভাল দাম দাও, ওদের পেয়ে যাবে।'

ব্যবসায়ী ওদের কাছে গিয়ে শুধোচ্ছে, 'একটা, না দুটোই?'

ওরা বলছে 'দুটো! দুটো!'

—'ব্যস্! পাকা কথা!' কি যে ঘটে গেল, দু'বজ্জাত তা বুঝে ওঠার আগেই বুড়ির ছেলে পয়সা বুঝে নিয়ে রওনা দিয়েছে। এরা দু'জন তো এখন কেনা গোলাম। ওরা চেঁচামেচি করলেও ওদের বাগানের কাজে লাগানো হ'ল। ব্যবসায়ী কোন ওজরআপত্তি শুনবে না। সে চাবুক হাঁকড়াচ্ছে। দুই বজ্জাতই বুঝল, বুড়ির ছেলে ওদের চেয়ে অনেক বড় বজ্জাত। ওরা ব্যবসায়ীর পায়ে পড়ে মিনতি জানাল, 'মশাই! আমরা জীবনে কুটো ভেঙে দুটো করিনি কখনো। আমরা ভাল ঘরের ছেলে, তেমন ব্যবহার করাই উচিত। ওই ছোকরা আমাদের খেতে ডেকেছিল। তারপর আপনার কাছে জানেপ্রাণে বেচে দিয়ে গেল?'

ব্যবসায়ীও শক্ত মানুষ। সে বলল, 'তোমাদের কুলুজীকুষ্ঠী জানতে চাই না। মোটা দাম দিয়ে কিনেছি তোমাদের। সে বিষয়ে দয়ামায়া দেখালে আমার চলবে?'

দু'জনই কাতরে দয়াভিক্ষা করল। বলল, 'আমাদের ধোঁকা দিয়েছে গো! আপনাকেও ঠকিয়েছে। আমাদের সঙ্গে কাউকে পাঠান। ওকে খুঁজে বের করব, ফেরত নেব টাকা, আপনাকে দিয়েও দেব।' মন মানে না, তবু ব্যবসায়ীকে মানতে হ'ল, এরা নির্দোষ। অপরাধীকে ধরার জন্যে ও এদের সঙ্গে এক ভৃত্যকে পাঠাল।

ওদিকে বুড়ির ছেলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেছে পাশের গ্রামে। এক মিঠাইয়ের দোকানে ঢুকে ও দু'হাতে মিঠাই মণ্ডা তুলছে আর খাচ্ছে। যে ছেলেটা দোকান দেখছে, সে তো এ আজব কাণ্ড দেখে অবাক। সে বলছে, 'মিষ্টি যদি এত ভালো লেগে থাকে মশাই, পয়সা ফেলুন, সাধ মিটিয়ে খান।'

—'আরে না না। আমার নাম হ'ল গে' মাছি। যাও না, বাবাকে বলো না, মাছি মিষ্টি খাচ্ছে, কিন্তু দাম দিচ্ছে না? তিনি বুঝবেন। আমার বন্ধু হন তো!'

ছেলেটা দৌড়ে গিয়ে বাপকে এই আজব 'মাছি'র কথা বলছে। বাবা রেগে টং। সে বলছে, 'তুই একটা হাবা! মাছি কত মিষ্টি খাবে? দোকান দেখছে কে? যা যা, দোকান সাম্‌লা গিয়ে!'

বুড়ির ছেলে ইতিমধ্যে এক থলে বোঝাই মিষ্টি নিয়ে দে চম্পট! যেতে যেতে দেখে, এক বুড়ি তার সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে।

দেখার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে তো প্রেমে ভেসে গেল। ঘোড়াটা এগিয়ে নিয়ে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে ঘোড়া ছোটাল বুড়ি কিছু বুঝে ওঠার আগেই। বুড়ি তো হতবাক। সে চেঁচাতে যাবে তো বুড়ির ছেলে বলছে, 'মেয়ের জন্যে ভেব না গো! আমার নাম জামাই।'

বুড়ি প্রচুর চেঁচিয়ে লোক জড়ো করে ফেলল। বুড়ি বলেই চলেছে, 'মেয়েকে তুলে নিয়ে গেল গো, তুলে নিয়ে গেল। লোকটার নাম জামাই গো, জামাই।'

সবাই হেসে খুন।—'বলো কি? তোমার জামাই তোমার মেয়ে তুলে নিয়ে গেছে? তা নিয়ে বাজার গরম করছ কেন? মেয়ে বড় হয়েছে তো! সে কি তোমার কাছে সারাজীবন পড়ে থাকবে? জামাইয়ের ধৈর্য মানে নি, বউ তুলে নিয়ে গেছে। বেশ করেছে!'

বুড়ির ছেলে মেয়েটিকে নিয়ে এক জঙ্গলে ঢুকেছে, খানিক জিরোবে। মেয়েটিরও ওকে পছন্দ হয়েছে, তার মজাও লাগছে বেশ। জিরোতে গিয়ে ওরা দেখে একটা ভালুক উইপোকা ধরে খাচ্ছে। এদের দেখেই ভালুক তেড়ে এসেছে।

বুড়ির ছেলে দারুণ লড়ে ভালুকটার মাথা নুইয়ে ওর নাক মাটিতে ঘষছে। হাতিয়ার

নেই, যে ওটাকে মারে। আবার ছেড়ে দিতেও ভরসা পাচ্ছে না। পকেটের টাকাপয়সা মাটিতে ছত্রাকার! লড়তে লড়তে ও যখন হয়রান, এক বণিক এল সেখানে। টাকা পয়সা দেখেই সে কুড়োতে লেগেছে। কুড়োতে কুড়োতে এগিয়ে দেখে, একটি ছেলে ভালুকের নাক ঘষছে মাটিতে। বণিক অবাক।—'কি করছ ভালুকটাকে? এত টাকা পয়সা বা ছড়িয়ে আছে কেন?'

—'মশাই! এ যেমন তেমন বুনো ভালুক নয়। আমি ওর নাক ঘষলে ও পাছার ফুটো দিয়ে টাকা হাগে। লড়তে বড্ড ভালবাসে। পোষ মানিয়ে ফেলেছি ওকে। এখন ও কিচ্ছুটি করবে না।'

—'বেচবে ভালুকটা?'

—'ভালো খদ্দের পেলে তো! তবে লাখ টাকার কমে একে বেচছি না। জানেন, রোজ এ দশ হাজার টাকা দেয়?'

বণিক ভাবল, 'একেই বলে টাকার বৃষ্টি। যত ব্যবসা করেছি, এ তার চেয়ে অনেক ভালো। ভালুকটা পেলে আমি ব্যবসাপাতি বন্ধ করে দেব। রোজগার করার ঝামেলা থাকবে না, টাকা পেয়ে চলব।'

ও একলাখ টাকা গুণে গুণে দিল। বুড়ির ছেলে, ছড়ানো টাকাগুলোও আদায় করল। বণিককে বলল, ভালুককে চেপে ধরে ওর নাক ঘষে চলতে। আর টাকাপয়সা, সুন্দরী মেয়ে, সব নিয়ে ভেগে গেল।

যেতে যেতে দেখে, এক ধোপা কাচাকাপড় মেলছে। বুড়ির ছেলে ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে থলের মিঠাই খাচ্ছে। দেখে ধোপার তো জিভে জল গড়াচ্ছে। ছেলেটা ওকে কিছু মিঠাই দিল। ধোপা তো তা খেয়ে মুগ্ধ!

তখন ছেলে বলছে, 'তোমার ভালো লেগেছে দেখে ভারি খুশি হলাম। আমি তো খুবই ভালবাসি এ মিঠাই। এ তো সামান্য মিঠাই নয়। পাহাড়ে একটা গাছে এগুলো ফলে। যাও না, যত ইচ্ছে কুড়িয়ে নাও। খাও, আর হ্রদের মিষ্টি জল খেও। যদি অনেক কুড়োও, চারটি বেচতেও পারবে। ভালো টাকা কামাবে। এ আশ্চর্য মিঠাই, বুঝলে?'

ধোপা তো ছেলেকে জামাকাপড়ের হেফাজতে রেখে পাহাড় পানে ছুটল। সে সব দামী দামী রেশম-কিংখাব-সাটিনের পোশাক! ছেলেটা সব পোঁটলায় বেঁধে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে পালাল। পাশের গ্রামে গিয়ে ও পোশাকগুলো বেঁধেছে এক গাছের ডালে, আর বিকট চেঁচিয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছে,—'হে আমার অলৌকিক গাছ! হে দেবতাদের কাপড়বোনা তাঁত! রেশম আর সাটিন ফোটাও আমার জন্যে!' যেতে যেতে এ কথা শুনে এক বণিক অবাক হয়ে ভাবছে, 'রঙিন ফুলের মতো রেশম-সাটিনও ফোটায় গাছ? এ তো আশ্চর্য কথা! স্বর্গেই এমনটি হতে পারে। কে কবে শুনেছে, মাটির পৃথিবীতে গাছে রেশম ফোটে?'

এগিয়ে গিয়ে ও বুড়ির ছেলেকে শুধোচ্ছে, 'তুমি কি হে?'

—'এ এক আশ্চর্য গাছ। অন্য গাছে ফোটে ফুল। এতে ফোটে রেশম আর সাটিন। গাছে চড়ো, চেপে বোস একটা ডালে, আর বলো, 'ফোটাও হে অলৌকিক গাছ! আমার জন্যে রেশম আর সাটিন ফোটাও।' তখনি দেখবে গাছ তাই ফোটাচ্ছে। আরে! রাজা রানীর যুগ্যি সেলাই করা পোশাক পাবে! দেখ! আমার মিষ্টি বউটাকে দেখ! সে বাসি পোশাক পরেই না। নিত্যি নতুন পোশাক পরে। আজ পরল, কাল ফেলে দিল, ঠিক যেন বাসি ফুল! কি ভাগ্যিমানী মেয়ে বলো তো?'

এ বণিকের কাপড়চোপড়ের ব্যবসা। ও ভাবছে, 'কারখানা থেকে কাপড় কিনব দোকানের জন্যে, আবার দর্জিদের পয়সা দেব, কেন? কারিগররা এত ঝামেলা করে! গাছটাকে একটু যত্ন করতে হবে, ব্যস! আর কোন ঝামেলা থাকবে না। খু—ব কম সময়ে অনে—ক টাকা হবে আমার! কারিগরদের ঝামেলা থেকেও রেহাই পাব। আহা! পোশাকগুলো কি চমৎকার না বানিয়েছে!'

বুড়ির ছেলের সঙ্গে দরদস্তুর করে, ওকে একগাদা টাকা দিয়ে ও অলৌকিক গাছটির মালিক হ'ল। কি গর্বের কথা! বুড়ির ছেলে মেয়েটাকে নিয়ে রওনা দিল। মেয়েটি জীবনে এমন মজা পায় নি।

বণিক ঝটপট গাছে উঠল। ছেলেটার প্রার্থনা অবিকল আউড়ে চলল। কিন্তু কিছুই হ'ল না। সারাদিন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে গেল ওর। তারপরে ওর মাথায় ঢুকল এ কোন অলৌকিক গাছ নয়, সে মোক্ষম বোকা বনেছে।

সেই দুই বজ্জাত তখনো একে খুঁজছে। এল মিঠাইয়ের দোকানে, দোকান তো ডকে উঠেছে। মিঠাই দোকানীকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চলতে পেয়ে গেল বুড়িকে। বুড়ির মেয়েকে তো সে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। চারজন চলতে চলতে পেল সেই বণিককে। বেচারি ভালুকের সঙ্গে তখনো লড়ছে, তবে নেতিয়েও পড়ছে।

এরা চারজন পিটিয়ে ভালুকটাকে মারল। তারপর পেল ধোপাকে। সে ভেবে পাচ্ছে না, শহর সুদ্ধ মানুষের পোশাক নিরুদ্দেশ, এর কি কৈফিয়ৎ দেওয়া যাবে। ধোপাকে ওরা সান্ত্বনা দিল।

শেষ অবধি শহুরে বজ্জাতকে ধরল তার বাড়িতেই। সবাই তো ওকে এই মারে তো সেই মারে।

বজ্জাত চূড়ামণি বলল, 'আমি ঠগ নই, চোরও নই। প্রত্যেককে ফিরিয়ে দেব যা নিয়েছি। তবে মিঠাইগুলো খেয়ে ফেলেছি। দেব, তার দাম দিয়ে দেব। এ সব করি, মজা লাগে বেশ! আমি শুধু দেখাতে চেয়েছিলাম, মানুষ যখন ভীষণ লোভ করে, তাকে বোকা বানানো কি সহজ!'

সবাই ওর সৌজন্যে আর ব্যবহারে মোহিত হয়ে গেল। ও সকলকে চমৎকার

এক ভোজ খাওয়াল। চাকরদের বলল, নরম বিছানা পেতে দিতে। ওরা খেয়েদেয়ে, ঘুম লাগাল। মন তো নিশ্চিন্ত! যা খোয়া গেছে, স ব ফেরত পাবে।

এদিকে বুড়ির ছেলে গেছে গ্রামের চৌকিদারের কাছে। সে লোক ঢাক পিটিয়ে চেঁচাচ্ছে, যদি কেউ কোন অচেনা অজানা মানুষকে আশ্রয় দিয়ে থাকে, কাল সকালে রাজদরবারে তাদের যেন হাজির করে। রাজার আদেশ এটা! নকীব চেঁচাচ্ছে, নবাগত মানুষ দেখলে গুপ্তচর বলে ধরা হবে। যারা হুকুম মানবে না, তাদের দেশদ্রোহিতার অপরাধে কয়েদ করে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে।

দুই বজ্জাত, সেই বুড়ি, দুই বণিক, ধোপা, ভয়ে তাদের কালঘাম ছুটছে। প্রাণভয়ে তারা ছুট লাগাল। যখন নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছল। এক বজ্জাত অপরকে বলল, 'ভাই! আমি গ্রামের বজ্জাত, তুমি শহরের বিখ্যাত বজ্জাত। এ লোক তো বজ্জাতদের রাজা! আমরা ওর কাছে তুচ্ছ! অন্যদের ঠকিয়ে পেট চালাই, আমরা ঠকেছি, সর্বস্ব হারিয়েছি, এখন পালাতে হচ্ছে।'

বজ্জাতদেব রাজা সুন্দরী বউ নিয়ে পরম সুখে আছে। এই তো সেদিনই আমরা কথা কইছিলাম। ও বলল, 'শুধু ঠকিয়ে সুখ হয় না। চালাকি করে ঠকালে, তবে না মজা লাগে!'

আমাব কথাটি ফুরোল!

লম্বা দেড়ে কাজি

মারাঠী

তেলের পিদিম জ্বেলে সন্ধেবেলা এক কাজি এক প্রাচীন পুঁথি পড়ছিলেন। হঠাৎ চোখ পড়ল একটি বাক্যে। 'যে সব লোকের দাড়ি লম্বা, তারা সাধারণত নির্বোধ হয়।'

কাজি সর্বদা চায়, জ্ঞানের জন্য মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করুক। শহরে তার দাড়িই তো সবচেয়ে লম্বা! সবাই নিশ্চয় তাকে নিরেট বোকা ব'লে ভাবে! এ চিন্তাও অসহনীয়।

পিদিমটা চোখে পড়ল। এতটুকু দোনামোনা না করে কাজি দাড়ি ধরল মুঠোয়, দাড়ির ডগায় আগুন ধরিয়ে দিল। আঃ, এবার দাড়ি খাটো হবে।

দাড়িটি লম্বা, চিকণ, রেশম-রেশম। আগুন তো দাউ দাউ জ্বলে উঠল। আঙুল যখন পুড়তে শুরু করল, কাজি মুঠ ছেড়ে দিল। আগুন ধাঁ ধাঁ করে কাজির গোঁফ, ভুরু, এমন কি চুলও পুড়িয়ে দিল।

এখন কাজি বুঝল, লম্বা দেড়ে মানুষরা সত্যিই নির্বোধ হয়।

চোখ চালালেই মক্কা

অসমীয়া
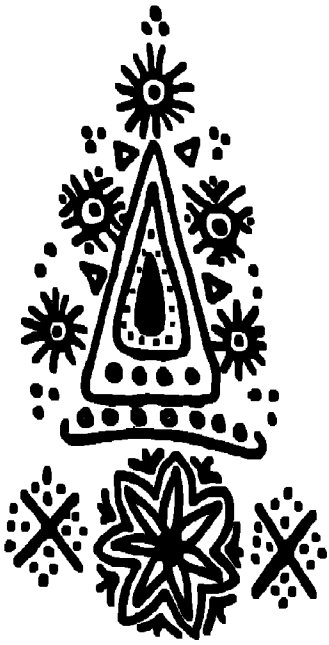
এক মোল্লাকে নেমন্তন্ন করেছে এক ধর্মপ্রাণ দম্পতি। বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়েই সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'বেরো! বেরিয়ে যা!' যেন কোনো পশুকে তাড়াচ্ছে।

বাড়ির কর্তা শুধোল, ও অমন করে চেঁচাল কেন?

মোল্লা বলছে, ' দেখলাম, মক্কার পবিত্র কাবায় একটা কুকুর ঢুকছে। সেটাকে তাড়ালাম।'

বাড়ির কর্তা তো তটস্থ। মোল্লার শক্তি কত! চোখ চালালে সে হাজার হাজার মাইল দূরে মক্কা দেখতে পায়!

কিন্তু গিন্নির তেমন বিশ্বাস হ'ল না। মোল্লাকে পরিবেশন করার সময়ে ও ব্যঞ্জন তলে রেখে ওপরে ভাত চাপা দিল। মোল্লা দেখছে, সকলের পাতে ব্যঞ্জন, একা তার পাতায় নেই। সে এদিক-ওদিক চাইছে।

গিন্নি বলল, 'কিছু চাই আপনার?'

—'পাতে তো ব্যঞ্জন দেখি না?'

—'চোখ চালিয়ে মক্কা দেখতে পান! ভাতের নিচে কি আছে, দেখতে পাচ্ছেন না?'

অবাধ্য ছেলের কাণ্ডকারখানা

কন্নড়

এক যে রাজা, তাঁর চার রানী আর চার ছেলে। একেক রানীর একেক ছেলে। রাজার ভাবনাচিন্তা নেই কোন। সর্বদা ভোগে রাগে ডুবে থাকো। তাঁর আছে লম্বা লম্বা খেতাব। চব্বিশজন রাজা তাঁকে নজরানা দেন। তাঁর রাজ্যও আকাশের মতো বিশাল।

পূর্ণিমার রাতে দোলনায় দুলছেন রাজা, রানীদের সঙ্গে প্রেমালাপ করছেন, হঠাৎ কি মনে হ'ল। ডেকে পাঠালেন চার ছেলেকে, বড় কুমারকে বললেন, 'তুমি হ'লে বড় ছেলে। এ দেশের রাজা হবে একদিন। সে বিষয়ে ভেবেছ কিছু?'

—'বাবা! আপনার মহান দৃষ্টান্ত অনুসরণ করব আমি। আপনার মতো বড় রাজা হতে চেষ্টা করব।'

মেজ কুমারকেও একই প্রশ্ন করলেন, 'ভেবেছ কিছু?'—'বাবা! আমি হব কূটনীতিজ্ঞ। দাদাকে রাজ্য চালনা করতে সাহায্য করব।'

সেজ কুমার বলল, 'আমি হব বিরাট সেনানায়ক। দাদাকে সাহায্য করব সে যেন শান্তিতে রাজ্য শাসন করতে পারে।'

ছোটকুমার একেবারে অন্য কথা বলল।—'বাবা! আপনি রাজার রাজা! চব্বিশজন রাজা আপনাকে নজরানা-খাজনা দেন। আমি আপনাকে ছাড়িয়ে যেতে চাই। রাজ্যের পর রাজ্য জয় করব, চারজন দেবকন্যাকে বিয়ে করব, নিজেই গড়ব এক নগর।'

রাজা যেন ফেটে পড়লেন।—'কি? আমাকেও ছাড়িয়ে যাবে? ওহে দুই ঠেঙো জানোয়ার! দেবকন্যাদের বিয়ে করবে? আমাকেও ছাড়িয়ে যাবে?'

রাগে আত্মহারা রাজা অনুচরদের ডাকলেন, 'বের করে দাও ওকে! জঙ্গলে নির্বাসন দাও এখনি!'

ছোটরানী রাজাকে শান্ত করতে গেলেন, কোন লাভ হ'ল না। তখন কাঁদতে কাঁদতে ছেলেকে পুঁটুলি বেঁধে ভাত দিলেন, বিদায় জানালেন।

ছোট কুমার প্রাসাদ ছেড়ে, নগর ছেড়ে সিধা হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলেন জঙ্গলে। বাঘসিংহের গর্জন, বুনো হাতির ডাক, বুনো শুওরের ঘোঁতঘোঁত চারদিকে। সাবধানে একটা লম্বা গাছে উঠে তার ডালে রাত কাটালেন। ভোরে নেমে এসে কাছের এক হ্রদে স্নান করলেন। তাঁর গৃহদেবতা, শিবের বাহন বৃষকে পূজা করে প্রার্থনা করলেন, আমাকে রক্ষা কোর।

চলে আসার সময়ে দেখেন একটি গোখরো সাপ এক ব্যাংকে খেতে যাচ্ছে। সাপ তাড়িয়ে তিনি ব্যাংকে বাঁচালেন। তাঁকে অবাক করে দিল ব্যাং। সে বলল, প্রয়োজনে

আমাকে স্মরণ কোর।' তারপরেই ও জলে লাফিয়ে পড়ল।

ছোটকুমার মায়ের দেওয়া পুঁটলি থেকে ভাত খেল। সন্ধে অবধি জঙ্গল ভেদ করে হেঁটে চলল। আঁধার ঘনালে দেখে, দূরে একটি বাতি জ্বলছে। ফুল দেখে মৌমাছি ধায়। ছোটকুমারও চলল সেদিকপানে। একটি কুটীর, তার দরজার সামনে ও।

—'বাড়িতে কেউ আছেন?'

এক খুনখুনে বুড়ি দোর খুলে দিল।

—'নিশ্চয় খুব ক্লান্ত হয়ে এসেছ। হাত পা ধোও। এখানেই থাকো রাতটা।'

বুড়ি জানতে চাইল জঙ্গলে ও এল কেন। ছোটকুমার নিজের কথা বলে জানতে চাইল বুড়ি কেন জঙ্গলে একলাটি থাকে। বুড়ি বলল, 'আমার নাম কান্তে বুড়ি। আমার কাহিনী, সে অনেক কথা বাছা! এখন জিরোও, পরে শুনো।'

ছোটকুমার ভারি কৌতূহলী, সে তখনি শুনবে। তা বুড়ি জীবন কথা বলতে শুরু করল।

—'দেখলে বুঝবে না, কিন্তু আমি এক বিরাট ঋষির মেয়ে। সংযমী জীবন তাঁর, এ জন্য খ্যাতিও বিস্তর। কিন্তু একদিন তিনি কামে অধীর হলেন, আমার মায়ের পিছনে লাগলেন। মা তো তা চায় নি। এ কাজ করলে যে ঋষির অতীত গৌরব ধ্বংস হয়ে যায়। ঋষি মানলেন না। জোরের বলেই মাকে গ্রহণ করলেন, কামনা চরিতার্থ করলেন। জন্ম নিলাম আমি, হতকুচ্ছিত এক মেয়ে। যে জঙ্গল দিয়ে তুমি এলে, সেখানেই ঋষি গেছেন ফল আনতে। একটা বাঘ ওঁকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। মা মারা গেলেন কিছু বাদে। আমি অনাথ হলাম। জানি যে আমি দেখতে কদাকার, তাই জঙ্গলেই থেকে যাই। লোকালয়ে আর যাইনি। প্রার্থনা, পূজা, জপতপ করতে করতে তপোবলে পেলাম আশ্চর্য শক্তি। কত অপরূপ মায়া না দেখেছি! বলতে পারি আরো, সে পরে হবে। দেরি হয়ে গেছে, তুমি ঘুমোও।'

ছোট কুমার ওখানেই থাকে। বুড়ির গরু চরায়। বুড়ি শুধু একটি সাবধানবানী বলেছে, 'গরু চরাতে যাও যখন, ভুলেও উত্তর দিকে যেও না।'

কুমার বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে থাকবে।'

একদিন তার কৌতূহল তো বাগ মানে না। উত্তরে কি আছে, যা তার দেখা অনুচিত? গরুর পাল নিয়ে ও উত্তর দিকেই গেছে। কি অপূর্ব সব দৃশ্য! সবচেয়ে সুন্দর এক স্নানের দীঘি। আগাগোড়া বাঁধানো সোনার ইটে। ঘাটের সিঁড়ি স্ফটিকের। সবুজ, লাল, গোলাপী, নীল আর হলদে মাছ খেলছে সে জলে। ও একটি বড়সড় জাম গাছের নিচে বসতে না বসতে যেন আকাশ থেকে নেমে এল চার দেবকন্যা। হলুদ পীতাম্বরা রেশমের শাড়ি খুলে পাড়ে রেখে ওরা সেই স্পটিকস্বচ্ছ জলে ঝাঁপাঝাঁপি জুড়ল। ছোট কুমার একটি শাড়ি তুলে নিয়ে ছুটল। শাড়িটা দেবরাজ ইন্দ্রের কন্যার।

কন্যা সবই দেখেছে। জল থেকে উঠে ও পিছনে দৌড়চ্ছে আর বলছে, 'হে তরুণ! বীরের মতো তোমার কান্তি। তুমি ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না আমি। থামো, ঘুরে দাঁড়াও, তাকাও আমার দিকে।'

অবাক বিস্ময়ে কুমার থমকে দাঁড়াল। দেবকন্যা শাড়িটি কেড়ে নিল, ওকে করে দিল এক নিষ্প্রাণ পাথর, আর উধাও হয়ে গেল।

সন্ধ্যা ঘনাল, কুমার তো ফেরেনি। কাস্তে বুড়ির উদ্বেগ হল। জাদুলাঠি আর লণ্ঠন হাতে বুড়ি ওকে দক্ষিণ-পুব-পশ্চিমে খুঁজে পেল না। বুঝল কুমার সেই নিষিদ্ধ উত্তরদিকেই গেছে। সেদিকে যেতে যেতে দেখে, নিষ্প্রাণ পাথর হয়ে সে পড়ে আছে। জাদুলাঠির স্পর্শে তাকে বাঁচিয়ে তুলে দুজনে ঘরে ফিরল। বুড়ি ওকে বকতে বকতে চলল।

—'পই পই করে বলিনি কখনো যেও না উত্তর দিকে? আমার 'না' মানে 'কক্ষণো না!'

—'হ্যাঁ দিদিমা, বলেছিলে। কিন্তু আমি জানতাম, ওদিকে গেলেই আমার জীবন চরিতার্থ হবে। নিজেকে সামলাতে পারিনি, গেলাম। সত্যি বলতে কি, আবার যেতে চাই।'

—'বেশ! যাবেই যখন, যেও। তবে সাবধান হতে হবে। সঙ্গে গরু নিয়ে যেও না। আর দেবকন্যাদের রূপ বা মিষ্টিকথায় ভুলো না। এবার শাড়ি নিয়ে সিধা চলে এসো ঘরে। আমি বসে থাকব, বাকিটুকু আমিই করব।'

ছোট কুমার বুড়ির কথা মানল। পরদিন সকালে জলখাবার খেয়ে চলে গেল সেই অপরূপ সরোবরে, জাম গাছের নিচে লুকিয়ে বসে থাকল। আজও দেবকন্যারা এল, শাড়ি খুলে রাখল। কুমার যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না।

কি রং! কাজল কালো চোখ, মুখ যেন চাঁদের মতো, জলের ধারার মতো লহরে লহরে চুল নেমেছে কোমর ছাপিয়ে, বুক জোড়া যেন জোড়া তরমুজ, সবাই তরুণী, অপাপবিদ্ধ কুমারী।

মাটিতে শাড়ি আর গয়নাগাঁটি রেখে ওরা জলে ঝাঁপ দিল। ছোট কুমার, কাল যার শাড়ি নিয়েছিল, আজও তার শাড়িই নিয়ে দৌড় লাগাল।

দেবকন্যা পিছনে ছুটতে ছুটতে কতই কাঁদল, কতই ডাকল, ও কানও দিল না। ঘরে এসে স্বর্গলোকের সে শাড়ি দিল বুড়িকে। বুড়ি তক্ষুণি ওকে করে দিল এক ছোট্ট শিশু, আর দোলনায় শুইয়ে দিল। যেন বুড়ি ওকে দোলা দিচ্ছে, ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ওকে ঘুম পাড়াচ্ছে। জাদুবলে শাড়িটিকে এতটুকু করে বাচ্চাটির উরুর মাঝে রেখেছে। একটু বাদেই দেবকন্যা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির।

—'কেউ কি এসেছে এদিকে? কোন তরুণ যুবা?'

—'তরুণ যুবক? কই, কেউ তো আসেনি। আমি তো কখন থেকে বসে আছি।'

—'হয়তো লুকিয়ে আছে!'

—'সবচেয়ে আগে নিজের লজ্জা ঢাকো বাছা! ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়ানো ঠিক নয়। এই সুতির কাপড়টা নাও, অঙ্গে জড়াও।'

কিছুক্ষণ এমন ছলাকলার পর বুড়ি বলল, 'জানি তোমার শাড়ি কোথায়! ফেরত পাবে, যদি ওকে বিয়ে করো।' দেবকন্যা রাজী। বুড়ি কুমারকে নিজরূপ ফিরিয়ে দিল। ওই কুঁড়েঘরেই বিয়ে হ'ল ওদের, বুড়ি বিয়ের পুরোহিত।

ওখানে ক'দিন থেকে বুড়ির কাছে বিদায় নিয়ে ওরা ঘর ছাড়ল। কুমারকে তো আরো তিনটে বিয়ে করতে হবে, মনে নেই?

কথা কইতে কইতে চলল ওরা, পৌঁছল এক নগর তোরণে। নগরবাসী ওদের ভুবন ভুলানো রূপ দেখে যেন মন্ত্র মুগ্ধ। ছেলে যেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, আর ওর বউ যেন কৃষ্ণ প্রিয়া রুক্মিনী। পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য তিলে তিলে নিয়ে যেন গড়া এই সচল প্রতিমা। একটা ছেলে মিঠাই খাচ্ছিল, রূপ দেখে সব ভুলে ও নিজের হাত চিবোতে থাকল। এক কাঠুরে কাঠ কাটতে নিজের পায়ে মেরে বসল কুড়োল।

কুমার একটি ছোট বাড়ি ভাড়া নিলেন, ওখানকার রাজার কাছে কাজও নিলেন। একদিন কুমার আর দেবকন্যা দোলনায় দোল খাচ্ছেন, রাজভৃত্যরা এল কুমারকে বেতন দিতে। দেবকন্যার রূপ দেখে ওরা তো বোবা। ছুটে গেছে রাজার কাছে। তোৎলাতে তোৎলাতে বলছে, 'মহারাজ! নতুন কর্মচারীর বাড়িতে যা দেখলাম, তা আপনার ঘরেই সাজে! ওর বউ যা রূপসী, দেখে মনে হয় না মর্ত্যলোকের মেয়ে!'

রাজা যুক্তিবুদ্ধি শিকেয় তুলে রেখে কল্পনা সাগরে ডুবে গেলেন। মেয়ের রূপবর্ণনা যত শোনেন, ততই চান তাকে।

পরদিন রাজসভায় গিয়ে কুমার দেখে, রাজা নেই। রাজা কোথায়? না, তিনি পেটের যন্ত্রণায় যাই যাই! কুমার তাড়াতাড়ি গেল রাজার ঘরে। বলল, 'মহারাজের জয় হোক!'

রাজা ককিয়ে ককিয়ে বললেন, 'দেখে বড় খুশি হলাম। যেন হারিয়ে যাওয়া ভাই ফিরে এল। চিকিৎসকরা বলছেন, কর্কোটক নাগের বিষই আমার একমাত্র ওষুধ। কথা হল, তা এনে দেয় কে?'

কুমার তো রাজার মৎলব বোঝেন নি। তিনি যেতে রাজী, তাতেই যদি রাজার অসুখ সারে! বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবছেন, সবচেয়ে বিষধর সাপ কর্কোটক নাগ। তার বিষ আনা যায় কি করে!

এই চিন্তায় খাওয়াদাওয়া ভুলে গেলেন। দেবকন্যা স্বামীর হাল দেখে সব জেনে নিলেন।

বললেন, 'উত্তরে জম্মু পর্বত চূড়া পেরিয়ে যাবে। পৌঁছে যাবে শেষাদ্রি পাহাড়ে। সেখানে তমাল গাছের নিচে এক সাপের বিবর। একটা চিঠি দিচ্ছি তোমাকে। চিঠিটা

বিবরে ফেলে দিয়ে অপেক্ষা কোর।' কন্যা চিঠি লিখে দিল।

খেয়েদেয়ে, মনের সুখে ঘুমিয়ে পরদিন ভোরে উঠে কুমার রওনা হ'ল। যেতে যেতে দেখে, গাছের ডালপালায় এক মাকড়সার জালে জড়িয়ে একটা ভোমরা ছটফট করছে। কুমার সযত্নে জাল ছিঁড়ে ভোমরা বাঁচাল। তারপরই পৌঁছে গেল সাপের গুহায়। বউয়ের চিঠিটা ফেলে দিল ভিতরে। শীঘ্রই শোনা গেল সাপদের হিস্ হিস্! শোঁ শোঁ! অনেক সাপ এসে সযত্নে ওকে নিয়ে গেল পাতালপুরীতে। সেখানে নাগরাজ কর্কোটক চিঠি পড়ছেন। তাতে লেখা আছে, 'হে পাতালপুরীর নাগরাজ! এ পত্র দিচ্ছে ইন্দ্রের কন্যা। সে আপনার মেয়ের সমান। চিঠি নিয়ে যাচ্ছেন আমার স্বামী। ধরাধামে আমি বড় একলা হয়ে পড়েছি। এই যোগ্য পাত্রের সঙ্গে দয়া করে আপনার মেয়ের বিয়ে দিন, তাকে পাঠিয়ে দিন। আমরা দুটিতে মনের সুখে থাকব। ওঁর অনুরোধটাও রাখবেন, উনি নিজেই বলবেন।'

নাগরাজের কুমারকে পছন্দ হ'ল। মেয়ের সঙ্গে কুমারের বিয়ে দিলেন। তারপর নবদম্পতি বিদায় নিলেন। জম্বু পাহাড়ের চূড়া ওদের পার করে দিয়ে এল নাগবাহিনী। কুমারকে এক মুখ আঁটা পাত্রে কর্কোটকের গরলও দেওয়া হ'ল। সন্ধ্যায় ঘরে পৌঁছতে দুই কন্যা দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন আনন্দে। ওঁরা তো পুরনো বন্ধু!

পরদিন কুমার বিষপাত্র নিয়ে গেলেন রাজার কাছে। রাজা ভৃত্যদের বললেন, প্রাঙ্গণে নিয়ে পাত্রটি খুলতে। পাত্রের ঢাকনা ওরা একচুল মাত্র ফাঁক করেছিল। এক তেঁতুল গাছ দাউদাউ করে জ্বলে উঠে নিমেষে ছাই হয়ে গেল।

রাজা সভায় বললেন পাত্রটি দূরদুর্গমে নিয়ে পুঁতে ফেলতে। রাজা প্রথম চালে হেরে গেলেন। কুমার হারিয়ে যান নি, নিহত হন নি। তীব্রতম হলাহলও এনেছেন। কুমারকে একটু ভয় পেলেন রাজা।

একমাস বাদে এক ছুটির দিনে রাজভৃত্যরা কুমারের বেতন দিতে গেছে ওঁর বাড়িতে। এবার তো একজন নয়, দু'জন অলোকসামান্যা রূপসী কুমারের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করছে। আবার তারা রাজসকাশে। রাজা আবারও কুমারের পত্নীদের লোভে মরোমরো। আবার কুমারকে ডেকেছেন। এবারের অসুখ শিরঃশূল, ওষুধ, কুমিরের পিওরস।

আবার কুমার চিন্তামগ্ন। দুই কন্যাই বললেন, 'আমাদের হৃদয়-মনের স্বামী! কি ভাবছ এত?'

কুমার সবই বললেন। কুমিরের পিওরস পাবেন কোথায়? দেবকন্যা ও নাগকন্যা এতটুকু বিচলিত হলেন না। ফসফস করে দু'জনে দুটো চিঠি লিখে সেগুলো সমুদ্রে ফেলে দিতে বললেন।

নিশ্চিন্ত মনে রাতে ঘুমিয়ে সকালে কুমার রওনা হলেন। যেতে যেতে দেখেন,

একটা কুমির ডাঙায় পড়ে ছটফট করছে, দুর্বলও হয়ে পড়েছে। সযত্নে তাকে বয়ে নিয়ে নদীর জলে ফেললেন। কুমিরের যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। সে বলল, 'হে মানুষ! আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। কখনো দরকার পড়লে আমাকে স্মরণ কোর।' বলেই সে ভুস করে ডুব মারল।

সমুদ্রতটে গিয়ে কুমার চিঠি ভাসালেন জলে, সঙ্গে সঙ্গে চারটে কুমির এসে তাঁকে নিয়ে গেল পাতালপুরীতে, জলাধিরাজ বরুণের কাছে। বরুণ চিঠি পড়ে মেয়ের সঙ্গে কুমারের বিয়ে দিলেন। যৌতুক দিলেন সমুদ্র গর্ভের অমূল্য হীরামুক্তো। আর, অবশ্যই সেরা কুমিরের পিওরস।

কুমার ঘরে ফিরতে অমর্ত্যকন্যা তিনজনেই মহা খুশি। আর কুমিরের পিওরস পেয়ে রাজার বুক দমে গেল। এ চালটাও মাঠে মারা গেল যাকে বলে!

পরের মাসে বেতন দিতে গিয়ে রাজভৃত্যরা তিন রূপসী দেখে থ'! তিন বউ নিয়ে কুমার ভোজ খাচ্ছেন। আবার তারা রাজার কাছে হাজির। কন্যাদের রূপের প্রশংসা আর থামে না। রাজা লোভে উন্মাদই হলেন।

এবার কুমারকে ডেকে তিনি শুরু করলেন প্রশান্তি।—'তুমি প্রকৃত বীর বটে! কোন কাজই তোমার অসাধ্য নয়। তা, ইন্দ্রলোকে যেতে পার? স্বর্গে গিয়ে আমার বাবা-মা-ভাইরা কেমন আছেন, খবরটা এনে দিতে পার?'

—'যথা আজ্ঞা মহারাজ!'

কুমার বাড়ি গেলেন তাঁর বউদের সঙ্গে পরামর্শ করতে।

তিন কন্যা রাত জেগে পাঁচশো চিঠি লিখলেন। সকালে কুমার বস্তাবোঝাই চিঠি নিয়ে রাজার কাছে গেলেন। বললেন, একটা গভীর অগ্নিকুণ্ড বানানো হোক।

কাঠ বোঝাই অগ্নিকুণ্ড যখন জ্বলছে, কুমার তাতে ঝাঁপ দিলেন। অগ্নিদেব অপেক্ষাতেই ছিলেন। কুমারকে নিয়ে গেলেন দেবলোকে। কন্যাদের চিঠি পড়লেন। তাঁর আগুনের মতো সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে কুমারের বিয়ে দিলেন, অন্য দেবদেবীদের সঙ্গে পরিচয় করালেন, মর্ত্যে ফেরত পাঠালেন।

ফেরার পথে কুমার দেখেন, একটা পিঁপড়ের ঢিবির দিকে জলস্রোত ছুটে আসছে। জলের ধারা অন্য পথে বইয়ে দিয়ে তিনি পিঁপড়েদের বাঁচালেন। রাতে ঘুমটা জমল ভালো।

পরদিন কুমার, রাজাকে আর রাজাকে কুমন্ত্রণাদাতা মন্ত্রীকে দুটো চিঠি দিলেন। রাজার চিঠিতে লেখা ছিল,

'প্রিয় পুত্র!

তোমার দূত এসে তোমার সব খবর দিল। আমরা খুব আনন্দিত হলাম। আমরা মহাআরামে আছি, কোন দুশ্চিন্তা নেই। দেবতাদের মতো খাইদাই, পোশাক পরি। এখানে এসে আমাদের দেখে যাও না

কেন? চিরদিন থেকে যেতেও পার। যে পথে তোমার দূত এল, সে পথেই এসো। সত্যি বলতে কি, অন্য আর কি পথ বা আছে! তাড়াতাড়ি এসো। আমরা সাগ্রহে তোমার পথ চেয়ে থাকব।

তোমার...ইত্যাদি।'

রাজা আর তাঁর শয়তান মন্ত্রী চিঠি পড়ে উত্তেজিত। সশরীরে স্বর্গে যাবার জন্য দুজনেই আগ্রহে অধীর। রাজাদেশে সূর্যোদয়ের আগেই এক বিশাল চিতা জ্বলে উঠল। খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। নগরবাসী সবাই স্বর্গে গিয়ে মৃত আপনজনদের দেখতে চান।

কুমার বললেন, 'হে সজ্জনগণ! শান্ত হোন! আগে মহামান্য মহারাজ ও মাননীয় মন্ত্রীবরকে যেতে দিন!'

রাজা ও মন্ত্রী দারুণ পোশাকে সেজে সপরিবারে, সপার্ষদ চিতায় ঝাঁপ দিলেন। সবার সামনে পুড়ে ছাই হলেন। কুমার নগরবাসীদের বললেন, 'নষ্ট রাজা আর দুষ্ট মন্ত্রী মরেছে, দেখতেই পেলে। আগুন তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যাবে না, পুড়িয়ে মারবে মাত্র। ঘরে ফিরে যাও, ভালোভাবে জীবনটা বাঁচো।'

রাজপ্রাসাদে গিয়ে কুমার একটুকরো কাগজ পেলেন রাজার ঘরে। তাতে এক ব্রাহ্মণের নাম লেখা। তখনি তাঁর খোঁজ করলেন, পেলেন একটি কুটীরে। রাজমুকুট পরালেন। ব্রাহ্মণ অবশ্য হাঁ হাঁ করে উঠেছিলেন, 'আমি গরিব, গরিব থেকেই ভালো আছি। রাজ্যপাটে আমার দরকার কি? আপনি রাজত্ব করুন!' কুমারও ছাড়লেন না।

—'না না, এ সবই আপনার। পরে যখন আসব, তখন নয় আশ্রয় দেবেন।'

এবার কুমার চার বউ নিয়ে নগর ছেড়ে জঙ্গলে গেলেন। ওদের সহায়তায় বন কেটে বসত বসালেন, এক বিশাল নগরী গড়ে তুললেন, কিছুকাল গেল সুখে শান্তিতে।

এদিকে কুমারের বাবার তো জীবনে দুর্দিন নেমেছে। রাজ্য, ঐশ্বর্য, সবই গেছে তাঁর। অবস্থা এমন, যে দিন চালান গাছ কেটে, জ্বালানী কাঠ বেচে। হতভাগ্য রাজপরিবারটি সামান্য রোজগারের জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। একদিন তারা কুমারের নগরীর পথে। বারান্দা থেকে তাদের দেখে কুমার তখনি ওঁদের ডেকে আনল। সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখল ওঁদের।

কিছুদিন বাদে কুমার তিন দাদাকে নিয়ে শিকারে বেরোবে। যাবার আগে ইন্দ্রকন্যার শাড়িটি মাকে দিল সাবধানে রাখার জন্যে। যেন ওটা চোখের সামনে থাকে, কাউকে যেন দেওয়া হয় না ওটা। সে সময়ে বড় তিন কুমারের বউরা স্নান করছিল। বড় বউ এ কথা জেনে ফেলল।

শাশুড়িকে মধুমাখা গলায় বলল, 'মা! নতুন হলদে পীতাম্বরা শাড়িটা দেখান না? কি সুন্দর! দিন না আমাকে, আজকের দিনটা পরি?'

—'না বাছা, আমি পারব না। ছেলে বলে গেছে, কারুকে না দিতে।'

যেন ভারি ক্ষুণ্ণ হয়ে বড় বউ বলল, 'আমাকেও নয়?'

অনেক কথায়, অনেক খোশামোদে বউ শাশুড়ির মন ভেজাল। বুড়ি সাদাসিধে মানুষ। বউ কাপড়টা বাগাল বটে, কিন্তু নিমেষে কুমারের চার বউ সে শাড়ি ছিনিয়ে নিয়ে কাপড়টা চারজনে গায়ে দিয়ে হুশ্ করে উঠে গেল দেবলোকে।

সঙ্গে সঙ্গে এ বিশাল নগরী অন্তর্হিত হল। আদিম অরণ্য গ্রাস করল সব কিছু।

বুড়ি মা হাহাকার করে কেঁদে উঠল। চার কুমারকে ঘিরে গজিয়ে উঠল দুর্ভেদ্য অরণ্য দুর্গ। ভাইরা বিস্মিত।—'কি হ'ল বলো তো?'

ছোট কুমার বুঝেছে। বলল, 'আমার মায়ের কাণ্ড!'

খরধার তরোয়ালে জঙ্গল কেটে, লতা ছিঁড়ে কোনমতে বেরিয়ে ওরা মায়ের কাছে পৌঁছল। ছোট কুমার ওদের নিয়ে এসে রাখল সেই ব্রাহ্মণ রাজার আশ্রয়ে। নিজে গেল পলাতকা দেবকন্যাদের খুঁজতে।

দেবকন্যারা দেবলোকে কিছুকাল আনন্দে কাটাল। কিন্তু স্বামীর জন্যে মন কেমন করে। কত রঙ্গকৌতুক না করত সে! ওরা মর্ত্যে নেমে এল। দেখে দিশাহারা ঘুরছে ও। বলল, ওকে ওরা দেবলোকে নিয়ে যাবে।

ইন্দ্রকন্যা বলল, 'চলো, বাবার সঙ্গে দেখা করো। তাঁর অনুমতি পেলে আমাদের সকলকে নিয়ে আসতে পারবে। যখন আমাকে অপহরণ করো, ওঁর অনুমতি তো নাওনি।'

—'যাবনা কেন? যাব, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করব, এবার ওঁর সম্মতিও নেব। চলো!'

জলের বয়ামে মাছ বানিয়ে দিল ওরা কুমারকে, নিয়ে চলে গেল। দেবলোকে কুমার একা, ওরা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

—'মেয়েরা সব পারে!'

এই বলে কুমার সবাইকে শুধোচ্ছে ইন্দ্রপুরীর পথ কোনটা। সবাই নিয়ে গেল ওকে। সবাই তো এক জ্যান্ত মানুষকে দেখে অবাক! ইন্দ্রের সামনে যেতে দেবরাজ ওর কথা শুনলেন। ঠাট্টা করে বললেন, 'এদের চাও তো? প্রমাণ করতে হবে নিজের যোগ্যতা। চারটে কাজ দেব, করতে হবে। পারলে পরে চারজনের সঙ্গেই তোমাকে আরেকবার বিয়ে দেব।'

একটা বিশাল মাঠে ইন্দ্র চারটি তিল ছড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'তিন ঘণ্টার মধ্যে তিল কুড়িয়ে জড়ো কর, অগ্নিদেবের মেয়েকে পাবে।'

কুমার তো চিন্তায় পড়লেন। হঠাৎ মনে পড়ল, পিঁপড়েদের, তো জলের তোড় থেকে বাঁচিয়েছিলেন? মনে করতে না করতে পিলপিল করে চলে এল পিঁপড়ের দঙ্গল। একটি একটি করে তিল এনে চুড়ো করে রেখে গেল। যাক, ছোট বউকে জিতে নেওয়া গেল।

এবার ইন্দ্র এক গভীর কুয়োতে ফেললেন তাঁর সীলমোহর ক্ষোদিত আংটি। ওই

আংটি তুলতে হবে। কুমারের মনে পড়ল ব্যাঙের কথা। ব্যাং তো এসেই লাফ মেরেছে, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে কুঁকড়ে উঠেও এসেছে। কুয়োর তলদেশ পাহারা দিচ্ছে এক সাপের কুণ্ডলী। ব্যাং ডাকল তার ছেলে ব্যাঙাচিকে। ব্যাঙাচিকে ছুঁড়ল সাপের দিকে। সাপরা খেতে এল ব্যাঙাচিকে, আর ব্যাং উঠে এল আংটি নিয়ে।

কুমার ফিরে পেলেন বরুণ কন্যাকে।

ইন্দ্র কুমারকে দেখালেন একটা কলাগাছ।—'আমি চাই, এক কোপে গাছটা তিন টুকরো করো। তাহলেই পাবে নাগকন্যাকে।'

কুমার স্মরণ করলেন সেই কুমিরকে, যার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। কুমির হাজির হয়েই জানতে চায়, কাজটা কি!

—'দেখছ কলাগাছটা? তোমার ধারালো লেজের এক কোপে ওটা তিন টুকরো করতে হবে।' 'হবে' বলার আগেই গাছ তিন টুকরো। এবার নাগকন্যাকেও পাওয়া গেল।

ইন্দ্র শেষ পরীক্ষা নিচ্ছেন। তাঁর মায়াবলে তিন কন্যা যেন অবিকল ইন্দ্রকন্যা।

—'বলো, কে আমার মেয়ে!'

কুমার ঘাবড়ে গেছেন। চার ইন্দ্রকন্যা, কোনজন আসল? হঠাৎ মনে পড়ল, ভোমরাকে তো বাঁচিয়েছিলেন মাকড়সার জাল থেকে! যেমন মনে পড়া, অমনি উড়ে এল ভোমরা (সে এখন বড়োসড়ো), বসল ইন্দ্রকন্যার আঁচলে, গুনগুন গুঞ্জনে ওঁকে ঘিরে উড়তে থাকল।

কুমার বললেন, 'এই তো আমার প্রথম স্ত্রী!' ইন্দ্রকন্যার হাত ধরলেন তিনি। এঁকেও জিতে নিলেন। মর্ত্যের সামান্য প্রাণীরা কি ভাবে এসে এই মানুষটিকে সাহায্য করল, তা দেখে দেবতারা বিস্ময়ে মুগ্ধ একেবারে! ইন্দ্রের তো দারুণ মজা লেগেছে। তিনি দেবলোকে এক বিবাহ উৎসব আয়োজন করে দেব-প্রথায় এঁদের বিয়ে দিলেন।

কুমার চার বউ নিয়ে আগে গেলেন পিতার রাজ্যে। দখলদার বিদেশী রাজাদের পরাজিত করে রাজধানী দখল করলেন। চারপাশের ছোট ছোট রাজাদের জয় করে আগেকার বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হলেন। নিয়ে এলেন বাবা-মা-ভাই সকলকে।

এক পূর্ণিমার রাতে চার বউয়ের সঙ্গে দোল খেতে খেতে মনে পড়ল এমনই এক দিনের কথা।

বাবাকে ডাকলেন তিনি। বাবা আসতেই বললেন, 'বাবা! একদিন যা করব বলেছিলাম, সে কাজ করেছি তো?'

বাবা বললেন, 'করেছ পুত্র, করেছ। কারো ছেলে হ'লে যেন তোমার মতো ছেলেই হয়।'

হান্‌চি

কন্নড়

এক যে বুড়ি, তার তো এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ের চুল সোনার বর্ণ। তবে দুজনে বড় হবার আগে দাদা তা খেয়াল করে দেখেনি। বোন তখন এক সুন্দরী তরুণী। দাদা যেন হঠাৎ ওর চুল দেখল, যেন আগে কখনো দেখেনি, আর দেখেই বোনের প্রেমে পড়ল। মাকে গিয়ে বলল, বোনের সঙ্গে বিয়ে দিতে। সে বেচারি কেঁপে উঠল। বুঝল, সর্বনাশ আসন্ন। তবে মনের ভাব লুকিয়ে রেখে ছেলেকে পাঠাল শহরে। বিয়ের ভোজের জন্যে চাল-ডাল-আটা তো চাই।

ছেলেও বেরোল, মা-ও ছুটে গেল মেয়ের কাছে।

—'বাছা! আমাকে ছেড়ে যাবার সময় হয়েছে। আজ বাদে কাল, তুমি আমার কাছে মৃতই বটে! এখানে নিরাপদে থাকো, তার পক্ষে তুমি বড় বেশি সুন্দরী। তোমার চুল সোনালি। যে দেখবে, সেই তোমাকে চেয়ে পাগল হবে। একটা মুখোশ গড়িয়ে দেব। তোমার মুখ আর চুল ঢাকা পড়বে। বিপদ থেকে রক্ষা পাবে ভবিষ্যতে।'

ছুটে কুমোরের কাছে গিয়ে তাকে একটা সোনার বাসনই দিয়ে দিল। বলল, মেয়ের মুখ ঢেকে থাকে, এমন একটি মাটির মুখোশ গড়ে দিতে। সে রাতেই মেয়েকে একটা খাবারের পোঁটলা দিয়ে বলল, 'অবস্থা নিরাপদ না হওয়া অবধি এ মুখোশ খুলো না।'

মেয়ে চলে গেল। বুড়ি মনের দুঃখে বিষ খেয়ে মরল। পরদিন ছেলে এসে দেখে, মা মরে কাঠ, বোনের দেখা নেই। বোনের খোঁজে বৃথা ঘুরতে ঘুরতে সে পাগলই হয়ে গেল। এখন সে উন্মাদ, পথে পথে ঘোরে আর ঘোরে।

মাটির মুখোশ পরে মেয়ে পথে পথে ঘুরল। ওর মায়ের দেওয়া ভাত আর রুটিতে যতদিন চলল, ও ঘুরল। মাটির মুখোশটা মাটির টালি বা 'হান্‌চি।' দুপুরে বা সন্ধেয় চাঁদ উঠলে ও কোন পথের ধারে কোন ছোট নদীর পাড়ে বসে পোঁটলা খুলে খেয়ে নেয়। ক্রমে নিজের জায়গা থেকে অনেক দূরে চলে এল ও। এক বুড়ির সঙ্গে ভাবসাব হল বেশ। বুড়ি ওকে বাড়িতে নিয়ে রাখল। খায় দায়, থাকে। একদিন বুড়ি বাড়ি এসে বলছে, কাছেই এক 'সাউকর' থাকে, খুব ধনী মানুষ। ওদের একটি ঝি দরকার। বুড়ি হান্‌চির কথা বলে এসেছে। হান্‌চি রাজী হল। সেই বড় বাড়িতে গেল কাজ করতে। ও পাকা রাঁধুনি। ওর মতো চালের মিঠাই বা পায়েস কেউ বানাতে পারে না।

একদিন সাউকার তার ফলবাগিচায় ভোজসভা ডাকল। হান্‌চিকে বলল চালের

নানাবিধি মিঠাই বানাতে। সেদিন সবাই গেল বাগানে। বাকি রইল হান্‌চি। আর সাউকারের ছোট ছেলে। ছেলেটা কি কাজে বেরিয়েছিল যেন।

হান্‌চি ভেবেছে সে একা। জল গরম করেছে, তেল মেখে স্নান করবে। ওরা বাড়ি ফেরার আগেই স্নান সেরে নিতে চায়। মুখোশ নামিয়ে রেখে, সোনার চুল খুলে, শুকনো দেহে তেল মেখে ও স্নান করছে। এদিকে ছোট ছেলে বাড়ি ফিরে এসেছে। চেঁচিয়ে ডাকছে ঝি-কে। স্নানঘর থেকে হান্‌চি তো ওর ডাক শোনেনি। ধৈর্য হারিয়ে ছেলে ওকে খুঁজতে এসেছে। স্নানঘরে আওয়াজ শুনে উঁকিও মেরেছে। ওর সৌন্দর্য চোখ ভরে দেখল। হান্‌চি ওকে দেখার আগেই ও সরে পড়ল। কিন্তু ছেলে ওর দেহসৌন্দর্যে মুগ্ধ, ওর স্বর্ণাভ চুলের ঐশ্বর্যে মুগ্ধ, তখনি ঠিক করল, ওকেই বিয়ে করবে।

বাড়িতে সবাই ফিরতে না ফিরতে ছেলে মাকে বলল মনের কথা। অমন কালোকুচ্ছিৎ ঝিয়ের জন্যে ছেলে এমন উতলা? মায়ের ধাঁধা লেগে গেল। মা ছেলেকে বলল, নিচুঘরের একটা কেলেকুষ্টি মেয়ের জন্যে নিজেকে হাস্যাস্পদ করা ঠিক নয়। বলল সবুর করতে। ধনী ঘরের সুন্দরী মেয়ে মা এনে দেবেই দেবে। ছেলে কোন কথা কানে নেয় না, জেদও ছাড়ে না। বহুৎ গরম গরম কথাকাটাকাটি হল। শেষে ছেলে মাকে টানতে টানতে হান্‌চির কাছে নিয়ে গেল, ওর মুখে হাত দিয়ে মুখোশটা খুলে নিয়ে আছড়ে ফেল।

হান্‌চি নিজের সৌন্দর্য সুষমায় যেন দীপ্ত, ওই সোনালি চুল যেন মাথার মুকুট। মা তো এ অলৌকিক রূপ দেখে হতবাক। এখন বুঝলেন ছেলে কেন এত মোহিত। আর নম্র, মিষ্টি স্বভাবের জন্য হান্‌চিকে তিনি পছন্দই করতেন। লাজুক মেয়েটাকে নিয়ে গেলেন আদরে। কিছু প্রশ্ন করলেন। শুনলেন ওর অবিশ্বাস্য জীবন কাহিনী। হান্‌চিকে তাঁর আরো ভাল লাগল। সবচেয়ে আগে যে লগ্ন পাওয়া গেল তাতেই ওদের বিয়ে হয়ে গেল।

নতুন বরকনে, কবুতর কবুতরীর মতোই সুখী। তবে এ সুখ তো বেশিদিন টিকল না। সাউকরের বাড়িতে এক সাধু থাকেন, সবাই তাঁকে বলে, গুরুস্বামী। ইনি সাউকারের প্রধান মন্ত্রণদাতা। গুপ্তবিদ্যা, তন্ত্র মন্ত্র জানেন বলেও শোনা যায়। এ সমানে হান্‌চিকে দেখে লালসা মাখানো চোখে, ওকে পেতে চায়। হান্‌চির শাশুড়ি যখন ওকে বললেন, নাতির মুখ দেখতে তাঁর মন বড়ই ব্যাকুল, গুরুস্বামী মওকা পেয়ে গেল। বলল, জাদুবিদ্যা প্রয়োগেই সে হান্‌চিকে গর্ভিনী করতে পারে। হান্‌চিকে তার কাছে পাঠালেই হবে। তবে কিনা, এজন্যে চাই কলা, কাঠবাদাম, পান সুপারি।

এক শুভদিনে গুরুস্বামী ডাকল হান্‌চিকে। সব উপচার সাজানো, ও মন্তরও পড়ে দিয়েছে। হান্‌চি তা খেলেই জাদুর খেলা শুরু হয়ে যাবে। হান্‌চি ওর আকর্ষণে উন্মাদ

হয়ে ছুটে যাবে। হান্‌চি হ'ল বুদ্ধিমতী। এ সব শয়তান জাদুকরদের ও চেনে। ও দিল কলা, হান্‌চি সেটা ফেলে দিল গরুর জাবনা রাখার ডাবায়। আরেকটা কলা খেয়ে চলে গেল ঘরে। গুরুস্বামী ভাবছে, ওর মন্ত্র মেয়েটিকে টেনে আনল ব'লে। এখন, এক মাদী মোষ ডাবা থেকে সেই কলা খেয়েছে। খেয়েই গুরুস্বামীর প্রেমে পড়েছে। কামনায় অধীর হয়ে মোষ ছুটে এসে গুরুস্বামীর দরজায় শিং দিয়ে ঢুঁ মারছে। হান্‌চি এসেছে ভেবে যেমন দরজা খোলা, প্রেমপাগল মোষটি ওকে গুঁতিয়ে ক্ষতবিক্ষত করল। গুরুস্বামী হাল ছাড়ল না। বেশ কিছুদিন বাদে ও হান্‌চির সাদাসিধে শাশুড়িকে বলল, কতকগুলো তন্ত্রাচারের জন্যে হান্‌চিকে ওর ঘরে পাঠাতে। হান্‌চি যেতেই ওকে দিল মন্ত্র পড়া কাঠবাদাম আর পান। হান্‌চি সেগুলো লুকিয়ে ফেলে নিজের আনা কাঠবাদাম আর পান খেয়ে ঘরে চলে গেল। যাবার সময়ে গুরুস্বামীর দেওয়া জিনিস ছোট বড় ধাতুর কুনকে, ধাতুর পাত্র, এ সবে ফেলে গেল। রাতে গুরুস্বামী শুয়ে আছে, তার প্রেমে পাগল ঘটি-বাটি-গামলা-জালা, সব এসে দরজার গায়ে গড়িয়ে পড়ছে, আর গুরুস্বামী দোর খুলতেই দড়াম দড়াম করে আছড়ে পড়ছে ওর গায়ে। তৃতীয়বার হান্‌চি একটা মুড়ো ঝাঁটায় মন্তর পড়া সুপুরি রেখে চলে গেল। গুরুস্বামী দোর খুলতেই এক মুড়োঝাঁটা তার বুকে লেপটে থাকল। গুরুস্বামী তার কৌশল পালটাল।

সে গেল তার বন্ধু, হান্‌চির শ্বশুরের কাছে। বলল, ফলবাগিচায় আরেকবার বনভোজন হোক না! বুড়ো তো রাজী। বরাবরের মতো এবারও হান্‌চি নানাবিধি চালের মিষ্টান্ন বানাল। বাড়ির লক্ষ্মী বউয়ের মতো নিজে রইল বাড়ি দেখশোনার জন্যে।

সবাই যখন বনভোজনে ব্যস্ত, কোনো অছিলা করে গুরুস্বামী এল বাড়িতে। সবাইকে বলল, কি একটা ফেলে এসেছে, আনতে যাচ্ছে। আসার পথে পুরুষদের পোশাক পাগড়ি, কুর্তা এ সব এনেছে। হান্‌চি যখন রান্নাঘরে, ও হান্‌চির ঘরে রেখেছে ওগুলো, খাটের নিচে আর মেঝেতে ফেলেছে পোড়া বিড়ি, পানের ছিবড়ে।

তারপর উড়তে পুড়তে গেছে ফলবাগানে আর চেঁচাচ্ছে, 'তোমাদের বেটার বউ একটা বেশ্যা! ধরে ফেলেছি, ওর নাগর ওর কাছে ছিল। পরিবারের মর্যাদা, নারীত্বের সম্মান, সব ভুলে গেছে। এ পাপ! তোমাদের বংশে দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে। কলঙ্কিনী!'

পরিবারের বিশ্বাসী বন্ধুর এ সব কথা শুনে সবাই দৌড়ল বাড়িতে। ন্যায়ের ধ্বজার মতো ঘৃণায় জ্বলে গুরুস্বামী ওদের পুরুষের পোশাক দেখাল। পোড়া বিড়ি, পানের ছিবড়ে। সবই তো হান্‌চির কলঙ্কের অকাট্য প্রমাণ! বাড়ির লোকজনের মতই হান্‌চিও থ' মেরে গেছে। তবে তার প্রতিবাদ তো শুনল না কেউ। সে গুরুস্বামীকেই দুষ্ট নষ্ট বলে অভিযোগ করল, তার দুষ্ট মন্ত্রক্রিয়ার কথাও বলল। কিন্তু বাড়ির সবাই সন্দেহে ও ক্রোধে পাগল। তারা ওকে এত মারল, যে সোনার অঙ্গে কালশিটে পড়ে গেল। যখন ও বুঝল, সকলেই ওর বিপক্ষে, ও মুখ বন্ধ করে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিল

নিজেকে। ওরা ওকে তিনদিন ঘরে বন্ধ করে রাখল, খেতে দিল না। কিন্তু ওর মুখ থেকে পাপের কথা কবুল করাতে পারল না। এই জেদ ও নীরবতা ওর স্বামী ও শ্বশুরকে আরোই ক্ষেপিয়ে তুলল। গুরুস্বামী দেখল তার হাতে তুরুপের তাস এসে গেছে। সে বলল, 'এ হারামজাদীর এ ওষুধে কাজ হবে না। পাপের যোগ্য শাস্তি দিতে হবে। ওকে একটা বাক্সে পোর। বাক্সটা আমাকে দাও। আমি ওটা নদীতে ফেলে দেব। এমন মেয়েছেলেকে তোমরা খুব দয়া দেখাচ্ছ। ওর যে শাস্তি প্রাপ্য, তাই দিতে হবে।'

ক্রোধ ও লজ্জা এদের যেন অন্ধ করে ফেলেছে। এরা ওর কথায় রাজী হল। হান্‌চিকে টেনে হেঁচড়ে এনে একটা বাক্সে পুরে বাক্স বন্ধ করা হল, গুরুস্বামীকে সেটা দেওয়া হ'ল। ও হান্‌চিকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোল খুশি মনে। ষড়যন্ত্রটা সফল হয়েছে।

তারপর ভাবল চাকরগুলোকে বিদেয় করা দরকার। বলল, শহরের বাইরে এক বুড়ির বাড়ি। বাক্সটা নিয়ে সকাল অবধি রাখতে। নদী তো অনেক দূরে। গুরুস্বামী জানে না, এ বুড়ি আর কেউ নয়। হান্‌চির দুঃসময়ের বন্ধু, যে হান্‌চিকে শহরে কাজ খুঁজে দিয়েছিল। গুরুস্বামী বুড়িকে বলল, বাক্সে আছে পাগলা আর হিংস্র কুকুর। পরদিন ও ওগুলোকে নদীতে ডোবাবে। বুড়ি যেন সাবধানে থাকে। কোন কারণেই যেন বাক্স না খোলে। তাহলে কুকুরগুলো বেরিয়ে আসবে। এমন ভয় দেখাল ও, যে বুড়ি বেজায় ঘাবড়ে গেল। গুরুস্বামী বলল, ও এসে ওগুলোকে নিয়ে যাবে।

ও চলে গেছে। বুড়ি বাক্স থেকে অদ্ভুত সব আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। প্রথমে ভেবেছে কুকুরই হবে। কিন্তু এ তো ওরই নাম ধরে ডাকছে। হান্‌চি বুড়ির গলাও চিনেছে, সাহায্যও চাইছে। বুড়ি সাবধানে ডালা খুলতেই দেখে হান্‌চি গুটিসুটি হয়ে বসে আছে। বুড়ি হতভাগিনীকে বের করে আনল, ওকে খেতে দিল। ক'দিন ধরে উপোসী, হান্‌চি একেবারে গপগপিয়ে খেল। দুর্দিনের বন্ধুকে নিজের সব দুঃখের কথাই বলল, ওকে বাগাবার জন্যে বজ্জাত গুরুস্বামীর শয়তানির কথাও বলল। বুড়ি সব শুনল। মাথা খাটিয়ে একটা বুদ্ধিও করল। হান্‌চিকে লুকিয়ে রাখল ভিতরের ঘরে। শহরে গেল সেই লোকের কাছে, যার কুকুর পাগল হয়ে গেছে। বুড়ি কুকুরের মুখ এঁটে জাল বাঁধল, ওটাকে ঘরে আনল, জালটা খুলে নিয়ে কুকুরটাকে বাক্সে পুরে বন্ধ করল।

গুরুস্বামী তো বাতাস ভরে উড়ে এসেছে। এবার হান্‌চির ওপর ওর ক্ষমতা খাটাবে। গায়ে আতর, মুখে গান, বাক্স পরখ করে দেখছে। বুড়ি ভয়ে কেঁপে বলছে, সে বাক্সটা ছোঁয়নি অবধি। গুরুস্বামী বলছে ও সান্ধ্যাহ্নিকে বসবে, বুড়ি বেরিয়ে যাক।

দোর বন্ধ করে, দরজায় খিল দিয়ে আদর করে হান্‌চিকে ডাকতে ডাকতে ও বাক্সের ডানা খুলেছে। ওর কলজে যেন কণ্ঠায় লাফিয়ে উঠল। এক ভীষণ কুকুর, মুখে ফেনা গড়াচ্ছে, লাফিয়ে উঠে ওকে কামড়াতে থাকল। ও তখন নিজের

পাপকাজকেই শাপশাপান্ত করছে, বলছে সর্বদ্রষ্টা ঈশ্বর ন্যায্যবিচারই করেছেন। একটা মেয়েকে এক পাগলা কুকুর বানিয়ে দিয়েছেন। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে ঈশ্বরের কাছে করুণা চাইতে চাইতে ও ঢলে পড়ল। পাড়াপড়শিরা হতভাগ্য গুরুস্বামীর চিৎকার শুনে দৌড়ে এল। কুকুরটাকে মারল, তবে গুরুস্বামীকে বাঁচানো গেল না। জলাতঙ্কেই ওর মৃত্যু হল।

গুরুস্বামীর মৃত্যুতে হান্‌চির স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকরা খুব আঘাত পেল মনে। কয়েক মাস বাদে এই বুড়ি ওদের সকলকে নেমন্তন্ন করল। হান্‌চি ন্যায় বিচার না পেলে তার তো শান্তি নেই। হান্‌চির শ্বশুরবাড়ির সবাই এলে বুড়ি নানা সুখাদ্য পরিবেশন করল, নানা রকম চালের মিষ্টান্ন। এ তো হান্‌চি ছাড়া কেউ বানাতে পারে না। যেই খেল, তারই মনে পড়ল হান্‌চিকে, দুঃখে তারা কাতর হ'ল। তারা জিগ্যেস করল, হান্‌চির সঙ্গে টেক্কা দেয়, এমন রাঁধুনি যোগাড় হল কি করে! উত্তর না দিয়ে বুড়ি হান্‌চিকে নিয়ে এল। এরা স্তম্ভিত। এরা তো জানে হান্‌চি মরে গেছে, নদীর জলে ডুবে চিরতরে চলে গেছে। গুরুস্বামী তাকে মেরে ফেলেছে। বেচারা নিজেও জলাতঙ্কে পাগল হয়ে মরেছে। বুড়ি হান্‌চি আর শয়তান গুরুস্বামীর বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা সব খুলে বলল।

হান্‌চির স্বামী, আর স্বামীর পরিবার তখন অনুশোচনায় দগ্ধ। কি না করেছে ওরা হান্‌চির সঙ্গে! গুরুস্বামীর মতো একটা বিষাক্ত সাপ সদৃশ মানুষকে ওরা এত বিশ্বাস করেছিল? গুরুস্বামীকে শাপশাপান্ত করল ওরা, হান্‌চির কাছে ক্ষমা চাইল।

এতদিনে হান্‌চির সুসময় শুরু হ'ল! ভাগ্য ফিরে গেল ওর। সেদিন থেকে সবরকম সুখ ওর জীবনকে ভরে তুলল।

মোষ থেকে মোরগ

মারাঠী
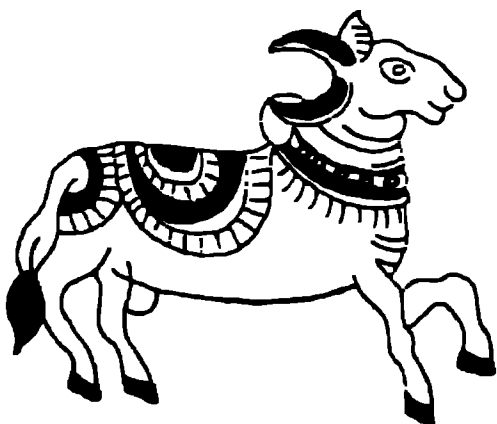
পাটিল লোকটা বেজায় গরিব। কিন্তু বউ তাকে খুব ভালবাসে আর থাকার মধ্যে আছে দুটো মোষ। মোষ দুটো বেড়ে উঠছে, পাটিলরা আরো গরিব হচ্ছে। তা, বউ বলল, 'একটা মোষ নিয়ে হাটে বেচে এসো না কেন? চারটি বাড়তি পয়সা হাতে আসে?'

পরদিন সকালে পাটিল পাশের গাঁয়ের হাটে চলেছে, দেখে একটা লোক একটা ঘোড়া নিয়ে সেই হাটেই যাচ্ছে। পাটিল বলল, ও

বুড়ো মোষটা বেচতে যাচ্ছে। এ লোকটার ভারি মনে ধরল মোষটা। বলল, 'অত দূরে যাবে বা কেন? ওটা আমাকে দাও, আমি তোমায় ঘোড়াটা দিচ্ছি।'

পাটিল ভাবল, 'মন্দ কি? ঘোড়ায় ঝামেলাও কম, ছেলেপিলে মজাও পাবে।' তাই বলল, 'ঠিক আছে, ঘোড়াটা দাও।'

ঘোড়া চেপে হাটে যাবে তো দেখে ঘোড়াটা অন্ধ। দেখে একজন একটা গরু নিয়ে চলেছে।

—'অ বুড়ো! ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছ কোথায়?'

—'বুড়ো মোষটাকে হাটে বেচতে যাচ্ছিলাম। তা এই ঘোড়াটার সঙ্গে বদলাবদলি করলাম। ঘোড়াটা কানা!'

—'তাই না কি? আমার গরুটা কিন্তু খাসা। এটা নিয়ে ঘোড়াটা দাও না কেন? আমার কাজে লাগবে।'

পাটিলের গরুটা চোখে ধরল। ঘোড়ার চেয়ে গরুর খাটনি আরোই কম। ঘোড়ার বদলে গরু নিল ও। কিন্তু অচিরে বুঝল, গরুটার এক পা খোঁড়া।

দেখে একজন একটা মাদী ছাগল নিয়ে যাচ্ছে। লোকটা শুধোল, ও যাচ্ছে কোথায়। পাটিল বলল, 'বুড়ো মোষটা বেচতে হাটে যাচ্ছিলাম, পথে সেটার বদলে পেলাম একটা কানা ঘোড়া। এখন কানা ঘোড়ার বদলে পেয়েছি খোঁড়া গরু। যাই, এটাই বেচে আসি!'

—'আহা, ওটা বেচবে কেন? একটা গরু পেলে আমার...আমার মাদী ছাগলটা নাও, গরুটা দাও!' হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে, তো দেখে ছাগলটা বেজায় রুগ্ন। হাটে পৌঁছে দেখে একটা লোক একটা মোরগ বগলদাবা করে নিয়ে চলেছে। পাটিলের ছাগলটা সে নিল, পাটিল নিল মোরগটা।

তখন দুপুর। সঙ্গে নেই একটি পয়সা। আছে শুধু মোরগটা। হাটে সেটাকে বেচে পেল একটি টাকা। সে টাকা দিয়ে কিন্তু খাবার কিনল। কাছের পুকুরে পা ধুয়ে অশত্থ গাছের ছায়ায় বসে খাবারটা রাখল পাতায়। মুখে খাবার তুলতে যাবে, তো কোথা থেকে এল ছেঁড়াখোঁড়া কাপড় পরনে এক ভিখিরি। বলল, 'অনেকদিন খাইনি কিছু। কিছু খেতে দাও!'—নিজে পেটভরে খাবে, ভিখিরিটির জুটবে না, এ পাটিলের সইল না। ভিখিরিকে সব খাবারটুকু ধরে দিয়ে ও বাড়ি চলল।

বউ তো দাঁড়িয়েছিল। পাটিল আসার আগেই ও রেঁধেবেড়ে ঘরের কাজ সেরে ছেলেপিলেকে খাইয়ে দিয়েছে। সে জিগ্যেস করল, দিনটা কাটল কেমন। পাটিলকে অমন হতাশ বা দেখাচ্ছে কেন!

—'বলছি, বলছি সব। আগে এক গেলাস জল দাও তো!'

জল খেয়ে, খানিক জুড়িয়ে ও বলতে শুরু করল কি কি ঘটেছে।

—'মোষটা...ইয়ে...বেচিনি। মোষের বদলে ঘোড়া পেয়ে গেলাম একটা।'

—'খু—ব ভালো! কই, ঘোড়া কই? অ বাছারা! বাবা একটা ঘোড়া কিনেছে রে!'

—'রোস, রোস। ঘোড়াটোড়া নেই। বদলে একটা গরু নিলাম তো!'

—'চমৎকার! একটা গরুর যে কি শখ ছিল! বাচ্চারা যা হোক গাইয়ের দুধ খেতে পাবে। ওরে! বাইরে যেয়ে দেখ। বাবা গরু এনেছে!'

—'শোন গো শোন! গরুটা বাড়ি আনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার বদলে যে মাদী ছাগল নিলাম একটা?'

—'মাদী ছাগল তো আরোই ভালো। ছাগলের দুধে ছেলেপিলের শক্তি বাড়ে। আর ছাগল নিজেই জোগাড় করে খায়। বাছারা! নতুন ছাগলটা দেখে আয়।'

—'তাড়াহুড়ো কোর না গো! ছাগলের বদলে একটা মোরগ নিয়ে নিলাম।'

—'স—বচেয়ে ভালো। ও রোজ আমাদের ভোরে জাগিয়ে দেবে। ওটা কোথায় গো? চলো, সবাই যেয়ে দেখি মোরগটা, কেমন?'

—'ওগো! মোরগ আমি আনিনি। ক্ষিদে লেগেছিল, তা ওটা এক টাকায় বেচে খাবার কিনলাম।'

—'ঠিক করেছ। মোরগ দিয়ে করতাম বা কি? দুপুরে কিছু খেয়েছ, তাতেই আমি খুশি। এত খাটাখাটনির পর না খেয়ে থাকা উচিত হত না।'

—'ওগো! সবটুকু বলতে দাও! খেতে যাব, এক উপোসী ভিখিরি এসে হাজির! তাকে সবটুকু খাবার ধরে দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরলাম!'

—'আর নিজে না-খেয়ে রইলে? বে-চা-রি! তবে, কাজটা তো উচিত কাজই করলে। খাবার সময়ে ভিখিরিকে কক্ষনো ফেরাতে নেই। এখন হাত মুখ ধোও। আমি তোমায় যা হয় কিছু খেতে দিই। ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে তো!'

—বউ ওকে খাবার বেড়ে দিল।

সকালে ঘরের দোর খুলে পাটিল অবাক! ও বউকে ছুটে আসতে বলল। দরজার সামনে কত যে জীবজন্তু! মোষটা মোটেও বুড়ো নয়, ঘোড়াটা কানা নয়, গরুটা নয় খোঁড়া। মাদী ছাগলটা দিব্যি তাজা আর ছটফটে। মোরগটা খুব সুন্দর।

এ দেখে বিস্ময়ে হতবাক বউ ফিশফিশিয়ে বলল, 'দুনিয়াতে এমন কাজ করে দেখাল কে? যে ভিখিরিকে খাইয়েছিলে, সে?'

পাটিল বলল, 'হ্যাঁ...সেই ভিখিরি...ভগবানই হবেন তিনি, আর কে?'

কুমার আর তার বামাঙ্গিনী

কন্নড়

এক রাজার এক ছেলে। কুমারের বয়স হ'ল তো রাজার ইচ্ছে তাকে বিয়ে দেন। কুমার বিয়ে করতে চায় না, কারো পরামর্শ নেয় না, বড়দেরও না। রাজা বেজায় মরিয়া। বললেন, কুমার বিয়ে না করলে তিনি গলায় দড়ি দেবেন। কুমার বলল, 'ঠিক আছে! আমাকে আধাআধি করে চেরো মাথা থেকে পা। বাঁ দিকটা ফুলের নিচে সমাধি দাও। তা থেকে একটি নারী জন্মাবে, আমি তাকে বিয়ে করব। আর কাউকে নয়!'

রাজার ভয়, চেরার সময়ে ছেলে মরে যাবে। তিনি বললেন, 'এর চেয়ে সহজ কিছু করা চলে না?'—কুমার বলল, 'না। অন্য মেয়েদের মুঠোয় রাখা যায় না। ওদের তাঁবে রাখা খুব কঠিন।'

অগত্যা রাজা রাজী হলেন। কুমারকে আধাআধি চেরা হ'ল। বাঁ দিকটা ফুলে চাপা দেওয়া রইল। ক'দিনেই ফুল থেকে উঠে এল এক কন্যা। রাজা তাকে ছেলের সঙ্গে বিধিমতে বিয়েও দিলেন।

এক নির্জন প্রান্তরে কুমার বউয়ের জন্যে চমৎকার প্রাসাদ বানালেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। রাজাও পুত্রবধূকে খুব স্নেহ করেন। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসেন তার যত্নআত্তি হচ্ছে কি না।

কোন দূরদেশ যাবার পথে ওখানে এল এক মায়াবী। এমন নির্জনে এমন প্রাসাদ? সে প্রাসাদ ঘিরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কুমারপত্নী, জানলায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখে হাসলেন।

কাছের গ্রামে এক বুড়ির বাড়িতে উঠল মায়াবী। এ বুড়ি মালিনী। কুমারপত্নীর জন্যে নিত্যি মালা গাঁথে। একদিন মায়াবী এক আশ্চর্য মালা গাঁথল, বুড়িকে দিয়ে বলল, 'কুমারপত্নীকে মালা দাও। উনি কি বলেন, আমাকে এসে জানিও।'

বুড়ি তো মালা নিয়ে গেছে। কুমারপত্নী মালাটি নিরীক্ষণ করে দেখে বুঝলেন, মালা কি খবর এনেছে। মনে আনন্দ, বাইরে রাগের ভাণ, দু'হাতে সিঁদূর মেখে বুড়ির দু'গালে চড় মারলেন। বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এসে মায়াবীকে গাল দেখাল। মায়াবী সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ভেবো না, কিছুই হয়নি। ও জানাল, যে ও এখন ঋতুমতী।'

ক'দিন বাদে আবার একটি মালা গেঁথে ও পাঠাল। এবার কুমারপত্নী দু'হাত চুনে ডুবিয়ে বুড়ির বুকে চড় মারলেন। বুড়ি কেঁদে কেঁদে ঘরে গেল। দেখে মায়াবী বলল, 'উনি জানালেন, এখন শুক্লপক্ষ।'

ক'দিন বাদে সে আবার পাঠাল মালা। এবার কুমারপত্নী দু'হাত কালো কালিতে

ডুবিয়ে বুড়ির পিঠে চড় মারলেন। বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে ঘরে গেল। মায়াবী বলল, 'বুড়ি! গোপন বার্তাগুলো ঠিক ঠিক বুঝতে শেখো। উনি চান, কৃষ্ণা প্রতিপদে আমি যেন প্রাসাদের পিছনে যাই।'

গিয়ে মায়াবী দেখে, প্রাসাদের বারান্দা থেকে একটা দড়ি ঝুলছে। দড়ি ধরে ও উঠে এল। জানলা দিয়ে ঢুকল প্রাসাদে। কুমারপত্নী তো প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি খুশি। দু'জনে যথেষ্ট ভালবাসাবাসি করলেন। কুমার পত্নী মধুর গলায় বললেন, 'তুমি যদি মানুষী চেহারায় আসো, তোরণে শাস্ত্রীরা ঢুকতে দেবে না তোমায়। ছদ্মবেশে এসো, প্রায়ই আসতে পারবে।'—মায়াবী বলল, 'এ তো খুব সোজা!'—এরপর থেকে ও সাপ হয়ে আসতে থাকল, নালানর্দমা দিয়ে সাপ হয়ে ঢোকে, কুমার পত্নীর ঘরে ঢুকেই নিজ চেহারা ধরে। ভালবাসাবাসি করে। এ ভাবে অনেক দিন গেল।

একদিন রাজা দেখতে এসেছেন পুত্রবধূকে, দেখেন নালা দিয়ে সাপ ঢুকছে। তখনি লোকজন ডেকে সাপ মারলেন চাকরদের বললেন, মরা সাপটা বাইরে ফেলে দিতে। পুত্রবধূর মহলে গিয়ে বললেন, 'জানো? দেখলাম, বাড়িতে একটা সাপ ঢুকছে। তুমি বেঁচে গেছ। আমি ওটাকে মারিয়েছি, বাইরে ফেলে দিইয়েছি!' পুত্রবধূ আর্ত চীৎকার করে উঠল। 'হায় হায়! কি সর্বনাশ!'—ও জ্ঞান হারাল।

অনেক শুশ্রূষার পর ওর জ্ঞান ফিরল। বুক ভেঙে যাচ্ছে দুঃখে। ওর প্রেমিক তো ধরাও পড়েছে, নিহতও হয়েছে। বাইরে ভাণ দেখাচ্ছে, সাপের জন্য, আর কোনমতে প্রাণে বেঁচেছে বলে এত ভয় পেয়েছে। যাবার আগে রাজা ওকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন, 'ভয়ের কি আছে তোমার? সাপটা সত্যিই মরে গেছে।'—সেদিন থেকে কুমার পত্নী শোকাকুলা, নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিলেন।

একদিন এক 'দসায়া', এক সাধু ভিক্ষা চাইতে এল। কুমার পত্নী তাকে দরজায় ডাকল।—'দেখ দসায়া! তোমাকে একটা টাকা দেব। বাইরে বোধহয় একটা মরাসাপ পড়ে আছে। গিয়ে দেখ তো, ওটা আছে কি না?'—দসায়া গেল, দেখল, এসে বলল, সাপটা পড়ে আছে। কুমারপত্নী বললেন, 'ওটাকে শ্মশানে নিয়ে পোড়াও, আমাকে ছাইটা এনে দাও। এ জন্যে দু'টাকা দেব।'—দসায়া রাজী। শ্মশানে নিয়ে ও সাপটিকে বিধিমতে সৎকার করে ছাই এনে দিল। কুমার পত্নী ওকে দু'টাকা দিল। আরো তিন টাকা দিয়ে বলল, 'স্যাকরার দোকানে যাও, একটা তাবিজ এনে দাও।'—দসায়া আবার গিয়ে তাবিজ এনে দিল।

মৃত প্রেমিকের দেহভস্ম তাবিজে পুরে ও সেটা গলায় পরল। শোক করে চলল

ও, দিনে দিনে রোগা হয়ে যেতে থাকল। কুমার শুনল, বউ বড় শীর্ণ হয়ে গেছে। ভাবল, 'ওর কোন গোপন দুঃখ আছে। আমি যাব, ওকে সান্ত্বনা দেব। দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে!'

প্রাসাদে এসে কুমার শুধোল, স্ত্রীকে এমন শীর্ণ, এমন রুগ্ন দেখাচ্ছে কেন! অনেক পীড়াপীড়ি? ওকে সব খুলে বলতে। বউ না খুলল মুখ, না বলল কথা। বউকে কোলে বসিয়ে কুমার নানাভাবে মিনতি করে চলল। শেষে বউ বলল, 'আর কি করার আছে আমার? আমাকে তো কয়েদে রেখেছ। পূর্ণিমার দিনে, আর প্রতিপদের দিনে, এই তো তোমার দেখা পাই। আমার মনে কি সুখ আছে, না সান্ত্বনা?' কুমারের খুব অনুশোচনা হ'ল ওর দুঃখের কথা জেনে। সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'তবে এখানেই থাকব প্রত্যহ, অষ্টপ্রহর।'

কুমার পত্নী বলল, 'আমি একটা ধাঁধা বলছি। যদি উত্তর দিতে পারো, আমি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরব। যদি উত্তর দিতে না পারো, তুমি আগুনে পুড়ে মরবে। পরে যদি কেউ শুধোয়, এমন কেন ঘটল, আমরা কেউ তার জবাব দেব না। যদি এমন শর্তে রাজী থাকো, আমি ধাঁধাটা বলি। নইলে আমাদের ছাড়ছাড়ি হয়ে যাক।' বোকা কুমার রাজী হয়ে গেল। বউয়ের হাতে হাত রেখে কথা দিল। কুমারপত্নী বলল :

দেখার জন্যে এক
জ্বালাবার জন্যে দুই
গলায় পরার জন্যে তিন
উরুর জন্যে স্বামী
গলার জন্যে প্রেমিক
বলো এর মানে কি!

কুমার অনেক চেষ্টা করল, অনেক আঃ উঃ বলল, ধাঁধার মানে বের করতে। উত্তর তো প্রাণপণ চেষ্টাতেও দিতে পারল না। তাই কথামতো আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরল। বউ আরেকটি প্রেমিক জোগাড় করে নিয়ে সুখে বাস করতে থাকল।

গালার মোষ

তামিল

এক ভারি গরিব বামুনের ঘেন্না ধরে গেল দারিদ্রে। ভাবল, বারাণসী যাই। সেখানে ভারতের সর্বত্র থেকে তীর্থযাত্রী আসে। তামিল দেশের এই হতভাগা ছোট শহরের চেয়ে সেখানে ওরা বামুনকে বেশি টাকা দেবে, দানদক্ষিণাও বেশি মিলবে। তাই, বউ যখন ঘ্যানঘ্যান করে চলে, ওর চেয়ে ধনী পড়শীদের সঙ্গে নিজের তুলনা করে, আঙুল দিয়ে দেখায় ওদের ছোট্ট মেয়েটা ছেঁড়া কাপড়ে ঘুরছে,—বামুন দেশ ছেড়ে পুণ্যতীর্থ বারাণসীতে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করবে বলে ঠিক করল।

দুটি বছর ও কাটাল গঙ্গাতীরে। সব রকম প্রণামী-দান-দক্ষিণা ও নেয়। তেল, বা মোষ, যে সব দান অপয়া বলে মনে করা হয়, তাও ও নিত। কেন না এগুলো দান করলে তীর্থযাত্রীদের, বামুনকে দান গ্রহণ করার জন্য সঙ্গে মোটা দক্ষিণা দিতে হত। বামুন এখন শুধু টাকা চায়। কি ভাবে টাকা করছে, তা নিয়ে সে ভাবিত নয়। দুই বছরেই সে বেশ কয়েক হাজার টাকা করে ফেলল। এতে বামনী কি খুশি হবে, ভাবতেই তখনি ওর ঘরে ফেরার ইচ্ছে হ'ল। ফেরার পথে ও পুনায় এল। ও তো জানে কোনো ভারিসারি গয়না নিলে ওর বউয়ের সুখের সীমা থাকবে না। গেল এক স্যাকরার কাছে। বেশির ভাগ টাকা দিয়ে দু'ছড়া সোনার মটরমালা কিনল, একেকটায় একশোটা মটর। ওজনেও ঠিকঠাক। কষ্টি পাথরে কষে দেখা গেল উৎকৃষ্ট সোনা। আর নকশাটি চমৎকার।

বামুন আশাতীত সন্তুষ্ট। খুশি হয়ে ও স্যাকরাকে বলল, 'তুমি যেমন খাঁটি, তেমন কথা রাখো। আমি যাদের জানি, সে সব স্যাকরাদের মতো নও। আরো টাকা থাকলে ভালো বখশিস দিতাম।' স্যাকরা ওকে ধন্যবাদ জানাল, বখশিসের ব্যাপার উড়িয়ে দিল, বামুন তাতে আরোই খুশি।

বাড়ি পৌঁছল বামুন। এতকাল বাদে ওকে দেখে বামনী আর মেয়ে কি খুশি না হ'ল। একশো দানার মটরমালা পেয়ে তো তারা আরোই খুশি। মেয়ে পাড়ায় গেল তার নতুন উপহার দেখাতে। বামনি গেল রাঁধতে। আগুনের সামনে বসে আনন্দে গদগদ বামনী মালাটা খুলে হাতে নিয়ে ওজন যাচাই করছে। নেড়েচেড়ে ওজন দেখে ওর মনে হ'ল, কোথাও একটা কারচুপি ঘটেছে। একটা দানা খুলে নিয়ে আগুনে ধরতেই সেটা হস করে জ্বলে গেল। যেন গালা জ্বলছে। ওর সৎসজ্জন স্বামীকে এক ধাপ্পাবাজ স্যাকরা ঠকিয়েছে দেখে ও তো ভীষণ আঘাত পেল। কিছুক্ষণ গেল এ ধাক্কা সামলাতে, তারপর স্বামীর কাছে গিয়ে সাধ্যমতো ঠাণ্ডা ভাবে বলল, বামুন কি ভাবে ঠকে এসেছে। এ কথা শুনে বামুন যেন পাগল হয়ে গেল। কয়েক দানা গালার পুঁতির

জন্যে এত কষ্টের টাকা জলে দিয়ে এসেছে, তা যেন ভাবতেই পারছে না। এর পরে ওর মাথায় ঢুকে গেল একটাই কথা, যে স্যাকরাদের কখনো বিশ্বাস করা চলে না।

ও যখন বারাণসীতে। বউ কি করে সংসার চালিয়েছে, এ কথা জিগ্যেস করার কথা মনে হ'ল দু'তিন দিন বাদে। বামনী বলল, 'আমাদের স্যাকরা পোন্নাসারির কাছ থেকে একটা চমৎকার দুধেলা মোষ কিনেছিলাম। চেনো তো তাকে, মন্দিরের কাছেই থাকে।'

বামুন বলল, 'কি? ওই বদমাশ স্যাকরার কাছে দুধেলা মোষ কিনেছ?'—'হ্যাঁ গো, তার কাছেই। মোষটা রোজ অনেকটা দুধ দেয়। আমি মাখন তুলি, কিছু বেচি। তাতে যা পাই, ভালই চলে যায়। একেক বেলা দু'বালতি করে দুধ দেয়!'

—'হায় রে নির্বোধ! ভালো করে দেখে নাওনি। ওটা আসল মোষ নয়, গালায় তৈরি মোষ।'

—'না না, তা কি করে হয়? দুধ দেয় তো! ওটা কখনো গালার মোষ হতে পারে না।'

—'এজন্যেই বলি, মেয়েছেলের বুদ্ধি নেই। দুধ দিল তো কি হ'ল? তা সত্ত্বেও ওটা গালার মোষ। তা নয়, এ কথা বলবে না। তুমি স্যাকরাদের চেনো না।'

—'আরে! কিরে কাড়ছি। চরছে, ঘাস খাচ্ছে। ও গালায় তৈরি হতে পারে না।'

—'বউ! লক্ষ্মী বউ! স্যাকরাদের ধাপ্পাবাজি বোঝো, এত বুদ্ধিই নেই তোমার। তবু বলছি, ওটা গালার মোষ। আমার সঙ্গে তর্ক কোর না।'

—'কি করে তা হতে পারে? কেনার পর দুটো বাচ্চাও দিয়েছে। উঠোনে ওদের দেখতেই পাবে। গালার মোষ হয় কি করে?'

এখন বামুন বেজায় ক্ষেপেছে।—'মূর্খ মেয়েছেলে! স্যাকরাদের চাতুরি তুমি জান না। তুমি হাবা। তাই ভাবছ ওটা একটা সাধারণ, জ্যান্ত প্রাণী! না, তা নয়। তুমি যাই বলো, আমি জানি ওটা গালার মোষ। এখন মুখ বন্ধ করো, নিজের কাজে যাও।'

স্বামী বেচারির অবস্থা দেখে বামনীর করুণাই হ'ল। যাই বলুক, যাই করুক, বামুনকে বিশ্বাস করানো যাচ্ছে না। ওর মাথায় একটি মাত্র ধারণা গেড়ে বসেছে। অবশেষে মরিয়া হয়ে ও উঠোনে গেল, বেচারি মোষটাকে টেনে আনল, তার কানটা সামান্য চিরে বামুনকে দেখল, রক্ত পড়ছে যখন, এটা জ্যান্ত প্রাণীই বটে। লাল রক্ত দেখে বামুন চেঁচাচ্ছে, 'অরে রে মূর্খ স্ত্রীলোক! তুই এখনো ভাবছিস স্যাকরা পোন্নাসারির কাছ থেকে যা কিনেছিস, তা জ্যান্ত মোষ? গালায় তৈরি নয়? আমাকে ওটা রক্ত দেখাচ্ছিস? ওটা তো গালার রং, মোষটা গালারই তৈরি, নয়? আমাকেও ঠকাতে চাস্?'

শহরের কিছু বিচক্ষণ মানুষ এসে বামুনকে কতই বোঝাতে চেষ্টা করলেন, মোষটা জ্যান্ত, গালার তৈরি নয়! কিন্তু ও তো স্ববিশ্বাসে অনড়। স্যাকরা পোন্নাসারির কাছে

যখন কেনা হয়েছে, তখন মোষটা গালার মোষ ছাড়া আর কি হবে?

এক সুপরিচিত সংস্কৃত শ্লোক বোঝাতে মানুষ ওই গল্পটা বলে।

নির্বোধ রমণী! ও আমাদের দুধ দেয়,
তাতে কি?
ঘাসে চরে বেড়ায়, তাতে কি?
শাবক প্রসব করে, তাতে কি?
তুমি তো স্যাকরাদের শঠতা জানো না,—
সব সত্ত্বেও ওটা গালায় তৈরি মোষ।

গল্পের গরু গাছে ওঠে

হিন্দী
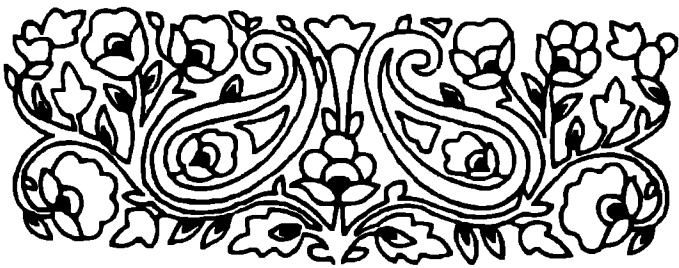
এক গ্রামে এক বেনের আছে মুদীখানা। সে চাল-লবণ-তেল ও সব বেচে। একদিন কাছাকাছি এক শহরে যাবার পথে দেখা হল এক জাঠ চাষীর সঙ্গে। জাঠটি শহরে চলেছে মহাজনকে তার ধারের কিস্তি দিতে। জাঠের প্রপিতামহ, তার প্রপিতামহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করার জন্য টাকা ধার নেয়। পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বেড়েছে। একশো টাকার ঋণ সুদে আসলে দাঁড়িয়েছে হাজার টাকায়। বেচারি জাঠ ভাবছে, মহাজনের হাত থেকে বাপ-ঠাকুর্দার জমিটা বাঁচায় কি করে! হঠাৎ শোনে বেনে বলছে, 'ওহে চৌধুরি। দেখছি মহাজনকে ঋণের কিস্তি দিতে যাচ্ছ। জমিটা বাঁচাবার জন্যে কিছু করতে পার না?'

—'হায় শাহজী। জানেনই তো, এ বড় দুঃখের কাহিনী। আমার প্রপিতামহ নিলেন একশো টাকা। সেটা ফুলে ফেঁপে দাঁড়াল এক হাজারে? আমার সামান্য জমিতে ও ধার শোধ হবে কি করে?'

—'ভেব না, ও নিয়ে অত ভেব না। তোমার কপালে যা লেখা আছে, তাই তো হবে! ও সব কথা তোলা থাক। আমরা গল্প বলে বলে মজা করি। তাতে চলার পথটা কাটবে ভালো। কি বল তুমি?'

—'শাহজী, দারুণ বলেছেন! কপালে যা লেখা আছে, তা নিয়ে কেঁদে কেটে বিলাপ করে কি হবে? আসুন, গল্প বলেই সময় কাটাই। তবে হ্যাঁ, একটা শর্ত আছে। গল্প অসত্য হতে পারে। আজগুবিও হতে পারে, কিন্তু আমরা কেউ বলব না ও সব

মিছে কথা। আমরা একজন যদি অপরের গল্পকে 'মিছে কথা' বলি, তবে বক্তার হাতে হাজারটি টাকা দিতে হবে।'

বেনে বলল, 'রাজী আছি। তা আমিই গল্প শুরু করি।' বেনে গল্প শুরু করল।

--'তুমি তো জানো, আমার প্রপিতামহ ছিলেন সব বেনেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রচণ্ড ধনীও ছিলেন।'

—'হাঁ হাঁ শাহজী. ঠিক।'

--'এখন, আমার সেই বড়ঠাকুরদা না? একবার চল্লিশটা জাহাজ নিয়ে চীন দেশে গেলেন, আর বাণিজ্য করে এত এত মণিমুক্তো পেলেন।'

—'হাঁ শাহজী, ঠিক।'

—'অনে—ক দিন থাকলেন সেখানে, প্রচু—র উপার্জন করলেন। দেশে ফেরার কালে সে দেশের কত যে আশ্চর্য জিনিস আনলেন! খাঁটি সোনার একটা মূর্তি, সে আবার কথাও কয়। এমন কৌশলে বানিয়েছে না! যে প্রশ্নই করো, ফটাফট জবাব দেবে।'

—'ঠিকই তো শাহজী!'

—'তা, তিনি ঘরে ফিরলেন তো পালে পালে লোক আসছে। আশ্চর্য মূর্তিকে দিয়ে ভাগ্য গণাচ্ছে, আর ভাগ্য জেনে বেজায় খুশি হয়ে ফিরে যাচ্ছে। একদিন তোমার বড়ঠাকুরদা এলেন আমার বড়ঠাকুরদার কাছে। কি, না মূর্তিটাকে প্রশ্ন শুধোবেন! তিনি শুধোলেন, 'কোন জাতের মানুষ সবচেয়ে জ্ঞানী?'—মূর্তি বলল, 'বেনে জাত।'—'দুনিয়াতে সবচেয়ে নির্বোধ কোন জাত?'

—'জাঠ'। তোমার বড়ঠাকুরদা শেষ প্রশ্নটি শুধোলেন, 'আমার পরিবারে সবচেয়ে মোটামাথা কার হবে?'

—মূর্তি তখনি বলল, 'চৌধুরি! লাহড়ী! সিং!' (জাঠ চাষীটির নাম ওটা)।

—'হাঁ শাহজী! একেবারে ঠিক!'—জাঠ বলল বটে, তবে বেনের বিদ্রূপটা ওর বুকে বিঁধে থাকল। মনে মনে ভাবল, বেনের পাতা ফাঁদেই বেনেকে ফাঁসাবে। এমন কৌশলে, যে বেনের সে কথা অনেকদিন মনে থাকবে।

—'তারপর সে মূর্তির সুনাম তো যাকে বলে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল! রাজাও জেনে গেলেন। আমার বড়ঠাকুর্দাকে তলব করে ওই মূর্তির বদলে ওঁকে প্রধানমন্ত্রীই করে দিলেন।'

—'একেবারে হক কথা শাহজী!'

—'অনেকদিন বাদে বড়ঠাকুর্দা অবসর নিলেন। তখন তিনি রাজার, যাকে বলে প্রিয় পরামর্শদাতা! আমার ঠাকুর্দা গেলেন তাঁর জায়গায়! তিনি খুব ভোগে সুখে থাকতেন। মন্ত্রীর কাজে কিঞ্চিৎ গাফিলতিও করতেন। রাজা অসন্তুষ্ট! হুকুম দিলেন, ওঁকে হাতির পায়ে পিষে মারা হোক! ফেলে রাখা হ'ল ওঁকে একটা পাগলা হাতির

সামনে। কিন্তু যেমন তাঁকে দেখা, হাতি তো ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমার ঠাকুর্দার সামনে মাথা নোয়াল। শুঁড়ে জড়িয়ে তুলে ওঁকে নিজের পিঠে বসাল।'

—'ঠিকই তো শাহজী, সত্যি কথা!'

—'এ ঘটনায় রাজা তো বিস্ময়ে থ'! তখনি ঠাকুরদাকে ডেকে পাঠালেন, কত না খেলাত দিলেন! এখন, ঠাকুরদা মরে যেতে বাবা প্রধান মন্ত্রী হলেন। কিন্তু তাঁর তো এ কাজ পছন্দ নয়। চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি বিদেশে চলে গেলেন। কত যে আশ্চর্য জিনিস দেখলেন দেশে দেশে! গাছ থেকে ঝুলছে একঠেঙো মানুষ, সবার মাথা নিচে! এক চক্ষু দত্যিদানব! সবুজ বানর! এমন কত কি! একদিন একটা মশা বাবার কানের কাছে ভন্‌ভন্ করছে, এখনি কামড়াবে। বাবা ভেবে পায় না কিংকর্তব্যম্! জানোই তো ভাই, আমরা, বানিয়ারা জীবহত্যা করি না।'

—'সে তো বটেই, শাহজী!'

—'তো বাবা নতজানু হয়ে দয়াভিক্ষা করলেন মশার কাছে। মশা বেজায় খুশি। বলল, 'হে মহান শাহজী! আপনি মানব শ্রেষ্ঠ আমার কাছে। আপনার জন্যে কিছু করতে চাই।'—এই ব'লে মশা হাঁ করল। বাবা দেখেন কি, মশার মুখের মধ্যে এক ঝকঝকে সোনার প্রাসাদ! কত যে জানলা, তোরণ, দরজা, তার মেয়ে। তেমন সুন্দরী তো বাবা দেখেননি। দেখেন, পিছন থেকে এক চাষা মেয়েটিকে মারতে আসছে। বাবা তো বীরত্বের জন্যে বিখ্যাত। তখনি তিনি লাফ মেরে ঢুকেছেন মশার মুখে, পৌঁছে গেছেন মশার পেটে। সেখানে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। বাবা শুধু পথ হাতড়াচ্ছেন।'

—'একদম খাঁটি কথা শাহজী!'

—'তারপর আঁধার মিলিয়ে গেল। বাবা আবার দেখতে পেলেন সেই প্রাসাদ, সেই রাজকন্যে আর কুচ্ছিত চাষীটাকে। বাবা তো বীরপুরুষ। ঝাঁপিয়ে পড়লেন চাষীর ঘাড়ে। সে চাষী আবার তোমারই বাবা! একটি বছর মশার পেটে লড়লেন তাঁরা। শেষমেশ তোমার বাবা আমার বাবার পায়ে পড়ল, ক্ষমা চাইল। বাবা তো দয়ালু ছিলেন, ওকে ছেড়েই দিলেন। তারপর রাজকন্যেকে বিয়ে করে ওই প্রাসাদে থেকে গেলেন।
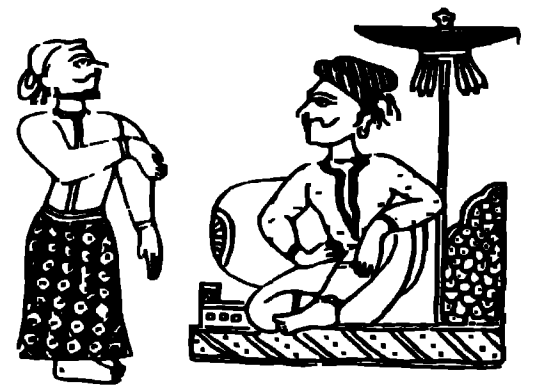
আমার জন্ম ওখানেই। তোমার বাবা আমার বাবার দরোয়ান হয়ে থেকে গেল। আমার বয়স যখন পনেরো, ফুটন্ত জলের তোড় নেমে এল, প্রাসাদ গলে গেল, আমরা চারজন পড়ে গেলাম একটা ফুটন্ত জলের সমুদ্রে। হাঁচড়েপাঁচড়ে চারজন পাড়ে উঠেছি তো দেখি এ তো একটা রান্নাঘর! রাঁধুনী আমাদের দেখে ভয়ে তটস্থ! ওকে ভরসা দিলাম যে আমরা ভূত নই, মানুষই বটি! তো মেয়েছেলেটা বলে কি, 'বেড়ে মানুষ তোমরা। দিলে তো আমার ঝোলটা নষ্ট করে? যে পাত্তরে মাছের ঝোল

রাঁধছি, তাতে নামলে কোন্ দরকারে? আমাকে ঘাবড়ে দিলে বা কেন?'—আমরা ওর কাছে মাপ-টাপ চাইলাম। বললাম, 'রান্নার পাত্তরে পড়েছি বলে তো জানিনি। এক মশার পেটে এক প্রাসাদে পনেরো বছর ধরে আছি।'—'ও হো হো, মনে পড়েছে। পনেরো মিনিট আগে একটা মশা আমার হাতে কামড়াল বটে! দেখ, কামড়ের দাগ দেখ! মনে হচ্ছে, কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা আমার হাতে ঢুকে গিয়েছিলে। খুব যন্ত্রণা করছিল, তো টিপে টিপে বিষটা বের করলাম। সে তো একরত্তি, সরষে দানার মতো। সেটা পড়ল ফুটন্ত জলে। স্বপ্নেও ভাবিনি তোমরা ওর মধ্যে ছিলে।' তখন বুঝলাম বয়সটা আমার পনেরো মিনিট, যদিও চেহারা আর কথাবার্তা পনেরো বছুরে ছেলের মতো। আমরা আশ্চর্য! মশার পেটে মোটে পনেরো মিনিট ছিলাম? ওইটুকুন সময়ের মধ্যেই আমি জন্মেছি, বড়ও হয়েছি। আমার বাবা আর তোমার বাবার পনেরো বছর বয়স বেড়েছে। আমায় দেখতে বয়স্ক লোক, আসলে তো আমি দশ বছরের বালক! মশার গরমাগরম পেটের মধ্যে পনেরো মিনিট থাকার মধ্যেই আমি তাড়াতাড়ি বড়সড় হয়ে গেছি!'

—'সত্য! সত্য শাহজী!'

—'বেরিয়ে এসে দেখি আমরা এক নতুন দেশে, মানে এই গ্রামে। বাবা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, এখানে দোকান দিলেন। তাঁর পরে আমি দোকান চালাচ্ছি। রাজকন্যে, মানে আমার মা, সেদিন মারা গেছেন। জানোই তো! ব্যস্, আমার গল্প শেষ!'

—'সত্যি শাহজী! আপনার গল্প নির্জলা সত্যি। আমার গল্পও সত্যি। তবে আপনার গল্পের মতো এমন আশ্চর্য গল্প নয়। তবে শুনুন,—

আমার বড়ঠাকুরদা গ্রামে সবচেয়ে ধনী জাঠ। দেখতে চমৎকার, মহান হৃদয়, জ্ঞানী, খুবই অভিজাত। সবাই তাঁর প্রশংসা করত। তিনি গাঁয়ের মোড়ল। দুর্বল আর গরিবদের রক্ষা করেন। গ্রাম বৈঠকে সর্বদা ওদের হয়ে কথা বলেন। তিনি যাদের ষাঁড় নেই, তাদের নিজের ষাঁড় ধার দিতেন নিজের লোক পাঠিয়ে তাদের ফসল কাটাতেন। তাঁর গোলার শস্য, আর গোহালের দুধ সকলকে দিতেন। চারপাশের গ্রামের মামলা তিনিই মেটাতেন। কি সম্রাট, কি হাকিম, এঁদের চেয়ে তাঁর কথা সবাই বেশি মানত। বজ্জাতরা তাঁকে ডরাত। ভীমসেনের চেয়েও শক্তি ছিল তো!'

—'হ্যাঁ চৌধুরি, ঠিক কথা!'

—'এখন, একবার না গাঁয়ে হ'ল দুর্ভিক্ষ। বষ্টি নেই। নদী, কুয়ো, সব শুকোচ্ছে। গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে! গরু-মোষ-ভেড়া উপোসে মরে, বনের পশুপাখি মরছে। যখন বড়ঠাকুরদা দেখলেন, গোলা খালি হয়ে যাচ্ছে, কিছু না করলে মানুষ উপোসে মরবে, তিনি সব জাঠদের ডেকে জড়ো করলেন। বললেন, 'ভাই সব! বৃষ্টির দেবতা ক্রুদ্ধ হয়েছেন নিশ্চয়। ঝটপট ব্যবস্থা না করলে সবাই উপোসে শুকিয়ে মরব। তোমরা যদি ছয় মাস আমাকে তোমাদের ক্ষেতগুলো দাও, আমি দেখব যে সেগুলোতে ফসল হয়।

'সব জাঠরা রাজী হল। তখন আমার বড় ঠাকুরদা কোমরে কষি বেঁধে এক ঝটকায় ওই এক হাজার একর জমি সুদ্ধ গ্রামটাকে মাথায় তুলে নিলেন।'

—'হ্যাঁ চৌধুরি, ঠিকই তো!'—বলল বটে, কিন্তু বেনে এমন আজগুবি গল্প শুনে মনে মনে হাসছে।

—'বড়ঠাকুরদা পুরো গ্রামটা মাথায় নিয়ে বৃষ্টির খোঁজে বেরোলেন। যেখানেই বৃষ্টি পড়ে, সেখানেই তিনি হাজির। মাঠে, পুকুরে, সর্বত্র জল ধরছেন। তারপর জাঠদের বললেন, ক্ষেতে লাঙল দাও, বীজ বপণ করো। ছয়টি মাস তিনি ঘুরে ঘুরে বৃষ্টি ধরলেন, জাঠরা চাষ করল। অমন ফসল কখনো ফলে নি। ভুট্টা আর গমের শিস আকাশে উঠে গেল।'

—'একেবারে হক বলেছ চৌধুরি।'

—'গ্রাম আর গ্রামবাসীদের নিয়ে দুনিয়া ঘুরে ঘরে ফিরে তিনি গ্রামটা যেখানে ছিল, সেখানেই বসালেন। বড়ঠাকুরদা সে বছর প্রচুর শস্য পেলেন। গ্রামটাই তাঁর হয়ে গেল। ভুট্টা আর গমের একেকটা দানা তোমার মাথার মতো বড় বড় হয়েছিল।'

—'ঠিক বলেছ চৌধুরি, ঠিক!'

—'ফসল তো কাটা হ'ল। কিন্তু সে এতই, যে রাখার জায়গা নেই। দেশের দিকে দিকে মানুষ জেনে গেল আমাদের চমৎকার ফসলের কথা। দূর দূর থেকে কিনতে এল ওরা। আমার বড়ঠাকুরদা প্রচুর লাভ করলেন বটে, কিন্তু তিনি তো গরিবদের বিলিয়ে দিলেন হাজার হাজার টাকা, আর ক্ষুধার্তদের বিতরণ করলেন গম।'

গল্প যখন এইখানে, ওরা দু'জনে শহরে ঢুকেছে। জাঠ তার গল্প বলে চলেছে।

—'সে সময়ে তোমার বড়ঠাকুরদা বেজায় গরিব। আমার বড়ঠাকুরদা দয়ার বশে তাঁকে চাকর রাখলেন। তিনি শস্য মাপতেন আর ওজন করতেন।'

—'হ্যাঁ চৌধুরি, বেকসুর!'

—'বেচারি তোমার বড়ঠাকুরদা! রাতদিন শস্য ওজন করছেন, নয় মাপছেন। বড় দুর্দশা হয়েছিল তাঁর। মাথাও তো গোবর বোঝাই, অনেক ভুলচুকও করতেন। আমার বড়ঠাকুরদার হাতে আচ্ছা ধোলাইও খেতেন। বেচারি!'

—'হ্যাঁ চৌধুরি, একদম সত্যি।' যে মহাজনের কাছে টাকা ধারে জাঠ, তার দোকানেই ওরা ঢুকেছে। মহাজন টাকার তোরঙ্গ নিয়ে বসে আছে। সে এদের বলল, 'রাম রাম!' ব'লে মেঝেতে বসল। জাঠ মহাজনকে আমল দিল না। গল্প বলে চলল।

—'তারপর, শাহজী! আমার বড়ঠাকুরদার সব ফসল বেচা হয়ে গেল! আর তো মাপার, বা ওজন করার কিছু রইল না। তোমার বড়ঠাকুরদার চাকরিটি চলে গেল! যাবার আগে তিনি আমার বড়ঠাকুরদার কাছে একশো টাকা ধার চাইলেন। তিনি

দরাজ হাতে তা দিয়েও দিলেন।'

—'একেবারে নির্ভুল খাঁটি কথা!'

মহাজনও যাতে শোনে সে জন্যে খুব হেঁকে জাঠ বলল, 'ভালো, ভালো! তবে তোমার বড়ঠাকুরদা তো সে ধার শোধ করেন নি!'

—'ঠিকই তো চৌধুরি!'

—'না তোমার ঠাকুরদা, না তোমার বাবা, না তুমি, কে—উ সে ধার শুধলে না।'

—'ঠিক বলেছ চৌধুরি।'

—'সেই একশো টাকা চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে সুদেআসলে দাঁড়িয়েছে এক হাজার টাকায়। আমার কাছে তোমার ধার এখন ওই হাজার!'

—'একেবারে খাঁটি কথা!'

—'তা, ঋণটা যখন মহাজন আর সাক্ষীসাবুদের সামনে স্বীকারই করলে, আমার কাছে যা ধারো, সেটা মহাজনকে দিয়ে দেবে কি? তাহলেই আমার জমি-জমা বেঁচে যায়!'

বেনের মাথায় যেন বাজ পড়ল। সাক্ষীদের সামনে সে দেনা কবুল করেছে। উভয় সংকটে পড়েছে এখন। যদি বলে ওটা নেহাৎ গল্প কথা, আগাগোড়া মিথ্যে, বাজির শর্ত অনুযায়ী ওকে হাজার টাকাই দিতে হয়। যদি বলে ও কথা সত্যি, তাহলেও দেনা স্বীকার করেছে বলে টাকাটা দিতে হয়। তাই ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, ওকে হাজার টাকা গুনোগার দিতেই হ'ল। বাকি জীবন কাটল আফশোস করে।

আয়না দিয়ে

তেলুগু

এক গণিকা স্বপ্ন দেখল, এক বামুন এসে তার সঙ্গে ভালবাসাবাসি করছে। ঘুম ভাঙতেই ও চাকরবাকর ডাকল। বামুনের বর্ণনা দিল, বলল, তারা যেন পাওনাটা আদায় করে আনে। বামুন পথ দিয়ে যাচ্ছে, এরা তো তাকে ধরেছে। সব কথা বলে গণিকার পাওনাটা চাইছে। বামুনের মাথায় বজ্রাঘাত। সে বলল, গত রাতে সে নিজের বউয়ের সঙ্গেই রাত কাটিয়েছে, এ বিষয়ে কিছুই জানে না। তার কানাকড়িও নেই। চাকররা তো তাকে ছাড়বে না। বামুন ভিক্ষে জানাল, তর্ক করল, মিনতিও করল। মজা দেখতে ভিড় জমে গেল। রাজাকে কেউ খবরটা দিল। রাজা গণিকা আর বামুনকে দরবারে ডাকলেন।

গণিকা বলল, 'আমার খরিদ্দাররা সবসময়ে পয়সা দেয়। এ লোকটা স্বপ্নে আমার কাছে এল গত রাতে, ফুর্তি করল খুব। আমাকে নিয়ে যা করল না! আপনাকে বলতেও লজ্জা লাগছে আমার। ওকে তার দাম দিতেই হবে।'

রাজা বললেন, 'হ্যাঁ পয়সা পাবার হক আছে তোমার। তবে একটু সবুর করো।'

তাঁর হুকুমে পথে একটা বাঁশ পোঁতা হ'ল। ডগায় ঝোলানো হ'ল এক থলি রুপোর টাকা, নিচে রাখা হ'ল একটা আয়না।

রাজা গণিকাকে বললেন, 'এখন আয়নায় হাত ঢোকাও, টাকা নিয়ে যাও। সব টাকাটাই তোমার।'

ঘাবড়ে গিয়ে মেয়েটি বলল, 'আয়নায় হাত ঢুকিয়ে টাকা নেব কেমন করে? থলি থেকে আমাকে আসল টাকা দিন।'

রাজা বললেন, 'না, না। ও টাকা তো তোমার নয় গো! বামুন তোমার কাছে গেল স্বপ্নে। তাই সঠিক পাওনাটা আছে ওই আয়নায়, যা দেখতে পাচ্ছ!'

তোতা যখন কুরুম্বা

কোটা

বহুদিনের কথা! কুরুম্বা আদিবাসীদের এক মায়াবী কোটাদের গ্রামে আসত, পুরুষদের মেরে ফেলত আর সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে রাত কাটাত। কোটারা এ নিয়ে পরস্পর খুব আলোচনা করত। লোকটাকে মেরে ফেলবার একটা পথ বের করতেও চাইত। লোকটা এ কাজ টোডা আদিবাসীদের সঙ্গেও করেছে। ফলে কোটারা আর টোডারা আলোচনা করতে করতে একটা সিদ্ধান্ত করল। বলল, 'চলো, জঙ্গলের সীমানায় যে পথ সেখানে লুকিয়ে থাকি। ওই কেলেকুষ্টি কুরুম্বাটা এলেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কুচিয়ে কেটে ফেলব।' তা ওরা সেই কাজই করল।

কুরুম্বা যখন আসছে, ওরা লাফিয়ে পড়ে ওর হাত আর পা কেটে দূরে ছুঁড়ে ফেলল। মহানন্দে ওরা ফিরছে ঘরে, দুষ্ট মায়াবীকে মেরে ফেলাটা যে কি ভালো একটা কাজ হ'ল, তাই বলছে। হঠাৎ কাটা হাত-পা উড়ে এসে জুড়ে গেল কুরুম্বার দেহে। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে কুরুম্বা হাসতে লাগল। বলল, 'কি হে কোটা! কি হে টোডা! অপদার্থের দল, আমাকে না মেরে ফেলেছিলি? দেখ্, আমি ফিরে এসেছি। ওরে মূর্খ! ভাবছিস ওই ভাবে আমাকে মারতে পারবি?'—কোটা

আর টোডাদের বাকি হয়ে গেল কাণ্ডবাণ্ড দেখে। বলল, 'দেখ তাজ্জব ব্যাপার! এর মতো লোকের সঙ্গে আমরা এঁটে উঠতে পারি?'—ভীষণ ভয় পেয়ে ওরা গ্রামে ফিরে গেল।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কোটা আর টোডাদের সেরা সেরা মানুষ বেশ কিছু মরল। ওদের বিধবারা কান্না জুড়ে দিল। গ্রামের বাতাসে শুধু বিলাপ ভেসে বেড়াল।

কথায় বলে, মায়াবীর চেয়ে তারবউ মায়াবিনীর বিদ্যে বেশি। কালো কুরুম্বার বউ তেমনই একজন। চিলের রূপ ধরে ও কোটাদের সাতটি গ্রামের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। তারও জাদু জানা আছে। সে মন্তর আওড়ায়, আর সুপুরুষ জোয়ানরা তার কাছে চলে আসে, তার সঙ্গে থাকে, সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে। সে মন্ত্র করে পুরুষদের, কালো কুরুম্বা ধরে মেয়েদের। গ্রামবাসীরা বলল, 'একদিন না একদিন ওর পতন হবেই।' হ'লও তাই।

একদিন ও একটা জংলী পেয়ারা গাছের নিচে বসে আশ মিটিয়ে পেয়ারা খাচ্ছে। একটা তুতী গাছের ডালে বসে বড় দুঃখে বিলাপ করছে। কুরুম্বা তো পাখির ভাষা বোঝে। ও বলছে, 'অ তুতী! অত কাঁদছ কেন গো?'

—'কি বলব? আমার স্বামী তোতা আজ মরে গেল। সে যে আমার প্রাণাধিক গো! আমার বুক ভেঙে গেছে, কান্না থামাতে পারছিনা। কে আমার শোক ভুলিয়ে দেবে?'

তুতীর দুঃখে কুরুম্বার মন গলে গেল। তুতীকে সান্ত্বনা দিতে চাইল মন। ও নিজে তোতার দেহে ঢুকে গেল। মুহূর্তে জ্যান্ত হয়ে তোতা উড়ে গেল তুতীর কাছে।

তুতী মহানন্দে তোতাকে চুমো খেয়ে বলল, 'আমাকে নিয়ে মজা করছিলে? পরখ করতে চাইছিলে আমাকে? মরে যাবার ছল করে আমাকে কাঁদিয়ে দেখছিলে, তাই না? না, পুরুষদের বিশ্বাস করা চলে না। তোমাদের মন আমাদের মতো নয়।'—দুজনে দুজনকে ঘিরে উড়ছে, তো তুতী দেখে গাছের নিচে কুরুম্বা মরে পড়ে আছে। মুখটা হাঁ, হাত পা চিতানো।

তুতী বলল, 'বেচারা! একটু আগেই আমার সঙ্গে কথা কইছিল। আমার দুঃখ দেখে কত মমতা জনাল! আমার তো কিছু করা দরকার!' গাছ থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে তুতী ভগবানকে ডাকল। বলল, 'আমি যদি সত্যি তুতী হই, একটি বর দাও। আমি যেমন তোতার জন্যে কেঁদেছি, এর বউও তেমন করেই কাঁদছে কোথাও। বর দাও, ওর বউ যতদিন না আসে, কোন শিয়াল, কুকুর, বাঘ, ভালুক, বা অন্য জানোয়ার যেন ওকে না ছোঁয়। ও যেন এখানে এমনি ভাবেই থাকে।'—প্রার্থণা জানিয়ে কুরুম্বার মৃতদেহে পাতাটি রেখে ওরা দু'জন উড়ে গেল পাশের জঙ্গলে। সেখানে হাজার তোতাপাখি হাসছে গান করছে। যেন ঈশ্বরের আবাস ওখানেই।

জঙ্গলটা এক নাসপাতি বাগানের পাশে, বাগানটা এক কোটা গ্রামের পাশে।

তোতাপাখিরা সে বাগানে যায়, মহানন্দে ফল খায়। বাগানের মালিক এতে মহাখাপ্পা। ঠিক করল জাল পেতে ধরবে পাখি। গাছের আঁশের মোটা সুতো বানিয়ে জাল বুনে ও পেতে রাখল জাল। ওপরে ছড়িয়ে রাখল নাসপাতি।

পরদিন তো এক হাজার পাখিই ধরা পড়ে গেল। তারা ক্যাঁ ক্যাঁ করে কাঁদছে আর বলছে, 'ধরা পড়লাম গো! ব্যাধের ফাঁদে ধরা পড়লাম।' একা কুরুম্বা নীরব। একে সে মানুষ, তার নানা ফন্দিফিকির জানে। সে বলল, 'অমন ওঠানামা করলে জালে আরোই জড়াবে। ব্যাধ আমাদের একে একে তুলবে আর মারবে। বাঁচতে চাও তো আমার কথা শোনো।'—ওরা বলল, 'কি? কি? আমাদের বলো।'

ও বলল, 'জলবৎ তরলং। ব্যাধ এসে যখন ছোঁবে, চোখটি বুজে মরার ভান করবে। ও ভাববে, 'এ পাখিগুলো মরে গেছে'। একে একে তুলে ফেলে দেবে, বলবে, 'এক...দুই...তিন'...যখন হাজার গোনা হয়ে যাবে, আমরা এক ঝাঁকে হুস্ করে ওপরে উড়ে গিয়ে পালাব।'—সবাই, ব্যাধ আসার আগেই রাজী হয়ে গেল।

ব্যাধ যখন এল, সব পাখি যেন মরে পড়ে আছে। সে বলল, 'অবাক কাণ্ড বটে! আমি তো বিষ দিইনি? সব মরে গেল?' ওর মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবল, 'যদি মাংস রেঁধে খাই, আমার অসুখ হতে পারে। দেখি, কতগুলো আছে!' ও তুলছে, ছুঁড়ে ফেলছে, গুনছে, এক...দুই...তিন...গোনা প্রায় শেষ, ও বলল, 'ন'হাজার, ন'শো, নিরানব্বই!' ওর বাঁ হাত থেকে ছুরিটা ধপ করে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কুরুম্বা চেঁচাল, 'হাজার!' আর সব পাখি উড়ে গেল। পড়ে থাকল কুরুম্বা, ব্যাধ তাকে ধরে ফেলেছে।

ব্যাধ ক্ষেপে লাল।—'পাজি পাখিগুলো ধাপ্পা দিয়েছে আমাকে। এটাকে রাঁধব, খাব, হাড় চিবোব। গলা মুচড়ে মারব, পালক টেনে তুলব, কেটেকুটে ঝোল বানাব।' কিন্তু গলা ধরতেই পাখি বলছে, 'ব্যাধ! ব্যাধ! আমাকে মেরো না। ঘরে নিয়ে চলো। আমাকে যত্নে আদরে রাখো, তোমার অবস্থা ফিরে যাবে। আমার ঝোল বানালে তো এতটুকুন ঝোল হবে।'

ব্যাধ তাজ্জব।—'এ যে দেখি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার? জন্মেও কোন তোতাকে এমন কথা কইতে শুনিনি। মানুষের ভাষায় চমৎকার কথা কয়! কেউ হাজার টাকা দিলেও একে মারব না।' তোতাকে চুমো খেয়ে, পালকে হাত বুলিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে গেল। বউ, মা, ছেলেমেয়েকে দেখাল। তোতার কথাবার্তা এমন জ্ঞানগর্ভ, যে কোন বুড়োবুড়ি তার কাছে লাগে না।

সাতটা কোটা গ্রামে রটে গেল কথা। ব্যাধ এক তোতা ধরেছে, সে মানুষের জীবন থেকে মৃত্যু, সব বিষয়ে জ্ঞান ধরে। দলে দলে সব এল এ অবাক-পাখি দেখতে। যে আসে, সেই আনে গম, ব্যাধকে তা দেয়। শীঘ্রই তার বাড়ি শস্যে উপছে পড়ল। সে রীতিমত সচ্ছল মানুষ এখন।

কোটা সমাজে প্রথা আছে, অন্ত্যেষ্টী ক্রিয়ার সময়ে একদিন নাচতে হয়। সেদিন

ওরা আফিম ফুল খায়, প্রচুর নেশা হয়। হাসি ও আনন্দে দিন রাত কাটে। তেমন একদিনে গ্রামমোড়লের বউ প্রচুর নেশা করে তোতাটা দেখতে গেছে। এক পা সিঁড়িতে রেখে ও দাঁড়িয়েছে, তো ওর উরুর কাপড় সরে গেছে। তোতা তিরস্কার করে বলল, 'তুমি একজনের বউ, না বেশ্যা? মেয়েছেলে, না বেটাছেলে?'—মোড়ল বউ খুব অপমান হ'য়ে কথাটি না বলে ধীরে হেঁটে চলে গেল।

সে রাতে তার স্বামীরও খুব নেশা। বউ গিয়ে বরের পাশে শুয়েছে। স্বামী ওর দিকে ফিরতেই বউ বলছে, 'যদি আমার দুঃখ দূর করতে না পারো, ঘুমোও গে'।' স্বামী শুধোতে বউ বলছে, 'কথা-কওয়া তোতা এনে দাও। না দিলে আমি মরব।' বউ শপথও করল। মোড়ল বলল, 'হাজার টাকা লাগলেও, তোতা আমি এনে দেব। এদিকে ফেরো, আমাকে জড়িয়ে ধরো।' বউ ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল। দুজনে খুব ভালবাসাবাসি করল।

তারপর বউ ওকে দু'পায়ে চেপে ধরল। মোড়ল তো বউ যা চায়, তাতেই রাজী। বউ বলল, 'আমার চোখ ছুঁয়ে শপথ করো যে ওই তোতা এনে দেবে। নইলে তোমায় ছাড়ছি না। মোড়ল তো আর সইতে পারে না। সে বলল, 'ওই তোতাই এনে দেব, যদি অনেকগুলো মোষ দিয়ে দিতে হয়, দেব। এখন ছেড়ে দাও।' ও বউয়ের চোখ ছুঁল। বউ খুশি হয়ে ওকে ছেড়ে দিল।

রাতে বউ মোটে ঘুমোল না। ভোর না হতে স্বামীকে ডেকে দিল, পাঠাল ব্যাধের কাছে। মোড়ল ব্যাধকে বলল, 'আমার মাথা ছোঁও, একটা কথা দাও। ব্যাধ তো মোড়লকে চটাতে চায় না। প্রথামতো মোড়লের মাথা ছুঁয়ে কথা দিল। তারপর শুধোল, মোড়ল কি চায়। মোড়ল বলল, 'আমার মোষগুলো নিয়ে নাও, তোমার তোতাটা দাও। ক'টা মোষ চাও?'

—'আমি তো বুঝি নি তুমি কি চাইবে! আমার তোতা দিতে পারব না।'

—'কিন্তু আমার মাথা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছ!' ওদের ঝগড়া বেধে গেল। তখন গ্রাম বৃদ্ধ ওদের ডাকলেন। মোড়ল বলল, 'আমার মাথা ছুঁয়ে কথা দিল। এখন কথা রাখছে না।'—ব্যাধ বলল, 'ও কি চায় তা না জেনেই মাথা ছুঁই, কথা দিই।'—গ্রামবৃদ্ধ বলল, 'তাতে এসে যায় না কিছু। ওর মাথা ছুঁয়েছ, কথা দিয়েছ, কথা রাখো। আমাদের জাতে কথা আছে, 'মুখে যদি কথা দিয়ে থাকি, নিজের মাকে বিক্রি করলে করতে হবে।' তাই ওকে তোতা দাও।'

ব্যাধ ভয় পেয়ে গেল, সমাজবিচারে তার দণ্ড হবে। তাই সে নিল পাঁচটা দুধেলা মোষ, দিয়ে দিল তোতা। দেবার আগে তোতা ব্যাধকে বলল, 'মোড়লের বউ নির্লজ্জের মতো উরু দেখাচ্ছিল। তাকে তিরস্কার করি। তাই সে আমাকে চায়। আমাকে মেরে ফেলবে। দেবার আগে আমার একটা পালক তুলে নাও, জামার পকেটে রাখো। তা'হলে আমি মরব না। তোমার পকেটেই জ্যান্ত হয়ে উঠব।'

ব্যাধ পকেটে একটা পালক রেখে মোড়লকে তোতা দিয়ে দিল। মোড়ল তো এই কথাকওয়া তোতার জ্ঞানগম্যি দেখে মুগ্ধ। বাড়ি গিয়ে বউকে বলল, 'পাঁচটা দুধেলা মোষ দিয়ে তবে তোতা আনলাম। খুব জ্ঞানী পাখি। একে যত্ন কোর।' বউ বলল, সে যত্ন করবে। স্বামীকে বলল, একটা খাঁচা বানিয়ে দিতে। স্বামী খাঁচা বানিয়ে দিল।

খাঁচায় তোতাকে রেখে, নিজের সামনে খাঁচা ঝুলিয়ে মোড়ল বউ বলল, 'নির্বোধ তোতা! আমাকে অপমান করেছিলি? আমাকে গাল দিয়েছিলি? এখন নিত্য তোকে এই সূচ দিয়ে বিঁধব।'

স্বামীর সামনে বউ পাখির যত্ন করে, দানা খেতে দেয়। স্বামী বেরিয়ে গেলেই লম্বা সূচে ওকে খোঁচায়, পাখি আর্তনাদ করে।

সন্ধ্যায় মোড়ল বাড়ি ফিরলে তোতা নালিশ করে। 'বাবা! তোমার বউ আমাকে সূচে বেঁধে, লেজের দিকে জখম করে দিয়েছে।' মোড়ল বউকে ডেকে শুধোতে বউ বলছে, 'বোকা পাখিটার কথা শোন কেন?'—তোতা বলছে, 'সেদিন আফিমের নেশা করে এসে উরু দেখাচ্ছিল। তাতেই তিরস্কার করি। সেজন্যেই ও আমাকে এমন বিঁধছে।'

—মোড়ল এ সব কথাবার্তা তেমন বুঝল না। বউকে বলল, 'ওকে চারটি দানা দাও, যত্ন কোর ওকে।' বলে ট'লে মোড়ল কাজে বেরিয়ে গেল। মোড়ল বউ তোতার পাঁজরে সূচ ফোটাল। তোতা তখনি মরে গেল। তার প্রাণটা চলে গেল ব্যাধের পকেটের ওই পালকে।

মরা পাখি থেকে দুর্গন্ধ বেরোল। বউ মোড়লকে বলল, পাখি মরেছে, পচে উঠছে। মোড়ল ওটা জঞ্জালের গাদায় ফেলে দিল। ভাবল, 'বউয়ের কথা শুনে পাঁচটা দুধেলা মোষ খোয়ালাম।'—বউ ভাবল, 'পাঁচটা মোষ গেছে, যাক গে! ওটার হাত থেকে তো বাঁচলাম!'

এদিকে ব্যাধের পকেট থেকে পালক বলছে, 'বাবা! ছোট্ট পাহাড়ে একটা গাছের নিচে একটা মড়া পড়ে আছে। এই পালকটা মড়াটার মুখে ঘষে দিতে পার, তো তামাশা দেখবে।'

ব্যাধ ভাবল, এ এক আশ্চর্য কথা বটে! পাহাড়ে যাব, মড়ার খোঁজ করব। তবে সন্ধে লেগে গেছে, সকালে যাওয়া যাবে।

সে রাতে কোটা গ্রামে এক বৃদ্ধ পিতামহ এক স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নে যেন কে বলল, 'পাঁচ-ছয় মাস আমরা শান্তিতে আছি। কালো কুরুম্বা হানা দেয়নি। এক ব্যাধের পকেটে একটা পালকের মধ্যে তার প্রাণ আছে। ব্যাধ আজ এসে মৃত কুরুম্বার মুখে পালক ঘষবে। কুরুম্বা প্রাণ ফিরে পাবে। আগের মতো তোমাদের জ্বালাবে। ওঠো, জাগো! এখনি গিয়ে ব্যাধের পকেট থেকে পালকটা নিয়ে জ্বালিয়ে দাও। তোমাদের

নাচের প্রাঙ্গনে দশ বোঝা কাঠ দিয়ে ওটা জ্বালাবে। নইলে গ্রামের পথেঘাটেও শান্তি থাকবে না। আগের মতই কষ্ট ভোগ করবে।'

বুড়ো তখনি উঠল। বউকে বলল পিদিম জ্বালাতে। কোটাদের মধ্যে প্রথা আছে, কেউ স্বপ্ন দেখলে পিদিম জ্বালতে হবে। পাঁচজনকে স্বপ্নের কথা বলতে হবে। বুড়ো ঠিক তাই করল। তারপর কয়েকজনকে পাঠাল সেই ব্যাধের খোঁজে, যার পকেটে পালক আছে। ওরা তো জানে কে সেই ব্যাধ। গিয়ে দেখে সে ঘুমোচ্ছে। ওরা তাকে ওঠাল। বলল ওদের সঙ্গে পাহাড়ে সেইখানে যেতে, যেখানে মড়া পড়ে আছে। তবে প্রথমে বলল, 'পালকটা দেখাও আমাদের।'—ও পালক দেখাল। পালক বলল, 'ছোট পাহাড়ে গাছের নিচে মড়া পড়ে আছে। যদি আমাকে নিয়ে যাও, মড়ার মুখে ঘষে দাও, আমি জবর তামাশা দেখাব।'

পালককে কথা কইতে শুনে লোকরা বলল, 'আমাদের গ্রাম বৃদ্ধের স্বপ্নটা খুব খাঁটি। আমাদের দেবতাই স্বপ্নে কথা বলেছেন। এও বলেছেন, 'দশ বোঝা কাঠ আনো। চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালো, পালক পোড়াও।' জোয়ানরা সেইমতো কাজই করল।

আগুন যখন লেলিহান, পালক যখন জ্বলছে, পালকটা চেঁচাল, 'বাবা! মা! আমি মরছি!'—জ্বলন্ত মড়ার মতই হিস্‌হিস্‌ শব্দ ছেড়ে ওটা মরল। কোটারা আগুন ঘিরে ঘিরে নাচল। পরদিন ছোট পাহাড়ে গিয়ে ওরা গাছের গোড়ায় মড়াটা দেখতে পেল। খুব তাজা মড়া। যেন লোকটা সেদিনই মরেছে।

ওরা এ-ওকে বলল, 'শয়তান কুরুম্বাটা মরেছে। আর আমাদের জ্বালাবে না।' মড়াটা বয়ে নিয়ে একটা অতল খাদে ফেলল ওরা। সেদিন থেকেই গ্রামের উন্নতি শুরু হল। সবাই নির্ভয়ে বাস করতে লাগল।

কয়েকমাস বাদে ওরা খবর পেল, কালো কুরুম্বার বউ স্বামীর জন্যে অনেক অপেক্ষা করে। ছ'মাসেও যখন সে ফিরল না, শোক করে করে, রোগা প্যাঁকাটি হয়ে বউটাও মরে গেল। লোকজন বলতে থাকল, 'ব্যাধ মানুষটি বড় ভালো। তাই দেবতা দয়া করলেন। তিনি দেখলেন, কালো কুরুম্বা যেন তোতা হয়ে যায়। তোতার জন্যে ব্যাধ অত মোষ, অত শস্য পায়।' লোকজন জীবন কাটাল খেয়েদেয়ে, উন্নতি করে।

আর তোতার গল্প ফুরিয়ে গেল।

আট নম্বর চাবি

সিন্ধী

সিন্ধুদেশের এক জ্ঞানী রাজা বুড়ো হয়েছেন. এই মরেন, কি সেই মরেন। প্রধান মন্ত্রীকে ডেকে তাঁকে আটটা চাবি দিলেন। বললেন, 'বেশিদিন বাঁচব না। আমার ছেলে বড় না-হওয়া অবধি সিংহাসন সামলে রেখো। যখন সে রাজ্যশাসন করার যোগ্য হবে, ওকে সাতটা চাবি দিও। পাঁচবছর রাজ্যশাসন না করলে আট নম্বর চাবি দিও না।' প্রধান মন্ত্রী কথা দিলেন, রাজাদেশ পালন করবেন। বুড়ো রাজা শান্তিতে মরলেন।

প্রধান মন্ত্রীই শাসন ভার হাতে নিলেন। তরুণ রাজকুমারকে এমন ভাবে নজরে রাখলেন যেন ইনি তাঁরই ছেলে। কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া অবধি ন্যায়নীতি মেনে রাজ্য শাসন করলেন। সময় এলে কুমারের হাতে তুলে দিলেন এক সমৃদ্ধ। সুশাসিত রাজ্য আর সাতটি চাবি। অভিষেকের পর কুমার সাগ্রহে সাতটা সিন্ধুক খুললেন সাতটা চাবি দিয়ে। তাতে ছিল সোনা, রুপো, দামী হীরে জহরৎ। খুব আনন্দিত কুমার, বড় কৃতজ্ঞ বিশ্বাসী এই মন্ত্রীর কাছে। মন্ত্রী সব কিছু সামনে রেখেছিলেন কুমারের জন্যে, সময় হতেই অভিষেক করে তাঁকে সিংহাসনে বসিয়েছেন। কিছুকাল সব ভালো কাটল। তারপর এক কুচক্করে লোক, মন্ত্রীর ওপর হিংসের বশে রাজাকে জানাল, চাবি আসলে আটটা। মন্ত্রী রাজাকে দিয়েছেন মাত্র সাতটা।

তরুণ রাজা ভীষণ রেগে গেলেন। সন্দেহ করলেন, মন্ত্রী বিশ্বাসঘাতক। আট নম্বর ধনরত্নের সিন্ধুকটা নিজের জন্যে রেখেছেন। বললেন আট নম্বর চাবি তাঁকে এখনি দেওয়া হোক, নইলে বুড়ো মন্ত্রীর প্রাণ যাবে। মন্ত্রী রাজার পায়ে পড়ে বললেন, রাজার পরলোকগত বাবাকে কথা দিয়েছেন, অভিষেকের পর পাঁচবছর কাটলে তবে আট নম্বর চাবিটি দেবেন। তরুণ রাজার উত্তেজনায় আর সবুর সয় না। চাবির জন্যে জোরাজোরি করলেন, আর চাবি হাতে পেতেই আট নম্বর সিন্ধুক খুললেন। অবাক কাণ্ড! সিন্ধুকটি ঢনঢনে ফাঁকা। কিচ্ছু নেই সেখানে। খুঁজতে খুঁজতে দেখেন একদিকে সিন্ধুকের গায়ে এক অপরূপ সুন্দরীর ছবি। রাজার চোখ যেন ছবিতে আটকে গেল। দেখতে দেখতে তিনি যেন মন্ত্রমুগ্ধ। তখনি ছবির সুন্দরীর প্রেমে পড়লেন। যেন ভেসেই গেলেন প্রেমে, জ্ঞান হারিয়ে ঠাস করে আছাড় খেলেন। মন্ত্রী তো ছিলেন পেছনেই, তাঁকে জাপটে ধরলেন। কপালে গোলাপজল ছিটিয়ে তাঁর জ্ঞান ফেরালেন। জ্ঞান ফিরতেই রাজার নজর আবার ছবির দিকে। মন্ত্রীকে বললেন, যত

তাড়াতাড়ি সম্ভব, ওই মেয়েকে আনতে হবে। নচেৎ রাজ্যপাট ফেলে রেখে তিনি অনশন করে মরবেন।

যাকে জীবনে দেখেন নি, তার বিষয়ে রাজার এমন সর্বনাশা আকর্ষণ দেখে মন্ত্রীর ভাল লাগল না। সান্ত্বনা দিলেন রাজাকে, কথা দিলেন, এখনি ছবি সুন্দরীব খোঁজে বেরিয়ে পড়বেন। সেই সপ্তাহেই এক জাহাজে নানা নিধি পণ্য বোঝাই করে, কয়েকটি বিশ্বাসী অনুচর নিয়ে তিনি ভেসে পড়লেন। যত বন্দর পথে পড়ল, সর্বত্র নামলেন। রাজ্যে রাজ্যে রাজদরবারে, বা প্রবীণ মানুষদের সেই ছবি দেখালেন। কিন্তু কেউ দেখেনি ছবি সুন্দরীকে, তেমন কেউ আছে বলেও শোনেনি। একটি বছর ঘুরতে ঘুরতে ওঁরা গেলেন অনে—ক দূরের এক রাজ্যে। বন্দরে ছবিটা টানিয়ে রাখলেন। ওখানকার মানুষজন হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'আরে! ইনি তো আমাদের রাজকন্যে।' মন্ত্রী গেলেন রাজদরবারে। রাজকন্যেকে এক ঝলক দেখেই চিনলেন, ইনিই ছবি সুন্দরী। মন্ত্রী রাজাকে বললেন, তিনি এক বণিক। দারুণ সব উপহার দিলেন রাজাকে। সব পণ্য বিক্রি না-হওয়া অবধি এ রাজ্যে থাকার অনুমতি পেলেন। আসলে তিনি রাজকন্যে, রাজপরিবার, সকলের চরিত্র ইত্যাদি বিষয়ে খবর জোগাড় করতে থাকলেন। ভালো ছাড়া মন্দ তো শুনলেন না কিছু। সন্তুষ্ট হয়ে দেশের পথে রওনা হলেন। অনেক মাস বাদে পৌঁছলেন রাজধানীতে। রাজাকে যখন বললেন, দেখে এসেছি ছবি সুন্দরীকে, ছবির চেয়ে হাজার গুণ সুন্দরী তিনি,—গিয়ে, স্বচক্ষে তাঁকে দেখার জন্যে রাজার যেন সবুর সয় না।

আবার পণ্যে জাহাজ বোঝাই করে রাজা, মন্ত্রী, আর সেই বিশ্বাসী অনুচররা জাহাজ ভাসালেন। অনেক মাস গেল, অনেক ঝড়তুফান আর কষ্ট সয়ে ওঁরা রাজকন্যের দেশে পৌঁছলেন। মন্ত্রী আবার গেলেন রাজার কাছে। তিনি তো সেই বণিক, যিনি গত বছর এসেছিলেন। শুনেছিলেন রাজকন্যে খেলনা ভালবাসেন। তা, তাঁর দেশের কারিগররা তো খেলনা তৈরিতে সিদ্ধহস্ত। বণিক রাজকন্যের জন্যে ফরমায়েসী সব খেলনা এনেছেন। এ খেলনা হাঁটে, কথা কয়। খেলনা বাঘ সিংহ গর্জন করে। যান্ত্রিক পাখি ডানা মেলে আকাশে ওড়ে কাৎ হয়ে। রাজকন্যে শুনে মুগ্ধ হলেন। মন্ত্রী বললেন, 'জাহাজে যা দেখবে, তার কাছে এ সব তো কিচ্ছু নয়। আমার মালিক জাহাজে বসে আছেন। তিনি কিছু মামুলি খেলনা পাঠিয়েছেন। আপনি জাহাজে এসে দেখুন না কেন?'—উত্তেজনায় অধীর রাজকন্যে তখনি ছয়জন সহচরী নিয়ে জাহাজে চললেন। তিনি জাহাজে উঠতেই রাজা তাঁকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা জানালেন। এমন সব চমৎকার খেলনা দেখালেন। তেমনটি রাজকন্যে কখনো দেখেননি। যা দেখেছেন, তার চেয়ে অনে—ক ভালো। একেকটি নতুন খেলনা দেখেন, আর উৎসাহে লাফাতে থাকেন। এদিকে খালাসীরা নোঙরের দড়ি কেটে দিয়ে জাহাজ নিয়ে চলেছে খোলা দরিয়ায়। এমন চুপেচাপে কাজ সেরেছে, যে কি রাজকন্যে, কি সহচরীরা, ডাঙা ছেড়ে

অনেকদূর যাবার আগে কিছু টেরই পাননি।

যখন বুঝলেন যে তাঁদের অপহরণ করা হচ্ছে, ওঁরা যত ভয় পেলেন. ততরেগে গেলেন, অবশেষে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তরুণ রাজা রাজকন্যেকে আশ্বাস দিতে থাকলেন। বললেন ছবি দেখেই তাঁকে কত ভালবেসেছেন, তাঁর খোঁজে সাত সমুদ্দুর পাড়ি দিয়েছেন। রাজকন্যের মন তিনি জয় করলেন। রাজকন্যে মোহিত। রাজাকে তিনিও ভালবাসলেন। কথা দিলেন, ডাঙায় পৌঁছলেই রাজাকে বিয়ে করবেন। অনেক মাস লেগে গেল বটে, কিন্তু এঁরা দুজনে দারুণ সুখী। ভালবেসেছেন তো!

তটভূমির কাছাকাছি চলে এসেছেন প্রায়, রাজা আর রাজকন্যে জাহাজের পাটাতনে পায়চারি করছেন এ-ওর দিকে চেয়ে,—বুড়ো মন্ত্রী হালে বসে জাহাজের এগোনো দেখছেন। জীবনে যা যা বিদ্যে শিখেছেন, তার মধ্যে পাখির ভাষাও পড়ে। দেখেন একটা তোতা আর একটা ময়না উড়ে এসে পালের দড়িতে বসল। মন্ত্রীর ইচ্ছে হ'ল, ওদের কথাবার্তা শোনেন। তা কিছুক্ষণ বাদে ময়না বলছে, 'ব'সে ব'সে একঘেয়ে লাগছে, একটা গল্প কেন বলো না?'—তোতা একটু ইতস্তত করে বলছে, 'আমাদের চোখের সামনে গল্প রয়েছে তো! দেখছ তো, তরুণ রাজা আর রাজকন্যে কি সুখী? আসলে, রাজার আয়ু আর তিনটি দিন! তিনদিন বাদে ডাঙায় নামতেই ওঁকে অভর্থনা জানাবে সেনাসামন্ত, ঘোড়া, হাতি! প্রাসাদরক্ষীরা আনবে ওঁর নিজস্ব ঘোড়া, সে ভারি চমৎকার ঘোড়া। কিন্তু ও ঘোড়া তো ঘোড়া নয়, আসলে এক দৈত্য। যেই উনি চাপবেন, ঘোড়া আকাশে উঠে যাবে, ওঁকে ফেলবে সাগরে।'

ময়না প্রায় কেঁদেই ফেলে। সে বলল, 'বিয়ের আগেই রাজকন্যে বিধবা হবেন না কি? আহা! দুটিতে যেন রাজযোটক হয়েছে। রাজকন্যে তো শোকে ভেসে যাবেন। রাজাকে কি কেউ বাঁচাতে পারে না?' ময়নার বড় আকুলি ব্যাকুলি।—'হ্যাঁ গো! কিছু উপায় আছে! রাজা ঘোড়াকে ছোঁবার আগেই কেউ যদি ঘোড়ার মাথা কেটে ফেলে, রাজা বেঁচে যাবেন। তবে যা বললাম, তা কাউকে বোল না। যা বললাম, তা যদি কেউ আরেকবার বলে, তার দেহের একভাগ পাষাণ হয়ে যাবে।'—তারপর ময়না আর তোতা উড়ে গেল। মন্ত্রী তো সবই শুনলেন, সবই বুঝলেন। এখন তিনি রাজার জন্যে চিন্তিত। কপালে কি আছে, তার কিচ্ছু না জেনে রাজা তাঁর সুন্দরী রাজকন্যেকে নিয়ে পাটাতনে পায়চারি করছেন।

পরদিন পাখি দুটো এসে একই জায়গায় গেল। দেখেই মন্ত্রী কাছে গিয়ে বসলেন। একটি শব্দও যেন না-শোনা না থাকে! আজ রাজাদের দেখে ময়না বলছে, 'বলো তো, ঘোড়াদত্যির হাত থেকে রক্ষে পেলে রাজা নিরাপদ তো?'—তোতা বলছে, 'এত হড়বড় কোরনা গো! রাজা আর রাজকন্যে হয়তো কোনদিন সুখী হবেন না। আরো কত বিপদ আছে রাজার! ঘোড়ার হাত থেকে বাঁচে তো ধুমধামে বিয়ের আয়োজন করবেন রাজা। বিয়ের আসরে রাজা দেখবেন একটা খাঁটি সোনার চমৎকার থালা।

দেখে এমন মোহিত হবেন, যে থালাটা তুলে সভাষদদের কাছে ধরতে চাইবেন। বামুনদের জন্যে প্রণামী তুলবেন। ওরাই বিয়ে দিচ্ছে তো! কিন্তু থালাটি ধরলেই মরণ! থালায় মাখানো আছে তীব্র বিষ। ছুঁলেই সে বিষ চামড়া দিয়ে ঢুকবে। রাজা পড়বেন, আর মরবেন।'—ময়না ব্যাকুল হয়ে বলল, 'কোনমতে কেউ রাজাকে বাঁচাতে পারে না?'—'পারে। যদি কেউ হাতে দস্তানা পরে থালাটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তবে মনে থাকে যেন! এ কথা কারুক্কে বলবে না। বলেছ কি দেহের আরেক ভাগ পাষাণ হয়ে যাবে।' মন্ত্রী ভাবছেন, এ কি শুনলাম। আর পাখি দুটো উড়ে গেল।

পরদিন সমুদ্রযাত্রার শেষ দিন। গভীর গোপন কথার ভারে মন্ত্রীর বুক বড় ভারি। পাখিদের আশায় তিনি হালে বসলেন। পাখিরা এল। ময়না তোতাকে শুধোল, 'বিষ মাখানো থালা থেকেও যদি বেঁচে যান, উনি রাজকন্যেকে বিয়ে করে সুখে আনন্দে থাকবেন তো?'—'না সোনামণি, না। বিয়ের পর ওঁরা রাজবাড়ির রাজশয়নে ঘুমোবেন। ক্লান্ত হয়ে যখন গাঢ় ঘুমোচ্ছেন। বাসরঘেরের ছাত থেকে একটা সাপ বউয়ের গালে বিষ ফেলবে। রাজা ঘুম ভেঙে বউয়ের গালে চুমো খাবেন, আর মরবেন।'—নবদম্পতির জন্যে কাতর হয়ে ময়না বলল, 'বিয়ের রাতে এমন শোচনীয় মরণ থেকে রাজা বাঁচেন, তেমন কোন উপায় হয় না?—তোতা বলল, 'আছে গো! একটি মাত্র উপায়, সে এমনই দুরূহ যে রাজা বিষেই মরবেন। বাসরঘরে যদি কেউ লুকিয়ে থাকে,—সাপ বিষ ঢালতে না ঢালতে কনের গালে চুমো খেয়ে বিষ তুলে নেয়, রাজা রক্ষে পাবেন। যে এ-কাজ করবে, সে যদি তখনি এক গেলাস দুধ খেয়ে নেয়, সেও মরবে না। তবে বাসরঘরের মধ্যে লুকোতে পারে কেউ? এ কথা কাউকে বোলনা গো! যদি বলো, দেহের বাকিটুকুও পাষাণ হয়ে যাবে।' এই বলে পাখিরা উড়ে গেল।

মন্ত্রী তো প্রতিজ্ঞা করেছেন, দরকারে প্রাণ বিসর্জন দিয়েও প্রভুর সেবা করবেন। গভীর উদ্বেগে ঠিক করলেন। রাজাকে চোখ ছাড়া করবেন না। জাহাজ ঘাটে ভিড়লে নেমে এসে রাজা সেই ঘোড়া দানোর পিঠে চড়তে যাবেন, মন্ত্রী তরোয়াল বের করে এক কোপে ঘোড়ার মাথা নামিয়ে দিলেন। রাজা অত্যন্ত রেগে গেলেন। মন্ত্রী যখন কিছুতে বললেন না কেন এ কাজ করলেন, রাজার রাগ বেড়ে গেল। মন্ত্রী তো জানেন, যা জেনেছেন সে বিষয়ে একটি কথা বলতে গেলেও দেহের একভাগ পাষাণ হয়ে যাবে। রাজা মন্ত্রীর আচরণে বিভ্রান্ত। তবে তিনি জানতেন, পরম বিশ্বস্ততায় মন্ত্রী তাঁর বাবাকে আর তাঁকে সেবা করেছেন। তাই মন্ত্রীকে ক্ষমা করে দিলেন।

ধুমধামে বিয়ের আয়োজন হ'ল। একশো দেশ থেকে অতিথিরা এসেছেন, ধুমধাম চলছে রাজার চোখ পড়ল এক অতি চমৎকার সোনার থালার ওপর। সেটি তুলবেন বলে হাত বাড়িয়েছেন, মন্ত্রী হাতে দস্তানা পরে ওটা তুলে নিলেন, এক খরস্রোতা নদীতে ওটা ফেলে দিলেন, মন্ত্রীর পাগলামির কারণ তো রাজা বুঝলেন না। কারণ

জানতে চাইলেন, মন্ত্রী নির্বাক। বলতে গেলেই তো দেহের আরেক ভাগ পাষাণ হয়ে যাবে। রাজা ভীষণ ক্ষেপেছেন। কিন্তু পাঁচজনের সামনে এত বড় উৎসব হচ্ছে, সে জন্যেই এবারটাও মন্ত্রীকে মাপ করে দিলেন।

বিয়ে চুকে গেলে ক্লান্ত রাজদম্পতি বাসর ঘরে ঢুকে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন। বিছানার কাছে, পর্দার আড়ালে যে মন্ত্রী লুকিয়ে আছেন, তা তো তাঁরা জানেন না। মন্ত্রী নজর রেখেছেন। এদিকে ছাত থেকে নেমে একটা সাপ রাজকন্যের গালে বিষ ফেলছে। তখনি এগিয়ে এসে তিনি চুমো খেয়ে সে বিষ তুলে নিলেন, আর সঙ্গে যে এক গেলাস দুধ এনেছিলেন, সেটা খেয়ে নিলেন। রানীর ঘুম ভেঙে গেল। গালে কেউ চুমো খেল, তা তিনি টের পেয়েছেন। চীৎকার করে উঠলেন তিনি, রাজাকে জাগালেন। শোবার ঘরের মধ্যে মন্ত্রীকে দেখে রাজা ক্রোধে আগুন হলেন। শান্ত্রীদের ডেকে বললেন মন্ত্রীকে ধরতে আর সকালে দুর্গপ্রাকারে তাঁকে ফাঁসি দিতে। শান্ত্রীরা বুড়ো মন্ত্রীকে কারাগারে নিয়ে গেল। মন্ত্রী বললেন, তাঁর শেষ ইচ্ছা, মৃত্যুর আগে রাজার দর্শন পেতে চান। রাজা এতে 'না' বলতে পারলেন না। শেকলে বেঁধে মন্ত্রীকে রাজসভাতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। মন্ত্রী সব কথা বলে দিলেন। ঘোড়া-দানবের বিষয়ে তোতা কি বলেছিল, তা যেমন বললেন, তাঁর পা দুটো শ্বেত পাথরের পা হয়ে গেল। বিষাক্ত সোনার থালার কথা বলতে বলতে বগল অবধি পাষাণ হয়ে গেল। ছাত থেকে নেমে সাপের বিষ ঢালার কথা বলতে তাঁর মাথা ও কাঁধ পাষাণ হয়ে গেল।

রাজা এত বিস্মিত হয়েছিলেন, যে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন নি। এ কথা শোনায় প্রচণ্ড আঘাত থেকে একটু সামলে উঠে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন বিশ্বাসী মন্ত্রীর এ পরিণাম দেখে। প্রস্তর মূর্তিকে রাখলেন এক আলাদা ঘরে, গলায় পরালেন মালা, গভীর দুঃখে মন্ত্রীর পূজা করে চললেন।

সময় হলে রানীর একটি ছেলে হ'ল। রোজ রাজা ছেলেকে নিয়ে মন্ত্রীর মূর্তির সামনে যান। ছেলেকে বলেন, মন্ত্রী কি ভালো, কি বিশ্বাসী ছিলেন। ছেলের বয়স যখন তিন বছর, একদিন সেই তোতা আর ময়না উড়ে এসেছে। ঘরে ঢুকে তারা কথা কইছে। আর মন্ত্রীর মূর্তির খুব কাছে আছেন বলে রাজা ওদের কথা বুঝতে পারছেন। তোতা বলছে, 'দেখ! মন্ত্রীর পরিণাম দেখে রাজা কত দুঃখ না পেয়েছেন! উনি চাইলে পরে মন্ত্রীকে বাঁচিয়ে তুলতে পারেন।'—ময়না বলছে, 'কেমন করে গো?'—তোতা বলছে, 'নিজের ছেলেকে কেটে তার রক্ত ছিটিয়ে দিলেই মন্ত্রী বেঁচে উঠবেন। রক্তমাংসের মানুষ হয়ে যাবেন।'

কি করা উচিত এবং ন্যায্য হবে, তা নিয়ে রাজা অনেক ভাবলেন। শেষে মনে হ'ল, তাঁর সব কিছুই তো মন্ত্রীর দৌলতে পাওয়া। একবার নয়, তিনবার তিনি রাজার জীবন রক্ষা করেছেন। মন দুর্বল হয়ে পড়ার আগেই তরোয়াল বের করে ছেলের মাথা কেটে ফেললেন। মূর্তির গায়ে রক্ত ছিটাতেই মন্ত্রী মানুষ হয়ে গেলেন। যেই

জানলেন, কি ভাবে জীবন পেয়েছেন, তখনি ঈশ্বরের কাছে এমন ব্যাকুল প্রার্থনা করলেন, যে ঈশ্বর তাঁব প্রার্থনা পূরণ করলেন। শিশুটির মাথা এসে তার দেহে জুড়ে গেল। প্রাণ ফিরে পেল সে, যেন গাঢ় ঘুম থেকে জেগে উঠল। রাজা রানীকে ডেকে সব কথা বললেন। বাপ ছেলের মাথা কাটল এ কথা ভাবতেও রানী শিউরে উঠলেন। তবু বললেন, রাজা এ ছাড়া আর কিছু করতে পারতেন না। যা হোক, মন্ত্রীর প্রার্থনা ও ঈশ্বরের করুণা শিশুটির জীবন ফিরে দিল। এখন মন্ত্রীর বিচক্ষণ নেতৃত্বে রাজা, রানী, ও রাজপুত্র সুখে বেঁচে বর্তে থাকলেন বহুকাল।

তাঁতির স্বর্গযাত্রা

উর্দু
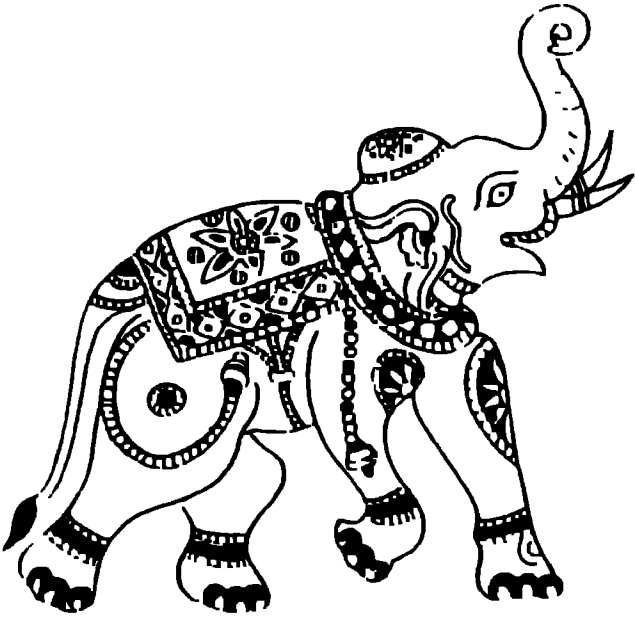
এক ছিল তাঁতি। দেবরাজ ইন্দ্রের এক হাতি প্রতি রাতে ওর শস্যক্ষেত্রে নামত। আকাশ থেকে নেমে ওর মাঠে চরত, ফসল তছনছ করে রেখে চলে যেত। ও অন্য তাঁতিদের শুধোল, কোন জন্তু তার শস্যক্ষেত্র ছারখার করে? তারা বলল, 'হয়তো বা গ্রামের আটা পেষার পাথরচাক্কী হবে! সবাই যখন ঘুমোয়, রাতে উঠে তোমার মাঠে ঘোরে!' তাঁতি গ্রামের প্রতিটি পেষাই চাক্কী দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখল। কিন্তু শস্যক্ষেত্রে হানাদারি চলতে থাকল। ও আবার বন্ধুদের শুধোল। তারা বলল, 'গাঁয়ের ধানভাটা ঢেঁকি নয়তো? সবাই যখন ঘুমে, ওরা হয়তো উঠে পড়ে রাতে, তোমার ক্ষেত্রে চরাবরা করে বেড়ায়?' তাঁতি ঢেঁকিগুলোকেও বেঁধে ছেঁদে রাখল বটে,—লাভ হ'ল না কিছু।

শেষে এক রাতে ও মাঠে গিয়ে বসে আছে। কি দেখল বল তো। আকাশ থেকে নেমে এল একটা হাতি, শস্য খেতে থাকল। হাতি যখন উড়তে যাচ্ছে, তাঁতি ওর ল্যাজটা কষে ধরেছে। সিধে পৌঁছে গেছে স্বর্গলোকে, ইন্দ্রসভায়। একটি কোণে বসে অপ্সরাদের নাচ দেখল। গান শুনল। কেউ তাকে লক্ষ্যই করেনি। ফলে দেবতাদের পাকশালায় গিয়ে পেটপুরে দেবভোগ্য খাবার খেল। পরদিন রাতে, হাতি যখন মাটিতে নামবে, তাঁতি ওর লেজ ধরে নেমে এল।

নেমেই বন্ধুবান্ধবদের বলল, কি কি অত্যাশ্চর্য জিনিস দেখে এসেছে। বলল, 'এমন হতভাগা জায়গায় থেকে লাভ কি? চলো, সবাই যাই ইন্দ্রলোকে।' সবাই

রাজী। পৃথিবীর মাটির শস্য খেয়ে পেট ভরিয়ে হাতি যখন উড়তে যাবে,— তাঁতি ওর লেজ ধরল, তাঁতি বউ জড়িয়ে ধরল তাঁতির ঠ্যাং জোড়া। ওদের সব আত্মীয়স্বজনও পরের পর এ-ওকে ধরল। যেন একটা লম্বা মানুষ দড়ি সেটা! এত মানুষ ঝুলছে, হাতির কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে শূন্যভয়ে উড়ে যাচ্ছে। ওরা যখন অনে—ক ওপরে, তাঁতি ভাবতে থাকল, 'কি মূর্খ আমি! তাঁত খানাই সঙ্গে আনলাম না?' ভাবতেই ওর হাত মোচড়াতে ইচ্ছে করল। ও যেমন লেজ ছেড়ে দিল, সবাই ধুপধাপ করে ধরাধামে পড়ে গেল।

এ জন্যেই সবাই বলে, তাঁতি কখনো স্বর্গ অবধি পৌঁছতে পারে না।

বাঘ বানানেওয়ালা

কন্নড়

এক সময়ে চার বামুন গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে নানা বিদ্যে শিখে এল। গোপন বিদ্যা, নানা রকম দক্ষতা এ দিয়ে কে কি করতে পারে তা সবাই সবাইকে দেখাতে ভারি ব্যস্ত।

এক জঙ্গলে তারা মিলিত হ'ল। একজন একখানা হাড়ও খুঁজে পেল। সেটি বাঘের উরুর হাড়। যে বামুন এটা পেল, সে বলল, 'এ থেকেই আমি জন্তুটির গোটা কঙ্কাল বানিয়ে ফেলতে পারি।'—সে কঙ্কালটা বানাল।

দু'নম্বর বামুন বলছে, 'আমি এ কঙ্কালে রক্ত-মাংস-চামড়া সৃষ্টি করতে পারি।' কাজটা ও করেই ফেলল। ওদের সামনে এক নিষ্প্রাণ, ডোরাকাটা বাঘ।

তিন নম্বর বামুন বলছে, 'জানো আমার ক্ষমতা? আমি এর দেহে প্রাণ সঞ্চার করতে পারি।' চার নম্বর বামুনের, ওদের মতো বিদ্যেবুদ্ধি নেই। সে বলল, 'দাঁড়াও! ওকে জ্যান্ত কোর না। আমরা তোমার কথা মেনে নিচ্ছি।'

তিন নম্বর বামুন বলছে, 'ক্ষমতাটা থাকতেও কাজটা করে দেখাতে না পারলে লাভটা কি? আমি এ বিদ্যে প্রয়োগ করতে পারিনি কখনো। আমি এটাকে বাঁচাব। তোমরা দেখে যাও!'

চার নম্বর বামুন বলল, 'যদি জেদ করো, তবে...! তবে সবুর করো ভাই। আমি গাছে উঠে যাই আগে।' ও সামনের গাছে উঠে পড়ল হাঁচড় পাঁচড় করে।

তখন তিন নম্বর বামুন, মন্ত্র আর জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে বাঘটার দেহে প্রাণ সঞ্চার করল। জ্যান্ত হতে না হতেই বাঘের পেটে বেজায় ক্ষিদে। এদিক-ওদিক

দেখছে, কি খায়! তিন বামুন ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল, পালাবার শক্তিও ছিল না। বাঘ ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনটেকেই মারল, ধীরে সুস্থে সব কটাকে খেল। পড়ে থাকল ওদের হাড়গোড়।

চার নম্বর বামুন গাছে বসে এ হত্যালীলা দেখল। আতঙ্কে ভয়ে ও যেন পাথর! খেয়েদেয়ে গরর গরর করতে করতে বাঘ ঢুকে গেল জঙ্গলে। তখন ও ধীরে ধীরে নেমে এল মনের দুঃখে। বিদ্বান বন্ধুদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করতে বাড়ির দিকে রওনা হ'ল।

আমার কথাটি ফুরোল

ওড়িয়া
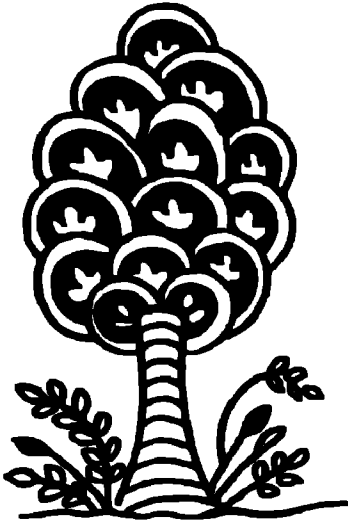
শুনেছি গল্প বলা হয়ে গেলে ওড়িশায় এই গানটা গায় ওরা।

আমার কথাটি ফুরোল
ফুলগাছটি মুড়োল
অ ফুলগাছ! মুড়োলি কেন?
কালো গাই যে খায়!
অ কালো গাই, কেন খাস?
রাখাল কেন চরায় না?
অ রাখাল! কালো গাই চরাস না কেন?
বেটার বউ কেন ভাত দেয় না?
কেন্ রে বেটার বউ রাখালকে ভাত দিস না?
আমার কোলের ছেলে যে কাঁদে?
অ ছেলে তুই কাঁদলি কেন?
কালো পিঁপড়ে যে কামড়াল!

অ কালো পিঁপড়ে! কেন ছেলেকে কামড়াস?
আমি থাকি ধুলোতে
যেই নরম নরম মাংস পাই,
কুটুস করে কামড়াই।

তারপরে? ফুড়ুৎ!

মারাঠী

এক গল্পবলিয়ে গল্প বলে বলে হয়রান! কিন্তু ছেলে বলো, বুড়ো বলো, তাদের তো শুনে শুনে ক্লান্তি নেই। তারা আরো গল্প শুনবে।

তা গল্পবলিয়ে বলল, একটা গাছে কেমন অনে—ক পাখি বসেছিল। বলে সে থামল। শুনিয়েরা বলছে, 'তারপর?'

—'একটা পাখি গাছ্ থেকে উড়ে গেল, ফুড়ুৎ!'

—'তারপর?'

—'ফুড়ুৎ! আরেকটা পাখিও উড়ে গেল!'

—'তারপর?'

—'আরেকটা পাখি উড়ে গেল, ফুড়ুৎ!'

—'তারপরে?'

—'ফুড়ুৎ!'

এই চলতে থাকল। শুধু শোনা যাচ্ছে, 'তারপর?' আর 'ফুড়ুৎ!'

শেষে একজন শুধোল, 'কতক্ষণ চলবে এ সব?'

গল্পবলিয়ে বলল, 'যতক্ষণ না স—ব পাখি উড়ে যায়!'

টীকা

এই সংক্ষিপ্ত টীকাগুলিতে আমি উল্লেখ করব প্রতিটি গল্পের উৎস, অনুসরণ করব, লোককথার আন্তর্জাতিক অনুক্রমনীতে যে-ভাবে বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশিত হয়েছে, তাই। কয়েকটি ভাষার তালিকা দেব যাতে অনুরূপ গল্প আছে। যেখানে দরকার, সেখানে কিছু সাংস্কৃতিক চাকচিক্যও যোগ করব।

এই অনুক্রমনীর বৈশিষ্ট্যগুলি দেখলে, ইচ্ছা হলে জিজ্ঞাসু পাঠক গল্পের ধরণ, এবং ভারত বা পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলে ওই গল্পেরই পরিবর্তিত রূপ বলা হয়, তার এক সারসংক্ষেপ খুঁজে পাবেন। যেমন, এই বইয়ের শেষ গল্প, 'তারপরে? ফুড়ুৎ'-কে চেনা যাবে 'এটি ২৩০০, এন্‌ডলেস্ টেল্‌স'—এর মধ্যে। যদি কেউ এটি খুঁজে দেখেন, স্টীথ টম্‌সন এবং ওয়ারেন রবার্টসের 'টাইপ্‌স অফ ইন্‌ডিক ওরাল টেল্‌স'—এ (হেল্‌সিংকি : সুয়োমালাইনেন, টিয়েডিয়া কাটেরনিয়া, এফ এফ কম্যুনিকেশন্‌স নং ৪০, ১৯৬০), তিনি দেখবেন, অনুরূপ গল্প সংকলিত করেছেন মারাঠীতে ম্যানওয়ারিং (আওয়ার টেল), হিন্দীতে ক্রুক 'নর্থ ইন্‌ডিয়ান নোট্‌স অ্যান্‌ড ক্যুয়েরিজ, ভল্যুম ৪, নং ৪২০' (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫), তেলুগুতে রামস্বামী রাজু 'ইন্‌ডিয়ান ফেব্‌লস্'-এ 'লণ্ডন : এস. সনেনশিয়েব, ১৮৮৭)। বিশ্ব নির্দেশিকা 'দি টাইপ্‌স অফ দি ফোকটেল' লিখেছেন আন্‌ত্তি আর্নে। তাকে পরিবর্ধন ও অনুবাদ করেছেন স্টিথ থম্পসন (হেলসিংকি : সুওমালাইনেন দিয়েতিয়াকাতারনিয়া, এফ এফ কম্যুনিকেশন্‌স নং ১৮৪, ১৯৬৪)। এখন থেকে এটিকে AT বলা হবে। এতে পৃথিবীর বারোটি ভাষা (জার্মান, লিথুয়েনিয়ান, আইসলান্‌ডিক, স্কটিশ ইত্যাদি) থেকে উপমা সংগ্রহ করে তালিকা করা হয়েছে। তাতে ব্যবহৃত গ্রন্থের উল্লেখও আছে। এই গল্পের শ্রেণী নির্দেশক নম্বরগুলি, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে অনুরূপ গল্পগুলি খুঁজে পেতে পাঠককে সাহায্য করবে। আমাদের আরো উল্লেখ করা উচিত স্টিথ থম্পসনের 'মোটিফ ইনডেক্স অফ ফোক লিটারেচার' (ব্লুমিংটন : ইনডিয়ানা য়ুনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৫); ভারত বিষয়ে বিভ্রান্তিকারী নামাঙ্কিত মোটিফ নির্দেশিকা 'দি ওরাল টেল্‌স অফ ইন্‌ডিয়া', যা লিখেছেন স্টিথ থম্পসন ও জোনাস ব্যালিস্ (ব্লুমিংটন : ইন্‌ডিয়ানা য়ুনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৮); 'ইন্‌ডিয়ান অ্যানিম্যাল টেল্‌স', যা লিখেছেন লরিৎস বড়কার (হেলসিংকি : সুওমালানিয়েন তিয়েদিয়াকাতেরনিয়া, এফ এফ কম্যুনিকেশন্‌স নং ১৭০, ১৯৫৭); এবং হেডা জেসনের টাইপ্‌স অফ ইন্‌ডিয়ান

ওরাল টেল্‌স : সাপ্লিমেন্ট' (হেলসিংকি : সুওমালানিয়েন তিয়েদিয়াকাতেরনিয়া, এফ এফ কম্যুনিকেশান্‌স নং ২৪২, ১৯৮৯)।

এ সব নির্দেশিকা যত প্রয়োজনীয়ই হোক, এগুলি প্রস্তুত করা হয় ১৯৫০ এবং ১৯৬০-র দশকে। বাতিল হয়ে যাওয়া তত্ত্বের ওপর এর ভিত্তি। আঞ্চলিক ভাষায় গল্প সংকলনগুলি না দেখেই ভারতীয় নির্দেশিকা লেখা হয়। এই শতাব্দীর শুরুতেই প্রধান প্রধান গল্প শ্রেণীর কতগুলি যে সংগৃহীত ও অনূদিত হয়েছিল ভাবলে তা না-দেখাটা অবাকই লাগে। ভারতের মাতৃভাষার কয়েকটিতে লোক কথা সংগ্রহের কাজ আবার শুরু হয়েছে বিগত কয়েক দশকে। তাই এ বইয়ের অনেক গল্পের উল্লেখ মিলবে না নির্দেশিকায়। যদিও অনেক অনুরূপ গল্প মিলবে। কেন না ভাষার মতোই লোককথাও সীমাবাঁধা উপায়ের সীমামুক্ত ব্যবহার। কোন ব্যক্তি যখন গল্প বলে, তেমন সব মোটিফ ও গল্প-শ্রেণী মিলিয়ে ফেলে, যে গুলি ঘটে যে-যার মতো স্বাধীনভাবেই। যেখানে অনেক গুলো শ্রেণী একটি গল্পে মিলেছে, আমি এ ভাবে তার টীকা লিখব : AT ৩০৬ A+৪৬৫ A। উদাহরণ, 'অবাধ্য ছেলের কাণ্ড' নামে দীর্ঘ ও জটিল গল্পটি। কোন কোন ক্ষেত্রে আমি বলব মোটামুটি একই ধরণের গল্পশ্রেণী ও মোটিফ সম্বলিত গল্পের কথা। কিছু ভারতীয় গুরু কাহিনী, ভাঁড়ের গল্প, গল্পের বিষয়ে গল্প, ব্রতকথা, এগুলি নতুন করে সমীক্ষা করে নির্দেশিকা তৈরি দরকার। বইটি সাধারণ পাঠকের জন্য, তাই টীকা থাকছে যৎসামান্য। নির্দেশিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর আমি নির্ভর করেছি, এবং স্টিথ থম্পসনের 'দি ফোকটেল'-এর উপর 'নিউইয়র্ক : হোল্‌ট, রাইনহার্ড অ্যান্‌ড উইন্‌স্টন, ১৯৪৬। একান্ত ভারতীয় ভাষা থেকেও বহু সংখ্যক গল্প বলা হয়েছে। সেগুলি গল্পে থাকুক, বা টীকায়, অপেক্ষাকৃত অপরিচিত শব্দগুলিকে উচ্চালোকিত করেছি আমি। ভারতীয় শব্দের শব্দটীকা দেবার প্রয়োজন এড়িয়ে গেছি।

দেয়ালকে বলো : সরেজমিনে জোগাড় করা। শ্রীরঙ্গমে কনকামল বলেছিলেন। এই গল্পসংকলনে যতিচিহ্নের মতো রয়েছে গল্পের বিষয়ে গল্প,—যা আমাদের জানিয়ে দেয়, বক্তারা গল্প বিষয়ে যা ভাবেন, ভাবনার ধরণগুলি। এখানে এমন কি একটি দেয়ালকে গল্প বলারও (সব গল্পের বেলায়ই তাই) যে বিশোধক ভূমিকা আছে, তা বলা হয়েছে। এতে আছে মনোবিকার বিষয়েও অন্তর্দৃষ্টি। দুঃখ বুকে চেপে রাখার সঙ্গে মোটা হয়ে যাবার সম্পর্ক।

না-বলা গল্প : ভেরিয়ার এলুইনের 'ফোক টেল্‌স অফ মহাকোশল' (লণ্ডন : অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৪৪), পৃষ্ঠাঙ্ক ৩০২-৩ থেকে গৃহীত।

AT ৫৬০-এর এই ভারতীয় পাঠান্তর কন্নড় ভাষায়ও মেলে। এই একই বিষয় বস্তু, কিন্তু একেবারে অন্যভাবে বলা হয়েছে সিন্ধী ভাষার 'আট নম্বর চাবি' গল্পে। ইউরোপ ও ইংলণ্ডে এ গল্প বিশ্বাসী জনের গল্প বলে জানিত। এই ভারতীয় রূপান্তর

বিশ্বাসী ভৃত্যকে নয়, অকথিত গল্পগুলির প্রতিহিংসাকে উচ্চালোকিত করে। এই প্রাচীনতম সাহিত্য রূপ পাওয়া যায় একাদশ শতকের সংস্কৃত গল্পসঞ্চয় 'কথাসরিৎসাগর'-এ (গল্পের সাগর)। 'ভাইয়ের দিন'ও দ্রষ্টব্য।

গল্পরা চেঁচায়, তাদের বলা হোক, মুখে মুখে ফিরতে দেওয়া হোক, বাঁচিয়ে রাখা হোক। বলা না-হলে, তারা অন্য রূপ পরিগ্রহ করে, যে, গল্প জমিয়ে রেখে ওদের শ্বাস রোধ করছে, তার ওপর প্রতিশোধ নেয়। সংস্কৃতির রাজ্যে নিষ্পেষণের এ এক তত্ত্ব। প্রচার। অন্যদের কাছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অবিরত সংবাহন, এর ওপরেই *ঐতিহ্য নির্ভর করে থাকে।*

গোপাল ভাঁড়ের তারা গোণা : এডোয়ার্ড সি. ডিমক জুনিয়ররে সম্পাদিত ও অনূদিত 'প্রেম চোর' (শিকাগো : যুনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস, ১৯৬৩) পৃষ্ঠাঙ্ক ১৮৩-১৮৫ থেকে গৃহীত। এষণা ১১২৪ 'ক্লেভার কোর্ট জেস্টার'। হিন্দী, কন্নড়, তামিল ও তেলুগুতেও সংকলিত। এষণা H ৭০২.১, 'হাউ মেনি স্টারস ইন দি হেভেন্‌স'? হিন্দী ও তামিলেও আছে।

ভারতীয় লোককথার বিখ্যাত রাজবিদূষকদের মধ্যে বাংলার গোপালভাঁড়, দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগরের তেনালি রাম (কৃষ্ণ) এবং আকবরের দিল্লী দরবারের বীরবল উল্লেখযোগ্য। এ বইয়ে তিনজনই আছেন। অনেক সময়ে একই গল্প বলেছেন বিভিন্ন বিদূষক। ভারতীয় সাহিত্য ও লোককথায় কৌতুক সাহিত্যের ঐতিহ্যের ওপর ইদানিং কালের এক চমৎকার বই হ'ল লী সিয়েগেলের 'হাস্যকর বিষয়' (শিকাগো : যুনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস, ১৯৮৭)।

এই গল্পে নবাব হলেন হিন্দু মহারাজার উপরে, মুসলিম শাসক।

বোপুলুচি : ফ্লোরা অ্যানি স্টীলের 'টেল্‌স অফ দি পাঞ্জাব', প্রথম সংস্করণ (লণ্ডন : ম্যাকমিলান ১৮৯৪), পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৮-৫১ থেকে নিয়ে পুর্নকথিত। AT ৯৫৬ B, 'বাড়িতে একা একা চালাক মেয়ে ডাকাতদের মেরে ফেলে, বা বোকা বানায়'। এটি বাংলা, গোণ্ডী, হিন্দী, কোঙ্কনী, তামিল ও সিংহলীতেও সংকলিত।

নারীকেন্দ্রিক গল্পের ভূমিকা দেখ। এমন অনেক গল্পে মেয়েদের সক্রিয়, প্রায়ই বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা,—'রামায়ণ'-এর সীতার মতো ধ্রুপদী নায়িকার ভিত্তিতে রচিত বাঁধাধরা ছাঁচের বশ্যতাপরায়ণ ভারতীয় নারী চরিত্রের একেবারে বিপরীত। এ বিষয়েও বলা যায় লোক ঐতিহ্য, ধ্রুপদী ঐতিহ্যের বিরোধী মেরুতে।

যুঁই রাজপুত্র : নাটেসা শাস্ত্রীর 'ইণ্ডিয়ান ফোক-টেল্‌স' (মাদ্রাজ : গার্ডিয়ান প্রেস, ১৯০৮), পৃষ্ঠাঙ্ক ২৭৭-৮০ থেকে গৃহীত; ও ভল্যুমে প্রকাশিত 'ফোকলোর ইন সাদার্ণ ইণ্ডিয়া'-তেও মুদ্রিত (বম্বে : এডুকেশান সোসাইটি প্রেস, ১৮৮৪-৮৮)

AT ১৫১১, 'দি ফেইথলেস কুইন', বিশেষত 'দি কুইন অ্যান্‌ড দি লোথ্‌সাম প্যারামোর' (মোটিফ T ২৩২), + ১৩৫৫ B, 'অ্যাডালটারেস টেল্‌স হার লাভার

'আই ক্যান সী দি হোল ওআর্লড' (মোটিফ K ১২৭১.৪)। AT ১৫১১, বাংলা, হিন্দী, গোণ্ডী, এবং কোটাতেও মেলে; ১৩৫৫ B আন্তর্জাতিক পাঠান্তর মেলে হাংগোরিয়ান, লিথুয়েনিয়ান ও ইতালিয়ানে।

চতুর্দশ ভুবন; হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বে, পৃথিবী মধ্যবর্তী বিশ্ব চৌদ্দটির মধ্যে। উপরে ছয়, নিচে সাত।

সোনা ও রূপা : পুনর্বিবরিত। সূত্র শ্যাম পরমার, 'ফোকলোর অফ মধ্যপ্রদেশ' (নিউ দিল্লী : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া, ১৯৭২), পৃষ্ঠাঙ্ক ১৭১-১৭৪।

AT ৭২২, 'দি সিস্টার ইন দি আন্ডারগ্রাউণ্ড কিংডম।'

পরবর্তী তিনটি ভইবোনের গল্প। প্রথম গল্প, 'সোনা ও রূপা'-র বিষয় এক ভাইয়ের বোনদের বিষয়ে অজাচারী কামনা। যে সকল ইচ্ছা ও কাজ, সংস্কৃতিতে নিষিদ্ধ, তা এ সব গল্পে পরিষ্কার জানানো হয়েছে, তার মুকাবিলাও করা হয়েছে। আরো দ্রষ্টব্য 'হান্‌চি' 'যে রাজকন্যেকে তার বাবা বিয়ে করতে চেয়েছিল,' এবং 'মা-ছেলের বিয়ে।'

একাধিক অঞ্চলে কথিত (গোণ্ডী, হিন্দী, কন্নড়, টুলু) এ গল্প বলে, অজাচার কি ভাবে নষ্ট করে পরিবার ও আত্মীয়তার সুশৃঙ্খল জগত,—যেখানে জন্মসূত্রের আত্মীয় এবং বিবাহসূত্রের আত্মীয়, দুই বিবেচিত হয় আলাদাভাবে। জ্ঞাতিত্ব প্রথা নির্ভর করে বউ ও বোনের পার্থক্যের ওপর। বোনদের গাছের ওপর পানে উঠে যেতে হচ্ছে,—নিচের পাপ পৃথিবী থেকে দূরে। কেন না তাদের আপনজনরা তাদেরকে নিষিদ্ধ যৌনসম্পর্ক সম্পর্কে যে সংস্কার তা ভাঙতে বাধ্য করছে। কয়েকটি কন্নড় পাঠান্তরে দেখছি, মৃগয়ু ভাই এবং পলাতকা বোন দুজনেই এক কুয়োতে পড়ে যায়। তারা দুটো পৃথক জাতের মাছ হয়ে যায়। যা কখনো একসঙ্গে ধরা, বা রাঁধা হয় না। মৃত্যুর পরেও ভাই ও বোন পৃথক থেকে যায়।

ভাইয়ের দিন : গৃহীত অ্যান গ্রোডজিন্‌স গোয়ডের 'ভিলেজ ফ্যামিলিজ ইন স্টোরি অ্যান্ড সং'-এর অনুবাদ থেকে। 'দি ইনডিয়াকিট সিরিজ, আউটরীচ এডুকেশনাল প্রজেক্ট, সাউথ এশিয়া সেন্টার, যুনিভার্সিটি অফ শিকাগো।'

AT ৫১৬-র এক পরিবর্তিত রূপ। 'না-বলা গল্প'-র টীকা দ্রষ্টব্য।

ভাইবোনের ঘনিষ্ঠ বন্ধন, আগের গল্পে যেমন দেখা গেছে তেমন নিষিদ্ধ যৌনসম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছায় পৌঁছাতে পারে। আবার আলোচ্য গল্পে যেমন, তেমন আগলে চলার ও উদার ভালবাসার মনোভাব জাগাতে পারে। বিশেষ প্রথায় এ বন্ধনকে অভিনন্দিত করা হয়।

বোনরা নানা কারণেই ভাইদের ওপর নির্ভর করে। বাপের বাড়ির সঙ্গে তাদের যোগসূত্র থাকে ভাইদের দিয়ে। বিবাহিতা বোনদের সঙ্গে করে বাপের বাড়ি আনে ভাইরা। 'ভাইয়ের দিন', যা হিন্দীতে 'ভাই দুজ', সেই বিশেষ দিনে ভাইরা শাড়ি

উপহার দেয়। এই ভাইদ্বিতীয়া বছরে দু'বার পালিত হয়। বসন্তোৎসব হোলির দ্বিতীয় দিনে। আর আলোকোৎসব দীপান্বিতার পরদিন। এই দিনটিতে ভাইরা বোনদের বাপের বাড়ির গ্রামে আনে। কোন বিবাহিতা বোন আসতে না পারলে ভাই উপহার নিয়ে বোনকে দেখতে যায়, যেমন এই গল্পে। 'ভাইয়ের দিন' নানা ভাবে পালন, শুধু রাজস্থান নয়, সমগ্র উত্তর ভারতেই বহুল প্রচলিত।

দেখতে হবে, স্বেচ্ছায় না হলেও বোনটি তার ভাইয়ের ক্ষতি করে বার বার। তবুও সেই শেষ অবধি বাঁচায় ভাইকে। প্রথমে পথের বিপদ থেকে, শেষে সেই ভয়ংকর সাপের শত্রুতা থেকে। ভাইকে বাঁচাবার জন্য প্রথমে তাকে ভাইকে শাপশাপান্ত করতে হয়,—তারপর ভাইয়ের কঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় ও। এক অর্থে নিজের জীবন দেয় ভাইকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে।

ভাইদ্বিতীয়ার গল্প ও আচার নিয়ম বলা ও পালিত হয় এক বহির্প্রাচীরের কাছে, গোবর দিয়ে ভাই, বোন, নববধূ, সাপ, এমন কি একটি বাড়ির অন্দর গড়ে, যাতে রন্ধনশালাও থাকে। গল্প বলার আগেই পুতুলগুলো গড়া হয়। খাবার জিনিস নিবেদন করা হয়, যা পড়ে থাকে পশুপাখি (কুকুর, ছাগল, পাখি) খাবে ব'লে। গল্প ফুরালে, উপস্থিত যে সব মেয়ের ভাই জীবিত, তারা ওই প্রাচীরের যত উঁচুতে পারে, হাত বাড়িয়ে ছোঁয় আর গল্পের শাপশাপান্তের সঙ্গে 'যেন সে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে,' এই আশীর্বানী আউড়ে চলে। এতে অংশগ্রহণ কারিনী সব মেয়েদের ভাইরাই না কি এ ব্রতের ফলে দীর্ঘায়ু হয়।

এই টীকার জন্য আমি অ্যান গোল্ডের কাছে ঋণী।

যে বামুন এক দেবতাকে খেয়েছিল : পুনর্বিবরিত। সূত্র রেভারেণ্ড উইলিয়াম ম্যাককুলোক, 'বেঙ্গলী হাউসহোল্ড টেল্স' (লণ্ডন : হডার অ্যান্ড স্টাউটন, ১৯১৭), পৃষ্ঠাঙ্ক ২৩-২৯। এষণা ২৩৭১-২, 'গড্স ট্রিক্ড ইনটু হেলপ ইন এসকেপিং ওআন্স ফেট।' হিন্দী এবং তামিলেও সংকলিত।

ভারতীয় লোককথায় গরিব, ক্ষুধার্ত, পেটুক বামুন এক পরিচিত চরিত্র। সে প্রায়ই মজাদার, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের পাত্রও বটে। এ ধরণের গল্পে দেখা যায়, লোককথা,—উচ্চতর শক্তি, সে রাজা, দেবতা, বা ভাগ্য যাই হোক না কেন, তার প্রতি সবসময়ে প্রত্যাশিতভাবে সশ্রদ্ধ নয়। দেবদেবতাদের পোষ মানায় লোককথা, দেখায়, যে দেবতাদের ঘাম ছুটছে, তাঁরা পায়খানা করে ফেলছেন, তাঁদের সর্দি লাগছে, ইত্যাদি। 'তেনালী রাম করে ফেলছেন, তাঁদের সর্দি লাগছে, ইত্যাদি। 'তেনালী রাম ভাঁড় হ'ল কেমন করে?' গল্প দ্রষ্টব্য।

'ঠাকুর' : দেবদেবতা, প্রভু, ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য কর্তাব্যক্তিদের শ্রদ্ধা সম্ভাষণ জানাতে বলা হয়।

এক ধার্মিকের ধর্ম : ডি. পি. পট্টনায়ক কথিত গল্প পুনর্বিবরিত।

'এষণা J ২১১, চয়েস বিটুইন ওয়েল্‌থ অ্যান্‌ড ভারচু'। পাঞ্জাবীতেও শোনা যায় গল্পটি।

এক কাকের প্রতিশোধ : গ্রন্থকার শৈশবে মহীশূরে শুনেছিলেন।

'বডকার ২৪, 'মার্ডার বাই স্ট্র্যাটিজি।' এ গল্প ছোটদের ব্যাপক ভাবে বলা হয়। প্রায়ই ছোটদের প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকে গল্পটি থাকে শিক্ষণীয় হিসেবে। পঞ্চম শতাব্দীর সংস্কৃত গল্পসংগ্রহ 'পঞ্চতন্ত্র' বইয়ে এটি সবচেয়ে আগে দেখা গেছে। ছোটদের বলা হয় এমন অনেক গল্পের মধ্যেই দেখা যায় একটি ছোট পাখি বা প্রাণী, সহজাত বুদ্ধিবলেই এক ভয়ংকর শত্রুর ওপর জিতে যায়।

গল্প ফেরে শ্রোতর খোঁজে : জুলাই ৫, ১৯৮৮, হায়দ্রাবাদে কে. ক্যাতায়িনী তেলুগুতে বলেন, এবং ভি. নারায়না রাও মুখে মুখে অনুবাদ করেন।

'এষণা M ৩১১, প্রফেসি; অজাত শিশুর ভবিষ্যৎ মহিমা।' গোণ্ডী, হিন্দী, কন্নড় এবং পাঞ্জাবীতেও সংকলিত। এ ধরণের 'ব্রতকথা'-র শ্রেণীভিভাজন ও নির্দেশিকা করণ এখনো বাকি।

এ একটি 'ব্রতকথা', মেয়েদের ব্রতপালন পদ্ধতির এক অংশ হিসেবে গল্পটি কথিত : এই গল্প (অনুরূপ এক জাদু গল্প বিষয়ে) সম্ভব করে অলৌকিক ফলাফল। বুড়িটি বলছে এক গর্ভস্থ কন্যাকে, যদি কেউ এই গল্প শোনে, তবে মরুভূমি সবুজ হবে, খঞ্জ হাঁটতে পারবে, অন্ধ ফিরে পাবে দৃষ্টি। গল্পের প্রথম ভাগে আছে, একটি গল্পই, তাকে কেউ শুনুক, এই প্রার্থনা জানাচ্ছে। কথক খুঁজছে শ্রোতা। কথক সন্ধান শুরু করছে তার পরিবার দিয়ে,—ছেলেরা, বউরা, নাতিনাতনিরা,—চলে যাচ্ছে শহরের পথে,—এ জাত, ও জাত,—শহরে সর্বত্র ফিরছে, পুরো জনসমাজেও খুঁজল, শেষে পেল এক ইচ্ছুক শ্রোতা,—সে কিন্তু আটকা পড়ে আছে। সে হ'ল এক অজাত শিশু, যে আছে নিচুজাতের এক মেয়ের গর্ভে। মারাঠী 'সূর্য কথা', এই ব্রতকথার কয়েকটি দিক বিশদ করে বলেছে।

বিশেষ বিশেষ মাসে বিশেষ কোনো বারে এ গল্প বলতে হয় বলে নিয়ম। যেমন, এটি হ'ল মাঘ মাসের (নভেম্বর-ডিসেম্বর) রবিবারে বলার গল্প। এই গল্প দিয়ে ব্রতকথা, পরিবারে সমৃদ্ধি আনার জন্যে বলতে হয়। অনুরূপ আরেকটি ব্রত সম্পর্কিত গল্প হ'ল 'ভাইয়ের দিন।'

মাটির শাশুড়ি : এ. কে. রামানুজনের 'দি ক্লে মাদার ইন-ল', সাদার্ণ ফোকলোর কোয়ার্টারলি, ভল্যুম ২০, নং ২ (জুন ১৯৫৬), পৃষ্ঠাঙ্ক ১৩০-৩৫ থেকে গৃহীত।

AT ১৬৫৩, 'দি রবারস্‌ আন্‌ডার দি ট্রী', + 'এষণা J ২৪১৫, ফুলিশ ইমিটেশান অফ লাকি ম্যান অর উওম্যান।'

পরের দুটি হ'ল শাশুড়ি ও বউয়ের গল্প। প্রথমটিতে বউটি নির্বোধ, কিন্তু শাশুড়ি অন্ত প্রাণ। পরেরটি এক প্রাণবন্ত ধারালো বউয়ের গল্প। সে তার অসভ্য শাশুড়িকে

জব্দ করে ছাড়ে। ভারতে শাশুড়িদের গল্প অঢেল। দেখার বিষয়, এ সব গল্পে শ্বশুরদের সাক্ষাৎ মেলে না। মা এবং স্ত্রী, দুই স্ত্রীলোকে চলে পরিবারের একমাত্র পুরুষকে বশ করার জন্য ক্ষমতার লড়াই।

সমাজে টাকা ও মর্যাদার জন্য মেয়েরা যে পুরুষদের (ছেলে হোক, বা স্বামী) ওপর নির্ভরশীল, এটা ঘটনা। সে ক্ষেত্রে সংঘাত অনিবার্য, মেয়েকেন্দ্রিক গল্পে যথেষ্ট প্রাধান্য পায়। AT ১৬৫৩ অংশ, 'দি রবারস্ আন্ডার দি ট্রী', স্বনির্ভর ভাবেই ঘটে এবং বাংলা, গোণ্ডী, কন্নড়, কোংকনী, নাগা, পাঞ্জাবী, তামিল ও সাঁওতালী ভাষার গল্পের সঙ্গেও সংযুক্ত হয়।

চালাক পুত্রবধূ : অনূদিত। সূত্র এইচ. জে. লাক্কাপ্পা গৌড়ার 'জনপদ কথাবলী' (বাঙ্গালোর : কর্ণাটক কো-অপ পাবলিশিং, ১৯৭১)।

AT ১৫৩৫, 'দি রিচ অ্যান্ড দি পুওর পীকেট, + ৯৫৬ B, দি ক্লেভার মেডেন অ্যাট হোম অ্যালোন কিল্স অর অ্যাউট উইট্স দি রবারস্।' যা অন্যত্র (বাংলা, গোণ্ডী, হিন্দী, কোংকনী, কোটা, নাগা, তামিল, ও সাঁওতালী) বলা হয়েছে ধনীও গরিব চাষী বা ভাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার গল্প হিসেবে, যেমন হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসনের 'বিগ ক্লস অ্যান্ড লিট্ল ক্লস' গল্পের সাহিত্য-রূপে, তা এখানে বলা হয়েছে শাশুড়ি-বউয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী রূপে। বউ (বয়সও কম, ক্ষমতাও নেই) শাশুড়িকে বোকা বানায়। আগের গল্পের টীকা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মদৈত্য ও নাপিত : পুনকথিত সূত্র রামসত্য মুখার্জি 'ইন্ডিয়ান ফোকলোর' (ক্যালকাটা : সান্যাল, ১৯০৪), পৃষ্ঠাঙ্ক ১০০-১০৩।

AT ১১৬৮ A, 'দি ডিমন অ্যান্ড দি মিরর।' গোণ্ডী, হিন্দী এবং সাঁওতালীতেও সংকলিত।

দ্রষ্টব্য হাস্যকৌতুক গল্পের ভূমিকা। দৈত্যদের বোকা বানানো নিয়ে অন্যান্য গল্প 'মরতে মরতে বাঁচা' ও 'সংগীতপ্রিয় দৈত্য।'

মাছ হাসল কেন? : পুনর্কথিত। সূত্র রেভারেণ্ড, জে. হিন্টন্ নোয়েল্সের 'ফোকটেল্স অফ কাশ্মীর" (লণ্ডন : কেগান পল, ট্রেঞ্চ, ট্রুব্নার, ১৯৮৩), পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৮৪-৯০।

AT ৮৭৫১০, 'দি ক্লেভার গার্ল অ্যাট দি এন্ড্ অফ দি জার্নি।' সাঁওতালী ও হিন্দীতেও প্রাপ্ত। 'আকবর ও বীরবল' বিষয়ে টীকা দ্রষ্টব্য।

টীয়ার নাম হীরামন : পুনর্কথিত। সূত্র লালবিহারী দে, 'ফোকটেল্স অফ বেংগল' (লণ্ডন : ম্যাকমিলান, ১৮৮৩), পৃষ্ঠাঙ্ক ২০১-১৯।

AT ৫৯৬, 'দি ক্লেভার প্যারট'। হিন্দী, পাঞ্জাবী এবং কাশ্মীরীতেও সংকলিত।

প্রিয়দের এবং অন্যান্য ইউরোপীয় গল্পে 'পুস ইন বুট্স', বা 'এ হেল্পফুল ফক্স' যা করে,—একটি পুরুষ বা নারীকে বিবাহের ব্যবস্থা করে দেয়,—এক টিয়া এখানে তা

করে। কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় রূপান্তরিত চেহারায় রাজহংস বা হাঁস। টিয়ার মতোই ঘটকালি করে।

মহামারী: মুখার্জি থেকে পুনর্কথিত, 'ইন্ডিয়ান ফোকলোর', পৃষ্ঠাঙ্ক ৫২।

বানর ও কুমির : গ্রন্থকার শৈশবে শুনেছিলেন। AT ৯১, 'দি মাংকি হু লেফ্ট হিজ্ হার্ট অ্যাট হোম'। অন্যান্য ভাষায় সংকলিত পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং তিব্বতী। এই ব্যাপক পরিচিত ভারতীয় গল্পটি প্রথম লেখা হয় 'পঞ্চতন্ত্র' বইয়ে (পঞ্চম শতকে) সংস্কৃতে। যদিও গল্পটি হয়তো খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

যখন সত্যি শোনো, তখন কি হয়? : ১৯৮৮ সাল গ্রীষ্মকালে হায়দ্রাবাদে একটি তেলুগু গল্প ভি. নারায়ণা রাও এর শ্রুতিবাহিত ঐতিহ্য থেকে পুনর্কথিত।

এষণা J ২৪৯৫, 'রিলিজিয়াস ওয়ার্ডস্ ইনটারপ্রেটেড লিটারালি'। কন্নড় ও তামিলেও সংকলিত।

আমাদের প্রধান প্রধান ভারতীয় পাঠ্য এবং লেখকদের ঘিরে অনেক গল্প রচিত হয়েছে। এগুলি এখনো শ্রেণী নির্দেশন ও অণুশীলন করা হয়নি। মহাকাব্য 'রামায়ণ', তার অসংখ্য লিখিত ও শ্রুতিবাহিত রূপে, লোককথা তরফে তাকে বেশদায়িত করার এক বিশেষ কারণ আছে। এর অনেকগুলি রামকাহিনীর অলৌকিক ক্ষমতা, এবং শ্রোতাকে তা কি উদ্দীপিত করে, তা বর্ণনা করে। এই গল্পে এক নির্বোধ, অমার্জিত মানুষই যখন অবশেষে কাহিনী শোনে কান (এবং মন) দিয়ে, সে 'রামায়ণ'-এর ঘটনাবলীর মধ্যে, মধ্যে পড়ে। গল্প এবং বাস্তবতার মধ্যবর্তী সীমারেখা ভেঙে ফেলে। উডি অ্যালেনের সিনেমা 'দি পার্পল রোজ অফ কায়রো'-র একটি চরিত্রের সঙ্গে এর বেশ মিল আছে।

তেনালী রাম : গ্রন্থকার শৈশবে শুনেছিলেন। ষোড়শ শতকে দক্ষিণভারতে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেবরায়ার রাজসভায় বিদূষক ছিলেন তেনালী রাম। গোপাল ভাঁড় যেমন বাংলায়, মোগল উত্তরভারতে যেমন বীরবল। দক্ষিণভারতে সর্বত্র এঁকে নিয়ে অনেক গল্প বলা হয় কন্নড়, তামিল ও তেলুগু ভাষায়। এই কিংবদন্তীস্বরূপ বিদূষককে নিয়ে ছোটদের বই, কমিক, এমন কি এক টেলিভিশান সিরিয়ালও তৈরি হয়েছে। ইনি তেনালী রামকৃষ্ণ, রামালিঙ্গুড়ু, তেনালী রামন্, নানা নামে পরিচিত।

তেনালী রামের বিষয়ে এক উৎকৃষ্ট আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, ডেভিড শুলম্যানের 'দি কিং অ্যানড দি ক্লাউন ইন সাউথইণ্ডিয়ান মীথ অ্যান্ড হিস্ট্রি' (প্রিসটন : প্রিন্স্টন যুনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৫), অধ্যায় ৪।

তেনালী রাম ভাঁড় হ'ল কেমন করে? : এই গল্পের একটি পাঠে বলা হয়েছে, দেবী তেনালী রামকে দেখা দিলেন। দুই হাতে দুটি পাত্র। একটিতে আছে জ্ঞান, অন্যটিতে কৌতুকবোধ। তিনি তেনালীকে একটি নিতে বললেন। তেনালী দুটোই ছিনিয়ে নিয়ে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলল। দেবী ক্ষেপে গিয়ে শাপ দিলেন, সে হবে এক

'বিকটকবি'। অধিকাংশ ভারতীয় লিপিই এ রকম, যে প্রতি অক্ষরেই একটি ব্যঞ্জনবর্ণ ও পরবর্তী স্বরবর্ণ বিধৃত থাকে। তাই 'বি-ক-ট-ক-বি'-র পাঁচটি অক্ষরই এমন, যা সামনে থেকে পড়লে যা, পিছন থেকে পড়লেও তাই থাকে। সেটা, দেবীর চেয়ে চালাক ওই বিদূষক বুঝেছিল, দেবী বোঝেন নি।

তেনালী রামের রামায়ণ: AT ১৬৯৩, 'দি লিটারাল ফুল।'

রাজাবিদূষক, 'রামায়ণ'-এর বিষয়বস্তু নিয়ে নানা খেলা খেলে। কাহিনী বা রূপকালঙ্কারকে আক্ষরিকতায় তর্জমা করে। এই উদ্দেশ্যে, যে দেখ, কল্পিত কাহিনী ও জীবনের বাস্তবতার আড়াল যদি ভেঙে দাও, তখন কি ঘটে। এ প্রসঙ্গেরই আরেকটি রূপ দ্রষ্টব্য, 'যখন সত্যি শোনো, তখন কি হয়' গল্পে।

লঙ্কাদহন (এষণা J ২০৬২.৭) প্রায়ই 'অক্ষরবিশ্বাসী বোকা'দের ঘটানো নানা সর্বনেশে ঘটনা, অসমীয়া, বাংলা হিন্দী, তেলুগু এবং অন্যান্য ভাষার গল্পে।

দুই বোন: সীতাকান্ত মহাপাত্রের বলা এক কাহিনী থেকে পুনর্কথিত।

AT ৭৮০ A, 'দি ক্যানিব্যালিসটিক ব্রাদার্স'। অসমীয়া ও বাংলাতেও সংকলিত।

'গানগাওয়া হাড়' আঙ্গিকে গল্পটি প্রায়ই বলা হয়। একটি মেয়ে নিহত হয় তার নিকট আত্মীয়দের হাতে ('ভাইরা, সৎমা)। সে হয়ে যায় পাখি বা গাছ (এষণা E ৬৩১), কখনো বা কোন বাদ্যযন্ত্র বানানো (E ৬৩২) হয় গাছটি থেকে, আর মেয়েটি বেরিয়ে আসে রাতে, বাড়ি পরিষ্কার করে (N ৮৩১.১) এবং অন্যান্য কাজ করে চলে ধরা না-পড়া অবধি। বর্তমান পাঠে নরমাংসভুক ভাইদের কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সুখু দুখু: রমানাথ দাসের 'ঠাকুরমা'র গল্প' (কলকাতা : সতীশচন্দ্র শীল, ১৯১১-১২), অনুবাদ করেন অরুণ কে. রায়। গল্পটি তা থেকে পুনর্কথিত। র‍্যাল্‌ফ ট্রোগারের' এ কমপ্যারেটিভ স্টাডি অফ এ বেংগলী ফোকটেল' (কলকাতা : ইন্‌ডিয়ান পাবলিকেশনান্‌স ফোকলোর সিরিজ, ১৯৬৬) পৃষ্ঠাঙ্ক ৮১-৮৭-এ উধৃত।

AT ৪৮০ A, 'দি কাইন্‌ অ্যান্ড আনকাইন্‌ড গার্লস : দি পারস্যুট অফ ব্লোয়িং কটন'। এই শ্রেণীর গল্পের হাজারটি পাঠ সারা বিশ্বে সংকলিত হয়েছে। ভারতে এটি খুবই প্রিয়,—বাংলা, হিন্দী, কন্নড়, কোংকনী, পাঞ্জাবী ও তামিলে। আঠারোটি ভারতীয় পাঠান্তরের উল্লেখ আছে AT নির্দেশিকায়। ইউরোপে (যেমন গ্রীম্‌সদের গল্পে) এটি ফ্রাউ হলে-র গল্প নামে পরিচিত। দ্রষ্টব্য, ওয়ারেন, ই. রবার্ট্‌সের 'দি টেল অফ দি কাইন্‌ড অ্যান্ড আনকাইন্‌ড গার্লস (বার্লিন : ফাবুলা, সাপ্লিমেণ্ট B, ১৯৫৮), এবং র‍্যাল্‌ফ ট্রোগারের 'এ বেংগলী ফোকটেল।'

লক্ষ্যণীয়, যে সব পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হচ্ছে, তার মাধ্যমে কি ভাবে 'ভালো মেয়ে'-র ভাবমূর্তি গড়ে উঠছে। সে একটি গরু, একটা গাছ, একটি ঘোড়াকে সাহায্য করে। কোথাও বা এক বুড়ির ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে দেয়। যা বলা হচ্ছে, ও তাই শুনছে। পুকু রে দুটো ডুব দিচ্ছে। নির্লোভ বলে সবচেয়ে ছোট পেটরা নিচ্ছে। নির্দয় বোনটি ও

সব কিছুই করেনি, শাস্তিও পেয়েছে বারবার।

এক নায়ক বা নায়িকার পেটরা নির্বাচনের এষণা সর্বাধিক খ্যাতি পেয়েছে শেক্‌সপীয়ারের 'মাচেণ্ট অফ ভেনিস'-এ।

এক, দুই, তিন : পুনর্কথিত। সূত্র সি. এইচ. বম্‌পাসের 'ফোকলোর্‌স অফ সান্‌তাল পরগনাজ্' (লণ্ডন : ডেভিড নাট্, ১৯০৯), পৃষ্ঠাঙ্ক ১৯২-৯৪। AT ১৭০৪, 'সাইন ল্যাংগোয়েজ মিস্‌আন্‌ডারস্টুড'। হিন্দী, কন্নড়, তামিল ও তেলুগুতেও সংকলিত।

যে বউ হার মানেনি : পুনর্কথিত। সূত্র নোয়েল্‌সের 'ফোকটেল্‌স অফ কাশ্মীর', পৃষ্ঠাঙ্ক ১৪৪-৫০।

AT ৮৮৮ A। পাঞ্জাবী, সাঁওতালী, তামিল ও তেলুগুতে সংকলিত।

এক প্রাণবন্ত সাহসী মেয়ে তার নির্বোধ স্বামীকে উদ্ধার করল, এই নিয়ে আরেকটি নারীকেন্দ্রিক গল্প।

রাক্ষসী রানী : পুনর্কথিত। সূত্র নোয়েল্‌সের 'ফোকটেল্‌স অফ কাশ্মীর', পৃষ্ঠাঙ্ক ৪২-৫০।

AT ৪৬২, 'দি আউটকাস্ট কুইন্‌স অ্যান্‌ড দি ওগ্রেস কুইন'। সংকলিত বাংলা, গোণ্ডী, হিন্দী কন্নড়, পাঞ্জাবী ও তেলুগুতে। AT ৩০২ A, 'দি ইয়ুথ সেণ্ট টু দি ল্যাণ্ড অফ দি ওগারস্' সাধারণত 'ওগ্রেস কুইন'-এর অন্তর্ভুক্ত; তবে এটি নিঃসম্পর্কিত ভাবেই ঘটে।

লক্ষ্যণীয় 'এক্‌সটার্নাল সোল' (E ৭১৮)-এর এষণা। রাক্ষসদের জীবন থাকে প্রতীকী কোন বস্‌তুর মধ্যে, চরকা, পাখি, অথবা দূরদেশে একটি মৌমাছি। তরুণটির যাত্রাও এদেরই সন্ধানে। যখন সে এগুলির কোনোটি কব্‌জা করে, এবং সেটিকে ভাঙে, বা বিকলাঙ্গ করে, বা হত্যা করে, তার সঙ্গে তালমিল রেখে রাক্ষসটিও আঘাত পায়, মরে যায়। ডাকিনীবিদ্যার মধ্যেও বাহির-আত্মার ধারণাটি আছে।

বাঘের হাতে মৃত্যু : সীতাকান্ত মহাপাত্রের বলা গল্প পুর্নকথিত।

AT ৯৩৪ B, 'দি ইউথ টু ডাই অন হিজ ওয়েডিং ডে'। এইটি এবং পরের গল্পটি, ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ বানী বিষয়ে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। এ গল্পে, বাঘের হাতে মৃত্যুর ভাগ্যলিপি অমোঘ। এ ধরণের গল্পের আন্তর্জাতিক পাঠান্তর আছে, ক্যাটালান, চেক, ফিনিশ, গ্রীক, হাংগেরিয়ান, আইরিশ ও সুইডিশ ভাষায়।

ভাগ্যের ওপর টেক্কা : পুনর্কথিত। সূত্র পণ্ডিত নাটেশা শাস্ত্রী, 'দি ইণ্ডিয়ান অ্যানটিকোয়ারি', সেপ্টেম্বর ১৮৮৮, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৫৯-৬৪১ AT ৯৩৪ D, 'আউটউইটিং ফেট'।

এই গল্পে এক বুদ্ধিমান মানুষ ভাগ্যকে পরাজিত করে। অথবা, ভাগ্যলিপির আদেশ পালন করে, কিন্তু পরিণাম হয় সুখের। এতাবধি এ গল্প ভারতীয় (বাংলা, গুজরাটী, তামিল) ভাষাতেই পাওয়া গেছে। ভাগ্যবাদী বলে ভারতীয় এবং অন্য

'প্রাচ্য' মানুষদের যে প্রচলিত, ছকে বাঁধা ছাঁচ আছে,—এ তার বিরোধিতা করে।

এক রাজা, চার কন্যা : পুনর্কথিত। সূত্র চার্লস সোয়াইনারটনের 'ইণ্ডিয়ান নাইট্‌স' এন্টারটেনমেণ্টস্, অর ফোকটেল্‌স ফ্রম দি আপার ইণ্ডাস' (লণ্ডন : ই. স্টক, ১৮৯২), পৃষ্ঠাঙ্ক ৫৬–৬২।

এষণা H ৬৩০, 'রিড্‌ল্‌স অফ দি সুপারলেটিভ, +K ৪৪৫.১, গড টু রিভিল সেল্‌ফ টু দোজ্ অফ লেজিটিমেট বার্থ'। কন্নড়েও কথিত।

'আকবর ও বীরবল'-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

তুমি নয়? তবে নিশ্চয় তোমার বাপ : বডকার ১২৫৬; এষণা U ৩১, 'রাইট্‌স অফ দি স্ট্রং'। হিন্দীতেও কথিত।

গ্রন্থকারের শৈশবে শোনা এই ছোট্ট সংলাপ-কাহিনী এক ফলপ্রসূ রাজনীতিক নীতিকথা। এতে অবশ্যই বর্ণবিদ্বেষী জননেতৃত্বের যুক্তি বিধৃত। অত্যাচার ও গণহত্যার সাফাই খুঁজতে প্রাচীনরা, ইতিহাসও এমন যুক্তি উল্লেখ করত।

শ্রোতারা হাসে কাঁদে কেন? : পুনর্কথিত। সূত্র সোয়াইনারটন, 'ইণ্ডিয়ান নাইট্‌স' এন্টারটেনমেণ্ট্‌স', পৃষ্ঠাঙ্ক ৮।

AT ১৮৩৪, 'দি ক্লার্জিম্যান উইথ দি ফাইন ভয়েস'। গোণ্ডী ও হিন্দীতেও সংকলিত।

আকবর ও বীরবল : ফ্রান্সেস প্রিচেটের অনুবাদ থেকে গৃহীত। অনুবাদ সূত্র মহানারায়ণ, 'লতায়িফ-ই আকবর, হিস্‌সা পহ্‌লা, বীরবল নামাহ্' (দিল্লী : মাঠা জৌহর-য়ে হিন্দ্, ১৮৮৮)।

'গোপাল ভাঁড়ের তারা গোণা'-র টীকা দ্রষ্টব্য।

অনুরূপ বহু গল্প AT ৯২১ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তাতে কোন বিচক্ষণ লোক (বিদূষক, চাষী, প্রায়ই তার কন্যা) রাজার প্রশ্নের বুদ্ধিতীক্ষ্ণ জবাব দেয়, যা প্রায়ই দেয় ধাঁধার আকারে। পৃথিবীজোড়া অনুরূপ গল্পের এগুলি ভারতীয় উদাহরণ।

রাতকানা জামাই : অনূদিত। সূত্র ডো. না. রামেগৌড়া সংকলিত 'নাম্মুরিনা জনপদ কথেগালা' (মাইসোর : তা. ভেম. স্মারক গ্রন্থমালে, ১৮৭৫) পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৬–৭৯।

AT ১৬৮৫, 'দি ফুলিশ ব্রাইডগ্রুম, + ১৬৮৫ A, দি স্টুপিড সান ইন-ল।' অসমীয়া, বাংলা, গোণ্ডী, কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী, তামিল ও তেলুগুতেও সংকলিত।

বোকা জামাইয়ের কথা পৃথিবীর সর্বত্র বলা হয়। ইউরোপে রেনেসাঁস ঠাট্টাতামাশার বইয়ে এবং শ্রুতিবাহিত কাহিনীতেও তা পাওয়া যায়। বিষয়বস্তু হিসেবে বোকা জামাইয়ের কথা প্রাচীন দিন থেকেই ভারতে বড়ই প্রিয়। স্বামীকে বউয়ের ওপর যত ক্ষমতা দেওয়া হয়ে থাকে, তাতে মেয়ের পরিবার যাতে জামাইকে অপদস্থ করতে পারে সে সুযোগও থাকবে, তা বিস্ময়কর নয়। বিয়ের ব্যাপার ভালোয় ভালোয় চুকে গেলে মেয়েরা, সেই জামাই আর তার আত্মীয়দেরই অপমানসূচক গান গায়, যাদেরকে

অনেক সম্প্রদায়ে ঠাকুরসেবা করতে হয়। নির্বোধ জামাইয়ের গল্প অনুরূপ উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। 'আমার আসল চেহারা দেখাব?' গল্পটি দ্রষ্টব্য।

আমার আসল চেহারা দেখাব? : গ্রন্থকার শৈশবে পিতামহীর কাছে শোনেন। কিছুটা সংশোধিত পাঠ মেলে এইচ. কিংসকোট ও নাটেসা শাস্ত্রীর 'টেল্স অফ দি সান, অর ফোকলোর ইন সাদার্ন ইণ্ডিয়া' বইয়ে (১৮৯০), পৃষ্ঠাঙ্ক ১১৯-৩০।

AT ১১৫২, 'দি ওগ্র্ ওভারঅ্যাড বাই ডিস্প্লেয়িং অবজেক্ট্স' (অসমীয়া, বাংলা হিন্দী, কন্নড় এবং কোটাতেও বলা হয়) + AT ৩১২ A, 'দি ব্রাদার রেসকিউস হিজ সিস্টার ফ্রম দি টাইগার' (কন্নড়, লোহ্টা, নাগা, ওড়িয়া, সাঁওতালী ও তেলুগুতেও কথিত)।

যে লোক বাইরে থেকে এসে বাড়ির মেয়েটিকে বিয়ে করে, সে সন্দেহেরপাত্র। এর সম্ভাবনা আরো বেশি সে সব গোষ্ঠীতে, যেখানে সগোত্রে বিয়ে হয়, গোষ্ঠীবন্ধন খুব দৃঢ়। তেমন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে, প্রস্তাবিত বধূ বা জামাতার পরিবার ও ইতিহাস বিষয়ে বিশদ সংবাদ জানার পর বিয়ের ব্যবস্থা হয়। এ গল্পে দেখি, জামাই বিষয়ে সন্দেহ ও বিদ্বেষ, মেয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে, সেই আশঙ্কা। এতে হয়তো আরো প্রকাশ পেয়েছে, যে-বহিরাগত এসে বোনটিকে নিয়ে গেছে, তার বিষয়ে ভাইয়ের ঈর্ষা; এবং স্বামীর কাছে সে যখন বিপন্ন, তখন ত্রাণকর্তা ভাইয়ের ওপর বোনের বিশ্বাস।

'রাক্ষসী রানী' এই গল্পেরই নারী-প্রতিরূপ। সেখানে যে অচেনা মেয়ে রাজাকে বিয়ে করে, সে এক নরমাংসভোজী।

কিছুতে যে খুশি হ'ত না : সূত্র নোয়েল্সের 'ফোকটেল্স অফ কাশ্মীর', পৃষ্ঠা ৩২১। AT ১৬৮৯, 'থ্যাংক গড দে ওয়্যার নট পীচেন'। পাঞ্জাবী, এবং সুইডিশ, স্পানিশ, হাঙ্গেরীয় এবং ইংরাজি ভাষাতেও কথিত।

চিলের মেয়ে : পুনর্কথিত। সূত্র জে. বরুয়ার 'ফোকটেল্ অফ আসাম' (গৌহাটি লইয়ার্স, বুক স্টল, প্রথম সংকরণ, ১৯১৫; প্রফুল্লদত্ত চৌধুরী কর্তৃক সংশোধিত, ১৯৬৩), পৃষ্ঠাঙ্ক ১০৩-১৬।

AT ৭০৯ A + ৮৯৭, 'দি অরফ্যান গার্ল অ্যান্ড হার ক্রুয়েল সিস্টার্স-ইন্-ল'।

কন্নড়, কোংকনী, তামিল ও তেলুগুতে গল্পের প্রথমাংশটি, যেখানে এক পরিত্যক্ত মেয়েকে এক পাখি লালনপালন করে, সেটি বলা হয়। অনাথ বালিকা এবং তার নিষ্ঠুর ননদরা যারা তাকে কঠিন কঠিন কাজ দেয় এবং প্রাণীরা মেয়েটিকে সাহায্য করে,—গল্পের এই বাকি অংশটি খুবই ব্যাপকভাবে প্রচলিত। 'চিলের মেয়ে' গল্পে প্রাণীজগতের ভূমিকা পালন করে চিল্নি মা এবং ননদদের বদলে পাই সতীনদের। দুটি গল্পই পাওয়া যায় ভারতীয় ভাষাতেই। যেমন, গুজরাটী, হিন্দী, কন্নড়, ওড়িয়া ও সাঁওতালী।

ভারতীয় গল্পে নানা রকম বিধি মতে গল্প শেষ হয়। যেমন অসমীয়াতে 'ধোপাকে

কাপড় ধুতে দেব, তাই আমরা বাড়ি চলে এলাম'; অথবা, 'কাঁঠাল গাছে ফল ধরল, তখন ফিরলাম বাড়ি'। গল্পের কল্প-জগৎ থেকে শ্রোতাকে মাটির জগতে ফিরিয়ে আনে এই বিধি মতে উপসংহারগুলি। অন্যান্য নমুনার জন্য ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

চৈত-বিহু : চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল) মাসে, হিন্দু বর্ষপঞ্জীর নববর্ষ উৎসব বছরের প্রথম মাসে। ভারতের কিছু অংশে এটি নববর্ষ উৎসব।

এক কুসুমিত গাছ : অনুবাদ এ. কে. রামানুজন; সূত্র ব্রেন্ডা ই. এফ. বেক-এর 'ফোকটেল্স অফ ইণ্ডিয়া'—সকল সংস্করণ (শিকাগো : যুনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস, ১৯৮৫)।

AT ৭০৬, 'দি মেডেন উইদাউট হ্যান্ড্স'। কাশ্মীরী ও হিন্দীতে পাঠান্তর সংকলিত।

উপর-উপর গল্পটির সঙ্গে এক যুরোপীয় গল্পের সাদৃশ্য আছে, যাতে নায়িকা বিয়ে করে এক রাজাকে; তার হাত কেটে ফেলা হয়; নির্বাসনে পাঠানো হয়, আবার সব ভালো ও ঠিকঠাক হয়ে যায়। এই ভারতীয় গল্পটির (কন্নড় ছাড়া অন্য কোন ভাষায় পাঠান্তর এখনো মেলেনি) কিছু বৈশিষ্ট্য আছে : গল্পের কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে মেয়েটি গাছ হয়ে যাচ্ছে, আবার মেয়ে হয়ে যাচ্ছে, এবং এ কথা স্পষ্ট করে পাঁচবার বলা হয়েছে। প্রথমবার সে এ কাজ করছে টাকার জন্যে; এরপর ওর মা, স্বামী, এবং সমব্যথাহীন কিশোরী ননদ ওকে ঘ্যানঘেনিয়ে গাছ হতে বাধ্য করছে। গল্পটি অনাচার থেকে অনাচারে এগিয়ে চলে। মেয়েটি হয়ে যায় কোন 'বস্তু' যে নির্বাক ও চলচ্ছক্তিহীন। গাছও নয়, মেয়েও নয়, মাঝামাঝি কোন ব্যাখ্যাতীত ব্যাপার। ওকে হারাবার ক্ষতিতে শোকাহত স্বামী বদলে যায়, শুধরে যায় যখন,—সযত্নে গাছ-মেয়ের ভাঙা ডালগুলি জুড়ে দেয়, একমাত্র তখনি ও পূর্ণ নারী রূপে প্রকাশ পায়। পরিবেশ প্রসঙ্গেও শিক্ষা আছে এতে, গাছকে আঘাত করা, মানুষকে আঘাত করার সমান। এক গাছ ও এক নারীর যে সংযোগ রূপকায়িত তা বিচিত্র ও সুপ্রাচীন। কবিতা, পুরাকল্প ও শিল্প তার সাক্ষ্য বহন করে। সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় গাছে ফুল ফোটা এবং মেয়েদের র‍্যাঃ বলা হওয়া বোঝাতে একই শব্দ ব্যবহৃত হয়। আম্মা : মাকে সম্বোধন। এক প্রবীণা বা শ্রেয়োতর রমণীকে সম্মানসূচক সম্বোধনেও এ শব্দ ব্যবহৃত। সুরাহোন্নে : আলেকজান্দ্রিয়ান লরেল, এক ফুল ফোটানো গাছ।

সংগীত প্রিয় দৈত্য : শাস্ত্রীয় 'ইন্ডিয়ান ফোকটেল্স', পৃষ্ঠাঙ্ক ১৭৩-৮৮ থেকে গৃহীত।

AT ১১৬৪ D, 'দি ডিমন অ্যান্ড দি ম্যান জয়েন ফোর্সেস'। অসমীয়া, বাংলা, হিন্দী ও পাঞ্জাবীতেও সংকলিত।

কোন কোন পাঠান্তরে (যেমন পাঞ্জাবী) দেখা যায় এক ঝগড়ুটে বউ দৈত্য এবং নিজের স্বামী, দুজনকেই তাড়িয়ে ছাড়ছে। পরে, এক রানীর শরীর থেকে স্বামী

দৈত্যকে এই ব'লে তাড়ায়, যে বাইরে তার বউ ঝাঁটা হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

জন্মান্তর : নোয়েল্‌সের 'ফোকটেল্‌স অফ কাশ্মীর' থেকে গৃহীত। এষণা E ৬০৫, 'রিইনকারনেশান ইন অ্যানাদার হিউম্যান ফর্ম', বাংলা ও তামিলেও সংকলিত।

জন্মান্তর, বা একই মানুষের বহু জন্ম, ভারতীয় ধর্মসমূহে কর্ম-তত্ত্বের একটি ভিত্তি। এ গল্পটি কিছু অস্বাভাবিক। কেননা লোককথা সাধারণত পূর্বজন্ম বা কর্ম নিয়ে মাথা তেমন ঘামায় না, যা ঘামায় ভারতীয় সাহিত্যের অন্যান্য শাখা (মহাকাব্য, পুরাকল্প ইত্যাদি)। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

শুওর হয়েই বেঁচে থাকা : ১৯৮৮-এ হায়দ্রাবাদে বি. ভি. আই. নারায়ণা রাও কথিত এক কাহিনী থেকে পুনর্কথিত।

এষণা E ৬১১ B, 'ম্যান রিইনকার্নেটেড অ্যাজ সোয়াইন'। অসমীয়া ও তামিলেও সংকলিত।

আগের গল্পটি বিষয়ে এ গল্পটি এক মজাদার মন্তব্য। বন্য বরাহ অবতারে জন্ম নিয়ে শ্রী বিষ্ণু পৃথিবীকে রক্ষা করেন, গল্পে আছে। শূকরী ও শূকর সন্তানসন্ততি সহ শূকর জীবন যাপন তাঁর এত ভাল লাগে, যে তিনি ফিরে দেবরূপ ধারণে রাজী হন না। শিব যখন তাঁকে রাজী করাতে পারলেন না, ত্রিশূল দিয়ে শূকরকে মেরে ফেলে দেবতাকে শূকর-জীবন থেকে মুক্তি দিলেন।

মুখের মধ্যে সারস : পুনর্কথিত। সূত্র পণ্ডিত শ্যামা শঙ্করের 'উইট অ্যান্ড উইজডাম অফ ইণ্ডিয়া (লণ্ডন : রুটলেজ, ১৯১৪) পৃষ্ঠাঙ্ক ১৩৪-৩৬।

AT ১৩৮১ D 'দি ওয়াইফ মাল্‌টিপ্লাইজ দি সিক্রেট'। হিন্দী, গোণ্ডী ও সাঁওতালীতেও সংকলিত।

অনেক গল্পেই বলা হয়, এক নির্বোধ ছেলে বা বউ পেটে কথা চেপে রাখতে পারে না, রং চড়িয়ে তা ব'লে চলে। গুজব ও কথাচালাচালি বিষয়ে এটি সমালোচনা, সেই সঙ্গে এটাও বলে দেয়, কেমন করে গল্প গজায়।

তেনালী রাম ছবি আঁকল : গ্রন্থকার শৈশবে শুনেছিলেন।

'তেনালী রামের রামায়ণ'—এ পণ্ডিতমাত্রদের বাস্তবতার প্রয়োজন নিয়ে তামাশা করেন তেনালী রাম। এ গল্পে তিনি এক হাত নিয়েছেন সেই সব শিল্পী ও রসশাস্ত্রে পণ্ডিতদের, যাঁরা দর্শকদের কাছে কল্পনা শক্তি দাবী করেন।

শিল্পীর কাজ কি ফুরায়? : পুনর্কথিত। সূত্র পুতলিবাই ডি. এইচ. ওয়াডিয়ায় 'দি ইন্‌ডিয়ান অ্যন্টিকোয়ারি' ভল্যুম ১৭ নং ২০৬ (মার্চ ১৮৮৮)।

সারসবালক : গৃহীত। সূত্র কারগির টুলু শ্রুতকাহিনীর অনুবাদ, পিটার ক্লস কৃত। এষণা T ৫৫৪৩, 'ওম্যাল গিভ্‌স বার্থ টু ক্রেন'। কোংকনী (গোয়া)-তেও কথিত।

আব্বা : বিস্ময়োক্তি।

মামি : শাশুড়ি মাসিকে সম্বোধনে ব্যবহৃত।

বাঘের পুষ্যি ছেলে : কে, মহাপাত্র ও নর্মান জাইড সংগৃহীত।

AT ৫৯৫, 'দি বয় অ্যাডপটেড বাই টাইগারস'। গোণ্ডীতেও কথিত।

এক আধলায় জীবন যাপন : পুনর্কথিত। সূত্র জিও এফ. ডি' পেস্‌হার 'দি ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি', ডিসেম্বর ১৮৯৭, PP. ৩৩৭-৪১।

এষণা H ৯১৫, 'টাস্‌ক অ্যাসাইন্‌ড বিকজ অফ গার্লস ফুলিশ বোস্ট'। হিন্দী, তামিল ও তেলুগুতেও সংকলিত।

জাদু বাটি : পুনর্কথিত। সূত্র এ. কে. রামানুজনের অনুবাদ 'সাদার্ন ফোকলোর কোয়ার্টারলি'তে। ভল্যুম ২০ নং ৩ (সেপ্টেম্বর ১৯৫৬), পৃষ্ঠাংক ১৫৫-৫৮।

AT ৫০৩, 'দি গিফ্‌টস অফ দি লিট্‌ল পীপ্‌ল'। তেলুগুতেও সংকলিত।

চার যোগী : গৃহীত। সূত্র বম্‌গাস-এর 'ফোকলোর অফ দি নানতাল পরগনাজ', পৃষ্ঠাংক ১৮১-৮৩।

AT ৯১৫, 'দি মিস্‌আণ্ডারস্টুড প্রিসেপ্‌ট্‌স '। কাশ্মীরীতেও সংকলিত। অনেক গল্প, যাতে রাজা প্রাণবাঁচানোর জন্যে নীতিবাক্য খরিদ করে,—এ গল্পটি তার প্যারডি। 'ছেলেটা জ্ঞান বেচত' গল্প দ্রষ্টব্য।

বিপদ কালের বন্ধু : এম. জি. শশীভূষণের মৌখিক কাহিনী থেকে পুনর্কথিত।

AT ১২২ G, 'ওয়াশ মী' ('সোক মী') বিফোর ইটিং (মোটিফ K ৫৫৩-৫); বাডকার ৬৩৮। এ কাহিনীর পাঠান্তর অতীতে মেলে বৌদ্ধ জাতকে।

রাজকণ্যের মন জয় : পালটাডি রামকৃষ্ণ আচারের কাছে প্রস্তু ও অনুদিত, 'তুলুওয়ারা জনপদ কাটেশালু' (মাধভু: সুপ্রিয়া প্রকাশনা ১৯৮৭) ।

AT ৫৫৯ (জেসনের 'টাইপ্‌স অফ ইণ্ডিক ওরাল টেল্‌স: সাপ্লিমেন্ট), 'দি ডাম্ব প্রিন্‌সেস '। গুজরাটী, মারাঠী ও পাঞ্জাবীতেও সংকলিত। AT ৮৫২' দি হিরো কোর্সেস দি প্রিন্‌সেস টু সে 'নো' দ্রষ্টব্য। শাহারজাদী যে ভাবে মৃত্যু ঠেকাতে গল্প বিনিময় করে চলেন। এই গল্পটি এক কঠিনা কন্যার মন গলিয়ে তাঁকে জয় করার জন্যে গল্প ব্যবহার করে চলে। যে সব গল্প বলা হয় তা ধাঁধাঁ গল্প, ভারত ও আফ্রিকায় জনপ্রিয়। গল্পগুলি শেষ হয় কোনো প্রশ্নে। স্বামীর গুণাগুণ কি, কে প্রকৃত মহৎ। এ সব বিষয়ে সামাজিক ভূমিকা, বা সম্পর্ককে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এমন ধাঁধাঁ-গল্পের মধ্যে ভারতে সব চেয়ে বিখ্যাত 'বেতাল পঞ্চ বিংশতি' (রক্তচোষার পঁচিশটি গল্প), যা একাদশ শতাব্দীর 'কথাসরিৎ সাগর'—এ আছে। হাইনরিখ জ্বিমার এ সব গল্প নিয়ে এক চিত্তাকর্ষক য়ুংগীয় প্রবন্ধ লেখেন। 'দি কিং অ্যান্‌ড দি ক্যর্প্‌স্‌' (নিউ ইয়র্ক: বোলিংটন বুক্‌স ১৯৫৭)। আরো দ্রষ্টব্য, উইলিয়াম ব্যাস্‌কোমের 'আফ্রিকান ডিলেমা টেল্‌স', (দি হেগ্‌: মৌটন পাবলিশার্স, ১৯৭৫) যাতে আছে ১৪২টিদৃষ্টান্ত।

AT ৬৫৩ এবং তার উপ শ্রেণী গুলিতে এ সব গল্পের অনেকগুলি আছে। কয়েকটি খুব জনপ্রিয়, যেমন, 'দি ফোর স্কিলফুল ব্রাদার্স'; দৃষ্টান্ত হিসেবে ২৭০ এর

বেশির খবর মিলেছে য়ুরোপ ও এশিয়া থেকে, ২২ আমেরিকা থেকে, ৬ আফ্রিকা থেকে। ভারতে পাঠান্তর মেলে বাংলা, গুজরাটী, গোণ্ডী, হিন্দী, কন্নড় ও তেলুগুতে।

চ্যাপটা চাল (অবহলক্‌কি) বা চিড়ে: চাল ঝলসে, শুকিয়ে, ভেজে হামালদিস্তায় কোটা হয়।

নদী পেরোতে বিপত্তি : গ্রন্থকার শৈশবে শুনেছিলেন। AT ১২৮৭, 'নাম্‌স্কাল্‌স আনএব্‌ল টু কাউন্ট দেয়ার ওন নাম্বার'। বাংলা, হিন্দী, গোণ্ডী, কাশ্মীরী ও পাঞ্জাবীতেও সংকলিত। এ গল্প বলা হয় য়ুরোপের সর্বত্র ডাচ, ইংলিশ, ফিনিশ, ফ্রেঞ্চ, আইরিশ, জার্মান, রাশিয়ান এবং অন্যান্য ভাষায়।

এই গল্পটি গুরু পরমার্থ (তেলুগুতে পরমানন্দ) এবং তাঁর শিষ্যদের নিয়ে দারুণ মজার গল্পমালার এক অংশ। ফ্র. রেশি নামক এক ইতালীয়ান ধর্মবাজক, যিনি 'বিরামমুনিবর' (১৬৮০-১৭৪৬) নামে তামিল লিখতেন, তিনি অনেক আগেই এ সব গল্প তামিলে নথিভুক্ত করেন। গল্পগুলি তিনি য়ুরোপ থেকেই আনুন, বা তামিলনাদেই সংগ্রহ করুন, গল্পগুলি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় শ্রুতি-নাটকের অংশ নিশ্চয়। বর্তমান গল্পটি, তাঁর কথনের খুব সদৃশ। বীরাকর্নি চেট্টিয়ার (১৮৭৬)-এর 'স্থিনোভারাকনানচারি' নামক সাহিত্যিক ও লোক উপাদানের এক সংকলনে পুনর্মুদ্রিত।

রাজকুমার সবুর : পুর্নকথিত। সূত্র পুতলিবাই ডি. এইচ. ওয়াডিয়া, 'দি ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি', ভল্যুম ১৬, নং ২০২ (নভেম্বর ১৮৮৭), পৃষ্ঠাংক ৩২২-২৭।

AT ৯২৩ B, 'দি প্রিন্‌সেস্ হু ওয়াজ রেস্‌পেন্‌সিবল ফর হার ওন ফরচুন', + AT ৩২, 'দি প্রিন্‌স অ্যাজ বার্ড'। AT ৯২৩ B পাওয়া গেছে একমাত্র ভারত থেকে (এতবধি) ২৫ পাঠান্তরে। বাংলা, গোণ্ডী, হিন্দী, কন্নড়, কাশ্মীরী এবং অন্যান্য ভাষার মধ্যে তামিলে; ৪৩২-র আছে ৪টি পাঠান্তর; যেমন বাংলা, হিন্দী ও কন্নড়।

গল্প শুরু হয় কিংলীয়র এষণার : এক পিতা তাঁর মেয়েদের বলেন তাঁর প্রতি ভালবাসা মুখে বলতে, কনিষ্ঠা কন্যার বক্তব্য শুনে নিরাশ হন, তাঁকে নির্বাসন দেন। তারপর গল্প চলে যায় সেই মেয়েটির কাছে। খুঁজছে তার স্বামীকে। 'অবাধ্য ছেলের কাণ্ড' গল্পের টীকা দ্রষ্টব্য, যাতে এক পিতা ছেলেদের অনুরূপ প্রশ্নই করেন।

মৃত্যুর দেবতা : গৃহীত। সূত্র স্টীলের 'টেল্‌স অফ দি পাঞ্জাব', পৃষ্ঠাংক ২০৭-১০।

মেষপালকের ভূত : সি. পেড্ডি রেড্ডির এক পি. এইচ. ডি.-র গবেষণামূলক প্রবন্ধ। 'অন্নতপুরম জিলা জনপদ কথালু'-র পৃষ্ঠাংক ৩০৮-১৬ তে কথিত একটি গল্পের, ভি. নারায়ণ রাওয়ের মৌখিক অনুবাদ থেকে গৃহীত।

AT ১৩১৩ A 'দি ম্যান টেক্স সিরিয়াসলি দি প্রেডিকশান অফ ডে'। পনেরটি ভারতীয় পাঠান্তর এতাবধি মেলেছে বাংলা, হিন্দী, পাঞ্জাবী ও অন্যান্য ভাষা থেকে। ফ্রেঞ্চ, ইতালিয়ান, লিথুয়ানিয়ান ও টার্কিশ ভাষাতেও কথিত।

এই জীবন, অন্য জীবন : এটি এবং পরের গল্পটি শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত বলে বলা হয়। 'বাঘ জানত না সে বাঘ' গল্পের টীকা দ্রষ্টব্য। এ গল্পটি ওড়িয়া ও তেলুগুতে কথিত।

ঈশ্বর যখন সর্বব্যাপী : এষণা ২৪৯৯ B। মারাঠীতেও কথিত।

বাঘ জানত না সে বাঘ : গৃহীত। সূত্র 'দি গস্‌পেল অফ রামকৃষ্ণ (নিউইয়র্ক : দি বেদান্ত সোসাইটি)। পৃষ্ঠাংক ২০৩-৪।

ভারতীয় ধর্মগুরুদের কথা নাটিকার অংশ নানারকম লোককথা। উনিশ শতকের মহান বাঙালী সন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক নীতিকথা বলেছেন, যা শ্রুতিবাহিত ঐতিহ্যের অঙ্গ হয়ে গেছে। উপরে উধৃত বইটিতে তাঁর কথোপকথন, গান ও গল্প আছে।

গন্ধর্বসেন মারা গেছেন : পুর্নকথিত। সূত্র মুখার্জি। 'ইণ্ডিয়ান ফোকলোর', পৃষ্ঠাংক ১৫-১৭।

AT ২০২৩, 'মোর্নিং ফর দি ডেড অ্যাস' (এষণা Z ৩২.২)। হিন্দী ও উর্দুতে সংকলিত।

তেনালী রামের স্বপ্ন : পুর্নকথিত। সূত্র ডেভিড শালমানের তেলুগু থেকে অনুবাদ। 'দি কিং অ্যাণ্ড দি ক্লাউন ইন সাউথ ইনডিয়ান মীথ অ্যান্ড হিস্‌ট্রি '।

এষণা J ১৫২৭, 'ড্রীম আনসার্‌ড বাই ড্রীম'। হিন্দী, কন্নড় ও তামিলে পাঠান্তর মেলে।

স্বপ্নে ভোজ খাওয়া : গৃহীত। সূত্র এরিন মূরের অনুবাদ রাজস্থানী থেকে, 'ড্রীম ব্রেড; অ্যান এক্‌সেলপ্লাম ইন এ রাজস্থানী পঞ্চায়েত', 'জার্নাল অফ আমেরিকান ফোকলোর', ভল্যুম ১০৩ নং ৪০৯ (জূলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯০), পৃষ্ঠাংক ৩১২-১৩।

AT ১৬২৬, 'ড্রীম ব্রেড', হিন্দী, কাশ্মীরী ও পাঞ্জাবীতেও প্রাপ্ত।

এটি আন্তর্জাতিক গল্প, জাপান, য়ুরোপ, আইসল্যাণ্ড, কানাডা, দি য়ুনাইটেড স্টেট্‌স, পুয়ের্টো রিকো এবং ব্রাজিলে প্রাপ্ত। গল্পটিতে সাধারণত থাকে তিন পুরুষ সঙ্গী। একজনকে নির্বোধ, বা সমাজ অবস্থানে নিচু মনে করা হয়। ত্রয়োদশ শতকের এক পারসী গল্পে, এক মুসলিমের ওপর টেক্কা নেবার জন্যে এক ইহুদী, এক মুসলিম ও এক ক্রীশ্চানকে বোকা বানায়। কাশ্মীরী পাঠান্তরে এক পাপী বোকা বানায় এক মুসলিম ও এক ক্রীশ্চানকে। মূর সংগৃহীত রাজস্থানী গল্পে এক মিও কেমন করে উদ্দতর মানমর্যাদার (খানজাদা) দুই মুসলিমকে বোকা বানাল। সেই গল্প বলে আরেক মিও। গল্পটি দিয়ে ও নিজ সম্প্রদায়ের বুদ্ধি কেমন, তাই দেখায়। মিওরা এক সংখ্যালঘু জাতি, প্রায়ই অন্যেরা তাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। গ্রাম সভায় (পঞ্চায়েতে) গল্পটি বলা হয়েছিল এক মুসলিমকে মুখের মতো জবাব দিতে। মুসলিমটি অভিযোগ করেছিল মিওটি গ্রামবাসীর সুখদুঃখ দেখে না। বিশদ জানার জন্য, মূরের উপরে উধৃত লেখাটি

স্বপ্নের খোঁজে : গৃহীত। সূত্র বম্‌পাস 'ফোকলোর অফ দি সানতাল পরগনাজ', পৃষ্ঠাংক ১৯৬-২০১।

AT ৫৫০, 'সার্চ ফর দি গোল্‌ডেন বার্ড', + AT ৫৫১, 'দি সান্‌স অন্‌ এ কোয়েষ্ট ফর এ ওয়াণ্ডারফুল রেমিডি ফর হিজ ফাদার, (এই ভারতীয় পাঠান্তরে বিশ্বাসঘাতক ভাইদের এষণা নেই, K ২২১১)। এ ছাড়াও এষণা H ১২১৭, 'কুইন অ্যাসাইন্‌ড্‌ বিকজ অফ এ ড্রীম', অন্যান্য ভাষার মধ্যে অসমীয়া, বাংলা, গোণ্ডী, হিন্দী, কন্নড়, কাশ্মীরী, ওড়িয়া ও তামিলে অবস্থিত। মণ: ওজনের একক। ৮২ পাউণ্ডের সমান।

যে রাজকন্যেকে তার বাবা বিয়ে করতে চেয়েছিল : আচারের 'তুলুবর্গ জনপদ কাটেগালু থেকে গৃহীত ও অমুদিত।

AT ৭০৬, 'দি মেড্‌ন উইদাউট হ্যাণ্ড্‌স'। এ ছাড়াও এষণা T ৪১১.১, 'লেচেরাস ফাদার' এবং S ১৬০, 'মিউটিলেশান'। হিন্দী ও কন্নোড়েও সংকলিত। বিকলাঙ্গকৃত নায়িকার কাহিনী 'কুসুমিত গাছ' ওই বিষয় একেবারে আলাদা এক পাঠান্তরের জন্য দ্রষ্টব্য।

মা—ছেলের বিয়ে : গৃহীত। সূত্র ইরাবতী কার্ভের 'এ মারাঠী ভার্শন অফ দি অয়দিপাউস স্টোরি', 'ম্যান', জুন ১৯৫০, পৃষ্ঠাংক ৭১-৭২।

AT ৯৩১, 'অয়দিপাউস'। কন্নড়, কোংকনী ও তামিলে পাঠান্তর পাওয়া যায়।

এখানে এক মায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে অয়দিপাউসের কাহিনী বলা হয়েছে, যে জন্য এটি এক নারী কেন্দ্রিক কাহিনী। মেয়েটির ভাগ্যে পুত্র এক দাবার গুটি মাত্র। মারাঠী কাহিনীতে মার আত্মহত্যার কাহিনী সমাপ্ত হয় না, যেমন হয় গ্রীক পুরাকল্পে, পুত্রও নিজের চোখ অন্ধ করে দেয় না। (রামায়ন সহ) অনেক ভারতীয় কাহিনীর দুটি বা ততোধিক সমাপ্তি থাকে। একটি বিয়োগান্তক, অন্যটির শেষে সুখ, অথবা যা হয় তা মেনে নেওয়া। কন্নড় পাঠ গুলিতে এই কাহিনীরও আরেকটি সমাপ্তি আছে। পুত্রের ঔরসে মায়ের ছেলে হয়। তারপর মা নিজের বিয়ের পিছনের সত্য জানতে পারে। এখন সে একটি ঘুমপাড়ানি গান গায়। এই গান দেখিয়ে দেয় অজাচার কি নৃশংস ভাবে সুনিয়াদ্রিত পরিবার-কাঠামো ভেঙে ফেলে: ঘুমোও পুত্র আমার। ঘুমোও আমার পৌত্র, ঘুমোও স্বামীর ভাই। ঘুমোও শান্তিতে! তারপর মা নিজের শাড়ি গলায় বেঁধে আত্মহত্যা করে। তিন নম্বর সমাপ্তিতে বিভ্রান্ত, শোকাকুলা মা ছুটে যায় দেবীর কাছে ও বলে, 'হে দেবী! আমার ও কি করলে তুমি? আমাকে নিজের ছেলেকে বিয়ে করতে বাধ্য করলে?' দেবী হাসেন ও বলেন, 'এমনটা ঘটে, মেনে নাওনা। এ তো তোমার দোষে ঘটে নি। বাড়ি যাও, শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করো। স্বামী ও ছেলের যত্ন করো'। মনে হতে পারে এমন উপসংহার মেনে নেওয়া যায় না। এ সব গল্প কিন্তু নানারকম সম্ভবপর সমাধান অণুব্যবচ্ছেদ করতে ডরায় না। সে যায় হোক, মেনে

নেওয়া, উপেক্ষা করা, আত্মহত্যা করা, দেবী কর্তৃক ক্ষমা করা, এমন কি ভাগ্যকে বোকা বানানো অবধি! নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ইরাবতী কার্ভে শুনেছিলেন, তাঁর দাসী নিজের মেয়েকে গল্পটি বলছে। গল্প ফুরলে দু'জনে হেসে বাঁচে না। উদ্ভট সব কাণ্ড কারখানায় তাদের ভারি মজা লেগেছে। এমন সব গল্পের গুরুত্ব বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য আমার লেখা 'দি ইণ্ডিয়ান অয়দিপাউস', পাওয়া যাবে লোয়েল এডমাণ্ডস এবং অ্যালান ডানডেস সম্পাদিত 'অয়দিপাউস, এ ফোকলোর কেসবুক-এ'(নিউইয়ক: গারল্যাণ্ড প্রেস, ১৯৮৩), পৃষ্ঠাংক ২৩৪-৬৬।

দাওয়াই: পুনর্কথিত। সূত্র মুখার্জি, 'ইণ্ডিয়ান ফোকলোর', পৃষ্ঠাংক ৭০-৭৩।

কাজি: মুসলিম ধর্মবাজক ও বিচারক।

উর্দুতে এক গাঁজাখুরি গল্প: গৃহীত। সূত্র মির্জা মাহ্‌মুদ বেগের 'নর্থ ইণ্ডিয়ান নোট, অ্যাণ্ড ক্যুয়েরিজ', নভেম্বর ১৮৯৪, পৃষ্ঠাংক ১৩৪-৩৭।

AT ১৯৬২ N, 'দি গ্রেট রেস্‌যিলার্‌স' ১৯৬০ D, 'দি গ্রেট ভেজিটেবল'। বাংলা, হিন্দী, পাঞ্জাবি এবং তেলুগুতেও সংকলিত।

গাঁজাখুরি গল্পের অন্য পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য, 'গল্পের গরু গাছে ওঠে।'

সবচেয়ে: গৃহীত। সূত্র জে. এইচ, হাটনের, 'ফোকটেল্‌স অফ দি আংগামী নাগাজ অফ আসাম', 'ফোকলোর', ভল্যুম ২৫ (১৯১৪) পৃষ্ঠাংক ৪৯৪-৯৫।

AT ২০৩১ C, 'দি ম্যান সীক্‌স দি গ্রেটেস্ট বিয়িং অ্যাজ এ হাজব্যাণ্ড ফর হিজ ডটার'। বাংলা, গোণ্ডী এবং হিন্দীতেও প্রাপ্ত।

সূর্য কথা: পুর্নকথিত। সূত্র সি. এ. কিমকেইড, 'ডেকাল নার্সারি টেল্‌স' (লন্‌ডন্: ম্যাকমিলান, ১৯১৪), পৃষ্ঠাংক ১-১৩।

ব্রতকথার সার্থক ফলদান ক্ষমতা বিষয়ে আরেকটি ব্রতকথা। দ্রষ্টব্য, 'গল্প ফেরে শ্রোতার খোঁজে।'

আটপাট (নগর): এই কিংবদন্তী নগরে অনেক মারাঠী ব্রতকথার ঘটনাস্থল।

শ্রাবণ: হিন্দু বর্ষপঞ্জীর একটি মাস। বলা চলে আগস্ট মাস।

তেনালী রাম আর বামুনেরা: দ্রষ্টব্য 'তেনালী রাম' বিষয়ে টীকা।

এষণা J ১৩২৭, 'স্বপ্নের বদলে স্বপ্ন'। হিন্দীতেও প্রাপ্ত।

মরতে মরতে বাঁচা: পুর্নকথিত। সূত্র নাটেসা শাস্ত্রী, 'দি ব্রম্মারাক্ষস অ্যাণ্ড দি হেগার', 'দি ইণ্ডিয়ান অ্যানটিক্যুয়ারি', অক্টোবর ১৮৮৭, পৃষ্ঠাংক ২৯৩-২৯৪।

AT ১১৭৫, 'স্ট্রেটেনিং কারলি হেআর'। হিন্দী ও তেলুগুতেও কথিত।

দুই বউ, এক বর: সরেজমিনে প্রাপ্ত।

মৃত রাজপুত্র আর কথাকওয়া পুতুল: এ. কে. রামানুজনের 'টেলিং টেল্‌স' থেকে নেওয়া, 'দেদেলাস' ফল ১৯৮৯, পৃষ্ঠাংক ২৩৯-৬২।

AT ৪৩৭, 'দি সাপ্লান্টেড ব্রাইড (দি নীড্‌ল প্রিন্‌স)'। বাংলা, হিন্দী ও মারাঠীতেও

সংকলিত।

সাপিনী মা: গৃহীত। সূত্র 'দি মাদার সার্‌পেণ্ট', সংকলয়িতা প্রফুল্লদত্ত গোস্বামী, সন্নিবেশিত রিচার্ড ডর্‌সনের 'ফোকটেল্‌স অ্যারাউণ্ড দি ওয়ালর্ড', (শিকাগো : য়ুনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস, ১৯৭৮), পৃষ্ঠাংক ১৮১-১৮৭।

৪৭৬ A, 'দি সারপেণ্ট রিলেটিভ্‌স (জেসনের টাইপ্‌স্ অফ ইণ্ডিক ওরাল টেল্‌স : সাপ্লিমেণ্ট)। মারাঠী ও তেলুগুতেও প্রাপ্ত।

তেজা আর তেজি: ....

ঘুঘুর ডিম: পালঘাটের এম. জি. শশীভূষণের এক অনুবাদ থেকে গৃহীত।

AT ২৪৮ A, 'দি এলিফ্যাণ্ট অ্যাণ্ড দি লার্ক'। অসমীয়া ও কন্নড়েও সংকলিত।

একটা ঢোল: উষা নিল্‌সনের অনুবাদ থেকে গৃহীত।

AT ১৭০ A, 'দি ক্লেভার অ্যানিম্যাল অ্যাণ্ড দি ফরচুনেট এক্সচেঞ্জেস্'। বাংলা, গোণ্ডী, কন্নড়, মারাঠী, পাঞ্জাবী এবং তামিলেও সংকলিত।

পয়মন্ত বদলাবদলির গল্প সাধারণত কোনো প্রাণী বিষয়ে বলা হয়। (বানর, শিয়াল)। তামিল পাঠে বানরটি শেষ অবধি ঢোলটা পায়। ঢোল বাজিয়ে বাজিয়ে কিসের বদলে কে পেল, তার সম্পূর্ণ তালিকা গেয়ে চলে।

বোকাদের রাজ্যে: গৃহীত। সূত্র এ. কে. রামানুজনের 'হু নীড্‌স্ ফোকলোর্‌স? দি রেলেভেন্‌স অফ ওরাল ট্রাডিসান্‌স টু সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ', সাউথ এশিয়া অকেশনাল পেপার সিরিজ, নং ১, সেণ্টার ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ, য়ুনিভার্সিটি অফ হাওয়াই অ্যাট মানোয়া, ১৯৯০। পৃষ্ঠাংক ২১-২৭।

AT ১৫৩৪ A, 'দি ইনোসেণ্ট ম্যান চোজ্‌ন টু ফিট দি স্টেক।' অসমীয়া, বাংলা, হিন্দী, কাশ্মীরী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, তামিল, তেলুগু ও উর্দুতে সংকলিত।

এই জটিল গল্পটি, সরকারের আর্থনীতিক সংস্কার, বিচার ব্যবস্থা, কর্ম বিষয়ে হিন্দু ধারণা, সব কিছুকে ব্যঙ্গ করে।

অহিংসা: ...

নাপিতের গোপন কথা: অনূদিত ও পুর্নকথিত। সূত্র 'বিবেকাপোতিনী : ৯৯'।

পুনর্মুদ্রিত 'তামিলানাত্র পালাংকাতাইকাল'-এ, সংকলয়িতা ভাট কোভিন্‌তান (ম্যাড্রাস : নিউ সেঞ্চুরি বুক হাউস, ১৯৬৫)।

AT ৭৮২ A, 'মিডাস অ্যাণ্ড দি অ্যাসে'স ইয়ার্স'। গোণ্ডী, হিন্দী, কন্নড় ও সাঁওতালীতে প্রাপ্ত।

গোপাল ভাঁড়ের গল্প: এডোয়ার্ড সি. ডিমকের মৌখিক অনুবাদ থেকে পুর্নকথিত।

AT ১৪৩০, 'দি ম্যান অ্যাণ্ড হিজ ওয়াইফ বিল্‌ড এয়ার কাস্‌ল্‌স।' পাঠান্তর মেলে গোণ্ডী, হিন্দী, পাঞ্জাবী, তামিল ও তেলুগুতে।

মেথরের স্বপ্ন: ডি. পি. পট্টনায়ক কথিত এক কাহিনী থেকে পুর্নকথিত।

ছেলেটা জ্ঞান বেচত : পূর্নকথিত। সূত্র সি. এ. কিসকেইড, 'ফোকটেল্‌স অফ সিক্ অ্যাণ্ড গুজরাট', (১৯২৫; পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ, আমেদাবাদ : নিউ অর্ডার বুক কোম্পানি, ১৯৭৬)।

AT ৯১০, 'দি গুড প্রিসেপ্‌ট্‌স্'। হিন্দী, কন্নড়, কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী, তামিল ও তেলুগুতেও প্রাপ্ত। পিতা বা কোন জ্ঞানী ব্যক্তির সদুপদেশ বিষয়ে শত শত গল্প চালু আছে ('নেভার প্ল্যান্ট এ থর্ন ট্রী', 'টেন্ট দি চেয়ার বিফোর সিটিং ডাউন', ইত্যাদি) যা নায়ককে কোন হঠকারী কাজ বা অকালমৃত্যু থেকে বাঁচায়।

দু' বয়াম পারসী ভাষা : পুর্নকথিত। সূত্র সোয়াইনর্টন, 'ইণ্ডিয়ান নাইট্‌স্' এণ্টারটেইনমেণ্টস্', পৃষ্ঠাংক ৮৫-৮৬।

AT ১২৯৬ A, 'ফুল্‌স গো টু বাই গুড ওয়েদার', কাশ্মীরীতেও সংকলিত।

আজব যে দেশে : পুর্নকথিত। সূত্র সোয়াইনারটন, 'ইণ্ডিয়ান নাইট্‌স্' এন্টারটেইনমেন্টস', পৃষ্ঠাংক ১৩৩-৩৮।

AT ৮১৩ B, "ওআইফ রেসক্যুজ্ হাজব্যাণ্ড ফ্রম স্নেক (জেভিল, ইত্যাদি)'।

একজনের খুশি : পুর্নকথিত। সূত্র শঙ্কর, 'উইট অ্যাণ্ড উইজডাম অফ ইণ্ডিয়া', পৃষ্ঠাংক ৯২-৯৩।

AT ১৬৯৯ 'মিস্‌আণ্ডার স্টাণ্ডিং বিকজ অফ ল্যাক অফ নলেজ অফ এ ফরেইন ল্যাংগোয়েজ'।

রাজা বিক্রম ও চীনের রাজকন্যা : পুর্নকথিত। সূত্র শেখ চিল্লি, 'ফোকটেল্‌স অফ হিন্দুস্তান', দ্বিতীয় সংস্করণ (এলাহাবাদ : পাণিনি অফিস, ১৯১৩)। পৃষ্ঠাংক ১০৮-২৯।

চারণগাথা কাহিনীর নিদর্শন হিসেবে আমি এই দীর্ঘ, রোমাণ্টিক, দুঃসাহসিক অভিযান কাহিনী বা ক্ষুদ্র উপন্যাসটিকে নিয়েছি; যদিও অনুরূপ গল্প মাঝে মাঝে পারিবারিক গল্পকাররাও বলেন। 'অবাধ্য ছেলের কাণ্ডকারখানা' দ্রষ্টব্য। এ সব গল্পে থাকে অসংখ্য এষণা, নানা গল্পের মূল খসড়া মিলে মিশে যায়। আমাদের উৎকণ্ঠাপূর্ণ উত্তেজনা ও চমৎকারী অনুভূতির কাছে এ সব গল্পের আবেদন। সুপারম্যান কাহিনীগুলির সদৃশ এগুলি, প্রাচীনতর। রাজা বিক্রমাদিত্য, উজ্জয়িনীর এক কিংবদন্তী স্বরূপ নৃপতি। ভারতীয় ভাষাগুলিতে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনীর নায়ক। তিনি 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (রক্তচোষাদের পঁচিশটি কাহিনী)-র নায়কও বটেন। তাতে তিনি পিঠে বহন করেন এক রক্তপায়ীকে এবং মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে তার বাঁধা-কাহিনীর জবাব দেন। 'রাজকন্যের মন জয়' কাহিনীর টীকা দ্রষ্টব্য।

এই দীর্ঘ ও জটিল কাহিনী প্রসঙ্গে AT ৪২৫ R, 'মার্ভেলাস বিয়িং উজ্ প্রিন্‌সেস' গল্পটি উল্লেখ্য।

জলের উপর হাঁটা : ওড়িয়াতেও কথিত এ কাহিনীটি রামকৃষ্ণ কথিত বলে বলা

হয়। 'বাঘ জানত না সে বাঘ' গল্পের টীকা দ্রষ্টব্য। এমন অসংখ্য হীনশ্রদ্ধা ভারতীয় ধর্মীয় কাহিনী সংগ্রহ করে নির্দেশিকা বানানোর কাজ এখনো বাকি আছে।

তন্ত্রের মতো বহু গূঢ় ধর্মপদ্ধতিতে লক্ষ্য থাকে অতিলৌকিক ক্ষমতা অর্জনের দিকে : শূন্যে উড়ে চলা, অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, অথবা জলের উপর হাঁটা। রামকৃষ্ণের মতো সন্তরা এ সব ক্ষমতাকে মনে করেন আধ্যাত্মিকতা হীন, এবং তুচ্ছ।

গুরু আর নির্বোধ : সরেজমিনে প্রাপ্ত। এই 'ভক্তি' কাহিনীতে গুরুর পার্থিব সাফল্যের চেয়ে ওপরে স্থান দেয়া হয়েছে বিশ্বাসকে, সে যদি এক নির্বোধের বিশ্বাস হয়, তবুও।

ইমানদার প্রাণিজগৎ, বেইমান মানুষ : গৃহীত। সূত্র জি. ভি. উপরেতি, 'প্রভার্বস অফ কুমাওন অ্যাণ্ড গাড়োয়াল' (লুধিয়ানা, ১৮৯৪), পৃষ্ঠাংক ৩২২-২৩।

AT ১৬০, 'গ্রেটফুল অ্যানিমাল্‌স, আনগ্রেটফুল ম্যান'। বাংলা, গোণ্ডী, কন্নড়, সাঁওতালী ও তামিলে সংকলিত।

পঞ্চম শতকে 'পঞ্চতন্ত্র' বইয়ে এই শ্রুতিবাহিত কাহিনীর প্রথম সাহিত্য রূপ মেলে।

সইয়ে সইয়ে বলা: পুর্নকথিত। সূত্র শঙ্কর, 'উইট অ্যাণ্ড উইজডাম অফ ইণ্ডিয়া'।

AT ২০৪০, 'দি ক্লাইম্যাক্স অফ হর্‌রস'। গুজরাটী ও কন্নড়েও প্রাপ্ত। গল্পটি ইংলিশ, স্পানিশ, হাংগোরিয়ান, রাশিয়ান ও অন্যান্য ভাষাতেও কথিত।

গেঁয়ো বজ্জাত, শহুরে বজ্জাত, বজ্জাতদের রাজা: পুর্নকথিত। সূত্র কে. বি. দাশ এবং এল. কে. মহাপাত্র, 'ফোকলোর অফ ওড়িয়া' (নিউ দিল্লী : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৭৬), পৃষ্ঠাংক ১৪১-৪৮।

AT ১৫২৫, 'দি মাস্টার থীফ' এবং পাঠান্তর সকল। দুনিয়া জুড়ে চোর, তাদের কলাকৌশল ও প্রতিযোগিতা নিয়ে অসংখ্য গল্প বলা হয়। AT নির্দেশিকা ৩২ উপশ্রেণী তালিকাবদ্ধ করেছে। এক ঠক, আরেক ঠককে কেমন করে বোকা বানায়, তা নিয়ে গল্পগুলি ভারতে প্রিয়, একমাত্র ভারতীয় ভাষাগুলিতেই মেলে, যেমন, অসমীয়া, বাংলা, পাঞ্জাবী, কন্নড়, তামিল ও তেলুগু।

যারা মানুষ ঠকায় তারা নিজেরা যখন ঠকে যায়, মানুষ স্পষ্টতই বিশাল মজা পায়। বর্তমান গল্পটি পরপর এমনই ঘটনা নিয়ে : প্রথমে এক জোচ্চোর আরেক জোচ্চোরকে বোকা বানায়, শেষে তৃতীয় জন দু'জনকেই ধোঁকা দেয়। তা ঘটে ধারাবাহিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে। ঘটানাগুলিও যে-যার মতো আলাদা গল্প, এ ভাবেই বলা হয়।

লম্বা দেড়ে কাজি: পুর্নকথিত। সূত্র উইলফ্রেড ই. ডেক্‌সটার, 'মারাঠী ফোকটেল্‌স' (লণ্ডন : হ্যারাপ, ১৯৩৮), পৃষ্ঠাংক ৩৫।

চোখ চালালেই মক্কা!: পুর্নকথিত। সূত্র প্রতাপদত্ত গোস্বামী, 'আসামিজ টেল্‌স

অফ প্রিস্ট্স্ অ্যাণ্ড প্রিস্টহুড', জার্নাল অফ ইণ্ডিয়ান ফোকলোরিস্টিক্স। ভল্যুম ৪, নং ৭-৮ (১৯৮১)।

অবাধ্য ছেলের কাণ্ডকারখানা : কিট্টুরে এক 'গোগুলিগা' অনুষ্ঠান থেকে বি. টি. পাটিল কর্তৃক সংগৃহীত, অনুবাদ এ. কে. রামানুজনের।

AT ৯২৩, 'লাভ লাইক সল্ট', + ৪১৩, 'ম্যারেজ বাই স্টীলিং ক্লোদিং', + ৪৬৫ A, 'দি ম্যান রিজেন্টেড বিকজ অফ হিজ বিউটিফুল ওয়াইফ', + ৫৫৪, 'দি গ্রেটফুল অ্যানিমাল্স'। এই বিশ্বব্যাপী গল্পটির ২৩-এর বেশি ভারতীয় পাঠান্তর আছে অসমীয়া, বাংলা, গোণ্ডী, হিন্দী, কোটা, পাঞ্জাবী, সাঁওতালী ও তামিলে।

এক সুদীর্ঘ কাহিনী, যা সাধারণত পেশাদারী গল্পকথকরা বলে থাকেন, তবে বাড়িতেও বলা হয়। আমার জন্য বর্তমান পাঠটি সংগ্রহ করা হয় এক কন্নড় চারণ (গোগুলিগা)-র কাছ থেকে। অনুষ্ঠাতাদের একট ছোট দল, যারা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ঘোরে। এমন চারণরা সাধারণত অমন দলে থাকে। তাদের অনুষ্ঠানে অন্যান্য রোমাঞ্চকর কাহিনীর মধ্যে পড়ে 'রাজা বিক্রম ও চীনের রাজকন্যা'-জাতীয় গল্প। এগুলি সাধারণত দুঃসাহসিক অভিযান কাহিনী, তাতে থাকে বহু জাদু উপাদান, বিবাহ, দৈত্যদের জয় করা, অন্য দুনিয়ার দীর্ঘ যাত্রা।

লক্ষ্যণীয়, কেমন করে এ কাহিনী শুরু হয় এক কিংলীয়র এষণা দিয়ে, কিন্তু কুরোসাওয়ার 'লীয়র' ভিত্তিক ছবি 'র‍্যান'-এর মতোই, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় পিতা ও পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে অনুব্যবচ্ছেদ করে। গল্পটি, পিতৃ প্রতীক মানুষদের সঙ্গে এক বিরামবিরতিহীন একটানা লড়াইয়ের গল্প, এ সব মানুষদের কাছে যুবকটিকে বারবার স্বীয় যোগ্যতা প্রমাণ করেত হয়; নির্বাসনকারী পিতা, যে রাজা তার স্ত্রীর ওপর লোভে তাকে বিপদসংকুল অভিযানে পাঠান, এবং দেবরাজ ইন্দ্র, যিনি তাকে স্বীয়কন্যাদানের আগে নানা কঠিন পরীক্ষা নেন।

হান্‌চি : এই অনুবাদের পূর্বতন সংস্করণগুলি বেরোয় 'সাদার্ন ফোকলোর কোয়ার্টারলি'-তে ১৯৫৬ সালে, এবং একটি আলোচনায়, 'হান্‌চি : এ কান্নাড়া সিন্‌ডারেল্লা', অ্যালান ডানডেস সম্পাদিত 'সিন্‌ডারেল্লা: এ ফোকলোর কেসবুক'-এ (নিউইয়র্ক; গারল্যাণ্ড পাবিলিশিং, ১৯৮৩)।

AT ৫১০ B, 'দি ড্রেস্ অফ গ্যোল্ড অফ সিলভার, অ্যণ্ড অফ স্টার্স্'স + ৮৯৬, 'দি লেচেরাস হোলি ম্যান অ্যাণ্ড দি মেডেন ইন এ বক্স। AT ৫১০ B, 'বাংলা, গোণ্ডী, হিন্দী ও তামিল; ৮৯৬ (যা বহু আগে কথাসরিৎসাগরে দেখা গেছে) হিন্দী, কোংকণী, তামিল ও তেলুগুতে প্রাপ্ত।

সিন্‌ডারেল্লা কেন্দ্রিক গল্পগুলি পৃথিবীর সর্বত্র বলা হয়। আলাস্কা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া থেকে দক্ষিণ আমেরিকা, সর্বত্র। প্রাচীনতম নিদর্শনের খোঁজ মিলেছে নবম শতকের চীনে। তবু সবগুলি একই কথা বলে না। চার্লস পেরোর

সিন্ডারেল্লা কাহিনী, ফরাসী রাজদরবারে মনোমত ভাবে রচিত। তাতে রান্নাঘরের দাসী পৌঁছয় সিংহাসন অবধি। ভারতের হান্চি-কাহিনী এক আদর্শ স্ত্রীর কেমন হওয়া উচিত তাই বলে। তার মুখোশ খুলে ফেলা হয়, ধনী পুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হয়, তারপরেও গল্প চলতে থাকে।

তাকে পরিবারের গুরুদেবের বিরক্তিকর ব্যবহারের মুখোমুখি হতে হয়, প্রতিরোধ করতে হয় তার মন্ত্রতন্ত্র ও ইশারাইংগিত, আবার নতুন করে আবিষ্কৃত হতে হয়, পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে হয়।

কিন্তু সিন্ডারেল্লা কাহিনী শ্রেণীটির দুটো অংশ আছে; তাকে পাওয়া যায়, সে হারিয়ে যায়, আবার খোঁজ মেলে তার। (এই কাঠামোর কারণে কিছু অধিক-কল্পনাপ্রবণ গবেষকরা এমনও ভেবেছেন, যে সিন্ডারেল্লা সূর্যের প্রতীক, যা রোজই হারায়, আবার পাওয়া যায়।) যাইহোক, ভারতীয় গল্পের শুরুতে এক ভাই তার বোনকে কামনা করে—যেমন কিছু য়ুরোপীয় সিন্ডারেল্লার কাহিনী শুরু হয় পিতার অজাচারী মনোযোগ দিয়ে। বোনটি ভাইয়ের হাত থেকে পালায়, এক দয়ার্দ্রহৃদয় বুড়িকে পায় (যিনি পরী-মার ভূমিকা নেন), এবং ধনী পরিবারটির দেখা পায়। দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত হয়, গুরুদেবের ব্যভিচারী কলাকৌশল থেকে বাঁচার জন্য তার লড়াই। এ ভাবে দুটি অংশে বর্ণিত হয় দুটি প্রলোভন,—অজাচার ও ব্যভিচার, এবং মেয়েটি দুটিকেই প্রতিরোধ করে।

ফরাসী সিন্ডারেল্লা তার কাচের চটির জন্যে পরিচিত। ভারতীয় হান্চি পরিচিত তার নিজস্ব বিশিষ্ট চালের আহার্য তৈরির জন্য। হিন্দু জগতে জাত, শ্রেণী, সব রকম ব্রতের মধ্যে নিহিত থাকে খাদ্য প্রতীকীয়তা। খাওয়া এবং যৌনমিলন বুঝাতে সংস্কৃতে যে সব শব্দ আছে, তার মূল শব্দটি একই, 'ভোজ'। ফরাসী গল্পের কাচের চটি হয়তো যোনি, এবং সমাজে শ্রেণীগত অবস্থান, দুটোরই প্রতিনিধি। চাল ও দুধের এক বিশেষ মিষ্টান্ন হয়ে ওঠে হান্চির নারীত্বের; আহার্য যোগানদার হিসেবে পরিবারে তার স্থানের; তার সেই আপাপবিদ্ধ যৌন শুচিতা, যা পরিবারের ভিতরের ও বাইরের সকল প্রলোভনকেই প্রতিরোধ করে; সব কিছুরই প্রতীক। এ ভাবে সিন্ডারেল্লা কাহিনী শ্রেণীটি ভারতীয় গল্পে পৃথক প্রাসঙ্গিকতা ও অর্থদ্যোতকতা অর্জন করে।

মোষ থেকে মোরগ : ইন্দুমতী শিওরে, 'ফেকটেল্স অফ মহারাষ্ট্র' (নিউ দিল্লী : স্টালিং পাবলিশার্স, ১৯৭৩), পৃষ্ঠাংক ৬৩-৬৭।

AT ১৪১৫ A, 'দি ফুলিশ ট্রেডার'। হিন্দী, কোংকণী এবং সাঁওতালীতেও সংকলিত।

কুমার আর তার বামাঙ্গিনী : সূত্র এ. কে. রামানুজন, 'দি প্রিন্স হু ম্যারেড হিজ ওন লেফ্ট হাফ', আছে মার্গারেট কেস ও জেরাল্ড ব্যারিয়ার সম্পাদিত, 'আস্পেক্টস অফ ইণ্ডিয়া : এসেজ ইন অনার অফ এডোয়ার্ড সি. ডিমক, দুনিয়ার'-এ, (দিল্লী : মনোহর,

১৯৮৫)। আলোচনাটিতে এই কাহিনীর বিশদ বিশ্লেষণ আছে।

AT ৮৫১ A, 'তুরানদোৎ, প্রিন্‌সেস হু সেট্‌স রিড্‌ল্‌স', + ৫১৬ A, 'দি সাইন ল্যাংগোয়েজ অফ দি প্রিন্‌সেস' + এষণা H ৮০৫, 'রিড্‌ল্ অফ দি মার্ডারড লাভার'। কাশ্মীরী এবং নেওয়াসি (নেপাল) ভাষাতেও সামান্য অন্য চেহারায় প্রাপ্ত।

গলায় তৈরি মোষ : পুর্নকথিত। সূত্র এস. এম. নাতেশা শাস্ত্রী, 'দি ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়রি', মার্চ ১৮৮৭, পৃষ্ঠাংক ৮০-৮৩।

বিষয়বস্তু AT ২২১৪, অ্যাবসার্ড জেনেরালাইজেশন ফ্রম এ পার্টিকুলার ইনসিডেন্ট।

সংস্কৃত নিশ্চয়ই এক ধ্রুপদী ভাষা। কিন্তু ভারতে এর একটি কথ্য ঐতিহ্যও আছে। বহু গল্প বলা হয় যে ভাষায়, তাকে 'সংস্কৃতের লৌকিক রূপ' বলা যায়। অথবা তা হয়তো আমাদের মাতৃভাষাতেই বলা, সঙ্গে জুড়ে দেয়া হ'ল কিছু সংস্কৃত বাঁধাবুলি, বা প্রবাদ। যেমন এই গল্পে, লোকটিকে ঠকানো হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ও সেই ঠকানোটাকে সর্বত্র সর্বভূতে দেখছে। ওই একটি প্রসঙ্গে প্রথমে বলা হয় এমন প্রসঙ্গে, যে প্রবাদটি বেশ খেটে যায়। গল্পটা, প্রবাদের ব্যাখ্যা হিসেবে পরে বলা হয়। 'আমার আসল চেহারা দেখাব।' গল্পটি দ্রষ্টব্য।

গল্পের গরু গাছে ওঠে : পুর্নকথিত। সূত্র চিল্লি। 'ফোকটেল্‌স অফ হিন্দুস্তান', পৃষ্ঠাংক ১১-২০।

AT ১৯২০ F, 'হি হু সেজ', দস্ট'স্ এ লাই' মাস্ট পে এ ফাইন।' কাশ্মীরী ও পাঞ্জাবী থেকেও সংকলিত।

দু'জন মানুষ গাঁজাখুরি গল্প বলা নিয়ে এই যে গল্প, এর কাঠামোটা বেশ মজার। গল্পের মধ্যে গল্প বলা হচ্ছে শ্রোতা ও তার গুষ্টীবর্গকে অবমাননা করার জন্যে; যখন সে প্রতিবাদ করবে, বলবে এ মিথ্যে, তাকে জরিমানা দিতেই হবে। গল্পের ভেতরে গল্প, তা কাঠামো গল্পটাকে খতম করে দেয়। ভিতরের গল্পের চরিত্রগুলোকে সম্পর্ক পাতিয়ে দেয় বক্তার সঙ্গে; বাইরের গল্পের চরিত্রগুলোকে জুড়ে দেয় শ্রোতার সঙ্গে। এ এক প্রক্রিয়া। এ ভাবেই গল্প (এবং প্রবাদ) চলতে থাকে। গল্পের ভেতরের চরিত্রগুলো হয়ে ওঠে গল্পের বাইরের চরিত্রগুলোর মতো। গল্পের ভেতরের পরিস্থিতি হয়ে ওঠে বাইরের পরিস্থিতিরই রূপক। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

আয়না দিয়ে : পুর্নকথিত। সূত্র সি. ভি. সুব্রমিয়া পান্তুলু, 'ফোকলোর অফ দি তেলুগুজ', দি ইণ্ডিয়ান অ্যালটিকোয়ারি', জানুয়ারি ১৮৯৭, পৃষ্ঠাংক ২৭-২৮।

AT ১৮০৪ B, 'পেসেন্ট উইথ দি ক্লিংক অফ মানি', + মোটিফ J ১১৭২, 'জাজমেণ্ট অ্যাজ রিবিউক টু আনজাস্ট প্লেনটিফ'।

তোতা যখন কুরুস্বা : পুর্নকথিত। সূত্র এম. বি. এমিনো, 'কোটা টেক্সট্‌স', ভল্যুম ২ (বার্কলি অ্যাণ্ড লস্ ১৯৪৬), পৃষ্ঠাংক ২৭০-৮৯।

AT ২৩০ A, 'বার্ডস এস্‌কেপ বাই শ্যামিং ডেথ,' + 'দি প্যারট প্রিটেণ্ডস্ টু বি

গড'। দুটি শ্রেণীই প্রাচীনকালে দেখা গেছে 'পঞ্চতন্ত্র' বইয়ে এবং দুটিই হিন্দী, কন্নড়সহ অন্যান্য ভাষায় শ্রুতিবাহিত ঐতিহ্যের অংশ।

নীলগিরি অথবা উটাকামণ্ড পর্বতে কুরুম্বা, কোটা ও টোডারা প্রতিবেশী আদিবাসি গোষ্ঠী। এই কোটা জাদুবিদ্যা কাহিনীতে এক মানুষ এক তোতার দেহে ঢুকে পড়ে এবং এই মোটিফের সঙ্গে যুক্ত আছে অনেক তোতা কাহিনী।

অনেক গল্পধারায় তোতারা কেন্দ্রচরিত্র। যেমন সংস্কৃত 'শুকসপ্ততি', 'তুতিনামেহ' (ত্রয়োদশ শতক), এবং হিন্দী 'তোতা কাহিনী'। প্রথমটিতে একটি লোক এক তোতাকে তার স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষার ভার দিয়ে চলে যায়। মেয়েটি যখন প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য বাড়ি থেকে বেরোতে যায়, তোতা একটা গল্প বলতে শুরু করে ও সারারাত গল্প বলে। রাতের পর রাত এ গল্প বলে, মানুষটি ফিরে আসে, পঁচাত্তরটি গল্পের পর ও স্ত্রীকে সচ্চরিত্রাই পায়।

হয়তো তোতা, ময়না মানুষের কথা নকল করতে পারে বলে, তারাই হয় সেই পাখি, যারা নায়ক-নায়িকার বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী বলে, যেমন 'আট নম্বর চাবি', তে। 'টিয়ার নাম হীরামন'ও দ্রষ্টব্য।

আট নম্বর চাবি : পুর্নকথিত। সূত্র কিনকেইড় 'ফোকটেল্স অফ সিন্ধু অ্যাণ্ড গুজরাট', পৃষ্ঠাংক ৪৫-৫৪।

য়ুরোপে এটি 'কেথফুল জন'-এর কাহিনী বলে কথিত। AT ৫১৬ অনুসারে। বাংলা, গোণ্ডী, হিন্দী, কন্নড়, মারাঠী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী ও তামিলে সংকলিত।

পর্তুগাল থেকে ভারত অবধি কথিত এ কাহিনীর উৎসটি ভারতীয় বলেই বিবেচিত। একাদশ শতকে 'কথাসরিৎ সাগর'-এ এ কাহিনী দেখা গেছে। তিনটি বিপদের মোটিফ-গুচ্ছ (যেমন, কুমারের ওপরে গাছ বা সেতু ভেঙে পড়া, বিষমেশানো খাদ্য, শোবার ঘরে সাপ ঢোকা); এক বিশ্বাসী ভৃত্য বা আত্মীয়ের দুটি পাখির কথোপকথন শোনা (অথবা ভাগ্যদেবী বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করছেন); এতদ্বারা বিপদ কাটানো; এ সব অনেক গল্পে আছে। 'না-বলা কাহিনী'তে, গল্পগুলির কথিত হবার প্রয়োজনের উপর জোর দেয়া হয়েছে; 'আটনম্বর চাবি'-তে জোর দেয়া হচ্ছে মন্ত্রীর বিশ্বস্ততা এবং রোমান্সের ওপর; 'ভাইয়ের দিন' গল্পে প্রাধান্য পাচ্ছে ভাই ও বোনের ভালবাসা এবং যে ভাবে বোন ভাইকে বাঁচাচ্ছে, তাই। ('ভাইয়ের দিন' এক ব্রতকথাও বটে) এ ভাবে মোটিফ ও গল্পের মূলকেন্দ্রবিন্দুকে, পৃথক পৃথক অর্থ এবং সূত্র অনুযায়ী তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে। একই বিষয়বস্তু অনেক গল্প বলে।

তাঁতির স্বর্গযাত্রা : গৃহীত। সূত্র 'নর্থ ইণ্ডিয়ান নোট্স অ্যাণ্ড ক্যুয়েরিজ', ভল্যুম ৪, (ফেব্রয়ারি, ১৮৯৫), পৃষ্ঠাংক ১৯৩।

AT ১২৫০ B, 'দি ফুল ড্যাংলিং ফ্রম দি এলিক্যাণ্টস টেইল' (মোটিফ J ২১৩৩.৫.২)। বাংলা, পাঞ্জাবী ও সাঁওতালীতেও কথিত।

বাঘ-বানানে ওয়ালা: শৈশবে গ্রন্থকার কন্নড়ে শুনেছিলেন।

মোটিফ J ১৭০৫.৩ 'ফুলিশ পাণ্ডিট্স', + J ২১৩০, 'ফুলিশ ডিস্‌রিগার্ড অফ পার্সোনাল ডেঞ্জার'।

মানুষের তৈরি এক ফ্রাংকেনস্টাইন দৈত্য, যে স্বীয় স্রষ্টাকে হত্যা করে, তার সদৃশ এই প্রাচীন ভারতীয় কাহিনী প্রাচীন দিনে 'পঞ্চতন্ত্র' বইয়ে মেলে। সেখানে তিন বিদ্বান ব্রাহ্মণ এক সিংহ তৈরি করেন। আমি বরাবর বাঘের গল্পই শুনেছি, সিংহের নয়।

আমার কথাটি ফুরোল: গৃহীত। সূত্র দাস ও মহাপাত্র, 'ফোকলোর অফ ওড়িশা', পৃষ্ঠাংক ১৪৮-৪৯।

অসমীয়া ও বাংলায় অনুরূপ গল্প ও ছড়া মেলে। কখনো বা ছড়াটি হয় এক পরিপূর্ণ কাহিনী। অন্য ধরনের উপসংহারের জন্য 'চিলের মেয়ে'-র উপর টীকা দ্রষ্টব্য।

তারপর? ফুড়ুৎ!: পুর্নকথিত। সূত্র রেভারেণ্ড এ. মানোয়ারিং, 'মারাঠী প্রভার্বস', (অক্সফোর্ড : ক্ল্যারেণ্ডন প্রেস, ১৮৯৯), পৃষ্ঠাংক ৩৭।

AT ২৩০০, 'এন্‌ডলেস্ টেল্‌স'। হিন্দী ও তেলুগুতেও সংকলিত।

অনুমতিদানের স্বীকৃতি

আগে প্রকাশিত লেখা পুনর্মুদ্রণের অনুমতিদানের জন্য নিম্নলিখিতদের সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি জানানো হচ্ছে।

অ্যামেরিকান ফোকলোর সোসাইটি : এরিন মুরের 'ড্রীম ব্রেড : আন এক্‌সেমপ্লাস ইন এ রাজস্থানী পঞ্চায়েত' থেকে 'স্বপ্নে ভোজ খাওয়া' গৃহীত। অ্যামেরিকান ফোকলোর সোসাইটির অনুমতিক্রমে 'জার্নাল অফ অ্যামেরিকান ফোকলোর' ভল্যুম ১০৩, নং ৪০৯ (জুলাই সেপ্টেম্বর, ১৯৯০) থেকে পুনর্মুদ্রিত।

সেণ্টার ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ, মানোয়াতে অবস্থিত য়ুনিভার্সিটি অফ হাওয়াই : 'হু নীড্‌স ফোকলোর? দি রেলেভেন্‌স অফ ওরাল ট্রাডিশানস্ টু সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ', ১৯৯০ থেকে 'বোকাদের রাজ্যে' গৃহীত। প্রথম প্রকাশ সাউথ এশিয়া অকেশনাল পেপার্‌স সিরিজ, নং ১ হিসাবে। অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

দিদেলাস্ : 'অ্যানাদার ইণ্ডিয়া' থেকে 'মৃত রাজপুত্র আর কথাকওয়া পুতুল' পুনর্মুদ্রিত। সূত্র 'দিদেলাস', জার্নাল অফ দি আমেরিকান একাডেমি অফ আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্সস, ভল্যুম ১১৮, নং ৪ (ফল্ ১৯৮৯)। অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

গারল্যাণ্ড পাবলিশিং ইনকর্পোরেশন : হান্‌চি : এ কন্নড় সিন্‌ডারেল্লা 'গৃহীত' সিন্‌ড্রারেল্লা : এ ফোকলর ক্রেসবুক থেকে, অ্যালান ডান্‌ডেস সম্পাদিত। অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

মনোহর বুক সার্ভিস : 'অ্যাসপেক্টস অফ ইণ্ডিয়া : এসেজ্ ইন অনার অফ এডায়ার্ড সি, ডিমক, জুনিয়র', সম্পাদনা মার্গারেট কেস এবং নেরাল্ড ব্যারিয়ার হইতে গৃহীত। গল্প, 'কুমার ও তার বামাঙ্গিনী', অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া : শ্যাম পরমারের 'ফোকলোর অফ মধ্যপ্রদেশ' থেকে 'সোনা ও রূপা', এবং কে. বি. দাস এবং এল. কে. মহাপাত্র সম্পাদিত 'ফোকলোর অফ ওড়িশা' থেকে 'গেঁয়ো বজ্জাত, শহুরে বজ্জাত, বজ্জাতদের রাজা' গৃহীত। অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস : ভেরিয়ার এল্যুইনের 'ফোকলোর টেল্‌স্ অফ মহাকোশল' থেকে 'না-বলা গল্প' গৃহীত। অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

প্রিন্সটন য়ুনিভার্সিটি প্রেস : ডেভিড শুলম্যানের 'দি কিং অ্যাণ্ড দি ক্রাউন ইন সাউথ ইণ্ডিয়ান মীথ অ্যাণ্ড হিস্‌ট্রি' থেকে 'তেনালী রামের স্বপ্ন' গৃহীত।

স্টার্লিং পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : ইন্দুমতী শিত্তরের 'ফোকটেল্‌স অফ মহারাষ্ট্র' থেকে 'মোষ থেকে মোরগ: অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

য়ুনিভার্সিটি অফ কালিফোর্নিয়া প্রেস : এম. বি. ইসিনোর 'কোটা টেক্‌স্‌টস' (ভল্যুম ২, নং ২, ১৯৪৬) থেকে 'তোতা যখন কুরুব্বা' অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

য়ুনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস : এডোয়ার্ড সি. ডিমক, জুনিয়র কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত 'দি থীফ অফ লাভ' থেকে 'গোপালভাঁড়ের তারা গোনা'; রিচার্ড এম. ডরসেন সম্পাদিত 'ফোকটেল্‌স টোল্‌ড অ্যারাউণ্ড দি ওয়ার্লড' থেকে 'সাপিনী মা', এবং 'তেজা ও তেজি'; ই. এফ. বেক ইত্যাদি সম্পাদিত 'ফোকটেল্‌স অফ ইণ্ডিয়া' থেকে এক কুসুমিত গাছ', অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

য়ুনিভার্সিটি প্রেস অফ কেন্টাকি : 'সাদার্ন ফোকলোর কোয়ার্টারলি', সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ থেকে 'জাদু কাটি' অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত।

সম্পাদক প্রসঙ্গে

এ. কে. রামানুজন 1929 সালে মহীশূরে জন্মান। মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয়, পুণের ডেকান কলেজ এবং ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। শেষোক্ততে তিনি ভাষাবিদ্যায় পি. এইচ. ডি. পান। অনুবাদক ও কবি হিসেবে ন্যাশনাল এনডাওমেণ্ট ফর হিউম্যানিটিজ থেকে দুটি গ্রাণ্ট, একটি ম্যাকআর্থার ফেলোশিপ, একটি ফুলব্রাইট ফেলোশিপ সহ অসংখ্য গ্রাণ্ট ও ফেলোশিপ পেয়েছেন। 'দি স্ট্রাইডার্স', 'রিলেশান্স' ও 'সিলেক্টেড পোয়েম্স' সহ অনেক কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা তিনি। তাঁর ভারতীয় ভাষা থেকে অনুবাদের মধ্যে আছে 'স্পীকিং অফ শিভা', 'সাম কন্নড় পোয়েম্স' 'সমস্কারা', হিম্স্ ফর দি ড্রাউনিং', এবং 'পোয়েম্স অফ লাভ অ্যাণ্ড ওয়ার'। তাঁর অনুবাদ কবিতা ও প্রবন্ধ ব্যাপক প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকা ও সংকলনসমূহে। রামানুজন ছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে সাউথ এশিয়ান ল্যাংগোয়েজেস অ্যাণ্ড সিভিলাইজেসন্সের উইলিয়াম ই. কোলাভিন অধ্যাপক এবং কমিটি অন সোশ্যাল থট-এর সদস্য।

Lasertypeset at Ess Ess Enterprises. New Delhi-110055
and printed at J. J. Offset Printers, Wazirpur. Delhi-110035